গবেষণা পত্রিকা
A Research Journal

Special Volume-4
Issues and Discourses Around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022

Faculty of Arts
University of Rajshahi, Bangladesh

A Research Journal
Special Volume-4
Issues and Discourses Around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205
April 2023

Cover Design
Dr. Suman Sen

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Kadirganj, Rajshahi-6100

Price: Tk. 500.00, $10

Contact Address
Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205, Bangladesh
Email: dean.arts@ru.ac.bd
URL: www.ru.ac.bd/arts

Message from the Chief Editor

It is my great pleasure that this volume (Volume 4) of research papers is published with 46 papers that were presented at the first ever International Conference on Issues and Discourses Around Liberal Arts and Humanities held on 13-14 November 2022 by the Faculty of Arts, University of Rajshahi. In total 220 papers were presented at the conference but 115 of them were submitted for publication. These 115 papers were reviewed and after a careful scrutiny 96 were finally recommended for publication in two volumes. I heartily congratulate those scholars of different disciplines whose papers have been published here. All those papers are of high standard and I believe they will be a good read for both students and teachers. The publication of these volumes has been possible for the collective effort put in by the experienced members of the editorial board. I am grateful to this board for their sincere and enthusiastic cooperation in the venture. I also thank the officers of the faculty without whose assistance the publication of these volumes would not have been possible. My sincere thanks are also due to the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their cordial support.

Professor Dr. Md. Fazlul Haque

Chief Editor
Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

সূচিপত্র

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

আল-ফারাযদাক ও তাঁর কাব্য প্রতিভা
(Al-Farazdak and His Poetic Genius)

Dr. Md. Belal Hossain*

Abstract : Al-Farazdak is one of the few poets who made significant contributions to the world of Arabic poetry during the Umayyad period. He was born in Basra in 640 AD, 19 AH, during the caliphate of Caliph Umar. Farajdak was a boy with very strong memories. So in a short time he memorised the Holy Quran completely. He visited the courts of various caliphs and rulers and composed hymns for them. Caliph Mu'awiyah, Caliph 'Abdul Malek, Sulaiman ibn' Abidul Malik and Hisham ibn 'Abd al-Malik were among those whom he regularly visited. Al-Farazdak was one of the three best poets of the Umayyad period. His poetry is like a real depiction of the social system of that time in the style of construction, stylistic ease, beauty of satirical deprivation, decorative art. In his poems, self-conceit, family pride, courage, heroism and satirical descriptions have found a place. The poet Al-Farazdak and his poetic genius are depicted in this article.

ভূমিকা

আল-ফারাযদাক উমাইয়া যুগের একজন প্রথিতযশা কবি ছিলেন। তিনি কাব্য সাহিত্যে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর লেখনী ছিল অত্যন্ত ক্ষুরধার। তাকে কাব্য পুনর্জাগরণ আন্দোলনের পৃথিকৃত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি উমাইয়া যুগের তিন সেরা কবির অন্যতম একজন। অপর দুইজন হচ্ছেন আল-আখতাল ও জারীর। তাঁদের প্রত্যেকের কবিতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফারাযদাকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর অহংকার ও গৌরব নির্ভর কবিতা। গৌরব ও ফখরকে ভিত্তি করেই তাঁর ব্যঙ্গ কাব্য ও নাকায়িদ প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমারাহ, সমাজপতি ও নেতৃস্থানীয় ধনী ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা কীর্তন করে অর্থ, উপঢৌকন ও সম্মান লাভ করেছেন এবং প্রতিপক্ষের কুৎসা রচনা করে কাব্যচর্চা করেছেন। উন্নত শৈলী, অলঙ্কারপূর্ণ শব্দ ও শক্তিশালী বাক্য বিন্যাসে ফারাযদাকের কবিতা যেন মজবুত ইমারত। নিম্নে ফারাযদাকের জীবনী ও তাঁর কাব্য প্রতিভা এ প্রবন্ধে চিত্রিত হয়েছে।

নাম ও বংশ পরিচয়

কবির প্রকৃত নাম হাম্মাম। উপনাম আবূ ফিরাস। তাঁর ডাকনাম বা উপাধি আল ফারাযদাক। এ ফারাযদাক উপাধিতে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১] ফারাযদাক শব্দটি মূল ফারসী فرزده (ফারাযদাহ) শব্দ হতে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ তন্দুরে পতিত রুটি। পোড়া রুটির টুকরা যা অগ্নিদগ্ধ হয়ে সংকুচিত ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। কবির শারীরিক গঠন খাঁটো ও কুৎসিত মুখাবয়বের কারণে তাকে ফারাযদাক নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর পিতার নাম গালিব ও মাতার নাম লায়লা বিনত হারিস আদ দাবিয়্যাহ। যিনি বিখ্যাত সাহাবী আল-‘আকরা ইবন হারিসের বোন।[২] তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো,

হাম্মাম ইবন গালিব ইবন সা‘সা‘আ ইবন নাজিয়া ইবন ‘ইকাল ইবন মুহাম্মাদ ইবন সুফ্য়ান ইবন মুজাশি‘ ইবন দারিম ইবন মালিক ইবন হানযালা ইবন যায়দ মানাত ইবন তামীমী আল বিসরী আশ্-শা‘ইর আল-মা‘রুফ বিল ফারাযদাক।[৩]

তাঁর পিতা-মাতা উভয়ই উচ্চ বংশ মর্যাদা ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। কবির পিতা গালিব বানূ তামীমের শাখাগোত্র দারিম গোত্রের বিখ্যাত দাতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। একবার তিনি মক্কা মুকাররামায় কারো নাম জিজ্ঞেস না করেই লোকদের মাঝে চল্লিশ হাজার দিরহাম অর্থ দান করেন। এজন্য ঐতিহাসিকগণ তাকে জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগের দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কবির দাদা সা‘সা‘আ ছিলেন

* Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh.

জাহিলী আরবের একজন খ্যাতনামা মহৎ ব্যক্তি। তাকে 'মুহয়ি'উল মাও'উদাত' (محيى المؤودات) জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যার জীবন সঞ্চারী বলা হত।

জন্ম ও শৈশবকাল

ফারাযদাকের জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষন করেছেন। ঐতিহাসিক আহমাদ ইস্কান্দারী ও আহমাদ হাশিমীর মতে, ফারাযদাক খলীফা 'উমার (রা.) এর খিলাফতকালে ১৯ হিজরী মোতাবেক ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪] হান্না আল-ফাখূরী ও কার্ল ব্রুকালম্যানের মতে, তিনি ২০ হিজরী মোতাবেক ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন।[৫]

কবির শৈশব অতিবাহিত হয় বসরার নিকটবর্তী মরু এলাকায়। পারিবারিক ঐতিহ্যগতভাবে গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী ফারাযদাক স্বীয় গৃহে সুখ-স্বাচ্ছন্দেই তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। ইসলামের নানাবিধ শিক্ষায় অবগত হলেও তিনি জাহিলী ভাবধারার মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে ওঠেন। ফলে ভোগ-বিলাসে অভ্যস্থ ফারাযদাকের বাল্যকালের শেষাংশে সীমাহীন প্রমোদ, মাদকাশক্তি ও অনৈতিকতা তাঁর জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাছাড়া গোত্রীয় মর্যাদা ও বংশীয় আভিজাত্য তাকে আরো বেপরোয়া করে তোলে।[৬]

শিক্ষা জীবন

তৎকালীন সময়ে শিক্ষার তেমন অনুকূল পরিবেশ ছিল না। বিধায় পারিবারিক পরিবেশে কবি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ফারাযদাক পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয় দিক দিয়েই সু-শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। তাদের উভয়ের কবিতার প্রতি আকর্ষণ ছিল অস্বাভাবিক। কাব্যের প্রতি ভালোবাসার কারণেই পুত্র ফারাযদাককে কাব্যমুখী শিক্ষা প্রদান করেন। পিতা-মাতার উৎসাহের ফলে ফারাযদাক অল্প বয়স হতেই কবিতা রচনা শুরু করেন।[৭] বাল্যকালে কবিতা রচনা সম্পর্কে কবি নিজেই বলেন,[৮] كنت أهاجي شعراء قومى وأنا غلام فى خلافة عثمان [আমি 'উছমানের (রা.) খিলাফতকালে অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। সে সময় নিজ গোত্রের কবিদের কুৎসামূলক কবিতার মোকাবিলা করতাম।]

পুত্রের কাব্য প্রতিভা দেখে পিতা সন্তানকে নিয়ে হযরত 'আলীর (রা.) দরবারে গমন করেন এবং বলেন, ابنى وهو شاعر [এ আমার পুত্র এবং সে কবিতা বলতে পারে।] উত্তরে খলীফা 'আলী (রা.) বললেন, علمه القرآن فهو خير له من الشعر[৯] (তাকে কুরআন শিক্ষা দাও। কবিতা অপেক্ষা এটাই তাঁর জন্য অধিকতর কল্যাণকর হবে।]

'আলীর (রা.) এই পরামর্শ কবির মনে দারুনভাবে রেখাপাত করে এবং পবিত্র কুরআন মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে বন্দি করে রাখেন। ফারাযদাক অত্যন্ত প্রখর স্মৃতি সম্পন্ন বালক ছিলেন। কাজেই তিনি অল্প সময়ের মধ্যে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে পায়ের শিকল খুলেছিলেন। কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ না করা পর্যন্ত তিনি আর কবিতা রচনা করেননি।[১০]

বৈবাহিক জীবন

ফারাযদাক দাম্পত্য জীবনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁর চাচাতো বোন নাওয়ারকে এক নাটকীয় কৌশলে বিয়ে করেন। কুরাইশ বংশের জনৈক যুবকের সঙ্গে যখন নাওয়ারের বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছিল; তখন খারিজীগণ কর্তৃক নাওয়ারের পিতা নিহত হওয়ায় চাচাতো ভাই ফারাযদাককে উক্ত বিয়ের অভিভাবক নিযুক্ত হওয়ার অনুরোধ করেন। বিবাহ কার্য সম্পাদনের জন্য দারিম ইবন মুজাশি' এর মাসজিদে সমবেত হন। কিন্তু ফারাযদাক উক্ত সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা পরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর দরূদ পাঠ করে জনসম্মুখে ঘোষণা করেন-[১১]

قد علمتم أن النوار قد ولتني أمرها وأشهدكم أني قد زوجتها نفسي على مائة ناقة حمراء-

[নিশ্চয় আপনারা অবগত আছেন আমিই একমাত্র নাওয়ারের অভিভাবকত্ব করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আপনারা সাক্ষী থাকুন আমি নিজেই তাকে একশত লাল উটনীর মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করলাম।]

এভাবে ফারাযদাক নাওয়ারকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। নাওয়ার ফারাযদাকের এ বিয়েতে রাজী না থাকায় তাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক তৈরী হয়নি। কারণ ফারাযদাক ছিলেন ধর্মের প্রতি উদাসীন ও ভবঘুরে আর নাওয়ার ছিল অত্যন্ত পূর্ণ্যবতী ও ধার্মিক।

দাম্পত্য জীবনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকট আকার ধারণ করলে নাওয়ার বিয়ে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে নাওয়ার সুফী হাসান আল-বাসরীকে সাক্ষী রেখে ফারাযদাককে তালাক দেন।[১২] ফারাযদাক তালাক প্রত্যাহারের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং এ ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হন। নাওয়ারের গর্ভে চারটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। ফারাযদাক এছাড়াও আরো কয়েকটি বিবাহ করেন। যেমন-রূহাহমা বিনত গুনাইম, যাবিয়াহ বিনতে হালিম এবং হারিছ ইবন 'আবদের কন্যার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের গর্ভেও একাধিক সন্তানের জন্ম হয়।[১৩]

কর্মজীবন

ফারাযদাক কর্মজীবনে একক কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন না। তিনি খলীফা ও শাসকবর্গের দরবারে অর্থবিত্তের জন্য ঘুরে বেড়াতেন। উমাইয়া শাসকবৃন্দেরও কাব্যের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা ছিল। খলীফাদের কাজে জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে কবিদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। স্বচ্ছল ও অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় ফারাযদাক প্রারম্ভিক জীবনে জীবিকার জন্য তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পেশা বেছে নেননি। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে তিনি জীবনের মূল্যবান সময় যৌবনকাল নাওয়ারসহ বিভিন্ন রমণীর পেছনে অতিবাহিত করেন। তিনি বিভিন্ন সময় খলীফা, আমীর উমারা ও রাজনৈতিক কর্মচারীদের প্রশংসাগীতি রচনা করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মতের অমিল হলে ব্যঙ্গ কবিতা ছুঁড়তে পিছপা হতেন না। অনেক সময় কারণে অকারণে তাদের বিরোধীমূলক কবিতা রচনা করে বহু উপহার উপঢৌকন পেয়েছেন।[১৪] যাদের দরবারে তাঁর নিয়মিত উঠাবসা ছিল তাদের মধ্যে খলীফা মু'আবিয়া (রা.), খলীফা 'আব্দুল মালেক, সুলায়মান ইবন 'আবিদল মালিক, ইয়াযীদ ইবন 'আব্দিল মালিক ও হিশাম ইবন 'আব্দিল মালিক ছিলেন অন্যতম। তাদের দরবারে আগমন ও প্রশংসাগীতি ছিল নিছক বাণিজ্যিক ও স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে। যেমন সুলায়মান ইবন 'আব্দিল মালিক খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলে কবি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে এক দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। উক্ত কবিতার কয়েকটি পুংক্তি নিম্নরূপ-

تركتُ بنى حَرْبٍ وكانوا أئِمَةً * ومروانَ لا آتيه والمتخيَّراَ
أباك، وقد كان الوليدُ أرادنى * ليفعل خيرًا أو ليُؤْمِنِ أوَ جَرًا
فما كنتُ عن نفسى لأرحل طائعًا * إلى الشام حتى كنت أنت المُؤَمَّرًا[١٥]

[আমি বানূ হারবকে পরিত্যাগ করেছি যারা জাতির ইমাম ছিলেন এবং আপনার পিতামহ মারওয়ানকেও পরিত্যাগ করেছি।

আর ওয়ালীদ ইবন 'আব্দিল মালিক আমার কল্যাণের জন্যই আমাকে আহ্বান করেছিলেন।

আপনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কখনও আমি আনন্দিত হয়ে সিরিয়ায় আসিনি।]

ইন্তিকাল

ফারাযদাকের মৃত্যু সন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, কবি জারীরের মৃত্যুর চল্লিশ দিন মতান্তরে আশি দিন পূর্বে ১১০ হিজরী মোতাবেক ৭২০ খ্রিস্টাব্দে পেটে ফোঁড়া কিংবা জ্বরের ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে বসরায় ইন্তিকাল করেন।[১৬] ঐতিহাসিক Clement Huart এর মতে, কবি ফারাযদাক মরুভূমিতে ভ্রমণকালীন সময়ে চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭২৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১৭]

ফারাযদাকের কাব্য প্রতিভা

আরবী সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র ফারাযদাক ছিলেন উমাইয়া যুগের তিন সেরা কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। যুগের অন্য দুইজন সেরা কবি হলেন আল-আখতাল ও জারীর। তাঁদের প্রত্যেকের কবিতার আলাদা স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নির্মাণরীতি, শৈলীগত সৌকর্য, ব্যঙ্গার্থক ব্যঞ্জনার সৌন্দর্যবহ, আলংকারিক কারুকার্যে তাঁর কবিতা যেন তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি চিত্রায়ন। এজন্যই তাঁর কবিতা কালিক, স্থানিক ও গৌষ্ঠিক সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী শিল্প সুষমার উজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত। ফারাযদাকের কবিতার আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর আত্মঅহংকার ও গৌরব নির্ভর কবিতা।[১৮] এটিকে ভিত্তি করেই তাঁর ব্যঙ্গকাব্য ও নাকায়িদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জারীরকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত কবিতায় সে চিত্রই ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন-

أولئك آبائي فجِئني بِمِثْلِهِمْ * إذاَ جَمَعَّتْنَاَ يَا جريرُ الْمَجَامِعُ

أنا ابنُ العَاصِمِينَ بَنِي تَمِيمٍ * إذا مَا أعْظَمُ الحَدَثَانِ نَابَا[১০]

[উপর্যুক্ত গুণধর ব্যক্তিবর্গই আমার পিতৃপুরুষ। ওহে জারীর! যখন সমাবেশ ঘটে তখন যদি পারো তো (তোমাদের মধ্য হতে) তাদের নজির পেশ কর।

আমি বনূ তামীমের সেই বংশের সন্তান, যারা অন্যের বিপদাপদে এগিয়ে এসে রক্ষা করে।][১০]

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি نقائض কবি হিসেবেই অধিক পরিচিত। কাব্যচর্চায় সিদ্ধহস্ত ফারাযদাক ছিলেন একজন স্বভাব কবি। তৎকালীন ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বসরা নগরীতে জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিক্রম করলেও তিনি পুরোপুরি ইসলামী মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেননি। ফলে তাঁর কাব্যে বর্ণনাভঙ্গীর গাম্ভীর্য, সমার্থক শব্দের প্রাচুর্য ও দুর্বোধ্যতাসহ কল্পনা-ভাবাবেগ, ব্যকুলতা-ইমেশনে, চিত্তচাঞ্চল্যে, বিরহ-বেদনায়, নিঃসঙ্গতা-নির্জনতায় ও উপমা-উৎপ্রেক্ষায় মরুজীবনের বেদুঈন প্রতিচ্ছবির চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।[১১]

বাল্যকালে মরুভূমির চারণ ভূমিতে মেষ চরানোর সময় থেকে শুরু করে মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত তিনি যে সাহিত্য সম্ভার রেখে গেছেন তাঁর সবই ছিল কবিতা। কবিতা ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোন অঙ্গনে তাঁর পদচারণা লক্ষ্য করা যায় না। শৈশব থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি অগণিত কবিতা রচনা করেছেন। এসব কবিতার অধিকাংশ স্থান পেয়েছে ديوان الفرزدق গ্রন্থে। উক্ত দীওয়ানে সর্বমোট কবিতার সংখ্যা ৬০১টি এবং بيت বা পুংক্তির সংখ্যা ৭২৭৪টি।

ফারাযদাক কাব্যচর্চায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্য বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। কাব্য বিতর্কে কুৎসার ভিত্তি ছিল গোত্রীয় শত্রুতা ও বিরোধ। উমাইয়া যুগে এ শত্রুতা রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যায়। এমনিভাবে অহংকার ও কুৎসার সাথে প্রশংসা অন্তর্ভূক্ত হয়। উমাইয়া যুগে বিকশিত ও পরিপুষ্ট এ কাব্য বিতর্ক একটা শিল্পে পরিণত হয়েছিল। যেমন ফারাযদাক তাঁর নিজ গোত্রের আভিজাত্য, সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে জারীরের গোত্রের নিন্দা করেন। সেখানে কুলাইব গোত্রকে হীনমন্যতা, নীচুস্বভাব ও তাদের নারীদের সম্পর্কে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করেন।[১২] সকল প্রকার মন্দ ও নিকৃষ্ট কার্যকলাপকে জারীরের গোত্রের সাথে সম্পর্কিত করে ফারাযদাক বলেন-

فَيَا عَجَبَا حَتَّى كُلَيْبٌ تَسُبُّنِى * وَكَانَتْ كُلَيْبٌ مَدْرَجًا لِلْمَشَاتِمِ
وَلَو تُرْمِى بِلُؤمَ بَنِى كُلَيْبٍ * نُجُوْمُ اللَّيْلِ مَا وَضَحَتْ لِسَارِيٍ
ولو يُرمى بلؤمهم نهارٌ * لدنّسَ لؤمهُم وضحَ النهارِ
وما بغدو عزيز بنى كليب * ليطلب حاجة الابجار[১৩]

[বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, কুলায়ব গোত্রের লোকেরাও তিরস্কারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে! অথচ তারা গালমন্দ ও তিরস্কারের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছে!

বানূ কুলায়ব গোত্রের নীচতা যদি নক্ষত্রের দেহে লাগে তবে নক্ষত্র নিভে যাবে!

যদি তাদের নীচতা দিনের আলোর মধ্যে লাগে তবে দিবালোকের চাকচিক্য ম্লান হয়ে যাবে।

বানূ কুলায়ব গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিও যদি কিছু দাবী করে তবে সেটাও কারো মাধ্যম ছাড়া করতে পারে না।][১৪]

ফারাযদাকের এ জাতীয় কবিতার যথাযথ জবাব কবি জারীর কবিতার মাধ্যমে দিয়েছেন। ফারাযদাকের সকল অপকর্মের চিত্র এভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন-[১৫]

لَقَدْ وَلَدَتْ أُمُّ الفَرَزْدَقِ فَاجِرًا * وَجَاءَت بِوَزْواز قَصِيرِ القَوائمِ
وَمَا كَانَ جَارٌ الَفَرَزْدَقِ مُسْلِمٌ * لِيَأمَن قِرْدَاً، لَيْلَهٗ غَيْرٌ نَائِمِ
اتيت حدود الله فدانت يافع * وشبت فما ينهاك سيب الهازم
تَتَبْعُ فى الماخور كل مريبة * ولست بأهل المحصنات الكرائم[১৬]

[ফারাযদাকের মা একজন দুষ্কৃতি স্বভাব ও খাটো দেহের ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছে।

ফারাযদাকের কোন প্রতিবেশী রাত্রিকালে জাগ্রত মানবের অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে না।

তুমি যৌবনকালে আল্লাহর সীমানা লংঘন করেছ, বাধর্ক্যও তোমাকে মন্দ কাজ থেকে ফেরাতে পারেনি।

পানশালায় তুমি মন্দ মেয়ে মানুষ সন্ধান করে থাকো, তুমি সতী-সাধবী ও অভিজাত মেয়েদের যোগ্য নও।]
এভাবে তাদের বিতর্ক জমে উঠতো। জারীর ও ফারাযদাকের ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুবই ঘনিষ্ট ও বন্ধুত্বপূর্ণ। কাব্য বিতর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য কুৎসা রটনা ছিল না, বরং রস ও ব্যঙ্গর মাধ্যমে আনন্দ দেয়াই ছিল এর প্রধান কাজ। এ কারণে খলীফা ও আমীর উমারাগণ নিজ নিজ পক্ষের কবিদের ডেকে এনে এ ধরণের কবিতা শুনতেন। একবার খলীফা 'আব্দুল মালিকের ভাই ইরাকের শাসনকর্তা বিশর ইবন মারওয়ান আখতালকে বলেছিলেন- احكم بين الفرزدق وجرير؟ [জারীর ও ফারাযদাকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?]
আখতাল এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি। কিন্তু বিশর ইবন মারওয়ান চাপাচাপি করলে একটু এড়িয়ে যেয়ে এভাবে জবাব দেন-

الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر [১৯]

[আল ফারাযদাক পাথর কেটে ভাস্কর্য নির্মাণ করে, আর জারীর সমুদ্র হতে অঞ্জলী ভরে পানি উত্তোলন করে।]
অসাধারণ কাব্য প্রতিভার অধিকারী কবি ফারাযদাক বংশগৌরব ও ব্যঙ্গ কবিতার বর্ণনায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখলেও কাব্যের সকল শাখায় সমান পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেননি। তবে কাব্য বিতর্কে জারীর ও ফারাযদাক এক নতুন রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা দুর্লভ চিন্তা-চেতনার সমাবেশ ঘটান। তাদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় নব উদ্ভাবিত এ বিষয় পরিপূর্ণ ও জনপ্রিয় রূপ লাভ করে। তারা কাব্য বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে হাস্য রসিকতার মাধ্যমে আনন্দ দিত। যেমন ফারাযদাক কবি জারীরকে ঘায়েল করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন-

يستيقظون إلى نهاق حميرهم * وتنام أعينهم عن الأوتار [২০]

[গাধার আওয়াজে জেগে যায় অথচ নিহতদের প্রতিশোধ নিতে গেলে ঘুমিয়ে পড়ে।]
জারীরও উপযুক্ত জবাব দেন ফারাযদাকের কবিতার। তিনি বলেন-[২১]

خُذُوا كُحْلاً وَمِجمَرة وَعِطرًا * فَلَسْتُمْ يا فَرَزْدَقُ بِالِرجَالِ [২২]

[সুরমা, আংটি এবং আতর নাও, কারণ তুমি তো আসলে পুরুষ নও।]
পরিশেষে বলতে পারি কবি ফারাযদাক আরবী কাব্যাঙ্গনে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর রচিত দীওয়ান আরবী সাহিত্যের এক সর্বোত্তম কাব্যকীর্তি। যেখানের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে উমাইয়া শাসকদের ভুঁয়সী প্রশংসা ও প্রতিপক্ষের নিন্দাবাদ। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই কবির কবিতায় তাঁর মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে অসাধারণ কাব্য সৃষ্টির জন্য আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তথ্যনির্দেশ

১. আবূ হাতিম আল রাযী, *কিতাবুল যারাহ ওয়াত তা'দীল*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৩৫৫; মুহইউদ্দীন আন নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ২৮০; শামসুদ্দীন আয যাহবী, *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: মু'আসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২২৬; ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া*, ৯ম খণ্ড (বৈরূত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ২৭৯।

২. তাঁর মায়ের নাম দাবিয়্যাহ। এ সম্পর্কে কবি নিজেই বলেন- بدارمى أمه ضبيبه * إذا ما كنت ذا محمية شاهد. দ্র. মাজীদ তারাদ, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবুল 'আরাবী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৯ম; আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *কিতাবুল আগানী*, ১৯শ খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৬ খ্রি.) পৃ. ২; *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৬; *আশ-শিরু ওয়াশ শু'আরা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭২।

৩. *কিতাবুল আগানী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪; *আশ-শিরু ওয়াশ শু'আরা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১; *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯।

৪. আহমাদ ইস্কান্দারী ও সহযোগীবৃন্দ, *আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরূত: দারু ইহইয়াউল 'উলূম, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৪; আহমাদ হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদব*, ২য় খণ্ড (মিসর: মাকতাবাতু তিজারিয়্যাতিল কুবরা, তা. বি.), পৃ. ১৫০।

৫. হান্না আল-ফাখূরী, *আল-মু'জায ফীল আদাবিল 'আরাবিয়্যাহ ওয়া তারীখুহু* (বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৫৬৪; কার্ল ব্রুকালম্যান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (মিসর: দারুল মা'আরিফ, তা, বি,), পৃ. ২০৯; মজীদ তুরাফ, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭।

৬. মজীদ তুরাদ, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭; *প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৪০৮; শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, *আল-আসরুল ইসলামী*, পৃ. ২৬৭; *উদাবাউল 'আরব*, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৩৭।
৭. ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, আল আসরুল ইসলামী*, পৃ. ২৬৭।
৮. *তবেদ*; 'উমার ফাররুখ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৯; *কিতাবুল আগানী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬।
৯. *'উদাবাউল 'আরব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭; ইবন হাজার 'আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৬৫৮; ইবন কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২২৩; মজীদ তুরাদ, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৭।
১০. জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (মিসর: দারুল হিলাল, তা, বি,), পৃ. ২৭৬; আহমাদ হাসান আয যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (মিসর: প্রকাশনালয়ের নাম ও তারিখ বিহীন), পৃ. ১২০; কার্ল ব্রুকালমান, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ২০৯।
১১. ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭০; *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯; *উদাবাউল 'আরব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১।
১২. *কিতাবুল আগানী*, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৯; *দীওয়ানুল ফারাাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০; কার্ল ব্রুকালম্যান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০-২১১।
১৩. *ওফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০০; ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আসরুল ইসলামী*, পৃ. ২৭০; *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।
১৪. বুতরুস আল-বুস্তানী, *'উদাবাউল 'আরব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০; *প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৪০৯।
১৫. 'আলী খারীস, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬।
১৬. কার্ল ব্রুকালম্যান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ২২১; *আল-মুফাসসাল ফি তারীখিল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ১৫০; ইবন কুতায়বা, *আশ শিরু ওয়াশ শু'আরা*, পৃ. ৩১৩; *আহমাদ হাসান আয যাইয়াত*, পৃ. ১৬৫।
১৭. Clement Huart, *A History of Arabic Literature* (London: William Heinman, 1903), p. 51.
১৮. *প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৪১০।
১৯. মাজীদ তারাদ, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ১১৪; আল-ফারাযদাক, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২।
২০. *প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৪১০।
২১. ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী, অনুবাদ ড. মুহাম্মদ মজীবুর রহমান, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (রাজশাহীঃ মুহাম্মদী প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৩৯।
২২. *তদেব*, পৃ. ১৩৭।
২৩. আলী ফাউর, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৩০৫, ৬১৯।
২৪. *তদেব*।
২৫. আলী ফাউর, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৪৫৮,৪৫৯,৪৬০।
২৬. *তদেব*, পৃ. ১৩৮।
২৭. *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২।
২৮. *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০।
২৯. আলী ফাউর, *দীওয়ানুল ফারাযদাক*, পৃ. ৩৪৩।
৩০. *তদেব*, পৃ. ১৪১।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

সূরা আল-ওয়াকি'আয় বর্ণিত আখিরাতের চিত্র
(The Depiction of Al-Akhirah in the light of Surah Al-Waqia)

Dr. Md. Ubaidullah*

Abstract: Al Quran, the last revelation of Allah has been revealed upon the last prophet Hazrat Muhammad (PBUH). Al Quran contains total 114 surahs. Surah Al Waqi'ah is one of the important Maccan surahs in it. This surah is named after the first word 'Waqi'ah' which is mentioned at the beginning of the surah. Surah Al Waqi'ah is the 56th surah of the Holy Quran which falls in part 27 of the Holy Quran. This surah has a deep and close relationship with its preceding and following surahs. Like other surahs of the Quran, Allah has described in this surah the discussed topics beautifully and easily with lucidity using diction, simile, metaphors and other rhetorical devices. The content of this surah is to protest against the doubts of the anti-Islamic people of Makkah about the Hereafter, Tawheed and the Quran. In Surah Al Waqi'ah the difference in the degree of the followers of sariah has been described because on the day of Resurrection all people must fall into three categories: The first is the 'Sabeqin.' 'Salehin' or virtuous people will fall in the second category whereas the people who deny the ruling of Allah and engage in sinful acts will fall in the third category. This surah details how to deal with these three classes of people. Then, the documents of Tawheed and the rightness of the Hereafter, two basic beliefs of Islam, have been presented in continuation in this surah. Attention also has been drawn to the existence of human beings, the horrors of the Resurrection and the hellfire. The Depiction of Al-Akhirah in the light of Surah Al-Waqia has been discussed here in this article.

ভূমিকা

বিশ্বমানবতার শান্তি ও মুক্তির অদ্বিতীয় সনদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ৫৬তম সূরা আল-ওয়াকি'আহ। ২৭তম পারায় এ সূরার অবস্থান। আল-কুরআনে অধিকাংশ সূরার নামকরণের ক্ষেত্রে সেই সূরার মাঝে উল্লিখিত কোনো অক্ষর বা শব্দকে কেন্দ্র করেই নামকরণ করা হয়েছে। যেমন সূরা আল-বাকারায় উল্লিখিত আল-বাকারাহ শব্দ দিয়ে আবার সূরা আন-নাস এ উল্লিখিত আন-নাস শব্দ দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে। তেমনিভাবে সূরা আল-ওয়াকি'আহ-এর নামকরণের ক্ষেত্রেও এ সূরার প্রথম আয়াতের আল-ওয়াকি'আহ (الْوَاقِعَةُ) শব্দটিকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। সূরা আল-ওয়াকি'আয় ৯৬টি আয়াত ও ৩টি রুকু রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরার ন্যায় সূরা আল-ওয়াকি'আয় আলোচিত বিষয়গুলোকে অলংকারপূর্ণ ভাব, ভাষা, শব্দ, বাক্য এবং উপমা অলংকারের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এ সূরায় আখিরাতের চিত্র খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহর অশেষ নিয়ামত, কিয়ামতের ভয়াবহতা, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানো, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সে সময় মানুষ অনিবার্যভাবে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যাবে। অগ্রবর্তীদল, ডানদিকের দল ও বাম দিকের দল। আল্লাহ তা'আলা অগ্রবর্তীদের বর্ণনা, ডানদিকের দলের বিভিন্ন নিয়ামত ও পুরস্কার প্রদান ও বামদিকের দলের কঠোর শাস্তির বর্ণনা অলংকারপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

সূরা আল-ওয়াকি'আহ অবতীর্ণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতিটি সূরা অবতীর্ণের পেছনে কিছু না কিছু প্রেক্ষাপট রয়েছে। কুরআনের সূরাগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। মাক্কী এবং মাদানী। মক্কায় যে সূরাগুলো অবতীর্ণ হয় সাধারণত সেগুলোকে মাক্কী এবং মদীনায় যে সূরাগুলো অবতীর্ণ হয় সেগুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়।[১] এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

---

* Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi.

সূরাসমূহের অবতীর্ণ হবার ধারাবাহিকতায় হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, প্রথমে সূরা ত্বাহা অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর আল-ওয়াকি'আহ, এরপর আশ-শুয়ারা।

মূলত আখিরাত, তাওহীদ ও কুরআন সম্পর্কে মক্কার ইসলাম বিরোধীদের মনে যে সব সন্দেহ ও সংশয় ছিল, তার প্রতিবাদ করাই হলো এই সূরাটির বিষয়বস্তু। কোন দিন কিয়ামত হবে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের বর্তমান সমগ্র ব্যবস্থাই চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে, এরপর সমস্ত মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে, তাদের হিসেব হবে, আল্লাহর বিধান অনুসরণকারীকে জান্নাতের বাগানে থাকতে দেয়া হবে এবং ইসলামের বিধান অমান্যকারীকে জাহান্নামে দেয়া হবে, এসব কথাই তাদের কাছে অত্যন্ত বেশি অবিশ্বাস্য ছিল। তারা এসব কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা বলতো, এসব হলো কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন কথা বার্তা। এ ধরনের হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ সূরায় তাদের কথার জবাবে বলা হয়েছে, সত্যই যখন কিয়ামতের সেই ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হবে, তখন তো আর কেও বলতে পারবে না যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়নি। এ ঘটনা ঘটানোর পথে এমন কোনো শক্তি নেই যে, তারা বাধার সৃষ্টি করতে পারে অথবা এ ঘটনার বাস্তবতাকে অবাস্তবতায় পরিণত করতে পারে।[২]

আখিরাতের চিত্র

সূরার শুরুতে কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, সে সময় জমিন, পাহাড় পর্বতে যে এক ভয়ানক অবস্থা দেখা দিবে এবং মানুষের যে করুণ অবস্থা হবে তা জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সূরার কিয়ামতের ভয়াবহতার উল্লেখ করে সেদিনের জন্যে আখিরাতের সম্বল সংগ্রহের তাগিদ করা হয়েছে। সে সময় সমস্ত মানুষ অনিবার্যভাবে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রথম শ্রেণির লোক সাবেকীন- সেই প্রাথমিক পর্যায়ের লোক হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয় শ্রেণির লোক হবে সব সালেহীন-নেককার, সৎকর্মশীল লোক আর তৃতীয় শ্রেণিতে গণ্য হবে সেসব লোক, যারা আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে মারাত্মক পাপে লিপ্ত থেকেছে। এই তিন শ্রেণির সাথে যে ধরনের আচরণ ও ব্যবহার করা হবে, এ সূরায় তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।[৩]

কিয়ামত দিবসের বর্ণনা

اَلْوَاقِعَةُ কিয়ামতের অন্যতম একটি নাম। وقع، يقع অর্থ সংঘটিত হওয়া, অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত করার ইচ্ছা করবেন তখন তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা কিয়ামতের আকলী ও নকলী উভয় প্রকার দলীল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। আবার বলা হয় তা কেও প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা কাউকে করবে নীচ, আবার কাউকে করতে সমুন্নত। ঐদিন বহু লোক নীচতম ও হীনতম হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, যারা দুনিয়ায় শক্তিশালী ও মর্যাদাবান ছিল। পক্ষান্তরে বহু লোক সেদিন সমুন্নত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও তারা দুনিয়ায় নিম্ন শ্রেণির লোক ছিল এবং মর্যাদার অধিকারী ছিল না। যারা মহান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করবে, তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে চিরশান্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না এবং তাঁর বিধান অমান্য করে, তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ– لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ–خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ[৪]

যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন সংঘটন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না। এটা কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে সমুন্নত।

আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন- فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ[৫] সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়।

আল্লাহ অন্য আয়াতে আরো বলেন- اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَه[৬] তোমরা তোমাদের রবের আহ্বানে সাড়া দাও, সেই দিন আসার পূর্বে যা আল্লাহর বিধানে অপ্রতিরোধ্য।

কিয়ামত কিছু মানুষকে তাদের খারাপ আমলের জন্য লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে। যেমন কাফিররা মুনাফিকরা কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। আর যারা মু'মিন তারা সেদিন হবে সম্মানিত; সুউচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের অবস্থা ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপদ

সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিঃস্ব ধনবান আর ধনবান নিঃস্ব হয়ে যায়।

পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং দুলতে থাকবে। পর্বতমালা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে তুলার মতো পাতলা হয়ে উড়বে। পাহাড়গুলোকে নির্মমভাবে ধুলিকণায় পরিণত করা হবে। এমন প্রচণ্ড ধূলি ধুসরিত ঝড় যা ক্ষণিকের মধ্যেই সবকিছু বিধ্বস্ত করে দিবে যাতে ওর পূর্বের কোন অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যাবে না।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا- وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا- فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا-[৭]

যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে পড়বে। ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন- «اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا»

পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে কম্পিত হবে।

অন্য আয়াতে আরো বলেন- «يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْمٌ» হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাব্বকে, (জেনে রেখ) কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার।

বিচার দিবসে তিন শ্রেণির লোকের বর্ণনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন:

«وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً» তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণিতে। اَزْوَاجًا-এর অর্থ: اَصْنَاف তথা শ্রেণি, দল। অর্থাৎ তোমরা সেদিন তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সে তিন শ্রেণির কথা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন:

(১) «فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ» অর্থাৎ এরা সাধারণ মু'মিন, যাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। এ জন্য এদেরকে আসহাবুল ইয়ামিন বা ডানপন্থী বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ[১২]

আর ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কাঁটাবিহীন বরই গাছ।

(২) «وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ» এরা হল কাফির শ্রেণি, যারা আল্লাহ তা'আলা, রাসূল (সা.) ও পরকালে বিশ্বাস রাখত না। এদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। এ জন্য এদেরকে বামপন্থীও বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَا اَصْحٰبُ الشِّمَالِ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ[১৪]

আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা থাকবে উত্তপ্ত বাতাস ও উত্তপ্ত পানিতে।

(৩) «وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ» এর হল বিশিষ্ট মু'মিন, যারা ঈমান ও আমলে অগ্রগামী। এদের মধ্যে নাবী, রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণ শামিল। সুদ্দী (রহ.) বলেন যে, তারা হলেন ইল্লীয়্যিনের বাসিন্দাগণ। যারা আগে বেড়ে গিয়ে অন্যদের উপর অগ্রবর্তী হয়ে আল্লাহ তা'আলার ফরমান পালন করে থাকেন তারা সবাই সাবেকুনের অন্তর্ভুক্ত।

জান্নাতীদের বর্ণনা

অগ্রবর্তী দলের বর্ণনা:

আল্লাহ তা'আলা ঐ বিশিষ্ট নৈকট্য লাভকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তারা পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে হবে বহু সংখ্যক এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। নাবী (সা.) বলেন- « نَحْنُ الآخِرُوْن

السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -আমরা সর্বশেষ উম্মত কিন্তু কিয়ামতের দিন অগ্রগামী। আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন যে, যখন কুরআনুল হাকীমের আয়াত- ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ[১৭]-অবতীর্ণ হয়, তখন এটা নাবী (সা.)-এর সাহাবীগণের উপর খুবই কঠিন ঠেকে। ঐ সময়- ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ[১৮] -আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ 'বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং বহু সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।' তখন নাবী (সা.) বলেন- আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ, বরং এক তৃতীয়াংশ এমনকি অর্ধাংশ। তোমরাই হবে জান্নাতীদের অর্ধাংশ। আর বাকী অর্ধাংশের মধ্যেও তোমরা থাকবে।[১৯]

মোটকথা এই উম্মাত বাকী সমস্ত উম্মাত হতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। আর এই উম্মাতের মধ্যে নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মাতদের তুলনায় বহুগুণ বেশি হবে। তারা হবে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন। কেননা দীন পরিপূর্ণ হওয়া এবং নাবী (সা.) সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এরাই সর্বোত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

اَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَ مِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ-[২০]

জান্নাতবাসীগণ একশত বিশ কাতারে বিভক্ত হবে; তার মধ্যে আশি কাতার এ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, বাকী চল্লিশ কাতার অন্যান্য সকল উম্মতের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীরা জান্নাতে যে আরাম আয়েশে থাকবে তার বিবরণ তুলে ধরেছেন। مَوْضُوْنَةٍ বলা হয় নির্ণিত, খচিত। অর্থাৎ জান্নাতীরা স্বর্ণের তৈরি মণিমুক্তা খচিত আসনে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসবে। তখন চিরকিশোর যারা কখনো বৃদ্ধ হবে না এবং শারীরিক গঠনে কোন পরিবর্তন আসবে না তারা পান পাত্র, সূরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে তাদের সামনে ঘোরাফেরা করবে। যা পান করলে মাথাব্যথা হবে না এবং জ্ঞানহারাও হবে না।[২১]

الْمَكْنُوْنِ অর্থ সুরক্ষিত, যাতে কখনো হাতের স্পর্শ লাগেনি। অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে এমন হুর প্রদান করা হবে যাদেরকে ইতোপূর্বে স্পর্শ করা হয়নি। দুনিয়াবী নারীদের যেসব সমস্যা হয় তাদের এরূপ কোন সমস্যাও হবে না। রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ-[২২]

আমি আমার সৎবান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান তা শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তা অনুভূতও হয়নি।

ডানপন্থী দলের পুরস্কার

অগ্রবর্তীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা সৎ আমলকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যাদের মর্যাদা অগ্রবর্তীদের তুলনায় কম। এদের অবস্থা যে কত সুখময় তার বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন- فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ[২৩] এরা ঐ জান্নাতে অবস্থান করবে যেখানে কাঁটাবিহীন বরই গাছ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার কাঁটা নষ্ট করে দিয়েছেন, প্রত্যেক কাঁটার স্থানে ফল রয়েছে। ফলের ভারে শাখাগুলি নুয়ে পড়বে। আর এমন ফল দেবে যা থেকে ৭২টি রং বের হবে; এক রঙের সাথে অপর রঙের কোন মিল থাকবে না।[২৪]

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ[২৫] আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ এখানে فُرُشٍ থেকে অনেকে জান্নাতী স্ত্রীদেরকে বুঝিয়েছেন। আরবরা স্ত্রীদেরকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

اِنَّا اَنْشَأْنَهُنَّ اِنْشَاءً[২৬] তাদেরকে (জান্নাতী হুরদেরকে) আমি সৃষ্টি করেছি দুনিয়ার নারীদের থেকে ভিন্নরূপে। জান্নাতী রমণীদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ দুনিয়ার নারীরা যেমন বয়স্কা, বৃদ্ধা হয়ে যায়, রূপ-লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়, প্রতি মাসে সমস্যা হয় জান্নাতী নারীরা এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা হবে চিরকুমারী, সমবয়স্কা ও বর্ণনাতীত রূপ-লাবণ্যে ভরপুর।[২৭]

عُرُبًا শব্দটি عرب এর বহুবচন। এমন নারী যে তার রূপ-লাবণ্য ও অন্যান্য গুণের কারণে স্বীয় স্বামীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়া। اَتْرَابًا হল ترب এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্কা, অর্থাৎ যে সব নারীদেরকে জান্নাতবাসীরা

স্ত্রীরূপে পাবে, তারা সবাই সমবয়স্কা হবে। হাদীসে এসেছে: সকল জান্নাতী তেত্রিশ বছর বয়সের হবে। অথবা এর অর্থ হবে, নিজ নিজ স্বামীর সমবয়স্কা হবে।[২৮]

জাহান্নামীদের বর্ণনা:

বামপন্থী দলের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন আসহাবুশ শিমাল বা বামদিকের লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কত হতভাগা বাম দিকের দল। তারা কতইনা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে; অতঃপর তাদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে এবং কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রের ছায়ায়। বাম হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত জাহান্নামীরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য কালো ধোঁয়াকে ছায়া মনে করে সেদিকে যাবে, কিন্তু আসলে তা ঠাণ্ডা ছায়া নয় এবং তা দেখতেও ভাল দেখাবে না।[২৯] এসকল জাহান্নামীরা দুনিয়াতে হারাম কাজে লিপ্ত ছিল; রাসূলগণ যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করত না। তারা সর্বদা কুফুরী, শিরক ও আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কাজে লিপ্ত থাকত; তাওবা করার পরওয়া করত না। তারা বলত আমরা মারা গেলে হাড়ও মাটিতে পরিণত হয়ে যাব তারপরেও কি পুনরুত্থিত হব? কাফিররা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে একথা বলত। আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে বলেন: হে নাবী! তুমি বলে দাও: আদম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যারা আসবে সবাই পুনরুত্থিত হবে। এ পুনরুত্থান হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে।[৩০]

তোমরা অবশ্যই যাক্কুম বৃক্ষ হতে আহার করবে, যাক্কুম জাহান্নামের একটি নিকৃষ্ট গাছ। যা অতি বিস্বাদ ও তিক্ত। খেতে ভাল না লাগলেও ক্ষুধার তাড়নায় তা খেয়েই তাদের উদরপূর্ণ করবে। هِيْمِ হল أهيم এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে, যে উটের পিপাসাযুক্ত রোগ রয়েছে। সে পানি চুষে নেয় কিন্তু পিপাসা দুর হয় না। এই রোগেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুরূপভাবে জাহান্নামীকে গরম পানি পান করানো হবে, যা নিজেই একটা জঘন্যতম শাস্তি। সুতরাং এর দ্বারা পিপাসা নিবারণ হয় না। এরপর মহান আল্লাহ বলেন: هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ[৩১] 'কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন' মহান আল্লাহ ঠাট্টা করে কাফিরদেরকে একথা বলেছেন। কারণ কষ্টদায়ক খাবার ও পানীয় দ্বারা কি আপ্যায়ন করা হয়।[৩২]

আখিরাতের বিচার ও পুনরুত্থান হওয়ার প্রমাণ:

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামত সংগঠিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং পৌত্তলিক ও কাফিরদের ঐ দাবীও নাকচ করে দিয়ে বলেন-

أَاِذَ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ[৩৩]

মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থান হব?

আল্লাহ তা'আলা ঐ কিয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্য কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং লোকদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দলীল পেশ করেছেন। যারা বস্তুবাদীতে বিশ্বাসী, পরকালে অবিশ্বাসী তাদের এরূপ চিন্তাকে খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছি অথচ তোমরা কিছুই ছিলে না, এরপরেও কি তোমরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা কি ভেবে দেখেছ? স্ত্রী সহবাসের সময় তোমাদের যে বীর্য স্ত্রীগর্ভে যায় তা থেকে মানুষের আকৃতি দিয়ে কে দুনিয়াতে আগমন ঘটায়? নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলাই তা করি। সামান্য পানি থেকে যদি আমি তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি তাহলে পুনরায় সৃষ্টি করে পুনরুত্থান করাতে পারব না? অবশ্যই পারব। বরং এটা আরো অতি সহজ। মহান আল্লাহ অন্যত্র বর্ণনা করেন- وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ[৩৪]

অর্থাৎ: তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ।

শিক্ষা

সূরা আল-ওয়াকি'আহ মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অসীম করুণার বহিঃপ্রকাশ। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম শক্তি ও অপূর্ব মহিমার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। এতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। এর সংঘটন অস্বীকার করার কেও থাকবে না। এটা কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে সমুন্নত। যখন প্রবল কম্পনে পৃথিবী প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে, তখন তা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। অতএব তার প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে সে দিনের ভয়াবহ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য সৎ আমল করতে হবে। সমস্ত মানুষ অনিবার্যভাবে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রথম শ্রেণি আরশের ডানপাশে থাকবে। তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, এদের সুখের অন্ত থাকবে না। এরা হলো জান্নাতীদের সাধারণ মু'মিন দল। দ্বিতীয় শ্রেণি আরশের বাম পাশে থাকবে। এদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এরা হল জাহান্নামী। তৃতীয় দলটি মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে থাকবেন। এরা হবেন বিশিষ্ট দল। এরা ডানপন্থীদের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান ও নৈকট্য লাভকারী। এদের মধ্যে রয়েছে নাবী, রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নৈকট্যশীলগণের মধ্যে শামিল করে নিন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যখন আখিরাতের ভয়াবহতাকে ভুলে মিথ্যা ও অহংকারের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, তখন এ সূরাটির শিক্ষা আমাদেরকে জান্নাতীদের মধ্যে শামিল হওয়ার এক বড় ধরনের হাতিয়ার হতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় সূরা আল-ওয়াকি'আহ কুরআন মাজীদের অন্যতম মাধুর্যমণ্ডিত একটি সূরা। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরার ন্যায় সূরা আল-ওয়াকি'আয় আলোচিত বিষয়গুলোকে অলংকারপূর্ণ ভাব, ভাষা, শব্দ, বাক্য এবং উপমা অলংকারের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এ সূরায় আখিরাতের চিত্র খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহর অশেষ নিয়ামত, কিয়ামতের ভয়াবহতা, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানো, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সে সময় মানুষ অনিবার্যভাবে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যাবে। অগ্রবর্তীদল, ডানদিকের দল ও বাম দিকের দল। আল্লাহ তা'আলা অগ্রবর্তীদের বর্ণনা, ডানদিকের দলের বিভিন্ন নিয়ামত ও পুরস্কার প্রদান ও বামদিকের দলের কঠোর শাস্তির বর্ণনা অলংকারপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। অতএব তাঁর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে সৎ আমল করতে হবে। তাই আমাদের জীবনে এ সূরার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নৈকট্যশীলগণের মধ্যে শামিল করে নিন। আমীন

তথ্যনির্দেশ

১. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন* (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রী.), পৃ. ৪৯।
২. শায়খ মুহাম্মদ আল গাযালী আস্ সাক্কা (র.), *আল কুরআন সূরাসমূহের নাযিলের ইতিহাস*, অনুবাদ সম্পাদনায় আব্দুস সালাম মিতুল ও মাওলানা কামাল হোসাইন (ঢাকাঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩৬৫-৩৬৬ ।
৩. আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌নে আহমদ আল মহল্লী (র.), *বাহজাতুল আইনাইন শরহু তাফসীরিল জালালাইন*, রচনা ও সম্পাদনা মাওলানা মুফতী হিফজুর রহমান, মাওলানা মুফতী আব্দুস সালাম, ষষ্ঠ খণ্ড (ঢাকাঃ মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ, তা.বি.), পৃ. ৪৯৮; *আল কুরআন সূরাসমূহের নাযিলের ইতিহাস*, পৃ. ৩৬৬।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি'আহ, আয়াতঃ ১-৩।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াতঃ ১৫।
৬. আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা, আয়াতঃ ৪৭ ।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি'আহ, আয়াতঃ ৪-৬।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-যিলযাল, আয়াতঃ ১।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ, আয়াতঃ ১।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি'আহ, আয়াতঃ ৭।

১১. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ৮।
১২. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ২৭-২৮।
১৩. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ৯।
১৪. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ৪১-৪২।
১৫. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ১০।
১৬. *তাফসীর ফাতহুল মাজীদ*, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪।
১৭. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ১৩-১৪।
১৮. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ৩৯-৪০।
১৯. *তাফসীর ইব্‌ন কাসীর*, সপ্তদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯।
২০. *তাফসীর ফাতহুল মাজীদ*, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৫।
২১. পূর্বোক্ত।
২২. পূর্বোক্ত; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৪৪।
২৩. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ২৮।
২৪. *তাফসীর ইব্‌ন কাসীর*, সপ্তদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫।
২৫. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ৩৪।
২৬. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ৩৫।
২৭. *তাফসীর ফাতহুল মাজীদ*, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭।
২৮. পূর্বোক্ত ।
২৯. *তাফসীর ইব্‌ন কাসীর*, সপ্তদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩; *তাফসীরিল জালালাইন*, ষষ্ঠ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১১।
৩০. *তাফসীর ফাতহুল মাজীদ*, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮।
৩১. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ৫৬।
৩২. *তাফসীর ফাতহুল মাজীদ*, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৮।
৩৩. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, আয়াত: ৪৭।
৩৪. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

أساليب الدعوة و مناهجها فى سورة يس
(Techniques and Methods of Da'wah in Surah Yaseen)

Dr. Md. Abu Bakor*

Abstract: Allah has nominated Prophets and Messengers as needed to guide mankind. All the prophets and messengers have fulfilled their responsibilities in the light of divine law. The methods and techniques of fulfilling those responsibilities of prophethood and risalat were varied. There is a lot of discussion on this subject in different surahs of Al-Quran. In Surah Ya-seen, a complete report of inviting towards monotheism has been presented on the wisdom and significant method and strategy. In general, the subject remains somewhat vague in the recitation of these surahs. The matter has been presented in a proper manner by gathering the relevant information and data in this article.

تلخيص المقالة

الله خلق الناس واصطفى من بينهم عددا كبيرا من خير خلقه ثم شرفهم وكرمهم بنبوته وبرسالته وهم الأنبياء والرسل عليهم السلام فأوحى إليهم ما أوحى. وهؤلاء الأنبياء والرسل هم بلّغوا رسالتهم ودعوا أممهم حسب ما أوحى إليهم. ودعوتهم ومناهجهم فيها كانت تتفق وتتقارب وتختلف عن غيرهم. وإن رسالة نبينا محمد ﷺ وتنزيل القرآن العظيم نسخت بها الشريعة السابقة كلها إلا أنه تعالى قد أبقى بعض الأحكام والسنن من الشرائع السابقة فى الإسلام وهى ساطعة فى الآيات والسور. سورة يس من أهم سور القرآن فذكر في الآية ١٣-٢٥ بعض أهم أساليب الدعوة ومناهجها نحو عرض الدعاة نفوسهم رسلا وإرسال المؤيدين على آثار المقدمين لتعزيزهم والتنكر فى الدعوة والدعوة سرا قبل العلانية وتصديق الدعوة بالآيات والدعوة بالحكمة وغيرها. فهذه الأساليب والمناهج فى آيات سورة يس قد عمل بها المسيح عيسى عليه السلام لأمته ثم علّمنا القرآن بأنه قد أمر به نبينا محمد ﷺ حيث قال الله تعالى وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ الآية. فأساليب الدعوة ومناهجها فى آيات هذه السورة ذات حكمة بالغة مؤثرة وقابل للبحث والدراسة. هذه المقالة وضح فيها الموضوع قدر الاستطاعة.

التقديم

الدعوة هى تبليغ وحى الخالق إلى المخلوق وهو أمر قد فرضه الله تعالى على كل من وصلت إليه كلمة من الوحى كما قال عليه السلام بلّغوا عنى ولو آية.[١] وأساليب هذه الدعوة فعلّمنا بها القرآن واضحة بينة. قبل إيضاح الأساليب والمناهج بيان مؤجز عن الدعوة وما تتعلق بها-

الدعوة معنى

الكلمة الدعوة هى مصطلح إسلامى وهى تطلق على عدة معان[٢] فمنها الطلب[٣] والنداء[٤] والحث والتحريض على فعل شيء[٥] والاستغاثة[٦] والأمر[٧]والدعاء[٨]

وفى الاصطلاح فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا[٩]

---

* Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh.

وقال السيد محمد الوكيل الدعوة إلى الله هي جمع الناس إلى الخير ودلالتهم على الرشد بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.[١٠] وقال الشيخ الصواف الدعوة هي رسالة السماء إلى الأرض وهي هداية الخالق إلى المخلوق وهي دين الله القويم وطريقه المستقيم.[١١]

الدعوة و منهجها عبر العصور

من لدن آدم عليه السلام إلى محمد ﷺ أمة واحدة والله خالق هذه الأمة وربهم والأمر من الله إليهم هو إخلاص العبادة له كما قال تعالى إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ[١٢] فكانت دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام دعوة واحدة وبه قال الرسول ﷺ والأنبياء إخوة لعلاَّت أمهاتهم شتى ودينهم واحد.[١٣]

ولقد تحدث القرآن الكريم في مواضع عن دعوات الأنبياء وجاء ذلك مجملا ومفصلا فمما جاء مجملا فقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ[١٤] قال المفسر الطبرى فى تفسير هذه الآية ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولاً كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له بالطاعة وأخلصوا له العبادة[١٥] وقال السعدى ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاً وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له.[١٦]

ومما جاء مفصلا فقال تعالى عن دعوة نوح عليه السلام لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ[١٧] وقال تعالى عن دعوة هود عليه السلام: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّن إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ[١٨] وقال تعالى عن دعوة صالح عليه السلام وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ[١٩] وقال تعالى عن دعوة إبراهيم عليه السلام: وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، الآية[٢٠] وقال تعالى عن دعوة شعيب عليه السلام وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ[٢١] وقال تعالى عن دعوة عيسى عليه السلام :وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ[٢٢] وقال عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم :قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً[٢٣]

وفى هذا الصدد روى عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله ﷺ التي عليها خاتمه، فليقرأ هؤلاء الآيات قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا إلى قوله تعالى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا الآية.[٢٤] وهذه الآيات فيها تقرير شامل لدعوة جميع الأنبياء عليهم السلام يسعهم ويسع الدعاة من بعدهم.

وأن مناهج الأنبياء والرسل[٢٥] فى دعواهم تتفق و تختلف كما أن نوحا عليه السلام قام على الإسرار بالدعوة أولاً ثم الجهر بها أخيرا، وعدم الاكترات لسخرية الساخرين وأن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان في دعوته يعتمد على استعمال الحجة والبرهان مع الأدب والوقار في دعوة الكبراء من الآباء والملوك والأقرباء وأن دعوة نبي الله موسى عليه السلام ضرورة الاهتمام بشأن الشباب أكثر من الشيوخ وأن عيسى عليه السلام يدعو إلى ربه ويقارع اليهود الحجة، بعد أن جرفوا شريعة موسى عليه السلام وأن نبينا محمد ﷺ فقال الله تعالى عن منهج دعوته ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[٢٦] وقوله تعالى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.[٢٧]

دعوة عيسى عليه السلام و مناهجه فيها

إن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام دعا أمته بنى إسرائيل والمناهج التى نهج بها النبى فى دعوته فأبدع منها-

- **الدعوة بما أوحى الله إليه:** وجاء ذلك فى قوله تعالى أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ الآية [٢٨]

- ومنها **إثبات دعوته بالآيات البينة:** مثلا الكلام فى المهد وخلق الطير من الطين والنفخ فيه وكونه طيرا بإذن الله و إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله والإنباء بما يأكل الناس فى بيوتهم وما هم يدخرون ونزول المائدة.
  كقوله تعالى إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي.[٢٩]
  وَأُنبِّئُكُمْ بِماَ تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بيُوتِكُمْ الآية[٣٠]
  قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبنَّا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ الآية[٣١]
- ومنها **جمع الأنصار فى دعوته:** لما كفر بنو إسرائيل وأعرضوا عنه استعان من الأنصار وقال للحواريين من أنصارى إلى الله وقيل ذلك فى قوله تعالى فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُاللَّهِ الآية[٣٢]
- **السياحة للدعوة فيما يحتاج:** وهى الانتقال من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى منطقة للدعوة وهذا ظاهر بأن عيسى بن مريم عليه السلام لما كذّبه اليهود وافترى عليه انتقل إلى أماكن مختلفة لتبليغ رسالته وقال بعض المفسرين أن إسمه المسيح فسبب تسميته به لكثرة سياحته.

أساليب الدعوة و مناهجها فى سورة يس

جاء فى سورة يس فى الآية ١٣-٢٥ حادثة عن دعوة عيسى عليه السلام وهى أنه أرسل رسولين من حوارييه إلى ملك من ملوك الروم ثم أرسل ثالثا لتعزيزهما ونصرهم صاحب عيسى الذى يسكن هناك من قبل ففى تلك الدعوة حدث ما حدث وفى هذه الحادثة اتخذ عيسى عليه السلام بعض أهم أساليب الدعوة وكانت تلك الأساليب ذات حكمة بالغة رائعة مؤثرة فأوحى بها الله تعالى نبينا محمدا ﷺ وقال له واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية يعنى بها أنك يا محمد ادع قومك إلى سبيل ربك واختر المنهج كما نهج به عيسى عليه السلام لقومه. فمناهج الدعوة التى علّمنا الله فى سورة هذه فى التالية-

عرض الدعاة نفوسهم رسلا

الأمر فى الدعوة هو أن جعل الله الناس خليفة فى الدنيا وذلك قوله تعالى وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗ الآية فالناس فى الدنيا خليفة الله حقيقة واصطفى من بينهم عدد كبير من خيرة خلقه لتبليغ رسالته إلى الأمم وهم أنبياء و رسل فأولهم آدم عليه السلام وخاتمهم نبينا محمد ﷺ فما قالوا منذ خلق الناس إلا كان ذلك ما أوحى الله إليهم وذلك قوله تعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فهذه هى سنة الرسل عليهم السلام فى دعواهم. فأصحابهم وأتباعهم الذين يرثون هذه الدعوة يجب عليهم أن يتبعوا سنة الرسل فيقدمون نفوسهم بأنهم رسل الأنبياء ويكون دعواهم بما دعا الله إليها وبما دعا إليها الرسل. وهذا هو الأسلوب الحكيم قد ذكر الله ذلك فى سورة يس بقوله تعالى وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.

روى المفسر ثناء الله رحمه الله أن عيسى عليه السلام بعث رسولين[٣٣] من حوارييه بمدينة انطاكية الى الملك أنطفس من ملوك الروم[٣٤] عابد الأصنام وقيل أنطيخس بن أنطيخس[٣٥] فلما قربا من المدينة أتيا شيخا اسمه

حبيب[٣٦] صاحب عيسى عليه السلام ولمّا سلما عليه قال الشيخ من أنتما فقالا رسول الله يدعوكم من عبادة الأصنام الى عبادة الرحمان. ولما أحضرا عند الملك قال من أنتما قالا رسولا عيسى وبرواية قال لهما شمعون من أرسلكما الى هاهنا قالا الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك.[٣٧] كلهم عرفوا نفوسهم بأنهم رسل.

إرسال المؤيدين على آثار المقدمين لتعزيزهم

كل من يبعث رسوله بدعوته إلى قوم أو سادة يجب عليه أن يرسل بعده من ينصره و يعززه وهذه الحكمة تؤثر في الدعوة أثرا بالغا على المدعوين وبه قال الله تعالى فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ

روى ثناء الله رحمه الله أن الرجلين بعثهما عيسى عليه السلام الى أنطاكية فطالا مدة مقامهما وذات يوم خرج الملك فكبرا وذكرا الله فغضب الملك فأمر بهما وحبسهما وجلد كل واحد منهما مائتى جلدة قال المفسرون فلمّا كذّب الرسولان وضربا بعث عيسى عليه السلام رأس الحواريين شمعون الصفا[٣٨] على أثرهما لينصرهما حتى عز الحق وزهق الباطل.[٣٩]

تنكر النفس في الدعوة

ومن الأسلوب الفعال في الدعوة أن يجهل الداعى تعريفه وإيمانه وحقيقته إذ يحتاج إليه وجاء ذلك في قوله تعالى فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فهذا الثالث هو شمعون الصفا من بعثه عيسى عليه السلام لتعزيز الإثنين.

قال وهب في هذا الصدد فلمّا كذّب الرسولان وضربا بعث عيسى رأس الحواريين شمعون على أثرهما لينصرهما فدخل شمعون البلد متنكرا فجعل يعاشر حاشية الملك حتى آنسوا به فرفعوا خبره الى الملك فدعاه ورضى عشرته وآنس به وأكرمه.[٤٠] و هذا التنكر يعنى تنكر النفس في الدعوة مباح شامل الحكمة.

الدعوة سرا قبل العلانية

ومن الأسلوب المتين في الدعوة أن الداعى يعلم أولا عن المدعوين حقيقتهم و أفكارهم ثم يبلّغ دعوته إليهم سرا حتى يقبلوا دعوته لمّا يجهر بها .

وهذا الأسلوب الحكيم نرى في قوله تعالى وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ[٤١]

فقال المفسر ثناء الله رحمه الله في تفسير هذه الأية أن عيسى عليه السلام وصل دعوته أولا إلى حبيب النجار ثم بعث رسولين من الحواريين الى مدينة أنطاكية فهما أتيا أولا إلى حبيب الذى كان مؤمنا بدين عيسى عليه السلام.[٤٢]

إثبات الضلالة بالبراهين العقلية

لا بد للدعاة أن يقدموا البراهين والحجج العقلية على صدق أقوالهم وأمورهم ويثبتوا بها ضلالة الضالين وشرك المشركين وكذب الكاذبين حتى يتبين الحق من الباطل. وفي هذه الحادثة نرى أن الرسول الثالث يعنى شمعون أتى الملك بعد تكذيب الرسولين وآنسه ورضى عشرته كما علمنا فإنه قال ذات يوم للملك أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك الى غير دينك فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ فقال الملك غاضبا بينى وبين ذلك قال وما لنا لا نطلع خبرهما؟ فدعاهما الملك فقال لهما شمعون من أرسلكما قالا الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك فقال لهما شمعون صفاه وأوجزا فقالا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وقدما من آيات الله كما شاء الملك فتعجب وبهت فقال شمعون للملك ان أنت سألت إلهك حتى يصنع صنعا مثل هذا فيكون لك الشرف فقال الملك ليس لى عنك من سر أن الهنا الذي نعبده لا يسمع ولايبصر ولايضر ولاينفع.[٤٣]

تصديق الدعوة بالآيات

الأمر الواقع فى الدعوة هو تصديق دعواه وتحقيقه بالآيات عندما يحتاج إليها لأن المخالفين فمن طبائعهم أنهم يسألون الآيات على صدق أقوالهم كما نراها فى هذه الحادثة وهى لما دعا الرسولان بأنهما رسلا عيسى عليه السلام قيل وما آيتكما قالا ما تتمنّونها فجئ بغلام مطموس العينين وموضع عينيه كالجبهة فما زال يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر فأخذا بندقتين من الطين فوضعاهما فى حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما. ثم سألهم عن إحياء الموتى وقال إن قدر إلهكم على إحياء ميت أمنا به قالا إلهنا قادر على كل شىء فقال الملك إن هاهنا ميتا مات منذ سبعة أيام وانا أخرته فلم أدفنه لغيابة أبيه فجاءوا بالميت فجعلا يدعوان ربهما علانية وجعل شمعون يدعو ربه سرّا فقام الميت وقال إنى قد متّ منذ سبعة أيام و وجدت مشركا فأدخلت فى النار وأنا أحذركم مما أنتم فيه فآمنوا بالله ثم قال فتحت أبواب السماء فنظرت فرأيت شابّا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة قال الملك ومن الثلاثة؟ قال شمعون وهذان فتعجب الملك فأخبره شمعون بحاله فآمن الملك وأمن قوم وكفر آخرون وقيل أن هذه الواقعة وقعت مع إبنة الملك التى كانت توفيت فأحياها الله حيث انشق القبر عنها فخرجت وقالت اعلموا أنهما صادقان ولا أظنكم تسلمون ثم طلبت من الرسولين أن يرداها الى مكانها فذرا ترابا على رأسها وعادت الى قبرها كما كانت.[٤٤]

الدعوة بالحكمة

الأسلوب المؤثر فى الدعوة هو إجابة المخالفين بالكلمات المحكمة البينة كما ظهر ذلك فى قوله تعالى يَٰقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وهى أن هذه القصة ففيها لما علم الملك عن حقيقة حبيب النجار يعنى دينه قال له وأنت مخالف لديننا ومتابع لدين هؤلاء الرسل فدعاه إلى سبيل ربه بالحكمة و الموعظة الحسنة وقال وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي أى خلقنى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ءاتّخذ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ.[٤٥]

فالحكم الساطعة فى هذه الآية هى-

- إخلاص العبادة للخالق الأحد
- النفس كلها تموت وإلى خالقه ترجعون
- إنما العبادة للضار والنافع
- لا العبادة إلا لمن ينقذ و يغفر يوم الحساب
- العبادة ما فيها حق لمن لا تغنى شفاعته شيئا

نهاية الكلام

بعد استعراض أساليب الدعوة ومناهجها اللامعة فى آيات سورة يس نقول عنها أن الدعاة يجب عليهم أولا أن يتزينوا بهذه الزين للدعوة ويتخلقوا بهذه الأخلاق التى تخلّق بها الأنبياء والرسل. وهذه الأساليب لو تختارها الدعاة ليستفيدن المدعوون ويتعلمون الدين ويعترفون بأن الدين عند الله الإسلام.

References

[١] الإمام البخارى، صحيح البخارى، رقم الحديث- ٣٢٧٤.

[٢] http://www.saaid.net/aldawah/492.htm

[٣] جاء بذلك المعنى في قوله تعالى لا تدعو اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً (الفرقان: ١٤).

[٤] يعنى به قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقًا (الكهف:٥٢)

[٥] دل على ذلك المعنى قوله تعالى ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار (غافر:٤١).

[٦] نحو قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين (الأنعام:٤٠)

[٧] نحو قوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم (الحديد:٨)

[٨] نحو قوله تعالى ادعوا ربكم تضرُّعاً وخفية (الأعراف:٥٥)

[٩] ابن تيمية ، مجموع الفتاوى، ج١٥(دار الوفاء، ٢٠٠٥)، صـ ١٥٧

[١٠] الدكتور السيد محمد الوكيل، أسس الدعوة وآداب الدعاء (دار الوفاء، ٢٠٠٠م)، ص٩

[١١] محمد محمود الصواف ، الدعوة والدعاء (بيروت: مؤسسة الرسالة)، ص٢٢

[١٢] الأنبياء: الآية ٩٢

[١٣] صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري، جـ٦ ص٤٧٨ رقم ٣٤٤٣.

[١٤] النحل، من الآية ٣٦

[١٥] الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن، جـ١٤ (بيروت: دار إحياء التراث العربى، ٢٠٠١)، ص١٠٣.

[١٦] السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، جـ٢ (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزى، ١٤٢٢هـ)، ص٥٩

[١٧] الأعراف، الآية ٥٩

[١٨] الأعراف، الآية ٦٥

[١٩] الأعراف، الآية ٧٣

[٢٠] العنكبوت، الآيتان ١٦، ١٧

[٢١] هود، الآية ٨٤.

[٢٢] المائدة، الآية ٧٢

[٢٣] الأنعام الآية ١٥١

[٢٤] العلامة سليمان بن عبدالله، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد(المملكة العربية السعودية: دار الصميعى،٢٠٠٧)، ص٦٣.

[٢٥] https://www.albayan.ae/sports/2007

[٢٦] النحل: ١٢٥

[٢٧] يوسف: ١٠٨

[٢٨] الأنعام: ٩٠

[٢٩] المائدة: ١١٠

[٣٠] آل عمران: ٤٩

[٣١] المائدة: ١١٤

[٣٢] آل عمران ٥٢-٥٣

[٣٣] قال وهب الرسولان هما يحى ويونس وقال كعب هما صادق وصدوق وحكى النقاش هما سمعان ويحى (انظر: الإمام القرطبى ، الجامع لأحكام القرآن، جـ ٨ (القاهرة: دار الحديث،٢٠٠٢)، صـ ١٦.)

[٣٤] تفسير الطبرى، جـ ٢١-٢٢، صـ ١٨٣.

[٣٥] وهذا رواية ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار و وهب بن منبه وقال ابن حميد براية يقال له أبطيحس بن أبطيحس (انظر: ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، جـ ٣ (القاهرة: مؤسسة المختار، ٢٠٠٢)، صـ ٥٧٢)

[٣٦] عن قتادة هو حبيب النجار وقال السدىّ كان قصارا وقال وهب كان حبيب رجلا يعمل الحرير وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة. (انظر: التفسير المظهرى، صـ ٣٦ ، تفسير ابن كثير، صـ ٥٧٣؛ و تفسير الطبرى، صـ ١٨٥)

[٣٧] القاضى محمد ثناء الله ، التفسير المظهرى، جـ ٨ (ديوبند: زكريا بكديفو، ب-ت)، صـ ٣٣ ؛الجامع لأحكام القرآن للقرطبى، صـ ١٧.

[38] اخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير وقال كعب اسمه شلوم وذكر ابن كثير كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا، واسم الثالث بوليس. وقال ابن حميد عن ابن عباس، وعن كعب الأحبار، وعن وهب بن منبه ثلاثة هم صادق، ومصدوق، وسلوم

[39] التفسير المظهرى ،صـ ٣٣؛ التفسير القرطبى، صـ ١٧.

[40] التفسير المظهرى، صـ ٣٤

[41] يس: ٢٠

[42] التفسير المظهرى، صـ ٣٦؛ ، تفسير القرطبى، صـ ١٩.

[43] هذا رواية وهب بن منبه(انظر: التفسير المظهرى، صـ ٣٤؛ تفسير القرطبى، صـ ١٨.

[44] التفسير المظهرى، صـ ٣٤؛ تفسير القرطبى، ١٨

[45] التفسير المظهرى، صـ ٣٧؛ تفسير القرطبى، صـ ٢٠.

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

মানফালুতির ছোট গল্পে মানব জীবন
(Depiction of Human Life in Manfaluti's Short Stories)

Dr. Md. Motiur Rahman (2)*

Abstract: Short stories are an integral part of every literature. The completeness of literature can not be imagined without short stories. Arabic short stories, like other literature, have made significant contributions to the success of Arabic literature. Sayed Mustafa Lutfi Al Manfaluti, a distinguished short-story writer from Egypt, is one of the leading figures in the development of modern Arabic language and literature. Manfaluti was born in 1876, in the village called Manfalut in the province of Asyut in Egypt. He is best known as a successful short-story writer in modern Arabic literature. Manfaluti's short stories include some translated and some self- written stories. His short stories have been published in a collection of short stories titled *Al Abarat*. Al-Yateem, Al-Iqab and As-Shuhada are the most famous stories of Abarat. These short stories have gained considerable popularity in Arabic literature. The story of helpless, poor and miserable people is depicted in Al-Iqab whereas Al-Yateem portrays the pathetic story of the childhood of an orphan. In Shuhada, the lamenting of bereaved families and the indomitable desire to get back the lost ones are beautifully expressed. Thus, the image of human life is skillfully narrated in brief and somewhere in detail. Many stories of human life have been recorded in various texts but not all of them are short stories. As a part of literature, a short story must be written in a special style including a unique beginning and ending. The characteristics of short stories have been adequately reflected in Manfaluti Portrayal of human life. This article attempts to present briefly the biography of Manfaluti, introduction to his short stories and the depiction of human life in those stories.

ভূমিকা

ছোটগল্প প্রতিটি সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছোটগল্প ছাড়া সাহিত্যের পূর্ণতা কল্পনা করা যায় না। আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে যারা উন্নত করেছেন মিশরের সৈয়দ মুস্তফা লুৎফি আল মানফালুতি তাদের অন্যতম। মানফালুতির ছোটগল্পসমূহের মধ্যে কিছু অনূদিত কিছু স্বরচিত গল্প রয়েছে। তার ছোট গল্পগুলো আল আবারাত নামক গল্প সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। আবারাত গল্পগুচ্ছে আল ইকাব, আল ইয়াতীম, আশ শুহাদা অন্যতম। ইকাব গল্পে অসহায়, গরীব এবং দুঃখী মানুষের জীবন কাহিনী ফুটে উঠেছে। ইয়াতীম গল্পে পিতা-মাতাহারা শিশুর জীবনী বিবৃত হয়েছে। শুহাদা গল্পে স্বজনহারা মানুষের আর্তনাদ এবং হারানো মানুষকে ফিরে পাওয়ার অদম্য ইচ্ছার কথা ফুটে উঠেছে। এভাবে মানফালুতির প্রত্যেকটি ছোটগল্পে কোথাও সংক্ষিপ্তাকারে আবার কোথাও একটু বিস্তারিত ভাবে মানব জীবনের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মানফালুতির জীবনী, ছোটগল্পের পরিচিতিসহ মানফালুতির দু-একটি গল্পের আলোকে মানব জীবনের বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মানফালুতির সংক্ষিপ্ত জীবনী

সৈয়দ মুস্তফা লুৎফি আল-মানফালুতি মিশরের মানফালুত নামক স্থানে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহন করেন।[১] জন্মস্থানের নামানুসারে মানফালুতি নামেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[২] ছোটকাল থেকেই তিনি লেখা-পড়ায় গভীর মনোযোগী ছিলেন। খুব অল্প বয়সেই কুরআনুল কারীমের হিফয সম্পূর্ণ করেন।[৩] স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি কায়রো গমন করেন। সেখানে বিখ্যাত জামি আল আযহারে দীর্ঘ দশ বছর

* Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh.

ধরে আরবী সাহিত্য, হাদিস, তাফসীর, ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তৎকালীন আল মুয়াইদ পত্রিকায় তার অনেক লেখা প্রকাশিত হয়, এর মাধ্যমে তিনি একজন লেখক, অনুবাদক, এবং সাংবাদিক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। পরিশেষে ১৯২৪ সালে আরবী সাহিত্যের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র ইন্তিকাল করেন।[৪]

ছোটগল্প পরিচিতি

ছোটগল্প আরবী সাহিত্যের এক আধুনিক রূপ। শুধু গল্প বলতে আরবী ভাষায় قصة- حكاية- نادرة- اسطورة- رواية- اقصوصة ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে।[৫] তবে ছোটগল্পের আরবী প্রতিশব্দ القصة القصيرة।[৬] প্রতিটি ছোটগল্পের জন্য একটি কাহিনী থাকা আবশ্যক। একটি সার্থক ছোটগল্পের জন্য উক্ত কাহিনীর সূচনা, মধ্যভাগ এবং পরিসমাপ্তি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। এ বিষয় গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে ছোটগল্পকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, যে গল্প অর্ধ হইতে এক বা দুই ঘন্টার মধ্যে এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া শেষ করা যায়, তাহাকে ছোটগল্প বলা হয়।[৭]

প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক আনীস আল মাকদাসী বলেন:

القصة القصيرة يشعر معناها بشدة الإيجاز بحيث لا تتجاوز بضع صفحات و تدور غالبا على شخص واحد أو أشخاص فصاعدا.[٨]

'ছোটগল্প বলতে এমন এক প্রকার সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে বুঝায় যা কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং একটি অথবা একের অধিক চরিত্র নিয়ে পরিক্রম করে।'

ড. মুহাম্মদ বিন স'াদ বলেন:

القصة القصيرة هى عمل أدبي يقوم به فرد واحد و يتناول فيها جانبا من جوانب الحياة.[٩]

'ছোটগল্প এমন সাহিত্যকর্ম যাতে একজন ব্যক্তির জীবনের কোন একটি দিক আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত হয়।'

ছোটগল্প আকার ও কাঠামোগত দিক থেকে ছোট হওয়ায় ইহা বিষয় বৈচিত্রের দিক থেকেও সংক্ষিপ্ত হবে। পূর্ণ জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন সমাবেশ, বিভিন্ন কাহিনীর মধ্য থেকে ছোটগল্পে অংশ বিশেষ আলোচিত হয়। তাইতো রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন-

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যেহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটী অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইলনা শেষ।[১০]

ইয়াতীম গল্পে ইয়াতীম জীবনের বর্ণনা

মানফালুতি তার ইয়াতীম গল্পে একজন অসহায় ইয়াতীম ছেলের জীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন। ছেলেটির বয়স যখন ছয় বছর তখন তার পিতা মারা যায়। পিতা মারা যাওয়ার পর ইয়াতীম ছেলেটি স্বীয় চাচার নিকট লালিত পালিত হতে থাকে। চাচা দুজনকেই একই স্কুলে ভর্তি করে দেন। এ অবস্থায় তারা দুজন বড় হতে থাকে এবং তাদের ভাই বোনের এ সম্পর্ক অজান্তেই একদিন ভালোবাসার সম্পর্কে রূপ নেয়। তাদের ভালোবাসার বর্ণনা দিয়ে ছেলেটি বলে:

بل كان حبي لها حب الراحب المتبتل صورة العذراء الماثلة بين يديه في صومعته يعبدها ولا يتطلع إليها.[١١]

'তার জন্য আমার ভালোবাসা ছিল কুমারী মাতার ছবির প্রতি সংসার বিরাগী পুরোহিতের ভালোবাসার ন্যায় যে কিনা মন্দিরে বসে ঐ ছবির কেবল পূজা করে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেনা।'

এভাবে চাচার ছত্রছায়ায় ভালোভাবেই তার জীবন চলছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চাচা এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে চাচা তার স্ত্রীকে বলে যায়; তুমি ছেলেটিকে মায়ের মত দেখে রেখ। কিন্তু একদিন সকাল বেলা ছেলেটি ঘরে বসে আছে, এমন সময় বাড়ির পরিচারিকা এসে বলল, আমার মনিব আপনাকে বলতে বলেছেন। তিনি শীঘ্রই তার মেয়ের বিয়ে দিতে চান। এ জন্য ঘরটিকে জামাই মেয়ের জন্য প্রস্তুত করবেন; তাই আপনি এ বাড়িতে না থেকে অন্য কোন বাড়িতে গিয়ে থাকুন। আপনার প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করা হবে। একথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ থেকে ছেলেটি বলল, আমার ঐ সব কিছুর প্রয়োজন হবে না; আমি এমনিতেই এই বাসা থেকে চলে যাব। এ বলে সে রাতেই তার ঘুমন্ত চাচাতো বোনকে এক নজর দেখে বেরিয়ে পড়লো। যাবার সময় ছেলেটি বলেছিল:

لعمرك ما فارقت بغداد عن قلى   لو انا وجدنا من فراق لها بدا

كفى حزنا أن رحت لم أستطع لها   وداعا و لم أحدث بساكنها عهدا[১২]

'তোমার জীবনের শপথ! আমি ঘৃণাভরে বাগদাদ ত্যাগ করিনি।

যদি এটি ছেড়ে না যাওয়ার কোন উপায় থাকত তাহলে আমি তাই করতাম।

দুঃখের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমি চলে গেলাম, অথচ পারলাম না তাকে জানাতে বিদায়..'

এরপর অস্থির মনে সকালে এক শহরে পৌঁছলে বিকালে আবার অন্য শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। এভাবে তার পকেটের টাকা প্রায় শেষ হয়ে যায়। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল কিছু বই বিক্রি করে জীবন চালানোর ব্যবস্থা করবে। কিন্তু স্বল্প মূল্য দিয়েও নিতে কেউ রাজি হলো না। এবার বিষণ্নচিত্তে বাড়ি ফিরে দেখে তার চাচার বাড়ির কাজের মেয়ে তাকে খোঁজ করছে। কথা শুরু করতেই মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়লো। তার কান্না দেখে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো। কি হয়েছে! তুমি কাঁদছো কেন? মেয়েটি চাদরের ভেতর থেকে একটি চিঠি বের করে ছেলেটির হাতে ধরিয়ে দিল। চিঠি খুলেই দেখলো এটা তার চাচাতো বোনের লিখা চিঠি। চিঠিতে লিখা ছিল:

إنك فارقتني ولم تودعني فاغتفرت لك ذلك, فأما اليوم وقد أصبحت على باب القبر فلا أغتفر لك ألا تأتي إلي لتودعني الوداع الأخير.[১৩]

'তুমি আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেছ। ব্যাপারটি আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। আজ আমি কবরের দোরগোড়ায়, এখন তুমি এসে যদি আমাকে শেষ বিদায় না জানাও তবে তোমাকে আমি ক্ষমা করব না।'

চিঠি শেষ করেই ছেলেটি দৌড় দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। মেয়েটি বললো; থামুন জনাব কোথায় যান? ছেলেটি বললো, সে অসুস্থ তার কাছে আমাকে যেতেই হবে। মেয়েটি বললো গিয়ে কোন লাভ নেই। ইতোমধ্যে মৃত্যু তার কাছে পৌঁছে গেছে। এ কথা শুনে ছেলেটি বললো, কিভাবে কি হলো একটু খুলে বলো। মেয়েটির ভাষ্য থেকে জানা যায়, ছেলেটি যেদিন সে বাড়ি থেকে চলে আসে, সেদিন থেকেই সঙ্গী হারানোর ব্যথায় মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর এক রাতে সে আমার নিকট থেকে কাগজ কলম নিয়ে অত্র চিঠি লিখে আপনার নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়। পরের দিন চিঠি নিয়ে আপনাকে খুঁজতে থাকি, কিন্তু দিন শেষে হতাশ হয়ে বাসায় ফিরে দেখি সে দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছে। এ কথা বলে পরিচারিকা যাওয়ার অনুমতি নিয়ে চলে গেল। এবার ছেলেটি চরম একাকীত্ব অনুভব করে এক পর্যায়ে আবারও চেতনা হারিয়ে ফেললো। বেশ কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরে এলে দেখলো একজন লোক তার পাশে বসে আছে, যে তার এ দূরবস্থা দেখে পাশের বাড়ি থেকে এসেছে। লোকটিকে দেখে ছেলেটি কান্না কণ্ঠে বললো, আমার আর বাঁচার আশা নেই। আপনি কি আমাকে মৃত্যুর পূর্বে একটি ওয়াদা দিবেন? আমি মারা যাওয়ার পর আপনি আমাকে আমার চাচাতো বোনের কবরের পাশে কবর দিবেন এবং তার সাথে এ চিঠিটিও কবরস্থ করবেন। লোকটি বললো হ্যাঁ করবো। ছেলেটি বললো, এবার একটু শান্তিতে মরতে পারবো। এরপর তার দেহ থেকে প্রাণটি বেরিয়ে গেল। লোকটি ছেলেটিকে তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চিঠিসহ চাচাতো বোনের পাশে কবর দিলো। এভাবে মৃত্যুর পর তাদের আশা পূরণ হলো।

هكذا اجتمع تحت سقف واحد ذانك الصديقان الوفيان اللذان ضاق بهما في حياتهما فضاء القصر، فوسعتهما بعد موتهما حفرة القبر.[١٤]

'এভাবে একই ছাদের নিচে দুই বিশ্বস্ত বন্ধু একত্রিত হল, জীবদ্দশায় যাদের জন্য প্রাসাদের প্রশস্ততাও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল, আজ কবরের সংকীর্ণ গর্ত তাদের জন্য প্রশস্ত হয়ে গেল।'

ইকাব গল্পে মানব জীবনের বর্ণনা

আল-মানফালুতি তার ইকাব গল্পে একজন বৃদ্ধের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। লেখক গ্রীষ্মের কোন এক রাত্রিতে স্বপ্নে জনমানব শূন্য এক মাঠ দিয়ে পথ চলতে চলতে দেখলেন, সেখানে একটি মস্তকবিহীন লাশ। লাশের চার পাশে তার মাথা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুলো বালি মাখা অবস্থায় পড়ে আছে। এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর লেখক দেখলেন কে যেন ছায়ামূর্তির মত দূর থেকে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর লেখক বুঝতে পারলেন একজন বৃদ্ধা মহিলা। মহিলাটি সেই বৃদ্ধ লোকের পাশে এসে লাশের সৎকার করে অঝোরে কাঁদছেন। লেখক বলেন আপনার অবস্থা আমাকে খুলে বলুন, আমি আপনাকে সহযোগিতা করতে চাই। বৃদ্ধা বলেন, মৃত ব্যক্তি আমার স্বামী। পরিবারের লোকজনের রুযির ব্যবস্থা করার জন্যই আজীবন পরিশ্রম করে গেছেন। এরই মধ্যে তিনি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন। তার একমাত্র ছেলে বড় হয়ে পিতাকে সাহায্য করতে শিখেছে। কিন্তু হঠাৎ করে ছেলেটি মারা যায়। আর পেছনে রেখে যায় পাঁচটি সন্তান। বৃদ্ধ লোকটির পক্ষে পরিবারের এতগুলো সদস্যের খাদ্যের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। তাই বৃদ্ধ স্বামীকে ছাদাকার কিছু মালের জন্য গির্জায় পাঠালাম। এবার বৃদ্ধ লোকটি পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে তার সমস্ত অবস্থা খুলে বললেন। বৃদ্ধের কথা শুনে পাদ্রী অবহেলা ও ধমকের সুরে বললেন,

إن الدير لا يحسن إلا إلى الذين أسلفوه الإحسان من قبل، وما كنت من أيام رغدك ورخاءك من المحسنين إليه فاذهب لشأنك فأبواب العيش واسعة بين يديك فإن ضاقت بك فأبواب الجرائم أوسع منها.[١٥]

'গির্জা তাদেরই প্রতি শুধু সাহায্যের হাত প্রসারিত করে, যারা ইতিপূর্বে গির্জাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তুমি নিজের স্বচ্ছলতা এবং স্বাচ্ছন্দের দিনে গির্জার প্রতি কোন সাহায্যের হাত বাড়াও নি। আর দুঃসময়ে সাহায্য চাইতে এসেছ, এখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। তোমার অবস্থা নিয়ে ফিরে যাও, জীবন ধারনের পথ অনেক প্রশস্ত। আর যদি না পার তাহলে অপরাধের দরজা তার চেয়েও প্রশস্ত।'

এরপর পাদ্রীর নিকট থেকে নিরাশ হয়ে বৃদ্ধ লোকটি গির্জা থেকে বেরিয়ে আসলেন। আঙ্গিনায় আসতেই গির্জার এক কোণে একটি আটার বস্তা দেখতে পেয়ে মনে মনে আটার বস্তা নেওয়ার কথা ভাবলেন এবং বললেন:

إن الطعام طعام الفقراء والمساكين، وأنا فقير مسكين، لا أعلم أن بين أسوار هذه المدينة، و لا في جميع أرباضها رجلا أحوج ولا أفقر مني، فإن كان الطمع في هذه الغرارة جريمة فقد أذن لي الكاهن بارتكاب الجرائم في سبيل العيش.[١٦]

'নিশ্চয় এ খাদ্য ফকির ও মিসকিনের খাদ্য, আর আমি একজন ফকির একজন মিসকিন। এ শহরের আশে পাশে বা শহরের সমস্ত উপকণ্ঠে আমার চেয়ে অধিক দরিদ্র কোন ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা নেই! তাই এ আটার বস্তা নেয়ার ইচ্ছা করা যদি আমার অপরাধ হয় তবে পাদ্রী আমাকে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এ রকম অপরাধ করার অনুমতি দিয়েছেন।'

এবার বৃদ্ধ লোকটি কষ্ট করে আটার বস্তাটি পিঠে উঠিয়ে নিয়ে পথ চলা শুরু করলেন। এক সময় তার বস্তা বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল এবং মাটিতে পড়ে গেল। তারপর আটার বস্তা চুরি হয়ে গেছে বলে চারিদিকে রব উঠল। এ আটার বস্তা চুরির দায়ে বৃদ্ধ লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধ লোকটি চোর ছিলেন না। বৃদ্ধা তার স্বামীর পরিচয় তুলে ধরে বিদায় বেলায় বলেন:

الوداع يا رفيق صباي، وعماد شيخوختي! الوداع يا خير الأزواج وأبر العشراء! الوداع حتى يجمع الله بيني و بينك في دار جزائه.[١٧]

'বিদায়! হে আমার শৈশবের সাথী, বার্ধক্যের সহায় বিদায়! হে প্রিয় স্বামী, হে উত্তম প্রতিবেশী, পরকালে তোমার ও আমার মাঝে স্বাক্ষাৎ হবে বিদায়!'

আশ-শুহাদা গল্পে স্বজনহারা নারীর জীবন কাহিনী

মানফালুতির আশ শুহাদা গল্পে পিতা-মাতা ও স্বামীহারা একজন নারীর জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লেখক বলেন, মহিলার পিতা-মাতা এবং স্বামী মারা যাওয়ার পর তার এক পুত্র ও এক ভাই ছিল। মেয়েটির হাতে অল্প কিছু অর্থ ছিল। তার ভাই বিপদে পড়ে অর্থগুলো নিয়ে এক অজানা গন্তব্যে চলে যায়। ফলে মেয়েটি একদম নিঃস্ব হয়ে যায়। ছোট বাচ্চা নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই সে নিরুপায় হয়ে বিভিন্ন কাজের সন্ধান করতে থাকে। এভাবে কোনোমতে সংসার চালিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এক সময় তার ছেলেটি বড় হয়ে উঠলো। যুবক ছেলেটি মায়ের দু:খ বেদনার কথা বুঝতে পেরে তার দায়িত্ব নেয়ার কথা ভাবলো। কারণ এ বৃদ্ধা মাতা তাকে অনেক কষ্ট করে লালন-পালন করেছে। সে চিন্তা করলো কিভাবে দু'টি পয়সা আয় করে মাকে সাহায্য করা যায়। তাই সে ছবি আঁকা শুরু করলো। ছবি আঁকা থেকে যা পাচ্ছিল তা থেকেই স্বাচ্ছন্দের সাথে মা ছেলের সংসার চলছিল। এদিকে ভাইয়ের কথা মহিলাটি কোন ভাবেই ভুলতে পারেনা। একদিন পুত্র বাড়ি ফিরে দেখে মা হাতে একটি ছবি নিয়ে কাঁদছে। তারপর ছেলেটি ভাল করে দেখলো ছবিটি তার মামার। ছেলেটি মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, মা কেঁদনা একটু ধৈর্য ধর তোমার হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের খবর তোমাকে এনে দিবো। বৃদ্ধা উজ্জ্বল চেহারায় আনন্দিত হয়ে বলল সে কি করে বাবা? ছেলেটি বলল কয়েক মাস পর আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে এক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে গিয়ে তোমার হারানো ভাইয়ের সন্ধান করবো। এ কথা বলে ছেলে দীর্ঘদিনের জন্য আমেরিকায় পাড়ি জমালো। ভাই হারা সন্তান হারা মা একাকী কুড়ে ঘরে অবস্থান করতে থাকলো। বেশ কিছু দিন পর মা তার ছেলের পাঠানো কিছু অর্থ লাভ করলো এবং চিঠির মাধ্যমে জানতে পারলো ছেলে মামাকে না খুঁজে বাড়ি ফিরবেনা। দুঃখিনী মা পুত্রের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে কিন্তু কেউ তাকে পুত্রের কোন খবর দিতে পারে না। সকালে গীর্জায় গিয়ে হারানো পুত্রকে ফিরে পাওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে বার বার প্রার্থনা করে। এ অবস্থায় একদিন বৃদ্ধা মহিলা এক সমাধি স্তম্ভে গিয়ে মনে মনে পুত্রের ছবি অংকন করে বিড়বিড় করে বলতে থাকলো। হে পুত্র! তুমি কি মারা গেছ; তোমার সমাধি কোন দেশে? তুমি জান না তোমার একজন দু:খিনী মা রয়েছে। তুমি যেখানেই থাক আমার বুকে ফিরে আস।

এভাবে পুত্র শোকে বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে স্বজনহারা বৃদ্ধা মহিলার করুণ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, মিশরের সৈয়দ মুস্তফা লুৎফি আল- মানফালুতি আধুনিক আরবী সাহিত্যের একজন সার্থক ছোটগল্পকার। তার ছোটগল্পের মাধ্যমে আরবী সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে। তার প্রতিটি গল্পেই মানব জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। তার গল্পগুচ্ছের মাঝে যে জীবন কাহিনীগুলো বর্ণিত হয়েছে তা একটি প্রবন্ধে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষিপ্তভাবে এখানে দু' একটি গল্পকে সামনে রেখে সেখান থেকে মানব জীবনের কিছু কিছু কাহিনীকে উপজীব্য করে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে অত্র প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। আশা করা যায়, এখান থেকে ছাত্র-শিক্ষক এবং পাঠকসমাজ কিছুটা হলেও উপকৃত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ.৩৪০।

২ হান্না আল-ফাখুরী, *আল জামি ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী* (বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২০১।

৩ *তারীখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪১।

৪ *আল জামি ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১।

৫ আবু তাহির মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী ছোট গল্প প্রসঙ্গ* (ঢাকা: পুরবী প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৯।

৬ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৬৪০।

৭ শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্য-সন্দর্শন* (কীলকাতা: দি এলিট প্রেস, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১১৬।

৮ ড. আনীস আল-মাকদিসী, *আল-ইত্তিজাহাতুল আদাবীয়্যাহ* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৪৫।

৯ ড. মহাম্মদ বিন সাআদ, *আল-আদাবুল আরাবী ওয়া তারীখুহু* (আল-মামলাকাতুল আরাবীয়্যাহ আস-সাউদীয়্যাহঃ ওযাবাতুত তালীম আল-আলী, ১৪১০ হি.), পৃ. ৭৩।

১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সোনার তরী* (ঢাকাঃ স্মৃতি প্রকাশনী, ১৩৯৫ বাং.), পৃ. ২৭।

১১ মুস্তফা লুতফি আল মানফালুতি, *আল আবারাত* (দেউবন্দঃ ইত্তিহাদ বুকডিপো, তা.বি.), পৃ. ১৩।

১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

১৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

১৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬-১০৭।

১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

১৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

مزاعم المستشرقين حول الآية القرآنية "تلك عشرة كاملة": دراسة نقديّة

(Refutation of Orientalists' allegations about a Qur'anic verse (تلك عشرة كاملة): A Grammatical Analysis)

Dr. Mohammad Nurul Islam*

Abstract: Orientalists are the scholars who study the language, culture, and history of eastern Asian countries. Today, some orientalists argue that the holy Quran has significant grammatical errors in several verses. As a part of this, they suggest using plural nouns instead of singular nouns, masculine gender in place of the feminine gender, nominative case instead of accusative case, and vice versa. More specifically, they are claiming that this verse **(** فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ: And whoever cannot find [or afford such an animal] – then a fast of three days during Hajj and seven when you have returned. Those are complete ten. Bakarah: 196**)** unnecessarily specifies a specific thing. They also argue to skip this (كَامِلَةٌ) and write only this (تِلْكَ عَشَرَةٌ) as correct. However, research shows that using (تِلْكَ عَشَرَةٌ) right after (كَامِلَةٌ) has greater significance. After studying Orientalists' claims, I have found that the ignorance of Arabic grammatical rules and different reading and recitation styles are the main reasons behind their illogical claims. The Orientalists' primary purpose of Arabic grammar research is to create doubt about the Holy Quran and divide the Muslim Ummah by creating anarchy and factionalism. This paper throws light on the introduction of Orientalists and the holy Quran, Orientalists' claim and its rebuttal. Here, I defend their base of suspicion by logical clarification with the help of Arabic grammar, Quran-Sunnah and intellectual evidence. This paper's ultimate finding is that the Quran is undoubtedly the highest original, divine, and reliable book. In-sha-Allah, this research work will assist both knowledge seekers and common people.

الملخص

المستشرقون هم الغربيّون الذين يكتبون ويدرسون عن العلوم والفنون والمعارف الخاصة بالشرق، ولغاته، وآدابه. هميدّعون بغير أدلة قاطعة بوجود الأخطاء النحويّة في بعض الآيات القرآنية، مثلا:استخدام المرفوع موضع المنصوب، أو عكسه، والتأنيث موضع المذكّر، أو عكسه، والمفرد في موضع الجمع، أو عكسه،أوالزّيادة بغير حاجة، وغيرها. فهم يدّعونأنّ القرآن الكريم أخطأ في الآية الكريمة: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. (القرآن الكريم، ٢:البقرة:١٩٦) حيث أتى في هذهالآية توضيح الواضح بغير حاجة. كما طعنوا أنّ قول الله:(كَامِلَةٌ) يوهم وجود عشرة غير كاملة في كونها عشرة، وذلك محال.ليست الحاجة إلى ذكر:[تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ]" عقب قوله:(ثَلَاثَةِ)، و(سَبْعَةٍ). لأنّهلأنّ الثلاثة مع السبعة صارت عشرةً، ولا أنّ ذلك يتنوّع، فيكون مرة كاملة، ومرة غير كاملة، لأنّها إذا لم تكن كاملة لم تكن عشرة. فيجب أن يقول:(تِلْكَ عَشَرَةٌ) فقط مع حذف قوله:(كَامِلَةٌ).أقول قد قمتُ بدراسة عميقة حول مزاعم المستشرقين فوجدتُ أنّ في إزادة كلمة "كاملة" بعد "تلك عشرة" لحكمةً بالغةً،وأنّ المستشرقين يزعمون ذلك لجهلهم بالقواعد النحويّة.ومن أهداف المستشرقين:التشويهُ في

---

* Professor, Department of Arabic, Chittagong University.

القرآن الكريم، والتشكيكُ في قلوب المسلمين والتشتيتُ بين الأمة الإسلامية، وحقدُهم على الإسلام، وكيدُهم فيه،وصدُّهم أبناءَ الإسلام عن دينهم. يتم هذا البحثُ وفقَ مناهج البحث العلمي من المنهج التحليلي والنقدي والجدلي.ومنأهم أهداف هذا البحث: عرضُ مظاهرِ ادّعاء المستشرقين حولَ الأخطاء النحويّة في القرآن الكريم، والإجابة للمستشرقين عن أهل الحقّ بالأدلة النقلية والعقلية. وتفنيد مزاعم المستسشرقين، وبيان جهلهم بالقواعد النحويّة والأساليب العربية.ومن أهمّ نتائج البحث: إنّ الآية المذكورة لصحيحة من منظور القواعد النحوية، وإثباتُ عدم وجود أخطاء نحويّة في القرآن الكريم، وإنّه لا يكون تابعا للقواعد النحوية، بل هى تابعة له. فالقرآن المجيد محفوظ من كلّ الأخطاء النحويّة.]

الإجابة

لقد طعن الملحدون-لعنهم الله تعالى-في ذلك من وجهين أحدهما: أنّ المعلوم بالضرورة أنّ الثلاثة والسبعة صارت عشرةً، فذكرُ لفظ "كاملةٌ" يكون إيضاحًا للواضح. والثاني: أنّ قوله:(كَامِلَةٌ) يوهم وجود عشرة غير كاملة، أي: عشرة ناقصة، وذلك محال. والعلماء أجابوا بجوابات عديدة، وبيّنُوا فوائد جمّة في ذكر "كاملة" بعد عشرة، كما يلي:

١- يقول أغلبُ المحققّين: قد زيدت كلمة(كَامِلَةٌ) بعد (عَشَرَةٌ) لقصد إفادة المبالغة في المحافظة على العدد، كما تفيد زيادة التوصية بصيامها، وأن لا يتهاون بها، ولا ينقص من عددها، حتى لا يظنّ أحدٌ أنّ المقصود إمّا صومُ ثلاثة أيّام فقط، وإمّا سبعة أيّام فقط، إنّه على الإفادة لجملة العددين إذ كانت العربُ أكثرُهم لا يحسنون الحساب، فاللائق بالخطاب العامي الذي يفهم به العامُ والخاصُ. يقول ابن عرفة: مذهب العرب إذا ذكروا عددين أن يجملوهما، وإنّما تفعل ذلك لقلّة معرفتهم بعلم الحساب. وقد قيل فيهم: "لَا يَحْسُبُ وَلَا يَكْتُبُ".[ب] إنّما قُصد بقول (كَامِلَةٌ) الإفادة إذ كانت العربُ لا تعرف دقيق الأعداد وليست ممن يحسن الحساب.[ت]

٢- ويقول جماعةٌ من النحويّين:إنّ الوصف (كَامِلَةٌ)لقصد التأكيد المجرَّد،وإنّها صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد، وزيادة التوصية بصيامها.يقول صاحب "تفسير الفاتحة والبقرة"محمد بن صالح في هذا الصدد: قوله تعالى:[تلك عشرة كاملة] للتأكيد على أنّ هذه الأيام العشرة وإن كانت مفرقة فهي في حكم المتتابعة.[ث]وإنّ التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد، بل لدفع نقصان الصفة.[ج]فإنَّه لا فائدة فيها من التَّبين أَوْ التَّمييز أَوْ المدح سوى التَّوكيد لتوكيد العشرة؛ نحو:"أمس الدَّابرُ لا يعودُ".[ح] إنّ التوكيد طريقة معروفة في كلام العرب. ونظائره كثيرة في الآيات القرآنيّة، منها: قوله -تعالى-:[وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ]، (٦: الْأَنْعَامِ: ٣٨)، والحال يطير الطائر بجناحيه، ومنها: قوله-تعالى-:[وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ.]،(٢٩: العنكبوت: ٤٨)، ولا يخطّ الناس إلا باليمين. ومنها: قوله-تعالى-:[وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَة وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً]،(٧: الأعراف:١٤٢)، فالثلاثين مع العشر أربعون.إنّ عادة الحساب قد جرت بذكر الجملة بعد التفصيل. وهذا أسلوب من أساليب طرق التأكيد. استشهدوا بقول الأعشى:[خ]

ثَلَاثٌ بِالْغَدَاةِ فَهِيَ حَسْبِي + وَسِتٌّ حِينَ يُدْرِكُنِي الْعِشَاءُ
فَذَلِكَ تِسْعَةٌ فِي اليَومِ رَبِّي + وَشُرْبُ الْمَرْءِ فَوْقَ الرَّيِّ دَاءُ
استخدم الشاعر تسعة بعد ذكر ثلاث وستّ توكيدا.

٣- يقول ابن عبّاس، والحسن -رضى الله عنهما- وجماعة من النحاة معناها: كاملة في قيامها مقام الهدي.[د] إنّما وصف العشرة بالكاملة لا ليعلمنا أنّ السبعة والثلاثة عشرة، بل ليبين أنّ بحصول صيام العشرة يحصل كمال الصوم القائم مقام الهدى.[ذ]

٤- ويقول جماعة من النحويين: أخرج ذلك مخرج الخبر، ومعناه الأمر بها. فتقديرها: تلك عشرة فأكملوا صيامها، ولا تنقصوها.[ر] كما يقول أبو جعفر الطبري: تلك عشرة أيام فأكملوا صومها لا تقصروا عنها، لأنّه فُرض عليكم صومُها.[ز]

٥- ويقول بعضُ أهل التأويل: معنى قوله تعالى:كَامِلَةٌ في البدل مِنَ الْهَدْيِ قائمةٌ مقامَه.[س] وفسّرها السمرقندي: "العشرة الكاملة كلّها بدل عن الهدي."[ش]

٦- ويقول بعضُهم: معناها: أنّها كاملة في ثواب صاحبه، مثل ثواب من يأتي بالهدى من القادرين عليه.[ص]وأيّده قولُ الحسن بن أبي الحسن في تفسير قول الله–تعالى-: كاملة في الثواب كمن أهدى.

٧- يقول أبو سليمان الدمشقي: معناها:كاملة في الفصل، وإن كانت الثلاثة في الحجّ، والسبعة بعده، لئلا يسبق إلى وهم أحد أنّ السبعة دون الثلاثة.[ض]

٨- ويقول بعضُهم في قوله: كلمة (كاملة) صفة مبينة كمال العشرة، فإنّها أوّل عدد كمل فيه خواصّ الأعداد، إذ به ينتهي الآحاد، وتتم مراتبها.[ط]

٩- ويقول بعضُ المحققين:إنّ الأعداد مراتبها أربعة: آحاد، وعشرات، ومِئِينَ، وألوف. والأعدادُ التي وراءها إمّا أن يكون مركّبًا أو مكسورًا. فوصّفت العشرة بالكمال لكونها عددًا موصوفًا بصفة الكمال خاليًا عن الكسر والتركيب.[ظ]

١٠- يقول القاضي أبو يعلى: قد كان يجوز أن يظنّ ظان أنّ الثلاثة قد قامت مقام الهدي في باب استكمال الثواب، فأعلمنا اللهُ-تعالى-أنّ العشرة بكمالها هي القائمة مقامه. أي: أنّه لما قيل:[فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ]؛ جاز أن يتوهم المتوهِّم أنّ الفرض ثلاثة أيام في الحج أو سبعة في الرجوع، فأعلم اللهُ -عزَّ وجلَّ-أنّ العشرة مفترضة كلّها، فالمعنى المفروض عليكم صومُ عشرة كاملة.[ع]

١١- يقول الأستاذ أبو الحسن عليّ بن أحمد الْبَاذِشُ: في قوله:[تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ]:أتى بكلمة (عَشَرَةٌ) تَوْطِئَةً للخبر بعدها، وهو(كَامِلَةٌ)، لا أنّها هى الخبر المستقلّ به،كقولنا: "خالد رجل صادق" والمقصود بهذه الجملة أن يقال: خالد صادق، فجِيء بِلفظ "رجل" تَوْطِئَةً للخبر بعدها.[غ]

١٢- قال بعض النحويّين : إنّما قال -تعالى-: "[تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ]"، وقد ذكر "سبعة" و"ثلاثة" لأنّه إنّما أخبر أنّها مجزئة، وليس يخبر عن عدتها، وقالوا: أنّ قوله:(كَامِلَةٌ) إنّما هو وافية.[ف]

١٣- أجاب بعضُ النحّاة: إنّما أريد بها تأكيد الكيفية، لا الكمّية، حتى لو وقع صومُ العشرة على غير الوجه المذكور لم تكن كاملة.[ق]

١٤- أجاب بعضُ النحويين: أنّها كاملة في أنّ حجّ المتمتّع إذا أتى بهذا الصيام يكون كاملا، مثل حجّ من لم يأت بها التمتّع. [ك]

١٥- ويقول بعضُ النحويين: ذكر "[كَامِلَةٌ]" بعد [تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ]؛ فائدتُها أن لا يتوهم متوهمٌ أنّ الواو بمعنى "أو".[ل]

١٦- ويقول دكتور شوقي ضيف: إنّما جاء بتلك العبارة دفعًا لتوهّم إرادة الإباحة في قوله-جل وعزّ-:[فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ].[م]وأن يعلم العددُ جملة، كما علم تفصيلا، فإن أكثر العرب لم يحسنوا علم الحساب.

١٧- يقول بعضُهم:إنّ هذا الكلام[تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ]، يزيل الإبهام المتولّد من تصحيف الخطّ، وذلك لأنّ سبعة وتسعة متشابهتان في الخطّ، فإن قال بعده[تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ]، زال هذا الاشتباه.[ن] كما حكى أنّ ابن أبي حاتم الرازي قرأ: "[فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَتسْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ.]" فقد قرأ "تسْعَةٍ" موضع "سبعة"، لأنّ سبعة وتسعة متقاربان في رسم الخطّ. فقيل: ما أقلّ بصرك بالحساب.[هـ]

١٨- يقول بعضُهم: إنّ الله –تعالى- خاطب بهذه الآية أهل العرب الذين هم لم يكونوا أهل حساب، فبيّن الله –تعالى- ذلك بيانا قاطعا للشكّ والريب. وهذا كما روى أنّه قال في الشهر: هكذَا وهكذَا، وأَشار بِيديه ثَلاثًا، وأَشار مرّةً أُخرى، وأَمسك إبهامه في الثّالثَة منبّهًا بِالإشارة الأولى على ثَلاثين، وبِالثَانية على تسعة وعشرين.[و]

١٩- يقول بعضهم: إنّ العدد مراتبه أربعة، وهي: آحاد، وعشرات، ومئين، وألوف. وما وراء ذلك فإمّا أن يكون مركّبا، أو مكسورا، وكون العشرة عددا موصوفا بالكمال بهذا التفسير أمر يحتاج إلى التعريف، فصار تقدير الكلام: إنما أوجبت هذا العدد لكونهعددا موصوفا بصفة الكمال خاليا عن الكسر والتركيب.[ي]

٢٠- يقول بعضهم:إنّ الله -تعالى- لمّا أمر بصيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة بعد الرجوع من الحجّ، فليس في هذا القدر بيان أنّه طاعة عظيمة كاملة عند الله –تعالى-، فلمّا قال بعده:[تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ]، دلّ ذلك على أنّ هذه الطاعة في غاية الكمال، والعلو. فإنّ التنكير فيهما يدلّ على تعظيم الحال، فكأنّه قال:عشرة وأيّةُ عشرةٍ، عشرةٌ كاملةٌ.[اأ]

٢١- يقول بعضُهم: إنّ قوله:[فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ]،يحتمل أن يكون المرادُ منه كونَ الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة أيام، على أنّه يحسب من هذه السبعة تلك الثلاثة المتقدمة، حتى يكون الباقي عليه بعد الرجوع من الحجّ أربعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة، ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة، فهذا الكلام محتمل لهذين الوجهين،

فإذا قال بعده[تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ]، زال هذا الإشكال، وبين أنّ الواجب بعد الرجوع سبعة سوى الثلاثة المتقدمة.[بب]

٢٢- يقول جماعة من المحققين: إنّ الكلام الذي يعبّر عنه بعبارات طويلة، ويعرّف بصفات غزيرة أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذي يعبّر عنه بعبارة قليلة.[تت]

نتائج البحث

نجد بعد البحث والتفكّروالتدبّر بمزاعم المستشرقين حول الآية المذكورة فى السؤال[تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ]:

- أنّ الآية المذكورة لصحيحة من منظور القواعد النحوية، والأساليب العربية الفصحى.
- وأنّ مزاعم المستشرقين باطلة حول ادّعاء إزادةكلمة "كاملة" في الآية المذكورة.
- وأنّ مزاعمهم بوجود أخطاءٍ نحويةٍ في القرآن الكريم باطلة.
- وأنّالمستشرقين لجاهلون بالقواعد النحويّة والأساليب العربية.
- وأنّ علوم المستشرقين بالقواعد النحويّة والأساليب العربية لقليلةٌ جدًا.
- وأنّ القرآن الكريملمحفوظٌ كلَّ الحفظ من كلّ الأغلاط النحويّة والصرفية واللغوية.
- والقواعد النحوية تابعة للقرآن الكريم، والقرآن الحكيم لن يتبعَه عوضُ.
- وأنّ أساليبَ القرآن الكريملغريبةٌ أعلى من أساليب العرب المتداولة.
- قد تحدّى الله بالقرآنبلغاءَ العرب، حتىّ عجزوا أن يأتوا بكتابٍ مثله، أو بعشر سورٍ أو بسورةٍ واحدةٍمن مثله.
- وإنّ القرآن الكريم لمعجزٌ لفظًا ومعنى، نحوًا وصرفًا، فصاحةً وبلاغةً.

التوصيات والمقترحات

- نشرُ تعاليمِ القرآن الكريم والسنّةِ في أنحاء العالم الراهن.
- تعليمُ الطلاب العلومَ الشرعيةَ والعلومَ العربية، وبالخصوص علمَ النحو والصرف وإعرابَ القرآن وعلم الفصاحة والبلاغة.
- تعليم أبناء الإسلام العقائد الصحيحة والتعاليم الإسلامية، وتحفيظُهم من العقائد الفاسدة والأفكار الباطلة.
- بناءُ مراكز التعاليم، والثقافات والحضارات الإسلامية في أرجاء العالم الراهن.
- إعداد الكتّاب والمفكّرين المخصصين لتفنيد مزاعم المستشرقين والمشكّكين والملحدين والمنكرين.

References

[أ] . الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر، مفاتيح الغيب=التفسير الكبير،ج٥، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط٣،١٤٢٠هـ)، ص:٣١٠.

[ب] . أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن عليّ، البحر المحيط في التفسير، المحقق: صدقي محمد جميل، ج٢، (بيروت: دار الفكر، الطبعة:١٤٢٠هـ)، ص ٢٦٨.

[ت] . أبو بكر محمد بن يحى الصولي، أدب الكتاب، تعليق: محمد بهجة الأثري، المدقّق: السيد محمود شكري الآلوسي، ج١، (بغداد: المكتبة العربية، عام النشر: ١٣٤١)، ص ٢٤٠.

[ث] . محمد بن صالح بن محمد العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، ج٢،(المملكة العربية السعودية:دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢٣هـ)، ص ٣٩٤.

[ج] .إبراهيم بن إسماعيل الأبياري، الموسوعة القرآنية، ج٣، (القاهرة: مؤسسة سجل العرب)، ص ١٢٥.

[ح] . شمس الدين، محمد بن يوسف الكرماني، تحقيق الفوائد الغياثية، المحقق: د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي، ج١،(المملكة العربية السعودية: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط١، ١٤٢٤هـ)، ص٣٦٧؛ حامد عونى، المنهاج الواضح للبلاغة، ج٤،(القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث)، ص ١٣٩؛مؤلف الشرح: أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية، ج١،(مكة المكرمة:مكتبة الأسدي، ط١، ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م)، ص ٤١٣.

[خ] . الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، ج٢،(بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م)، ص ١٠٢؛ أبو حيّان الأندلسي، محمد بن يوسف بن عليّ، البحر المحيط في التفسير،المصدر السابق، ص ٢٦٨

[د] . ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، المحقّق: عبد الرزاق المهدي،(بيروت: دار الكتاب العربي، ط١، ١٤٢٢هـ)، ص١٦٢

[ذ] . شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، تحقيق: إياد محمد الغوج، ج٣، (دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط١، ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م)، ، ص ٢٨٦

[ر] . ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني، اللباب في علوم الكتاب، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض،ج٣،(بيروت:دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٩هـ)، ص ٣٨٥؛ الخازن، تفسير الخازن، ج١، المصدر السابق، ص ١٧٩؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمد الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج١، المصدر السابق، ص ١٦٣

[ز] . الطبري، تفسير الطبري، ج٣،المصدر السابق، ص ١٠٨

[س] . الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، معاني القرآن وإعرابه، المحقّق:عبد الجليل عبده شلبي، ج١،(بيروت: عالم الكتب، ط١، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م)، ص ٢٦٨؛ الرازي، مفاتيح الغيب، ج٥، المصدر السابق، ص ٣١٠

[ش] . السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم الفقيه الحنفي، بحر العلوم، د. محمود مطرجي، ج١، (بيروت: دار الفكر، ط١، ١٤١٣هـ)، ص ١٥٨

[ص] . الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج١، المصدر السابق، ص ٢٦٨؛ الرازي، مفاتيح الغيب، ج٥، المصدر السابق، ص٣١٠

[ض] . ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج١، المصدر السابق، ص ١٦٣

[ط] . شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، تحقيق: إياد محمد الغوج، ج٣، (دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط١، ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م)، ص ٢٨٦

[ظ] . الرازي،مفاتيح الغيب، ج٥، ص ٣١١

[ع] . الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،ج١، ص ٢٦٩

[غ] . أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، ج٢، المصدر السابق، ص٢٦٨

[ف]. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري=جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، ج٣،(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، عام ١٤٢٠هـ /٢٠٠٠م)، ص ١٠٩؛الأخفش الأوسط، أبو الحسن المجاشعي، معانى القرآن للأخفش، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة،ج١،(القاهرة:مكتبة الخانجي، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩٠م)، ص ١٧٥

[ق].عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ج٢، (القاهرة: مكتبة الآداب، ط ١٧ سنة ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م)، ص ٣٦٤

[ك]. الرازي، مفاتيح الغيب، ج٥، المصدر السابق، ص ٣١٠

[ل]. البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ج١، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤١٨هـ)، ص١٣٩؛ شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي المصري، حَاشِيةُ الشِّهَابِ عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوِي، (الْمُسَمَّاة: عِنَايةُ القَاضِى وكِفَايةُ الرَّاضِى عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوي)، ج٢، (بيروت: دار صادر)، ص ٢٨٨؛ محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، محاسن التأويل، المحقّق: محمد باسل عيون السود، ج٢، (بيروت: دار الكتب العلميه، ط١، ١٤١٨هـ)، ص ٦٨

[م]. ضيف، أحمد شوقي عبد السلام الشهير بشوقي ضيف، المدارس النحوية، ج١، (القاهرة: دار المعارف) ص ٣٥٢

[ن]. ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب،ج٣، المصدر السابق، ص ٣٨٥؛ الرازي،مفاتيح الغيب، ج٥، المصدر السابق، ص ٣١١

[ه]. أبو حيّان التوحيدي، عليّ بن محمد بن العبّاس، البصائر والذخائر، المحقق: د. وداد القاضي، ج٦، (بيروت: دار صادر، ط١، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م)، ص ٥٨

[و]. الرازي،مفاتيح الغيب، ج٥، المصدر السابق، ص ٣١١

[ي]. نفس المصدر، ص ٣١١

[أأ]. نفس المصدر، ص ٣١٢

[بب].ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، ج٣، المصدر السابق، ص ٣٨٥؛ الرازي، مفاتيح الغيب، ج٥، المصدر السابق، ص ٣١١

[تت]. الرازي،مفاتيح الغيب، ج٥، المصدر السابق، ص ٣١١

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ধর্মের অনুশীলন
(The Practice of Religion in Establishing Morality, Values and Good Governance)

Dr. Abu Saleh Mohammad Toha*

Abstract: Morality, values and good governance are one of the most important teachings of all the religions.Every religion has given priority to these aspects.These differentiate humans from other animals.If anybody doesn't have a sense of ethics, human values and justice while prevailing in a power dynamic position within the society, he can't be righteous.Religion is for the welfare of the human race and salvation from evil.It is very important to be pursuant in practising religion to revive ethics, human values and justice within the new generation. If a religious atmosphere prevails in the family, it becomes easy to practise religious do's and don't. As children grow up in a religious atmosphere, a sense of responsibility, obedience toward parents, ethics, values and justice form within them. Besides, if religious education and practising religion are made mandatory in educational institutes, the base of ethics, values and justice will be stronger. As a result, society will be saved from the crimes that take place due to the degradation of morality. It is due to the lack of morality, that crimes like murder, rape, eve-teasing, corruption, usuryand bribery spread in society.Degradation of morality breeds social disaster. Teenage and youth get associated with crimes like addiction and drug abuse. The morals, values and justice that are talked about in religion to control a human are of immense power. So, if the practice of religion is strong, moral values and justice will be strong.So, it can be said that religion plays a vital role in establishing morality, values and good governance.

ভূমিকা

মানব কল্যাণের জন্য ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে। সব ধর্মই সততা, নিষ্ঠা ও ন্যায়বোধের নির্দেশনা দেয়। ইসলাম স্বভাবজাত ও প্রকৃতিসুলভ এমন এক ধর্ম– মানব কল্যাণ যেখানে অগ্রগণ্য। কল্যাণ কামনা করার নামই দ্বীন বলে ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ইসলামের নির্দেশনাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধে ভরপুর। ফলে ইসলাম ধর্মের যথার্থ অনুশীলন নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন নিশ্চিত করে।

নৈতিকতা

নৈতিকতার অর্থ– আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অভ্যাস।[১] নৈতিকতাকে একটি আদর্শিক মানদণ্ড বলা যেতে পারে যা বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিকতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, সামগ্রিকভাবে সমগ্র পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর বিষয়সমূহকেও নৈতিকতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।[২] ধর্মের নৈতিকতা হলো– ধর্ম কর্তৃক নির্দেশিত গুণাবলী।

মূল্যবোধ

মূল্যবোধ অর্থ– মূল্যবান, মর্যাদাবান বা শক্তিশালী হওয়া। বলা যায়– যে সকল চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সংকল্প ও আদর্শ মানুষের সামগ্রিক আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে সে সবের সমষ্টিই মূল্যবোধ।[৩] ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো– এমন চেতনা যা মানুষকে ধর্মীয় আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

---

* Associate Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh.

সুশাসন

সুশাসন হলো–আইনের শাসন। বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন হলো– 'Governance is the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development.'[4]

সাধারণভাবে সুশাসন বলতে এমন এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যা একটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটায়। অন্যভাবে সুশাসন হলো– এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, আইনের অনুশাসন, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়।

ইসলাম যেভাবে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন নিশ্চিত করে

ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত এক অনন্য জীবনব্যবস্থা। এটি স্বাভাবিকসুলভ ও মানবতার ধর্ম। ইসলাম শান্তি, সমৃদ্ধি ও ভালোবাসার নির্দেশনা দেয় এবং সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলে। ইসলাম পালনের অর্থ– ঈমান ও আমলের মাধ্যমে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধ জাগ্রত করে আত্মশুদ্ধি লাভ করা এবং লেনদেনের স্বচ্ছতা, আচরণের সুন্দরতা ও চরিত্রের নির্মলতা অর্জনের মাধ্যমে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়পরায়নতার প্রতিফলন ঘটানো। ইসলাম ধর্মের যথার্থ অনুশীলন নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন নিশ্চিত করে।

ইসলামের সার্বিক নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রধানত পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

১. আকাইদ বা বিশ্বাস বিষয়ক। যেমন– ঈমান।
২. ইবাদত বিষয়ক। যেমন– নামায, রোযা, যাকাত, হজ ইত্যাদি।
৩. মুয়ামালাত বা লেনদেন বিষয়ক। যেমন– ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদি, দেনা-পাওনা ইত্যাদি।
৪. মুয়াশারাত বা আচরণ বিষয়ক। যেমন– মুসলিম-অমুসলিম সব মানুষ এবং অন্যান্য জীবের সাথে আচরণ।
৫. আখলাক বা চরিত্র বিষয়ক। যেমন– সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারী ইত্যাদি।

সকল বিধান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনের পথ নির্দেশ করে। যেমন– ঈমানের মধ্যে পরকালে বিশ্বাস একটি অন্যতম বিষয়। পরকালে বিশ্বাসের ব্যাপারে দূর্বলতা ঈমানকে দূর্বল করে। পরকালে বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা। এই চেতনা মানুষকে ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করে এবং ইসলামের সার্বিক বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধ সক্রিয় হয়। এরপর সব ইবাদত-বন্দেগি মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধ সৃষ্টি করে। সবশেষে লেনদেন ও আচরণ বিষয়ক নীতিমালা এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য– সরাসরি নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের নির্দেশনা প্রদান করে। যেমন–মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

অর্থ– 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।'[৫]

আকাইদ বা বিশ্বাস

আকাইদ বা বিশ্বাস হলো– ঈমান। বিশ্বাস মানুষকে পরিচালনা করে। এজন্যই ইসলামি মূল্যবোধের প্রথম বিষয় ঈমান। ঈমান হলো- আল্লাহ্র একত্ববাদ ও ইলাহ্তে বিশ্বাস করা। তিনিই সবকিছুর মালিক, স্রষ্টা এবং জগৎসমুহের প্রতিপালক। মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ রাসুল। কুরআন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। অগণিত ফিরিশতা আল্লাহ্র নির্দেশে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। সবকিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছায় বাস্তবায়িত হয়। ভাগ্যের ভালো-মন্দ মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। মৃত্যুর পর রয়েছে পরকালিন জীবন আখিরাত। সেখানে রয়েছে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান। পুনরুত্থানের পর সবাইকে মহান আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হতে হবে। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে জীবনের প্রতি পদক্ষেপের হিসাব হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ

অর্থ– 'কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করবো; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট'।[৬]

ইবাদত

ইবাদত অর্থ– আনুগত্য করা, দাসত্ব করা, বিনয়ী হওয়া, অনুগত হওয়া, মেনে চলা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, দীনহীন ও নত হয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে তাঁর উপাসনা ও অর্চনা করা।[৭]
ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন,

وَالْعِبَادَةُ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ تَوْحِيدِهِ وَ الْتِزَامِ شَرَائِعِ دِينِهِ. وَأَصْلُ الْعِبَادَةِ الْخُضُوعُ وَ التَّذَلُّلُ

ইবাদত– মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেওয়া এবং তাঁর দ্বীনের বিধানসমূহের অনুসরণ করা। ইবাদতের মূল হলো বিনয় এবং নিজেকে তুচ্ছ করে প্রকাশ করা।[৮] মহান আল্লাহ্ মানুষ ও জিনকে শুধুমাত্র তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৯] ইসলামের মৌলিক ইবাদত ৪টি। ১. নামায, ২. রোযা, ৩. যাকাত ও ৪. হজ।

ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত হলো নামায। প্রতিনিয়ত নামায আদায় মানুষকে পরিচ্ছন্ন করে। নিজের মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে ধন-সম্পদ ও পদের অপব্যবহার, অন্যায়, অবিচার, পাপাচার থেকে বাধা দেয়। মনের প্রশান্তি নিশ্চিত করে। এমন না হলে প্রকৃত নামাযীও হওয়া যায় না। নামায অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে।[১০]

গরিব-দুঃখি ও অসহায় মানুষেরা বিভিন্ন সময় ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করে। রোযার মাধ্যমে রোযাদারের তা উপলব্ধির সুযোগ হয়। অন্যের দুঃখ-কষ্ট বোঝার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আবার রোযা মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিবৃত করে।[১১]

যাকাত ইসলামের অন্যতম মৌলিক আর্থিক ইবাদত। যাকাত ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার।[১২] এজন্য যাকাত দানকারীদের নিজ দায়িত্বে যাকাতের সম্পদ যাকাত গ্রহিতাদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়, পরিচ্ছন্ন হয় এবং বরকতময় হয়।[১৩]

হজের মাধ্যমে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে। প্রকাশ পায়- সবাই এক আল্লাহ্র বান্দা; মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো, আরবি-অনারবি সবাই সমান। রাসুলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজে লক্ষাধিক সাহাবির সামনে দশম হিজরির জিলহজ মাসের ৯ তারিখ বিকালে আরাফাতের ময়দানে এবং পরদিন ১০ জিলহজ কোরবানির দিন বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এই দুইদিনে দেওয়া তাঁর বক্তব্য বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবে পরিচিত। নবী (সা.) এর দৃঢ়আশংকা ছিল যে, এটাই তাঁর জীবনের সর্বশেষ হজ ও সর্বশেষ বিশ্বসম্মেলন। জীবনের সর্বশেষ সম্মেলন হিসেবে তিনি পুরো দ্বীন-ইসলামের সারাংশ তুলে ধরেছেন এই ভাষণে। ভাষণ শেষে ভাবের আতিশয্যে নবী (সা.) নীরব হন। জান্নাতি নূরে তাঁর চেহারা আলোকদীপ্ত হয়ে উঠে। এই মুহূর্তে নাযিল হয়–

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ

অর্থ– 'আজকের এই দিনে তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকেই তোমাদের ওপর দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'[১৪]

বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ (সা.) অন্যায়ভাবে মানুষের রক্তপাত বন্ধ, সুদের কুফল, বর্ণবৈষম্যের ভয়াবহতা, স্বজনপ্রীতির বিরূপ প্রভাব, জাহেলি যুগের মানসিকতা পরিহার করার বিষয়ে জোরালো নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদার বিষয় তুলে ধরেছেন। সাম্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের অধিকার রক্ষা, পরমতসহিষ্ণু হওয়া, সর্বপরি মানব সভ্যতাবিরোধী সব বর্বরতা পরিহার করে একনিষ্টভাবে কোরআন-সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৫] এভাবে সব ইবাদত-বন্দেগি মানুষকে পরকালীন জীবনে সফলতা প্রদানের পাশাপাশি পার্থিব জীবনকেও মানবিকতায় ভরে তোলে।

মুয়াশারাত বা আচরণবিধি

মুয়াশারাত অর্থ– মেলামেশা, সঙ্গ দেওয়া ইত্যাদি।[১৬] ইসলামি পরিভাষায় মুয়াশারাত– ইসলামের সামাজিকতা বা সামাজিক আচরণ। ইসলামের এ বিধান এতই বিস্তৃত যে, জীবনের কোনো অঙ্গন এর বাইরে নেই। এই বিস্তৃতিকে দুই বাক্যে ধারণ করতে হলে বলা যায়– খালিকের সাথে আচরণ এবং মাখলুকের সাথে আচরণ। মাখলুকের মধ্যে আবার স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশি, মুসলিম-অমুসলিম সব মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর সাথের আচরণবিধি বর্ণিত হয়েছে। সকল ঈমানদার আদর্শের ভিত্তিতে একে অন্যের ভাই। ভাতৃত্বের এই বন্ধনের ক্ষেত্রে সময়-কাল বা ভৌগলিক অবস্থা অন্তরায় হওয়া যাবে না। আল্লাহর জন্য পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও কল্যাণকামনার মানসিকতা থাকতে হবে। মানুষ হিসেবে সবাই এক আদমের সন্তান। আর আদম (আ.) মাটি হতেই সৃষ্ট। সব মানুষের প্রতি ভালোবাসা, উদার মনোভাব পোষণ এবং মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম শিক্ষা।

جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَا يرحم لا يرحم

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না।’[১৭]

মানুষই কেবল মানুষের সুন্দর আচরণ পাওয়ার যোগ্য নয়, বরং বন্য ও গৃহপালিত পশু-পাখির প্রতিও সুন্দর ও দয়াশীল আচরণ করতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لنا في البهائم أجراً؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্যও কি আমাদের পুরষ্কার আছে? রাসুল (সা.) বললেন, ‘হ্যাঁ। প্রত্যেক দয়াদ্র হৃদয়ের অধিকারীদের জন্য পুরস্কার আছে।’[১৮]

বৃক্ষ-তরুলতাকেও ভালবাসতে হবে। এরাই প্রকৃতির প্রাণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী।

عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنْ قَامَت السَّاعةُ وَفِي يَد أَحَدِكُم فَسِيلةٌ فَإنْ استَطاعَ أنْ لَا تَقُومَ حَتى يَغرِسَهَا فَليَغرِسْهَا

আনাস (রা.) ইবন মালিক থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, ‘যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে কিয়ামত এসে গেছে, তখন হাতে যদি একটি গাছের চারা থাকে, যা রোপণ করা যায়, তবে সেই চারাটি রোপণ করবে।’[১৯]

মুয়ামালাত বা লেনদেন

মুয়ামালাত অর্থ– লেনদেন, বিনিময়,বদল ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় মুয়ামালাত– সেইসব বিধান যা দ্বারা পারস্পারিক লেনদেন আদান-প্রদান বুঝায়। এই আদান-প্রদান কেবলমাত্র দাতা-গ্রহীতার ভেতর সীমাবদ্ধ থাকে। আল মুজামুল ওয়াসিত গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘আহকামে শরীয়ায় মুয়ামালাত হল দুনিয়াবী কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।’

ইসলামি ফিকহের ভাষায়– There are two kinds of dealings. These are permissible and prohibitable, Muamalat is permissible deals.[২০]

ইবাদত-বন্দেগি আল্লাহর কাছে গৃহিত হওয়ার জন্য যেমন নিখুঁত ঈমান দরকার তেমন ইবাদতকে সুরক্ষা করে পরকালীন জীবনে প্রতিদান লাভের উপযোগী করার জন্য দরকার আর্থিক স্বচ্ছতা। বিভিন্ন ভাবে আর্থিক স্বচ্ছতা বিনষ্ট হয়। যেমন– অন্যায় ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করা, জোর পূর্বক অন্যের সম্পদ দখল করা, এতিমের মাল ভক্ষণ করা, ঋণ পরিশোধ না করা, অন্যের প্রাপ্ত অধিকার প্রদান না করা, চুরি বা সন্ত্রাসী করে অন্যের মাল ভোগ করা ইত্যাদি। আবার কোন প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যায়ের হিসাব ঠিক না রাখা, খাতওয়ারী অর্থ খরচ না করা এবং নিয়ম অনুযায়ী ব্যয়ের ক্ষেত্রে হেরফের করাও আর্থিক অস্বচ্ছতার অন্তর্ভূক্ত। যে কোন ভাবে অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে নিজের দখলে নেয়াই হলো আর্থিক অস্বচ্ছতা। অর্থবিত্তসহ সামগ্রিক অস্বচ্ছতা প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ، وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা কি জান দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যার কোন অর্থ ও সম্পদ নেই। তিনি (রাসুল) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে আসবে। সে আরো নিয়ে আসবে অন্যকে এই পরিমান গালি দিয়েছে, এই পরিমান মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, এই পরিমান সম্পদ খেয়েছে, এই পরিমান রক্ত প্রবাহিত করেছে, অন্যকে এই পরিমান প্রহার করেছে। তার নেকি থেকে এই পরিমান (ক্ষতিগ্রস্থকে) প্রদান করতে হবে। তার দায় শেষ হওয়ার আগেই তার নেকি শেষ হয়ে যাবে। তখন ক্ষতিগ্রস্থদের পাপ থেকে এই পরিমান নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[২১]

আখলাক বা চরিত্র

আখলাক খুলুকুন এর বহুবচন। এর অর্থ– চরিত্র,স্বভাব,আচার-আচরণ,ব্যবহার ইত্যাদি। আখলাক বলতে সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র উভয়কেই বোঝায়।তবে প্রচলিত অর্থে আখলাক শুধু সচ্চরিত্রকেই বোঝায়। যেমন– ভালো চরিত্রের মানুষকে চরিত্রবান বলা হয়। মন্দ চরিত্রের মানুষকে বলা হয় চরিত্রহীন। উন্নত চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন।[২২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে চরিত্রবান।[২৩]

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধ সৃষ্টির উপায়

সন্তানদের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধ সৃষ্টি করতে পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রাখা ও পরিবারের সদস্যদের ধর্ম পালনে সচেষ্ট হওয়া একান্ত জরুরি।পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ বজায় থাকলে পরিবারের সদস্যদের জন্য ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পালন সহজ হয়। সন্তানেরাও দ্বীনি আবহে বেড়ে উঠায় তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ তৈরি হয়। এজন্য পরিবারে ধর্মচর্চা, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও নীতি-নৈতিকতা চর্চা করার কোন বিকল্প নেই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ইসলাম ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং ধর্ম পালন আবশ্যক করতে হবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। এর মাধ্যমে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের ভিত্তি দৃঢ় হতে থাকবে। এছাড়া সমাজিকভাবে প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্ম পালনে উৎসাহী করে তুলতে হবে। ভালো কাজের প্রশংসা আর মন্দ কাজের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। সর্বপরি রাষ্ট্রেরও এ ব্যাপারে সদিচ্ছা থাকতে হবে।

উপসংহার

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধ ধর্মের মূল শিক্ষা। সব ধর্মেই এসব বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সবার মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধ জাগ্রত করতে পরিবার ও সমাজে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং ধর্ম অনুশীলনে সচেষ্ট হওয়া জরুরি। মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের বর্ণনা রয়েছে তা অনেক বড় শক্তি। অর্থাৎ ধর্মচর্চা যদি সবল হয়, তাহলে সেই নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধও সবল হবে। কাজেই বলা যায়– ধর্মের অনুশীলন নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম ভূমিকা পালন করে।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. মো. ইব্রাহীম খলীল, *ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ* (ঢাকা: আলোর ভুবন, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৫।
২ https://honourstutorial.blogspot.com/2019/08/what-do-you-mean-by-morality.html
৩ https://noproblembd.com(10/09/2022)
৪ https://www.azharbdacademy.com/2022/06/ood-Governance-definition(10/09/2022)
৫ সুরা নাহ্‌ল, আয়াত: ৯০।
৬ সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৪৭।
৭ আব্দুল হাফিয বালয়াভী, *মেসবাহুল লোগাত*, হাবীবুর রহমান মুনীর অনূদিত (ঢাকা: থানভী লাইব্রেরী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩৯।
৮ আল-কুরতুবি, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৩৮৪ হি.,১৯৬৪খ্রি.), পৃ. ২২৫।
৯ সুরা 'আনকাবুত, আয়াত: ৪৫।
১০ সুরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬।
১১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারি, *সহিহ আল-বুখারি*, (বৈরুত: দারু ইব্‌ন কাসির, ১৪০৭ হি., ১৯৮৭ খ্রি.), হাদিস: ২৬৮৫; মুসলিম ইব্‌ন আল-হাজ্জাজ, *সহিহ মুসলিম*, (বৈরুত: দারুল জিল, তা.বি.), হাদিস: ৩৪৬৬।
১২ সুরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ১৯।
১৩ সুরা তাওবা, আয়াত: ১০৩।
১৪ সুরা মায়েদা, আয়াত: ৩।
১৫ *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ১২১৮।
১৬ *মেসবাহুল লোগাত*, পৃ. ৫৬৭।
১৭ *সহিহ আল-বুখারি*, হাদিস: ৫৬৫১।
১৮ *সহিহ আল-বুখারি*, হাদিস: ৫৬৬৩।
১৯ *বুখারি*, *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস: ৪৭৯; ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (কায়রো: মুয়াসসাসাতুল কুরতুবা, তা. বি.), হাদিস: ১৮৩।
২০ https://islamithink.blogspot.com/2013/08/blog-post_6454.html(20.09.2022)
২১ *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ২৫৭১।
২২ ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদিস: ৮৯৫১।
২৩ *সহিহ মুসলিম*, হাদিস: ২৩২১।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

الرومنطيقية في الشعر العربي الحديث: دراسة تحليلية
(Romanticism in modern Arabic poetry: An analytical study)

Dr. Md. Monirozzaman*

Abstract: Poetry is one of the most important literary arts in the Arab and Western world alike, and is a coordinated and artistically formulated speech that reflects the author's mind and the different feelings of his inner self, where poetry is divided into several types, including romantic poetry. Romantic poetry is the poetry of the Romantic era, an artistic, literary, musical and intellectual movement that originated in Europe in the late 18th century. It included a reaction against the prevailing enlightenment ideas of the 18th century, and lasted almost from 1800 to 1850. Romanticism has come to meet motives that have emerged within poetry that aspire to change in shape, language, image, attitude, and content. The reason for the transition of romanticism to the Arabs without a revolution was that there are a number of psychological, social and political reasons that have led to the stabilisation of romance in the Arab content, and despite the maturity of political awareness among Arabs during the disappointments suffered by the Arabs, romantic poetry was not only a reflection of politics but was linked to the growing awareness of the rich and social conditions that revolve around the personal life of the individual and his longing for freedom, and what the Arabs knew and touched freedom in the country Europeanism led them to embrace the idea of freedom and all its dimensions and called for it in their Arab homelands. Romantic poetry is characterised by honesty in expressing individual emotions and deep feelings that come deep into the soul, Romantic poetry is also reflected in the vast world of nature, relying on its arms and sensing its tenderness and beauty, and in romantic poetry it appears to go beyond imagination and perceptions, whether creative, conscious or dreams and whims. Romantic poets include Khalil Matran, Gibran, Ahmed Zaki Abu Shadi, Omar Abu Risha, Mahmoud Taha and others. We try to provide examples of their poems and their romantic thoughts in the article.

تقديم

يعد الشعر كنوع مهم بين نوعي الأدب ويعتبر واحداً من أهم الفنون الأدبيّة بين شعراء العالم وأدباء العصر ونقاده، وهو ما يبدعه الشاعر ويعربه بكلام منسق ومصاغ بطريقة فنية تعبر عمّا يجول في خاطره، وما يخالج في قلبه من أحاسيس ومشاعر متنوعة، وهذا حمل احتياجات العصر في مضمونه عبر العصور، ولما ذاعت وولجت الرومانسية في الأدب الحديث لم يتخلف الشعر عن حملها كسائر أنواعه من القصة والرواية والمسرحية؛ بل رافقها بكل قوة. وينقسم الشعر إلى عدة أنواع، ومن أهمها الشعر الرومانسي. والشعر الرومانسي هو الذي عرف بشعر العصر الرومانسي ، وهذا العصر يعنى حركة فنية وأدبية وموسيقية وفكرية التي بدأت في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر لعبت دورها ضد أفكار التنويرالسائد في المجتمع الأوروبي.[١] وهذا النوع من الشعر أصبح اليوم كمصطلح الرومانسية الذي يطلق على مذهب أدبي بعينِه.

---

* Associate Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh.

تعريف الرومانسية

يرى الباحثون أن كلمة (رومانسية) ترجع في الأصل إلى كلمة (Roman) ؛ وهي كلمة فرنسيّة قديمة كانت تدل في العصورالوسطى على قصة من قصص المخاطرات شعراً ونثراً، وكانت تُكتب أحيانا (Ramant) وانتقلت إلى اللغة الانكليزية في شكل (Romaunt) ثم نُسب إليها في الانكليزية (Romantic) وهي صفة تدل على ما ينسب إلى قصص المخاطرات، أو ما يثير في النفس خصائصها وما يتّصل بها واستعملت الكلمة " رومانسية " في اللغةِ العربية بطريق التعريب من الكلمة (Romanticism) الإنجليزية. وكانت معدومة فيها قبل العصر الحديث، إلا أن مفهومها ومعانيها كانت متواجدة بين أنواع الأدب من العصر القديم. فهى كلمة مستحدثة عند العرب.[٢]

وعرفها ستاندال (Stendhal) : بأن الرومانسية هي الفن الذي بموجبه نقدم للشعوب، في حالتها الراهنة من العادات والمعتقدات، أعمالاً أدبية جديرة بأن تعطيها أكبر قدر ممكن من المسرة.[٣] وعرفها كازاميان (Kazamyan) في كتابه، حيث قال -

“The Romantic spirit can be defined as an accentuated predominance of emotional life, provoked or directed by the exercise of imaginative vision, and in its turn stimulating or directing such exercise.” [4]

واستخلص أحمد قبش جميع التعاريف بقوله "إنها الثورة على الكلاسيكية أو المذهب السلفي أو التقليد الشعري".[٥]

انطلاق الرومانسية في الأدب الأوروبي

بدأ هذا المذهب يتصدر الحياة الأدبية في أوروبا أواخر القرن الثامن عشر وبلغ أوج ازدهاره في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (١٧٨٠-١٩١٠). هذه الحركة فعلا ثورة ضد الكلاسيكية الجديدة، وترفض التراث اللاتيني . واشتملت الأجناس الأدبية كالشعر والقصة والرواية والمسرحية والنقد الأدبي على سواء. والمذهب الرومانسي فقد انطفى مصباحه المنير بعد الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥م) واتخذ مكانه تيار جديد من الشعر الحر.[٦] إنما الكلاسيكية حملت بذور الرومانسية منذ قديم، و أكّد ستندال (1842-1783) على أن موليير (١٦٢٢-١٦٧٣) كان رومانسياً في أواخر القرن السابع عشر، وتلفظ الكلمة- الرومانسي. ورفض الرومانسيون التقليد والعرف، وعدوا العقل في ميدان الفن والأدب معيقاً لملكة الخيال ومجففاً لمصادر الإلهام. ويقول شوليو (sholio): العقل منبع الأخطاء الذي لا يغيض والسمّ الذي يفسد مشاعرنا نحو الطبيعة ويقتل الحقيقة التي منبعها العقل، إنما أنت فتنة قد يعجب بك الناس ولكن قلما يحبونك إذ لا يؤثر فينا إلا ما يوحي به القلب"[٧] فالكلاسيكية تدور حول المحاكاة والعقل والمنطق وتركز على الشكل الذي أثر يظهر فيه الأثر الأدبي. وفي عكسها الرومانسية وهى التي تدور حول الإبداع والعاطفة والحدس.[٨]

قضايا الرومانسية في الأدب [٩]

الذاتية: كل الأدب الرومانسي شخصي. إنه تعبير عن الإلحاحات الداخلية لروح الفنان. يعبر الشاعر بحرية عن مشاعره وعواطفه وخبراته وأفكاره، ولا يهتم بالقواعد والأنظمة.

حب الطبيعة: يأخذنا الشعر الرومانسي بعيدًا عن الأجواء الخانقة للمدن إلى شركة منعشة ونشطة لعالم خارج المنزل. كان جميع الشعراء من عشاق الطبيعة ونظروا إلى جوانب الطبيعة الجميلة. بالنسبة لهم ، كانت الطبيعة صديقة ومحبة وأمًا وأختًا ومعلمة..

العفوية: الشعر الرومانسي هو التدفق التلقائي للمشاعر القوية دون إنتاج الفكر. إنما الشعر للشعراء الرومانسيين ليس حرفة بل إلهام.

الكآبة: معظم الشعراء الرومانسيين في اللغة الإنجليزية مليئون بالكآبة والتشاؤم. الرومانسية هي فرد غير راضٍ. قد يكون غير راضٍ عن ظروفه الخاصة ، أو عن عمره ، أو عن الأعراف والتقاليد الأدبية السائدة ، أو عن المصير العام للإنسانية.

الخارق للطبيعة والتصوف: كانت الرومانسية بمثابة إحياء لعصور القرون الوسطى. الرومانسية تنبض بشكل غير عادي بعجائب الكون وغموضه وجماله. العالم غير المرئي هو أكثر واقعية بالنسبة له من عالم الحواس.

ثورة: لقد كانت الحركة الرومانسية ثورة ضد الأسلوب الشعري للقرن الثامن عشر.

الخيال والعاطفة: شدد شعراء القرن الثامن عشر الكلاسيكيون الجدد على العقل والفكر، فركز الشعراء الرومانسيون على الخيال والعاطفة بنوع كبير.

نشأة الرومنطيقيّة لدى العرب:

ظهرت الرومنطيقية في العربية منذ القديم، ظهر عند امريء القيس وعند كثير من الشعراء الجاهلين والأموين ولها أتباع ومؤيدون. ولكن ظهر في الأدب العربي الحديث انطلاقا مع خليل مطران في مصر ومع جبران خليل جبران من أدباء المهجر الشمالي. فهما رائدا الأدباء والشعراء الرومنطيقيين في الأدب العربي.[١٠] وقد عملت عوامل دافعة في ظهور الرومانسية في الأدب العربي. ويمكننا أن نتلخص تلك الأسباب في سطور آتية-[١١]

١- اتصال العرب بالثقافة الغربية عن طريق البعثات والترجمة للأدب الرومانسي الغربي.
٢- رفض النهج التقليدي السائد عند مدرسة الإحياء الكلاسيكية.
٣- الرغبة في التعبير عن الذاتية والوجدانية والشخصية المستقلة.
٤- الهروب من الواقع الأليم في ظل مفاسد الاستعمار إلى عالم الخيال.
٥- تفجر الأحزان عن الشعراء بسبب الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ – ١٩١٨م) وما خلفته من قتل وتشريد وتدمير.
٦-وجود المعاهد والكليات الأجنبية في الوطن العربي.
٧-هجرة كثير من الأدباء العرب الى أوروبا نظراً لسوء الحالة الاقتصادية.
٩-نشاط حركة الترجمة من الآداب الأوروبية إلى الأدب العربي مما أدى إنشاء جيل من الأدباء العرب اختلطوا بأدباء الغرب وأسسوا جمعيات أدبية ظهر فيها هذا الأثر.
١٠-أن القالب الأدبي الكلاسيكي، لم يعد يحسن استيعاب مضامين العواطف الإنسانية الجديدة، وكذلك التطور السياسي والاجتماعي والفكري.

وبتأثير هذه العوامل ظهر الاتجاه الرومانسي في الأدب العربي الحديث، وأول من دعا إليه خليل مطران.

التجمعات العربية تحت ظلال الرومانسية

وفي ظل الرومانسية نشأت تنظيما ت أدبية أهمها:

١-**الرابطة القلمية** (Pen Association) : تأسست سنة ١٩٢٠م بزعامة جبران خليل جبران تضم ابرز أدباء المهجر مثل نسيب عريضة .إيليا أبي ماضي وميخائيل نعيمة الذي وضع كتابا سماه الغربال سنة ١٩١٣م وهو عبارة

عن مجموعة من المقالات تتضمن الأسس النقدية الهامة التي اعتمد عليها الشعراء الرومانسيون. عالج المهجريون مواضيع شتى من حزن وألم وقلق. والشوق إلى الأهل والأوطان وذكر الطبيعة والاندماج فيها وتعمقوا في خبايا النفس البشرية . وكان للأدب المهجري اثر عميق في رقي الأدب العربي شكلا ومضمونا . [١٢]

٢-مدرسة الديوان (Al-Diwan School) : تأسست في ١٩٢١م يمثلها عبد الرحمن شكري عباس محمود العقاد وعبدا لقادر المازني وقد ساعدهم على تطوير الحركة الأدبية والشعرية خاصة-

١- الإطلاع الواسع على التراث العربي الأصيل .

٢- الإطلاع الواسع على الآداب الغربية والشعر الانجليزي خاصة. ثار هؤلاء على الشعر الكلاسيكي عند القدماء والمحدثين بزعامة احمد شوقي. فشكري وقد اصطبغ شعره {ضوءالفجر} برومانسية حزينة.[١٣]

٣-**جماعة أبلو** (Apollo Group) : تأسست في سبتمبر ١٩٣٢م بفكرة من الشاعر احمدزكيأبوشادي والذي اخرج لها مجلة تحمل نفس الاسم وقد ترأسها احمدشوقي لكن المنية اختطفته بعد أيام معدودات فخلفه الشاعر اللبناني خليل مطران. ضمت نخبة من الشعراء من أقطار مختلفة منهم : إبراهيم ناجي وعلي محمود طه أبوالقاسم الشابي والتجاني يوسف واحمد الشامي .ورغم افتقار الجماعة لتخطيط فني واختلاف نزعاتها إلا انه غلب عليها الاتجاه الرومانسي .[١٤]

ملامح الرومنطيقية الحديثة[١٥]

•**الانسياق للعاطفة:** تميز الشعر الرومانسي بالابتعاد عن التفكير المحض وترجيح العقل، أو الاهتمام بكافة القيود والتقاليد الاجتماعيّة المختلفة، حيث أطلق عنانَ البوحِ للقلب عن كافّة المشاعر المرهفة والأحاسيس التي تخالجه بعبارات عفوية مليئة بالحب، عدا عن الانطلاق لتقديس الجمال، والدعوة إلى الحرية والمساواة والعدل وكافّة القيم والمبادئ الإنسانية، ويعتبر (بايرون) من أهمّ الشعراء الذين تميّزوا بهذا الخصوص، ويشارُ أيضاً إلى أنّهم تغنّوا بالمثالية والأبطال الخارقين كاملي الصفات.

•**التأثّر بالتراث الديني:** تميز شعراء الرومانسية باهتمامهم الكبير في حياكة قصص وذكر شخصيات ذكرت في الكتب السماوية المقدسة، وذلك كطريقة نحو السموّ في الروح إلى مراتب أعلى بعيدة عن كافّة الأمور المادية لتحقيق السكينة وإنهاء العذاب، بالإضافة إلى أنهم أصبحوا أكثر اهتماما في الحكايات الملحمية المذكورة في الكتب والأساطير الفلسفية القديمة، والتي تتجسد فيها العديد من المشاعر الملتهبة الممزوجة بالأمل، والحلم بالمستقبل، والحنين إلى الماضي، وغيرها.

•**الاهتمام بالماضي:** التغني بانتصارات الماضي والإنجازات المترتبة عليها في الحاضر، خاصة لدى الرومانسيين الغربيين، تحديدا الفرنسيّين الذين ما زالوا يتغنّون بالثورة الفرنسية، بالإضافة إلى الإنجليز وغيرهم.

•**الفرار إلى الطبيعة:** يعتبرُ الشعراء الطبيعة بمثابة أهم الرّؤوم التي في أحضانها يشتكون من ألم وعذاب الحب، ويطالبونها بالعزاء والمداواة؛ وذلك لما فيها من سكينة وهدوء وجمال يريحُ النفس.

•**حب السفر:** يعتبر الترحال والسفر إلى أماكن جديدة وغريبة من أهمّ الأمور التي يتغنّى بها الرومانسيون، وذلك بسبب حبّهم لاكتشاف العوالم الجديدة غير المعهودة، والنظر إلى الأماكن المجهولة سواء في الشرق أو في الغرب، بالإضافة إلى إدراج الخيالات والأوهام، عدا عن الجن والأشباح والشخصيات الغريبة.

•**التغني بالمرأة:** كثر الحديث عن المرأة في الأشعار الرومانسيّة وبالعديد من وجهات النظر المتناقضة، فهناك بعض الشعراء الذين رأوا في المرأة أسباب السعادة، فكانت هي الحبيبة والقريبة والإنسانة التي يستمدّ منها الإلهام بمختلف أنواعه، فقاموا بتقديسها ورفع مكانتها في المجتمع، بينما رأى شعراء آخرون أنّها جالبة التعاسة والحزن والألم والشقاء، وهناك من رأى فيها كلا الأمرين، وبجميع الحالات فإنهم كانوا يصيغون عباراتهم بأسلوب جريء فيه الكثير من الشاعرية والتأمّل.

•**الميل إلى الكآبة:** كانت مشاعر الحزن والكآبة أكثرَ ما يسيطر على الجوّ العام للقصيدة الرومانسية، فقد امتلأت بعبارات اليأس والرغبة بالانعزال والابتعاد عن كافة الناس، حيث إنهم يعيشون في صراع داخلي يجعلهم يبتعدون عن الحياة والتفكير بالموت.

•**سهولة اللغة:** حيث ابتعدوا عن اللغة المتكلّفة والمتصنعة، وتحدّثوا بلغة أقرب إلى العامية واللهجة المفهومة من قبل أغلبية الناس، بالإضافة إلى أنّهم ابتعدوا عن الالتزام والتقيد بالقافية الواحدة.

•التمادي في الخيال والتصورات، سواء ما كان منها إبداعيا واعيا أم أحلاما وهلوسات ونزواتٍ. ومرد ذلك نفور من الواقع المخيب وهروب إلى عوالم متخيلة ولو كانت عوالم الجن والخرافات وعرائس الشعر.

•التعبير بالرمز الجديد الموحي، لأنه يناسب الأجواء الغامضة التي يصعب تحديدها وإيضاحها، إن الرمز يوجز المعاني الكثيرة ويوحي بانطباعات دون حاجة إلى تفصيل وبيان، ويخلق لدى المتلقي جواً من النشاط والفعاليّة والمشاركة مع الشاعر.

الفرق بين الرومانسية الغربية والعربية

تأثّر الأدب العربي بالرومانسيّة الغربيّة بشكل كبير، وأنتجوا من الأشعار مثل ما أنتجت شعراء الغرب ؛ إذ نجد أن النزعة الذاتيّة مسيطرة على الأعمال الشعرية التي صنعها الرومانسيّون العرب كشعراء الغرب، وأنّهم يحتفون بالنفس الإنسانية ويرفعونها إلى مرتبة التقديس. كما يمجدون الألم الإنساني والذاتيّ، ويلجؤون إلى الطبيعة في غاباتها البكر. ولكل من الفريقين تنظيم هو يتبعه-

١-الرومانسية الغربية: كانت ذات رسالة تنطوي على"ثورة اجتماعية فنية"في مواجهة الكلاسيكية، وارتبط الدور الاجتماعي الآخذ بيد الفرد، والمبالغة في إظهار الذات بالعواطف، وتبدو نظرتهم للكون من حنايا الطبيعة إلى جانب النزعة الفلسفية.

٢-الرومانسية العربية : تحاكي الرومانسية الغربية بعدما أدت دورها، فاعتنت الرومانسية بالأمور الذاتية وتناولت اغتراب الإنسان العربي عن واقعه، وسيطرة جنسيات غربية عنه في وطنه، والتعبير عن موقف الرومانسية واحد، ألا وهو "العاطفة " التي تحمل المفارقات من الحزن- الألم- الاغتراب- الفراق- الهجر- النجوى.[١٦]

أبرز الشعراء الرومنطيقيين في الأدب العربي ومن نماذج أشعارهم

طرقت شعراء العرب في سبيل الرومانسية في العصر الحديث بطريق وسيعة، ونتناول بعضهم بالذكر مع استشهاد من أشعارهم فيما يلي-

خليل مطران (١٨٧١-١٩٤٩): شاعر القطرين الذي ولدَ في لبنان عامَ ١٨٧١م وعاش في مصر، يعد الشاعر الكبير خليل مطران من أشهر رواد الشعر الرومنطيقي، وكان يمتاز بسَعة اطّلاعِه في الأدبين العربيّ والفرنسي، وغالبًا ما كان يوصف برقة الطبع والقلب والميل إلى المُسالمة، وقد توفي في مدينة القاهرة عام ١٩٤٩م.[١٧] هو رائد الرومانسية في الوَطن العربي. لأنه أول من جدد في الشعر ونشر آرائه الجديدة سنة (١٩٠٨م) في الجزء الأول من ديوانه

متأثراً بالرومانسية الفرنسية على يد "ألفريد دي موسيه" و "لامارتين" و "فيكتور هيجو". يقول خليل مطران في قصيدته الشهيرة المساء:[١٨]

إِنِّي أَقَمْتُ عَلَى التَّعِلَّةْ
حَتَّى نَقَعْتُ الْيَوْمَ غلهْ
مَنْ لا يُطِيعُ وَقَدْ دَعَا العَ
اصي وَجَدَ بِطِيبِ نَهْلَهْ

يرى في هذه الأبيات رواحة رومانسية واضحة من خلال ترسيخ معاني الغربة والاغتراب والشّكوى لله ولكن دونما جدوى، فأحزانه التي تعتري صدره أكبر من أن تسعها الكلمات، فجاءت اللغة مهموسة رقيقة، فيها مظاهر الطبيعة والنزوع إلى التحرر من سلطان الجسد.[١٩] ومن أشعاره التي اتسمت بالرومانسية قصيدته إلى بعلبك حيث يقول:[٢٠]

وذكّريني طفولتي وأعيدي
رسمَ عهدٍ عن أعيني متواري
يومَ أمشي على الطُّولِ السَّواجي
لا افترارُ فيهُنَّ إلّا افتراري تَرِقْ بينهُنَّ عِزًا لَعُوبا

جبران خليل جبران (١٨٨٣-١٩٣١): أحد أشهر رواد الشعر الرومنطيقي في الأدب العربي، وُلد جبران عام ١٨٨٣م في لبنان وقَضى بقية حياته في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أشهر مؤلفاته: الأرواح المتمردة، العواصف، الأجنحة المتكسرة، النبي، المجنون وغيرها، توفي في نيويورك عامَ ١٩٣١م.[٢١] يقول جبران خليل جبران في قصيدته المواكب:[٢٢]

الخيرفي الناس مصنوعٌ اذا جُبروا
و الشرُّ في الناس لا يفنى و إن قبروا

ثم ينتقل لوزنٍ آخر فيقول:

ليس في الغابات راعٍ
لا ولا فيها القطيعْ
فالشتا يمشي ولكن
لا يُجاريهِ الربيعْ

لقد نهج جبران في قصيدته منهجا فلسفيا فيُرى فيها مبادئ الرومانسيّة، فهي من رحم المجمتع وللمجتمع، ونهَل من معاناة وآلام الحياة وجعلها موضع مقارنة مع الطّبيعة الّتي تعني للرومانسيين مصدر الإلهام والخلوة،

حوصل الكلام:

بدأت الرومانسية في أحضان أوروبا وتورقت وتشعبت وترقرقت في ظلال الأدباء والشعراء فيها، ثم سرى أثرها بين آداب العالم وحكمت فضاء الآداب قريبا من القرنين. ولما أن الرومانسية تخالف العقل والمنطق واحتياجات

العصر، قام الشعراء والأدباء في تجديدها، وحاولوا ليجعلوا تطبيقا شاملا بين الواقع والخيال والمنطق والمجتمع. وانضموا إلى أدبهم الأخلاقية والدين مع الشعور والأحاسيس والخيال والفكر الحر.

References

[١] عصر التنوير المعروف أيضًا باسم عصر المنطق أو التنوير، هو حركة فكرية وفلسفية هيمنت على عالم الأفكار في القارة الأوروبية خلال القرن الثامن عشر.

Eugen Weber, Movements, Currents, Trends: Aspects of European Thought in the Nineteenth and Twentieth Centuries (1992)).

[٢] *الرومانسية، بحث في المصطلح وتاريخه ومذاهبه الفكرية* ، نغم عاصم عثمان، *الرومانسية : بحث في المصطلح وتاريخه ومذاهبه* الفكرية (المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية العتبة العباسية المقدسة، ٢٠١٧م)،ص١٧.

[٣] فيليب فان تيغيم، *المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا، ترجمة: فريد أنطونيوس*، ص١٩٩.

[٤] https://discover.hubpages.com/literature/Romantic-Poetry-Definition-Characteristics.

[٥] أحمد قبش، *تاريخ الشعر العربي الحديث* (بيروت: دار الجيل، ١-٦-١٩٧١م)، ص١٨٩.

[٦] ، *الرومانسية : بحث في المصطلح وتاريخه ومذاهبه* الفكرية ، ص ٧٦-٩٠.

[٧] أدهم مسعود القاق، جامعة الإسكندرية، ١٧ يناير، ٢٠١٥ نقد-أدبي/٢٩٠٤-*جبران-خليل-جبران-رائد-الرومانسية* ، صفحة رابطة أدباء الشام، https://www.odabasham.net واطلعت عليه في ٢٠٢٢/١١/٢٣.

[٨] عبد الرزاق الأصفر، *المذاهب الأدبية لدى الغرب، الدراسة* (مصر: اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٩)، ص٦٧-٧٠.

[٩] هاجر القحطاني، وأخرون، *مادة الدراسات الأدبية: المدارس الأدبية، الرومانسية*، جامعة الإمام محمد بن سعود.

[١٠] أحمد قبش، *تاريخ الشعر العربي الحديث*، (بيروت: دار الجيل، ١٩٧١)، ص١٩٠.

[١١] *بحث في المصطلح وتاريخه ومذاهبه* الفكرية، ص ٩٩ .

[١٢] د. نادرة سراج، *شعراء الرابطة القلمية* (مصر: دار المعارف، ب ت)، ص ٨١.

[١٣] أحمد قبش، *تاريخ الشعر العربي الحديث*، ص٢٢٣-٢٤.

[١٤] *المصدر السابق*، ص٢٣٣.

[١٥] *المذاهب الأدبية لدى الغرب*، ص٦٧-٧٠.

[١٦] هاجر القحطاني، وأخرون، *مادة الدراسات الأدبية: المدارس الأدبية، الرومانسية.*

[١٧] فؤاد الفرفوري، *أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي* الحديث (القاهرة: الدار العربية للكتاب، ب ت)، ص ٤٧.

[١٨] خليل مطران، *الأعمال الشعرية الكاملة*، ترتيب: دكتور أحمد درويش.(القاهرة: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطن للإبداع الشعري،٢٠١٠م)، ط١، ص ١٠٦.

[١٩] فؤاد الفرفوري، ص ١٢٤.

[٢٠] دراجي خديجة و ديريجي شهرزاد، *التجديد عند خليل مطران*، الدراسة، رسالة ماجستير في الليسانس، قسم اللغة والأدب العربي، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج-البويرة- الجمهورية الجزائرية، ص ٩.

[٢١] فؤاد الفرفوري، *أهم مظاهر الرومنطيقية*، ص ٥٢---٥٧.

[٢٢] د. درويش الجويدي، *موسوعة جبران خليل جبران العربية* (بيروت: الدار النموذجية، ٢٠٠٨)، ط١، ص٣٣٠.

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

الطبيعة في شعر ابن خفاجة شاعر الأندلس
(Nature in the Poetry of the Spanish Poet Ibn Khafaza)

Dr. Chalekujjaman Khan*

Abstract: Muslims ruled Spain for a long period of 782 years, from 711 A.D to 1492 A.D. The Muslims made Spain the centre of education, culture and civilization of all Europe. Great progress has been made in various branches of science. Muslims contributed unprecedentedly in every branch of literature. The victorious Arabs adopted Arabic as their language and wrote their literature in that language. Ibn Khafaza (1058-1138 AD) is one of the best poets of Arabic literature in Spain. He was a poet, writer and scholar at the same time. He is called the poet of nature because in his poems he has beautifully depicted the beauty of Spain, the gardens, days, nights, mountains and other things. He embellished his poems with metaphors, similes and with other rhetoric components. In Arabic poetry of Spain Ibn Khafaza was at a unique height. His poetic art, literature and poetry fascinated the Spaniards. Prominent personalities benefited from his poetic talent. Many poets are influenced by his thoughts in writing poetry. In his poetic description of Spain, the natural environment and profound connection with his homeland is so widely discussed that contemporary scholars called him a mad lover of Spain. This article will discuss the poet Ibn Khafaza, his poetic talent and his descriptive style of the nature of Spain.

المقدمة

إن تاريخ الأدب العربي حافل بالصفحات المشرقة مما يجعل منه أحد الآداب الكبرى في العالم، وينفرد الأدب الأندلسي من بين المراحل المختلفة بأنه يجمع مزايا كثيرة في حلقة التقاء بين الشرق والغرب، ففيه رصافة الأدب العربي القديم، وفيه الجدة التي تتحرك في الموشحات والأزجال، فمال الشعراء إلى وصف مظاهرها الجميلة التي قد هباها الله الأندلس من غزارة أشجارها وكثرة أزهارها وأنداء أفيائها الوارفة وجبالها المغطاة بالثلوج، وساعدت هذه الطبيعة الفاتنة على نضوج الشعر وحلاوته، والشاعر تطرق إلى جميع الأغراض الشعرية لكن اشتهر بوصف الطبيعة ومناظرها الجميلة الساحرة، وبجانب آخر نجد في جميع أغراضه الشعرية لون وصف الطبيعة حتى إنه قد مزج الطبيعة بالغزل، فوصفه النقاد الأندلسيون بـ جنان الأندلس ، ويعد شعره من النوع الوجداني المملوء بالصور الجميلة والأخيلة الرائعة .

نبذة من حياة ابن خفاجة

هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي شاعر شرق الأندلس، وكنيته أبو إسحاق، والمعروف بابن خفاجة.[١] ولد ابن خفاجة سنة ٤٥١ هـ في جزيرة شقر[٢]، بلدة من أعمال بلنسية في شرقي الأندلس ونشأ بها.[٣] بدأ ابن خفاجة حياته العلمية من مسقط رأسه شقر وشاطبة ومدن الشرق الأندلس فأقبل على الدرس، وحفظ القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية، ودرس الشعر والنثر وعلوم اللغة وتضلع في جميع العلوم الإسلامية، لكن مال إلى دراسة الأدب والتعمق فيه. تلقى ابن خفاجة التعليم الديني من كبار علماء الحديث والفقه حتى نبغ في الحديث والفقه وعلومه وصارت له منزلة عالية عند معاصره.[٤] وقد اطلع الشاعر على دواوين شعراء المشارقة في

---

* Associate Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh.

القرن الرابع الهجري، وحفظ بعضها حتى تأثر ببعضهم من أمثال المتنبي والشريف رضى وعبد المحسن الصوري ومهيار الديلمي، تأثر ملحوظا في شعره، كما صرح بذلك نفسه في مقدمة ديوانه.[٥]

فقسم شوقي ضيف حياة الشاعر إلى أربعة مراحل، فأولها مرحلة الشباب، يقضها الشاعر مثقفا نفسه بالعلوم الدينية والعربية، يتمتع بالشبابة وما ورثه عن أسرته من المال واليسر. وأعقبت بعد الفترة الأولى من حياته فترة انقطع فيها الشاعر عن نظم الشعر. ويقال إن هذه الفترة تستغرق مدة طويلة من الزمان ولكن شوقي ضيف يرجح أنها كانت سنوات معدودة انتهت بانتهاء عصر ملوك الطوائف، ويظن أن سقوط طليطلة على يد الإسبان سنة ٤٧٨ﻫ هو الذي جعله يتوقف في قول الشعر.[٦] ولعل هذه الحادثة جرت اليأس إليه وأفقدته الأمل، فزهد ابن خفاجة عن نظم الشعر، وتوقف عن حياته المرحلة. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة عودة الشاعر إلى قول الشعر بعد أن عاد الأمل إليه بدخول المرابطين لإنقاذ الأندلس من يد الإسبان. ويرجح أحد الباحثين أن تكون سنة ٤٩٥ﻫ هي السنة التي استعاد فيها المرابطون بلنسية، فرجع ابن خفاجة إلى الأندلس بعد فراقه لها مدة كانت في نحو عشر سنوات،[٧]. وفي المرحلة الأخيرة من حياته انصرف إلى الزهد والتوبة وغادر عن ملذات الحياة وبدأ يفكر في مصيره.

كان ابن خفاجة إنسانا متميزا وذا شخصية فريدة في عصره من حيث طباعه وسلوكه وملامح شخصيته ونظرته إلى الحياة، وهو على الرغم من ماله وجاهه وحبه للحياة لم يتزوج قط، ومع أنه عاش عصر ملوك الطوائف فقد أعرض ولم يجعل شعره في خدمتهم، كما وصفه ابن الآبار في التكملة بأنه كان نزيه النفس لا يتكسب بالشعر ولا يمتدح رجاء الرفد.[٨] وقد توفي شاعرنا ابن خفاجة سنة ٥٣٣ﻫ/١١٣٨ م.[٩]

شاعرية إبن خفاجة

ابن خفاجة كان شاعرا، كاتبا، مترسلا، وصّافا للطبيعة التي ربّته بجمالها، فعمل بجميع قواه العقلية والخيالية على التعبير عن هذا الجمال ممثلا في الرياض والغيضات والبساتين والرياحين. وقال في ذلك شعرا كثيرا. فالطبيعة عند ابن خفاجة هي كل شيء، فقد شغف بها ومزج روحه بروحها وبادلها الشعور والإحساس، وكان يتحدث إليها كما يتحدث إلى شخص ذي حياة وحركة. وتفرد ابن خفاجة بالوصف والتصرف فيه، ولا سيما وصف الأنهار والأزهار والبساتين والرياض والرياحين، فكان أوحد الناس فيها حتى لقبه أهل الأندلس بالجنان، ولقبه الشقندي بصنوبري الأندلسي.[١٠] ذكر ابن خفاجة بلاده الاندلس في شعره وشبه الاندلس بالجنة لنعمها الموفورة. وقوله من أجمل ما قيل في الاندلس.[١١]

يا أهل الأندلس لله دركم * ماء و ظل و أنهار و أشجار

ما جنة إلا في دياركم * و لو تخيرت هذي كنت أختار

كان ابن خفاجة أيضا من الكتاب البلغاء، صاحب مذهب كتابي، وأسلوب أدبي يوازن بشعر أبي تمام ومذهبه، كما يشبه في نثره وكتابته ابن العميد والهمداني، فشعره من النوع الوجداني، الإبداعي، المملوء بالصور والخيالات، والأنوار والظلال، والأوصاف الدقيقة، مع تفرده بالوصف والتصرف فيه. كان شعره رقيقا وألفاظه أنيقة، غير أن ولوعه بالصنعة وتعمده الاستعارات والكنايات والتورية والجناس وغيرها من المحسنات المعنوية واللفظية جعل بعض شعره متكلفا، وأوقع بعضه في الغموض.[١٢] ومع ذلك فإن ابن خفاجة كان يعد أديب الأندلس وشاعرها بدليل ما نعته به احمد المقري (١٥٧٧-١٦٣٢) في كتابه نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب. فهو شاعر الطبيعة الأكبر وأديب الأندلس وشاعرها، وأديبها المشهور الذي اعترف له بالسبق الخاصة والجمهور، وهو أوحد الناس في وصف الأنهار والأزهار، والرياض والحياض والرياحين والبساتين.[١٣] خلف ابن خفاجة للأدب العربي عامة ديوانا شعريا غنيا، وكانت أشعاره كلها تدور في الأغراض المعروفة المألوفة مثل الغزل والرثاء والمدح والزهد والشكوى والحنين والتوجيه والفخر والعتاب والهجاء والدعابة والألغاز إلا أنه يكثر من وصف الطبيعة. يضم هذا

الديوان ألفين وثمان مائة وستة وستين بيتا، نظمها الشاعر على إثني عشر بحرا، ووزعها على أربعة أنواع من القافية وعلى عشرين رويا.[١٤]

الطبيعة في شعر ابن خفاجة

لقد أبدع ابن خفاجة في وصف الطبيعة وتفوق وتفرد، فاستطاع أن يصل بشعر الطبية الاندلسي إلى الذروة متقدما بتجربه الجمالية الفريدة على كل من سبقه من الشعراء، إذ يعدّ أشهر شعراء الاندلس في موضوع وصف الطبيعة خاص ومن كبار شعراء العرب عامة. فوصف ابن خفاجة أشياء كثيرة مما يقع تحت نظر الإنسان في دائرة اهتمامه، وخصص للوصف قصائد ومقطوعات متفرقات في الديوان، وتجلى وصف الطبيعة في شعر ابن خفاجة على وجوه عدة واتخذ اهتمامه بها واتكاءه عليها أشكالا مختلفة، فكان ابن خفاجة شاعر الطبيعة يصدقها ويناجيها ويحملها شيئا كثيرا من هواجسه، وما يعتلج في نفسه. ووصفه الدكتور حنا الفاخوري أنه شاعر الشعور الحي الذي يتغلغل في الطبيعة فيحيي ويشخّص، وإذا الأزهار والأشجار ألسنة حديث، وثغور ابتسام، وإذا النسيم أنفاس نجوى، وامتدادات آمال، وإذا ابن خفاجة شاعر الفن والجمال وشاعر الطبيعة الذي ينسج على أرفع منوال.[١٥] ونحن نجد في شعر ابن خفاجة تصويرين أساسيين لوصف الطبيعة، أحدهما وصف الطبيعة المتحركة، وثانيهما وصف الطبيعة الساكنة. ونحن نتكلم كلا منهما أحسن الكلام.

وصف الطبيعة الساكنة

إن الطبيعة الأندلسية التي أعجب بها الكثير من الشعراء وافتتنوا بجمالها، فخلقها الله طبيعة فيغاية الجمال، لهذا أخذ الأندلسيون الرياض والبساتين والثمار والأزهار والرعد والأنهار للوصف. وأن الشاعر ابن خفاجة هو شاعر الطبيعة فيوجد في شعره كل العناصر للطبيعة، فذكرت الطبيعة الساكنة في شعره.

الروضات (Gardens)

إن الشاعر ابن خفاجة وصف الرياض بجميع مظاهرها ومباهجها من أوراق خضر، وأغصان غضة، وأنوار وأزاهير، وتغريد طيور، ومياه جارية حتى أصبحت منظرا رائعا لتلك الرياض. كما قال[١٦]

* ريا تلاعبها الرياح فتلعب   سقيا ليوم قد أنخت بسرحة

والروض وجه أزهر والظل فر * ع أسود والماء ثغر أشنب

فالشاعر يقدم لنا لوحة جميلة للطبيعة، بعناصرها المختلفة من الشجرة التي تلاعب أغصانها الرياح، فتنثني سكرى على سماع غناء الطير وتساقط المطر. ثم يمضي الشاعر إلى ذكر عناصر أخرى، تلون تلك اللوحة من الروض المزهر، وظل الشجرة الظليل وماء الجدول البارد والنسائم الطيبة اللينة.

الأزهار (Flowers)

للأزهار مكانة رفيعة عند الكاتب، أنه ذكر في شعره أنواعها، ووصف ألوانها وصورها وروائحها، ومن أنواع الزهور النارنج والريحان والورد وغيرها. فقال الشاعر في الشقيق.[١٧]

يا حبذا والبرد يزحف بكرة * جيشا رحيق دونه وحريق

حتى إذا ولى وأسلم عنوة * ما شئت من سهل وذروة نيق

وصف الشاعر زهرة الشقيق التي تتفتح في الصباح، كأنها جيشان من رحيق وحريق، ومن أبرز صفات الشقائق هو لونها الأحمر القاني الذي دفع ابن خفاجة وشعراء آخرون إلى الإكثار من إضفاء صورة الحروب عليها، لأن الأندلس أرض جهاد وكفاح.

الأثمار (Fruits)

إن الأندلس هي بلاد مملوءة بجمال الطبيعة وكمال التراث الأصلية، فيها خزائن من الأموال والثمار كالنارنج والتين والعنب والرمان. ومن ذلك قوله في وصف النارنج.[١٨]

ومحمولة فوق المناكب عزة * لها نسب في روضة الحزن معرق

رئيت بمرآها المني كيف تلتقي * وشمل رياح الطيب كيف تفرق

لقد شغل ابن خفاجة في وصف النارنج وأشجاره وأزهاره. ولعل السبب في ذلك كثرة النارنج في الأندلس. وفي هذه الأبيات يصف الشاعر ثمرة النارنج وهي عالقة على أغصانها، فتلاعبها الرياح فتبدو كأنها تتلاقى وتتعانق وكذلك الأماني الشاعر.

الأنهار (Rivers)

النهر هو عنصر مهم يزين الرياض به. لقد نال النهر قسطا كبيرا من اهتمام الشاعر ابن خفاجة حين وصف الرياض، فتردد ذكره على لسان الشاعر في مقطعات كثيرة وانفرد في مقطوعتين مستقلتين.يقول الشاعر في وصفه.[١٩]

لله نهر سال من بطحاء * أشهى ورودا من لمى الحسناء

لقد تعجب الشاعر من النهر الذي سال في البطحاء، فوجده أشهى ورودا من شفاه الحسناء، فشكله مثل السوار في تعطفه وتعرجه، وكأنه والزهر الذي ينبت في ضفتيه مجر سماء. وقد بالغ الشاعر في وصفه حين ظن أنه قوس من فضة في ثوب أخضر، وأن غصون الأشجار تحف به، أما لونه فوصف مرة بأنه فضي اللون وأنه كالعين الزرقاء.

الأجبال (Hills)

ومن أجمل ما يقع عيون المغرمين بالطبيعة مثل ابن خفاجة منظر الجبال التي تكون أساسا في وصف الرياض. فقال الشاعر.[٢٠]

وقور على مر الليالي كأنما * يصيخ إلى نجوى وفي أذنه وقر

قال الشاعر فيها واصفا للجبل فهو وقور على مر الليالي، كأنه يصغي للنجوى وفي أذنه صمم، وهو رزين كل الرزانة، بل هو حزين في حين نجد البدر يستهزئ به ويضحك من هرامته. .

النار (Fire)

يقول ابن خفاجة في وصف النار حينما تلاعبها الرياح.[٢١]

لاعب تلك الريح ذلك اللهب * فعاد عين الجد ذاك اللعب

شبه الشاعر الرياح والنار كالحبيبين، أحدهما يلحق الآخر في العشق، فيصف الشاعر تتبع الريح لخطوات اللهب أينما ذهب، كأنهما يلعبان واحدا ويلحق الأخر، وتلحق الرياح النار في مسيرها بشوق وحنين بين اشتعال الشوق واضطرابه وتردده، وبلمسة من الجناس الناقص بين مضطرم ومضطرب.

الثلوج (Snows)

الثلوج التي تنزل في فصل الشتاء وتغطي قمم الجبال العالية، قد نهض ابن خفاجة لوصفها. وصار أول من تغنى بالثلوج في الأندلس. فقال الشاعر في وصف الثلج:[٢٢]

وللأقاحي ثغور فيه باسمة * له من الثلج ريق بارد خضر

كأن في الجو أشجارا منورة * هب النسيم عليها فهي تنتثر

فمن أثر الثلج أنه جعل الأرض فضية اللون كأنها عجوز شمطاء قد بلغت الكبر، وجعل الأرض مرتفعة ومنخفضة مغطاة به. حتى أصبح الروض وأشجاره مبيضا كلون النور. وتفرح الأقاحي من تساقط الثلوج الباردة، وكأن قطع الثلج في الجو تنثر أشجار منورة نورها بعد أن هب النسيم عليها.

وصف الطبيعة المتحركة

ذكر الشاعر في شعره كثيرا من الحيوانات المتحركة مثل الخيل والكلب والذئب والحمام والمرأة وغيرها ووصفها بحسن التشبيهات والاستعارات، كما في الذيل:

الأخيال (Horses)

وصف ابن خفاجة الخيل في مواضع مختلفة من ديوانه، وهي تأتي في مقطعات وقصائد يعالج الشاعر أوصافه معالجة مستقلة،٢٣وأخرى يتناولها الشاعر ضمن الموضوعات الأخرى. ويكثر وصف الخيل وذكره في ديوان ابن خفاجة لأن الأندلس أرض جهاد وحرب، وأن الخيل أداة يروح بركوبها الشاعر أحزانه وآلامه، وكذلك يذهب بها في رحلة الصيد. قال ابن خفاجة يصف خيولا في قصيدة يدعو فيها استرجاع بلدة بلنسية.[٢٤]

وبات يطلع نقع الجيش معتكرا * بحيث يطلع وجه الفتح مقتبلا

ما بين ريح طراد سميت فرسا * جورا وليث شرى يدعونه بطلا

ذكر الشاعر أنواعا من الخيول، منها ما لونه الأسود الفاحم كلون الليل المظلم، ومنها ما هو أشقر اللون، وهو ذو الحمرة الصافية، فقد غطى ذلك اللون سائر جسم الفرس، حتى كأنه نار الحرب المشتعلة، ومنها ما هو أشهب اللون، وهو الأبيض الذي في بياضه سواد، وشبه الشاعر لمعان بياضه بلمعان القرطاس ونصاعته، وكأنما قد اغتسل ذلك الفرس بماء الصبح.

الكلاب (Dogs)

ذكر ابن خفاجة الكلاب مصاحبة لرحلة صيده، يصف فيها خلقها وخلقها، ومرة فصل في ذكرها ومرة أوجزها. كما يصف الشاعر كلبا مطوق العنق بالبياض.[٢٥]

يسوف الأرض يسأل عن بنيها * فتخبر أنفه عنها الرياح

أطلّ برأسه ليل بهيم * فشد على مخانقه صباح

يصف الشاعر أن هذا الكلب له أذنان مسترخيان، وهو يجيد الجري ويستعد له تمام الاستعداد إذا أمره صاحبه بصيد الفريسة، وأنه استطاع أن يلحقها بأرجله الأربعة السريعة. ومن طبيعته أن يشم الأرض ويسوفها إذا أراد أن يبحث عن القنائص التي يصطادها، فتخبر الرياح عنها. ومن صفات هذا الكلب أنه سريع حين يصطاد، وأنه قاتل كأن الموت قد اتكأ على القوس. والقوس استعارة عن أرجل الكلب.

الحمامات (Pigeons)

لقد أكثر الشاعر ذكر الحمام في ديوانه ولكن مما يلتفت النظر هو أن الشاعر لم يقم بوصف هذا الطير بعينه ولا يشغل نفسه بدقائق وصف الحمام بل يجد الباحث أنه جعله مصدر قول الشعر والحزن والشوق والحنان والفرح. قال ابن خفاجة واصفا للحمام.[٢٦]

سجعت وقد غنى الحمام فرجعا * وما كنت لولا أن تغنى لأسجعا

فوصف الشاعر حالة حمامة صادحة في شجرة البان، وفي يائسة من الحب وشاكية من الفراق، وكأنها تتلو صحفا من شوقها. وهو كان يتعجب من هذه الحالة ويستهزئ منها، لأنها تشكو كما يشكو الإنسان العاشق، ولكن هذا الطائر يستمر في إصدار صوته كأنه رد على الشاعر ردا لينا وجاوبه مجاوبة مؤدبة.

الخاتمة

فيقال في الختام ان وصف الطبيعة في شعر ابن خفاجة يمثل صورةً صادقةً لحياة الأندلس وطبيعتها، وإنه قد بلغ إلى الذروة في إبداع الشعر والجمال الفني والروعة الفكرية التي لا يتصور بعدها مرحلة من مراحل الإبداع الشعري في وصف الطبيعة، وإنه قد سبق الغرب بكثير في إيجاد هذا النوع من الشعر والوصول به إلى القمة. فالشاعر اشتهر بوصف الطبيعة ومناظرها بأبيات جميلة معبرة من الأوصاف والتشبيهات الجميلة والاستعارات الرائعة المبنية على بيئة الأندلس وحضارتها ما تطير له النفس ارتياحاً وقبولاً وإعجاباً.

References

١ - ابن خاقان، *قلائد العقيان*، تح حسين يوسف خريوش، ج٤ (عمان: مكتبة المنار، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م)، ص: ٧٣٩: احمد يحيى الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس (بيروت: دار الكتب اللبناني، ١٢٠٣م)، ص: ٢٦٥-٢٦٦

٢ - شوقي ضيف، *عصر الدول والإمارات الأندلس* (القاهرة: دار المعارف، الطبعة الثانية، ١٩٧٧م)، ص: ٣١٧-٣١٨.

٣- أبو عبد الله محمد بن عبد الله أبي بكر القناعي ابن الأبار، *التكملة لكتاب الصلة* (القاهرة: نشر السيد عزت الحسيني، ١٩٦٠م)، ص: ٤٠.

٤ - *المصدر السابق*، ص: ١٨٦. محمد علي سلامة، *الأدب الأندلسي: تطوره وموضوعاته وأشهر أعلامه* (بيروت: دار العرب للموسوعات، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م)، ٣٣٣.

٥ - مقدمة الديوان، ص: ٦.

٦ - عباس، إحسان، *تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين* (عمان: دار الشروق، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م)، ص: ٣١٨.

٧ - منجد مصطفى بهجت، *ابن خفاجة الأندلسي والنقد الأدبي*، مجلة حولية كلية الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، العدد: ١٩، قطر: مطبعة جامعة قطر.

٨ - *المصدر السابق*، ص: ٢٧.

٩ - د. حسن محمد نور الدين، *ابن خفاجة شاعر شرق الأندلس* (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٠م)، ص: ٢٥.

١٠ - د. حسن محمد نور الدين، *ابن خفاجة شاعر شرق الأندلس*، ص: ٢٥.

١١ - ابن خفاجة، *الديوان* ، ص: ١٣٣-١٣٤ .

١٢ - حنا الفاخوري، *الجامع في تاريخ الأدب العربي: الأدب القديم*، ص: ٩٧٤.

١٣- أحمد بن محمد المقري التلمساني، *نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب* (بيروت: دار صادر، ١٩٦٨م)، ص: ٧٤٣

١٤ - د. حسن محمد نور الدين، *ابن خفاجة شاعر شرق الأندلس*، ص: ٢٩.

١٥ - حنا الفاخوري، *الجامع في تاريخ الأدب العربي: الأدب القديم*، ص: ٩٧٤-٩٧٥.

١٦ - *ديوان ابن خفاجة*، ص: ٤٠-٤١

١٧ - *المصدر السابق*، ص: ٢١٣

١٨ - *المصدر السابق*، ص: ٢٠٨

١٩- *المصدر السابق*، ص: ١٣

٢٠ - *المصدر السابق*، ص: ١١٨

٢١ - *المصدر السابق*، ص: ٢٨.

٢٢ - *المصدر السابق، ص: ٣٧٢.*

٢٣- خضر، حازم عبد الله، وصف الحيوان في الشعر الأندلسي؛ عصر الطوائف والمرابطين (بغداد: دار الشؤون الثقافة العامة، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م)، ص: ١٩٧.

٢٤- ابن خفاجة، الديوان، ص: ٢٥٩

٢٥ - *المصدر السابق*، ص:٧٤-٧٥

٢٦ - *المصدر السابق*، ص: ١٩٠

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

زواج المسلم من المشركة أو الكتابية: دراسة تحليلية

(Marriage of Muslim to Polytheist & Kitabiyyah Moderan Era: An Analytical Study)

H. M. Ataur Rahman Nadwi*

Abstract: The marriage of a Muslim with a mushrik or ahl al-kitab has recently begun in all parts of the world, regardless of religion or belief, just as it has started in our Muslim country Bangladesh, where Muslims live as the majority. This issue has recently been raised by secularists, communists and some political leaders.They want to use the media in all spheres of life, from politics and commerce, to open the door of marriage to polytheistic women without distinction between divine slavery and polytheism, paganism, Islamic civilization, and Western culture and religion although it is related to the belief in Allah and the divine law from the beginning to the end of the Muslim nation.

Undoubtedly, the issue of Muslims' marriage with polytheism and Kitabiyyah is firstly related to the future of the Bengali Muslim people and secondly to the independence of the entire Islamic nation. Therefore, before anyone from the upper house gives a verdict on this matter, Islamic scholars and researchers must resist it with the power of faith and the ability of research so that they can not take any opportunity to control the Bengali Muslim people.To extract the roots of the Islamic faith from the depths of the hearts of the children by presenting colorful dreams at one time and by raising exciting chants at another time, and in the name of intellectual development sometimes and keeping pace with the times and financial progress at other times in the era of globalization, and as soon as the future generation swallows this Malicious Western awareness, their personality will never return to the right again, because it will open the doors of corruption and chaos by expanding the scope of achieving sexual ambition in family life. If this type of marriage becomes legally valid for Muslims, no one can be prevented from marrying by the name of religion and Sharia.
Keywords: Muslim Marriage, polytheism, golobalization, western marriage system.

خلاصة البحث:

ينتشر زواج المسلم من المشركة أو الكتابية في جميع أنحاء العالم دون النظر إلى الدين والعقيدة، ليس فقط في الدول الغربية، بل في البلاد المسلمة أيضا، وثارت هذه القضية مؤخرا من قبل العلمانيين والشيوعيين ومن بعض الزعماء السياسيين في هذه البلاد بنغلاديش، ويريدون فتح أبواب الزواج من المشركات دون الفرق بين العقيدة والإيمان، وبين الوثنية والمشركة، والحضارة الإسلامية والثقافة الغربية، وذلك عن طريق استخدام وسائل الإعلام في جميع ميادين الحياة السياسة والتعليمية وغيرها.

الكلمات المفتاحية: الزواج الإسلامي، الشريعة، العولمة، نظام الزواج الغربي.

المقدمة:

الحمد لله الذي أرسل نبيه إلى الجن والإنس كافة، وبعد! إذا ألقينا النظر على حياتنا اليومية فإننا نرى كوضوح الشمس في رابعة النهار أننا أصبحنا لا نبالي بنواهي الشريعة الإسلامية حكومة وشعبا، فردا وجماعة، أسرة وقبيلة،

---

* Associate Professor, Department of Arabic & Director of Center for General Education (CGED), International Islamic University Chittagong, Bangladesh.

بل إننا نخالف أوامر الله في جميع الأمور الإلهية تاركين جميع الأخبار السماوية وراء ظهورنا في رابعة النهار حينا، وفي ظلمات الليل حينا آخر، دون أي خوف وذعر.

نظرة خاطفة على أهمية الزواج في الإسلام:

إن الإسلام رغب أتباعه في الزواج، ووضع له الأحكام، وقد تضافرت النصوص في القرآن والسنة، ولزواج درو كبير في تحقيق مقاصد الحياة الإنسانية، وإن الله يريد من الإنسان أن يعيش زوجين زوجين، وقال: "﴿**وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ**﴾" (الذاريات: ٤٩) وفي موضع آخر: "﴿**سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا**﴾" (فاطر: ٣٦) وهذه الآية تدل على أن الزاوج سنة كونية، فكيف يكون الإنسان بعيدا عن هذه السنة؟ كما قال ﷺ: "**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج**"[١]

زواج المسلم من المشركة أو الكتابية قضية خطيرة:

هناك قضية يواجهها المجتمع وتدمر أخلاق شباب الأمة، وتضر بالمشاعر الدينية من خلال تقويض الروابط الأسرية والاجتماعية، وهي قضية زواج المسلم من المشركة أو الكتابية على المستويين: المجتمع الإسلامي والمجتمع الغربي، وانطلاقا من خطورة القصية فإن الباحث تكلم في البحث رجاءً إلى الله أن يهدي الجميع إلى الصراط المستقيم، حتى لو وجد أحد هداية عن طريقه فإنه يكون له أفضل من الأهل و الأموال،كما **قال النبي ﷺ لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم"** [٢]

زواج المسلم من المشركة أو الكتابية قضية عصر العولمة:

ومن الواقع لقد ثار موضوع هام في هذا العصر الذي يقال عنه إنه عصر العولمة، وهو زواج المسلم من المشركة أو الكتابية، ويواجه المسلمون هذه القضية، حتى لحقت بهم الهموم عن مستقبل أولادهم، ولأجل ذلك أنهم يرجون من الباحثين الإسلاميين أن يتسعوا أوقاتهم للتحقيق عنه، حتى تجد الأمة سبيلا لإنقاذها من الوقوع في الشبكة الخطيرة، ولذلك فإن الإسلام عُنِيَ بها عناية فائقة، نظرا إلى الفرق بينهم وبين الوثنيين والبوذيين والأديان الأخرى التي توجد في العالم كله، والمعلوم أن هناك حكم خاص في الشريعة لأهل الكتاب وهذا الحكم الشرعي يميزهم عن غيرهم. كما صور الشيخ محمود شلتوت عن الضرر:

> " أما إذا انسلخ الرجل المسلم عن حقه في القوامة، وألقى بمقاليد نفسه وأسرته وأبنائه إلى زوجته الكتابية، فتصرفت فيه وفي أبنائه بمقتضى عقيدتها وعادتها، ووضع نفسه تحت رأيها واتخذها قدوة له يتبعها، وقائداً يسير خلفها، ولا يرى نفسه إلا تابعاً لها، مسايراً لرأيها ومشورتها، فإن ذلك يكون عكساً للقضية وقلباً للحكمة التي أحل الله لأجلها التزوج من الكتابيات. وهذا هو ما نراه اليوم في بعض المسلمين الذين يرغبون التزوج بنساء الإفرنج، لا لغاية سوى أنها إفرنجية تنتمي إلى شعب أوروبي، يزعم أن له رقيّا فوق رقي المسلمين الذين ينتسب هو إليهم، ويعد نفسه واحداً منهم" [٣]

تاريخ بداية زواج المسلم من المشركة أو الكتابية:

وإن التاريخ الإسلامي يشهد لنا بأنه كانت فترة من الزمن في المجتمع البشري لا يتصور الإنسانُ زواجَ المسلم من غير هم قط، ثم تغيرت الأحوال مع تغير العصر، ومن هنا فتح باب الزواج من قبل الطرفين، ولما جعل المسلم العيش

في بلدان مختلفة غرقت في الفحشاء والوقاحة، وفي مثل هذا الوضع الخطير يصعب على المرء المؤمن الحفاظ على إيمانه، وعلى الرغم من ذلك كله كان أغلب زواج الأولاد المسلمين من الفتيات غير المسلمات، لا يتم إلا عن طريق الوقوع في الحب، وينتهي باعتناق أكثرهن الإسلام، سواء قبل الزواج أو بعده.

التعليم المختلط يهيئ للزواج من المشركة:

إننا نجد التعليم المختلط سائدا على الصعيدين: العالم الإسلامي والعالم الغربي، وقد تأثر جميع المسلمين وغير المسلمين بأثير التعليم المختلط، حتى أصبح الآن قضية مقبولة لدى الجميع، وكذلك فإن المجموعات السياحية أيضا واحدة من أخطر مجالات الاختلاط الحر بين الرجال والنساء، وإنها نصبت شبكتها في العالم كله، وتعلن المصاريف المنخفضة في مختلف المناسبات، ويتم الإعلان عن الخصومات بجميع أنواع المرافق لجذب السياح، وأصبحت مظاهر الاختلاط تمثل العوائق في طريق بناء سيرة البنين والبنات، بل إنها تدمر تلك الأقدار والأخلاق التي ورثوها من حجر الأمهات في الصغر، وهي الآن أصحبت وسيلة لفتح باب الفحشاء ثم تحرضهم على الزنا.

دور الرحلات في زواج المسلم من المشركة:

وفي العصر الراهن أصبحت الهجرة أمرًا شائعًا، ولكن إذا خرجت المرأة وحيدة فإنها كثيرا ما تتعرض لمصائب ومشاكل، ومع ذلك تذهب المسلمات مع الرجال الأجانب باسم السفر دون الالتفات إلى الإسلام والشريعة، ثم تتجول البنات بجو الاختلاط الحر بدون محرم، ويفعلن ما يردن مع أن الناس لا يحبون هذه السلوكيات، حتى تصبح ضحية للشهوة الجنسية وتحولت الحية إلى الجثة، وفي الأخير تتطول قائمة الحوادث التي تبدأ من بداية الاختلاط الحر، وتكون الجرائد اليومية مليئة بمثل هذه الوقائع المؤلمة.

هل يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة والمشركة؟

وأنا أحب أن أنبه إلى حقيقة كبرى، ألا وهي أن الانسجام الفكري بين الطرفين مما لا بد منه لاستمرار الزواج واستقراره في كل دين ومذهب، وهذا معترف لدى الناس في العالم كله، ولذلك فقد أولى الإسلام أهمية خاصة للوحدة الدينية في الزواج، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من المشرك، وقد منع الله المسلمين نكاح المشركات بنص فقال: "**﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾" (البقرة: ٢٢١).**

ولا يوجد أي نص في القرآن عن زواج المسلمة من الكتابي، واجتهد الفقهاء في هذه المسئلة وأظهروا بعض الاجتهادات الفقهية التي تشير إلى أن هذا الزواج لا يجوز في الإسلام، لا ينبغي أن يتدخل غير المسلم في شؤون الفتاة المسلمة وأولادها، مما يؤدي إلى عدم الانضباط في الأطفال والخلط بين الأم المسلمة والأب الكتابي، ولكن المفكرين الأحرار يقولون: **"غير المسلم، المسيحي واليهودي، وهم أهل الكتاب، و هم ليسوا عباد أصنام ولا ينكرون وجود لله سبحانه وتعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عنا"** [٤]

كما قال شيخ الأزهر عنه: "الزواج في الإسلام ليس عقداً مدنياً كما هو الحال في الغرب، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفيه، والمسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى، فهو شرط لاكتمال إيمانه" [٥]

وقد تكلم الشافعي: "نزلت الآية في تحريم نساء المسلمين على المشركين من مشركي أهل الأوثان: ﴿**ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا**﴾ فالمسلمات محرمات على المشركين" [٦].

حكم زواج المسلم من اليهودية والنصرانية:

وإن هناك مستويين من غير المسلمين، وقد اتسع مجال في الإسلام لزواج المسلم من اليهوديات والمسيحيات بشرط، وهو أن تكون يهودية أو مسيحية حقّيقية، كما كانت في عهد الرسول ﷺ، ومن الصواب أن يكون الزواج بامرأة نصرانية أو يهودية مع اشمئزاز طفيف في بلد مسلم، فقد فرق الفقهاء بالتفصيل بين اليهود والمسيحيين، هو أن الرجال يمكن أن يكون لهم تأثير أكبر على الأسرة، وفرقوا بين الدولة المسلمة وغير المسلمة، لأن الجو الديني فيها لا يبقي الرجل ثابتًا على الدين، بل إنه سيساعد زوجته الكتابية على اعتناق الإسلام.

أهمية المعتقدات الدينية في الزواج:

ليس من قبيل التحيز إعطاء أهمية للمعتقدات الدينية في الزواج، وإنه لا يشير إلى التعصب ولا إلى ضيق الأفق، بل الهدف منها حماية الزواج؛ لأن أحد الزوجين في نفس المنزل يعتقد أن الله واحد، ولا يعبد أحدا إلا الله، ومن ناحية أخرى في نفس البيت تُعبد الأصنام، ويقوم أحد الطرفين بتشجيع الأبناء على الإرسال إلى المسجد وعلى ترسيخ جذور الإيمان بالله في قلوبهم، والطرف الآخر يدعوهم للذهاب إلى عبادة الأصنام، فكيف يتم خلق جو من الانسجام والمحبة في هذه البيئة؟ لأن الخلافات بين الزوجين تدمر الأسرة، وهذا ما يعرفه الجميع في المجتمع.

توافق الزوجين أعون على الحياة الأسرية:

إذا تزوج المسلم من المسلمة فإنه يعيش في الأمن، ولا يفكر عن دينها وأولاده، لأن التوافق بينهما من ناحية الدين أعون على الحياة الأسرية، وتكون بينهما المودة، ولا يكتفي بمجرد زواج المسلم من مسلمة فقط، بل الإسلام يرغب المسلم في الزواج من المسلمة الملتزمة بأحكام الإسلام كما قال الرسول ﷺ:**"تنكح المرأة لأربعة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"** [٧] وإن الإسلام يحرض أتباعه على طاعة الله، ويكون المسلم قواما على زوجته، لأن من طبيعة المرأة أن تكون تابعة للزوج، ولا يمكن أن يكون غير المسلم وليا على الزوجة المسلمة، لأن عقيدتها تمنعها عن إطاعته، كما قال القرآن: ﴿**وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً**﴾ (النساء: ١٤١) ولذلك إذا تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله حيث قال الرسول ﷺ: **"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"** [٨]

ارتفاع التكاليف سبب الزواج من المشركة:

وإن المشكلة الكبيرة التي تواجهها الأمة هي زيادة الإسراف في زواج الأولاد، وإن الله منع عن التبذير: ﴿**إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ**﴾**" (الاسراء: ٢٧)** وإذا نظرنا إلى إعداد الزواج في مجتمعنا الإسلامي، فإننا نرى أن ملايين الروبيات تُنفق على زواج واحد، لذا إذا لم يكن هذا اسراف وتبذيرفما هو تعريف الاسراف والتبذير؟

الأحكام بزواج المسلم من المشركة:

إن الله أنزل الأحكام عن الزواج من المشركة أو الكتابية في القرآن، ثم دون أئمة الفقه الإسلامي مسائل ضخمة، فلا يستطيع أحد أن يقوم بإصدار حكم جديد مهما تغيرت الظروف و الأوضاع، ولأجل ذلك قد تكلمت الشريعة عن هذه المسألة لأنها تتعلق بالعقيدة وسلامة المجتمع، وتقول: الزواج من المشركة والشيوعية والبوذية لا يجوز. ويقول القرطبي :**"أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة"** [٩]وقد كتب الإمام النووي: **"ويحرم نكاح من لا كتاب لها"** [١٠]

نظرة على آراء الفقهاء عن زواج المسلم من غيره:

وهنا أذكر آراء العلماء بالاختصار، وبقول الإمام الرازي معبرا رأيه عن هذه المسألة:"**فلا خلاف ها هنا أن المراد به الكل-أي جميع غير المسلمين- وأن المؤمنة لا يحل تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة"** [١١]

وقد روى الطبري عن قوله تعالى: "**﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾**" يعني مشركات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه. [١٢]

وقال ابن كثير: "هذا تحريم من الله على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات" [١٣] وقال الإمام مالك:" إن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال" [١٤]وقال الشافعي: "فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال" [١٥] قال البهوتي: "ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم" [١٦] وقال ابن مفلح: "إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة " [١٧]

وكتب ابن قدامة: "إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة " [١٨]. وقال ابن حزم: "ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا برهان ذلك قول الله" [١٩]

اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:

وهناك خلافات كثيرة بين العلماء، ولكنهم جميعًا يعملون من أجل الإسلام، ودارسوا الأوضاع دراسة تحليلية، بادروا إلى تقديم الحل الصحيح للأمة. وقد عبروا جميعاً عن آرائهم في ضوء الكتاب والسنة لمعالجة القصية، ولذلك لن يكون من المرغوب فيه أبدًا أن نتشاجر مع كل هذه الاختلافات، وأن نتفق عليها كل الاتفاق، ولهذا السبب عرضت خلافاتهم للقرآء؛ لأن المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، كما هو يؤمن بجميع الرسل والأنبياء وبجميع الكتب السماوية.

حكم زواج المحصنات الكتابية والمحصنات الحرة من المسلم:

وينبعث سؤال إذا أباح الإسلام زواج المحصنات الكتابية، والمحصنات الحرة المعروفة في المجتمع بالعفة، كيف يعرف أنها عفيفة في أمريكا وأوربا أو في البلدان الغربية؟ وإن الحضارة الغربية العارية وتدمر جميع القيود الأسرية والحدود الاجتماعية، فتخرج بناتها من البيوت أمام الآباء بالملابسة التي تهيج الشهوات الجنسية، وتندفع وراء الشهوات بخلع العِذار دون الفرق بين الإخوان والأخوات، لقد اعتاد الغربيون أن يكونوا مثل الزوجين في استمتاع بعضهما بالبعض بدون زواج، ثم يقومون بالعلاقات الجنسية عاما بعد عام دون الالتفات إلى الأخلاق، وهذه الثقافة الأوربية والحضارة الغربية تذهب بأبنائها إلى الهلاك والدمار، وتدمر جميع الحواجز الأسرية التي تحول بين الحضارة الغربية الهدامة والحضارة الإسلامية السمحة بكل قوة بأسماء مختلفة.

زواج بعض الصحابة من الكتابيات:

وذُكر في كتب أسماء الرجال أن بعض الصحابة تزوجوا الكتابيين، ولكن لا نحتاج إلى ذكرهم، وهذا ليس موضوع مناقشة البحث هنا، ومع ذلك نشير إلى بعض منهم لإثبات حقيقة الأمر فقط، وعلى رأس قائمتهم حذيفة، وهو تزوج يهودية، وطلحة بن عبيد الله أنه نكح بنت عظيم اليهود، ولكن **"كره عمر لطلحة وحذيفة نكاح اليهودية والنصرانية"** [٢٠]

وذُكر "**أن عثمان بن عفان تزوج نصرانية، و إنها أسلمت، وفي غالب أحيان أن المرأة تميل إلى زوجها، ولأجل ذلك حُرمت المسلمةُ على المشرك**" [٢١]

خلاصة مواقف العلماء من زواج الكتابيّة:

- **الجواز:** وهو مذهب جمهور العلماء"﴿**الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ...... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ**﴾ " (المائدة :٥)
- **الجواز مع الكراهة:** كره رجال من السّلف، ومن بينهم "**عمر وعليّ وتبعهما بعض التّابعين منهم عطاء بن أبي رباح** " [٢٢]
- **التّحريم:** يقول بعض من الصحابة في قوله تعالى: "﴿**وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ**﴾" (البقرة: ٢٢١). و ابْن عُمَرَ قَالَ: "**إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنْ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، فكأنّه يرى أنّ آية المائدة منسوخة**" [٢٣]

الخاتمة:

إن الباحث نفسه يعطي الأولوية لتحريم الزواج من الكتابية في دار الكفر وفي ضوء الحقائق التي ذكرها في البحث، و يرى أن زواج المسلم من الكتابية في دار الإسلام مباح مع الكراهة. والبحث كله مبني على الآراء الّتي بُثَّت في كتب الفقه التي ظهرت في عصور الرُّقِيّ، فكيف يجوز التزوج من الكتابيات في عصرنا الذي يقال إنه عصر الفحشاء والمنكرات فشت بفضل الشبكة "الإنترنت". و نتائج البحث في سطور:

- لا يجوز من المشركة التي ليس لها دين سماوي إتفاقا.
- يجوز من الكتابية بين الكراهية.

ينبغي أن تكون الكتابية عفيفة.

References

[١] . *البخاري*، أبو عبد الله محمد بن إسماعيا، صحيح البخاري، دار اليمامة، بيروت. الرقم: ٤٧٧٨

[٢] - *البخاري*، المرجع السابق، الرقم : ٣٧٠١

[٣] - محمود *شلتوت*، *الفتاوى*، دار القلم، بيروت، ص/٢٧٩.

[٤] - www.dw.com/ar

[٥] - جريدة *القدس العربي*، القاهرة، 18 نوفمبر ٢٠٢٠

[٦] - الشافعي، محمد بن إدريس، *أحكام القرآن*، دار إحياء العلوم، بيروت، ج: ١ ص/ ١٨٩.

[٧] - *البخاري*، المرجع السابق، الرقم: ١٣٤١

[٨] - البخاري، *المرجع السابق*، الرقم: ٢٠٨٥

[٩] - القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، *الجامع لأحكام القرآن*، دار الكتب المصرية: ج/٣ ص/ ٧٢

[١٠] - النووي، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي الشافعي، *المنهاج*، دار القلم، بيروت، ج/ ٣، ص/ ١٨٧

[١١] - الرازي، فخر الدين، *التفسير الكبير*، دار الفكر، بيروت، ج/٦،ص/٦٤

[١٢] - االطبري، محمد بن جرير، *تفسير الطبري*، دار الحديث، القاهرة،ج/٤ ص/ ٣٦٣.

[١٣] - ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، *تفسير ابن كثير*، دار الطيبة، بيروت، ج/ ١، ص/474.

[١٤] - مالك، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني. (٩٣-١٧٩هـ / ٧١١-٧٩٥م) *المدونة الكبرى*، دار الكتب العلمية، بيروت، ج/ ٤ ص/ ٣٠١.

[١٥] - الشافعي، محمد بن إدريس، *الأم*، دار الحكمة، بيروت، ج/ ٥ ص/ ٧.

[١٦] - البهوتي، أبو السعادات المنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البُهُوتي الحنبلي المصري القاهري.*كشاف القناع*، دار القلم، بيروت، ج/ ٥، ص/ ٨٥.

[١٧] - ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الراميني المقدسي الصالحي الحنبلي / ١٤١٣ - ١٤٧٩م، *آداب المعلم والمتعلم*، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج/ ٧ ص/ ١١٧.

[١٨] - ابن قدامة،موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة، *المغني*، دار القلم، بيروت، ج/ ٧ ص/ ١٢٩.

[١٩] - ابن حزم، أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حَزْمِ بن غالب بن صالح بن خَلَفِ بن مَعدَان بن سُفيان بن يَزِيدَ، الأَندلسي القُرْطُبِي، *المحلى*، دار الحكمة، بيروت، ج/ ٩ ص/ ٤٤٩.

[٢٠] - الطبري، المرجع السابق، *تفسير الطبري*، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج/٤ ص/ ٣٦٦.

[٢١] - النووي، المرجع السابق، *المنهاج مع الحاشية*، دار الفكر، بيروت، ج/ ٣، ص/ ١٨٧.

[٢٢] - أبو شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خُوَاسْتي العبسي مولاهم الكوفي (١٥٩ هـ - ٢٣٥ هـ)؛ *مصنف أبي شيبة*، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج/ ٣، ص/ ٤٧٥.

[٢٣] - البخاري، *المرجع السابق*،الرقم: ٢٧٣١

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

মারুফ আর-রুসাফির কাব্যদর্শন: একটি বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ
(The Poetic Philosophy of Maruf Ar-Rusafi: A Multidimensional Analysis)

Muhammad Hanif*

Abstract: Maruf al Rusafi (1875-1945) is regarded as one of the most prominent poets in modern Arabic literature and the founder of the social school of poetry in Iraq. He was also an educationist, politician and literary scholar. Rusafi was born in 1875 at Rusafa in Iraq. Rusafi started his early schooling at the primary schools of Baghdad. For higher education he joined Al-Rashidiyah al-Askariyah but he failed in the annual examination and left the institution, then he studied Arabic literature and Islamic Sciences and received informal education from Mahmud al-Shukri and other famous scholars. Although he started his career as a teacher, he was widely regarded as a famous poet through his impeccable poetry. He is also known as a poet of freedom. He produced a large body of poetry that included social and political issues, religious devotion and piety in particular. Specially he criticised the British occupation in Iraq and called for revolution through his famous poetic works, such as Tanbihun neeam (تنبيه النيام), Al-Hurriyat Fi Siyasatil Mustamirin(الحرية فى سياية المستعمرين), Hukumatul Entidab(حكومة الانتداب) and Damishk Tandubu Ahluha(دمشق تندب اهلها). He was entirely rebellious against oppression, defensive of women and widows, freedom, love, revolution, strong advocate of education and knowledge. In this article, discussion has been made aboutthe Poetic Philosophy of Maruf Ar-Rusafi.

ভূমিকা

মারুফ আর-রুসাফি (১৮৭৫-১৯৪৫খ্রি.) ইরাকের জাতীয় জাগরণের কবি ও প্রতিথযশা সাহিত্যিক। আরবি কবিতার পুনর্জাগরণ ও আধুনিকরণের অন্যতম পথিকৃৎ। পাশাপাশি তিনি একজন শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ। কবিতা রচনার মধ্যদিয়েই মূলত আরবি সাহিত্যের সুবিস্তৃত জগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীতে তিনি গদ্যসাহিত্যেও সমান পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিতি ও ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর কাব্যদর্শন ও কাব্যচর্চা নিসক আবেগ-অনুভূতি ও ভাবাবেগের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সামগ্রিক জীবনাচার, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিকতা ও ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব ও বহুমাত্রিক চিন্তাধারা আধুনিক আরবি কাব্যধারায় নতুনমাত্রা সংযোজন করেছে। দেশপ্রেম ও আত্মচেতনায় উজ্জীবিত কবি আধিপত্য বিস্তার, স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যায়-অবিচার, দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কবিতার ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন। তিনি কবিতার মাধ্যমে একদিকে যেমন অধিকারহারা ও সুবিধা বঞ্চিত লোকদের সুকরুণ চিত্র এঁকেছেন– অন্যদিকে অত্যাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত ও জালেম শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে মুক্তির পথ অন্বেষণের দ্ব্যর্থহীন আহ্বান জানিয়েছেন। ধর্মান্ধতা, জড়াবদ্ধতা, গোঁড়ামি ও ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি পরিহার করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় মনোনিবেশের জোড়ালো ধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর কাব্যিক সুরে। তাঁর রচিত কাব্যসম্ভারে একই সাথে জীবন, শিল্প ও প্রকৃতি এই তিনটি বিষয়ের সার্থক সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর কাব্যদর্শন, কাব্যের উপাদান ও ভাবধারায় এমন কিছু অভিনবত্ব রয়েছে– যা তাঁর কাব্যচর্চাকে দিয়েছে অপূর্ব বৈচিত্র্য ও অনন্য সুষমা।

মারুফ আর-রুসাফির সংক্ষিপ্ত জীবনপরিক্রমা

মারুফ আর-রুসাফি ইরাকের বাগদাদ নগরীর 'রুসাফা' নামক গ্রামে ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতা আব্দুল গণী ছিলেন কুর্দি বংশোদ্ভূত এবং মাতা ফাতিমা আরব বংশোদ্ভূত।[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের

* PhD Researcher, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh.

দিকে কবির পিতা উন্নত জীবনযাপন ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভের আশায় বাগদাদের পূর্বদিকে 'রূসাফা' নামক গ্রামে আগমন করেন। সেখানের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নগরজীবনের নানা সুযোগ-সুবিধায় মুগ্ধ হয়ে পরবর্তীতে ঐ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৩] এ গ্রামের দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে 'রূসাফি' নামে ডাকা হয়। তিনি এ নামেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেন।[৪]

পিতা-মাতার কাছেই কবির শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। স্থানীয় এক মক্তবে ঐতিহ্যগত কারিকুলাম অনুযায়ী তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ও কুরআনুল কারিম 'হিফয' সম্পন্ন করেন। এরপর তাকে 'রুশদিয়্যা সামরিক বিদ্যালয়ে' ভর্তি করিয়ে দেন।[৫] এখানে চারবছর অধ্যয়নের পরও চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিহার করেন এবং বাগদাদের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ও প্রথিতযশা আলেমের নিবীড় তত্ত্বাবধানে ধর্ম, ভাষা-সাহিত্য, তর্কবিদ্যা, আইন ও ইতিহাস বিষয়ে গভীর বুৎপত্তি লাভ করেন। কবির শিক্ষাগুরুর মাঝে মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি, আব্দুল ওয়াহ্হাব আন-নায়্যিব, কাসিম আল-কায়সি, কাসিম আল-বয়াসির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির সামগ্রিক জীবনপ্রবাহে তাঁর শিক্ষাগুরু আল-আলুসির প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রিয় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থেকে রূসাফি কাব্যচর্চা শুরু করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর বেশকিছু কবিতা তৎকালীন সিরিয়া ও মিশরের বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যা তাঁর কাব্যচর্চায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করে এবং কাব্যপ্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[৬]

তিনি শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।[৭] পাশাপাশি কাব্য ও সাহিত্যচর্চা করেন। অল্পসময়ে তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[৮] তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত পত্রিকা 'সাবিলুর রুশদ' (سبيل الرشد) কর্তৃপক্ষ কবিকে ডেকে পাঠান। তিনি ইস্তাম্বুল চলে আসেন এবং পত্রিকায় লেখালেখির সাথে 'রয়েল হাই স্কুল' ও ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'মাদরাসাতুল ওয়ায়িজীন'-এ শিক্ষক হিসেবে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি সেখানকার এক ধার্মিক ও বিদূষীণি রমণীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৯] ১৯১২ সাল থেকে বেশ কয়েক বছর তিনি ইস্তাম্বুলে তুর্কি প্রতিনিধি সভায় দক্ষিণ ইরাকের একটি জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন। এরই মাঝে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) শুরু হয়। যুদ্ধকালে ইস্তাম্বুলে অবস্থান করলেও যুদ্ধ শেষে তিনি দামেশকে চলে আসেন।[১০] সেখানে সাত মাস অবস্থানের পর জেরুজালেমে এক টিচার্স ট্রেনিং কলেজে তিন বছর আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পাঠদান করেন।[১১] ১৯২১ সালে ইরাক সরকারের আহ্বানে দেশে ফিরে আসেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনুবাদ সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করেন।[১২] বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শেষে তিনি ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ মার্চ শুক্রবার সকালে নিজ গৃহে মৃত্যুবরণ করেন।[১৩]

মারুফ আর-রূসাফির সাহিত্যিকর্ম

রূসাফির কাব্যমালা জাতীয় জাগরণ ও সমাজ পরিবর্তনের প্রদীপ্ত আহ্বান জানিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করেছে জনসাধারণের হৃদয় থেকে হৃদয়ে। মানুষের যাপিতজীবন, তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, হাসি-আনন্দ, দুঃখ-কষ্ট, ভালোলাগা-ভালোবাসার উপাদান যেমন তাঁর কাব্যসম্ভারকে করেছে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত, ঠিক তেমনি ঔপনিবেশিক শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে জোরালো আহ্বান, আত্মভোলা জাতির দুর্দিন ও করুণ পরিণতির ব্যাপারে সতর্কীকরণ তাঁর কাব্যশিল্পকে করেছে দীপ্তিমান। যা তাঁকে এনে দিয়েছে একজন সাম্যবাদী ও জাতীয় জাগরণের কবির খেতাব এবং অনন্য মর্যাদা।[১৪] তাঁকে পরিণত করেছে ইরাকের কাব্যসাহিত্যের প্রাণপুরুষ রূপে। রূসাফির কাব্যচর্চার পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বহুমুখী। প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সকল বিষয়-ই তাঁর কবিতায় আলোচিত হয়েছে নতুন রূপে ও অভিনব আঙ্গিকে।[১৫] তাঁর কবিতার ভাষাশৈলী, বিষয়াবলীর অভিনবত্ব ও কাব্যিক-ভাব ব্যঞ্জন্যায় মুগ্ধ হয়ে সমসাময়িক কবি জামিল সুদকি তাঁকে মিশরের আহমদ শাওকি ও হাফিজ ইবরাহিমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও উঁচু স্তরের কবি হিসেবে অভিমত দিয়েছেন।[১৬] মুস্তফা আস-সাফা বলেন,

أنه كان من كبار شعراء هذا العصر، ذوى الافتنان فى الشعر، وقد ظهر فى شعره الكونى والفلسفى نزعات قوية دالة على عمق تكفيره، كما أبان شعره الوصفى عن دقة وقوة فى تصوير الأشياء.[١٧]

'তিনি আধুনিক যুগের একজন উঁচু স্তর কবি ও প্রতুৎপ্রন্নমতি ছিলেন। রুসাফি রচিত জাগতিক ও দার্শনিক কবিতায় তাঁর চিন্তার গভীরতা ও পরিপক্কতার ছাপ প্রতিভাত হয়। যেমনিভাবে তাঁর বর্ণনামূলক কবিতায় কোনো জিনিসের চিত্রায়ণে তাঁর যথার্থতা ও সুক্ষ্মতার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

রুসাফির সাহিত্যকর্মের তালিকা[১৮] নিম্নে প্রদত্ত হল, যেখানে তিনি তাঁর কাব্য ও জীবনদর্শনের নান্দনিক উপ্যাখ্যান উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। ১. الديوان , ২. دفع المراق في لغة العامة من أهل العراق , ৩. دفع الهجنة في إرتضاخ اللكنسة , 8. رواية الرؤياء , ৫.رسائل التعليقات , ৬.محاضرات في آداب اللغة العربية , ৭. على باب سجن أبي العلاء , ৮. آراء أبي العلاء , ৯. نظرة إجمالية في حياة المتنبي , ১০. عالم الذباب , ১১. الأدب الرفيع , ১২. في ميزان الشعر و قوافية , ১৩.خواطر و نوادر , ১৪. الرسالة العراقية , ১৫. الآلة والأداة , ১৬. شخصية محمد صلى الله عليه وسلم , ১৭. مع الرصافى الثائر , ১৮. الأنشدية الوطنية , ১৯. تمائم التعليم والتربية , ২০.مختارات من معروف الرصافي , ২১. المنهل الصافي من شعر الرصافي , نفه الطيب في الخطابة والخطيب ।

মারুফ আর-রুসাফির কাব্যদর্শন

আধুনিক আরবি কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে যারা সাম্য ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দূরীকরণ, শাসক গোষ্ঠীর অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের বজ্রকণ্ঠকে উচ্চকিত করেছেন, তাদের মাঝে প্রথম সারির কবি হিসেবে বিবেচিত হন মারুফ আর-রুসাফি। তিনি প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা ও মানবতাবাদি কবিদের পথিকৃত। তাঁর কবিতা ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে মানবপ্রেম, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, উদারতা ও মানবতার জয়গান দেদীপ্যমান। জাতিগত পশ্চাদপদতা, অজ্ঞতা, অস্থিরতা ও সামাজিক অবক্ষয় রোধের বিষয়টিও উঠে এসেছে তাঁর কাব্যে। নিঃস্ব, দরিদ্র, অসহায়, বিধবা ও অবহেলিত জনসাধারণের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ ও অগাধ ভালোবাসা। তাঁর কবিতার একটি বিশাল অংশ জুড়ে সমাজের এসকল সুবিধা বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের কথা উচ্চারিত হয়েছে। এসকল সাধারণ মানুষের সামগ্রিক উন্নতি ও ভাগ্য উন্নয়নের জন্য তিনি ছিলেন ব্যাকুলপ্রাণ। তাঁর অনবদ্য কাব্যমালায় কখনো উঠে এসেছে অধিকার হারা মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়ার অনুপ্রেরণা, আবার কখনো ফুটে উঠেছে সাম্যবাদী চেতনা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জোরালো আহ্বান। আরবদের জাতিগত আবদ্ধতা, প্রাচীন গোড়ামি, চিন্তা-চেতানার সীমাবদ্ধতা ও নিশ্চলতার কথাও আলোচিত হয়েছে তাঁর কাব্যসম্ভারে।

কবির ঈদ ভাবনা ও অসহায়ের প্রতি দয়ার্দ্র মনোভাব

রুসাফি 'আল-ইয়াতিম ফিল ঈদ'[১৯] (اليتيم فى العيد) কবিতায় ধনী-গরীবের ঈদের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস চালিয়েছেন। ঈদ অর্থ আনন্দ, খুশি। কিন্তু এই ঈদ যে কারো কারো জীবনে সুখের পরিবর্তে কষ্টের বার্তা নিয়ে আসে, কবিতার ভাষায় তিনি এর সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। সাধারণত ঈদের দিন বিত্তশালী লোকেরা বাহারি রঙের দামি পোশাক পরিধান করে। অন্যদিকে দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকেরা পুরাতন ও জীর্ণশীর্ণ তালিযুক্ত পোশাক পরিহিত অবস্থায় দুঃখবোধ করে। তাছাড়া ঈদের দিন সধবা ও বিধবা রমণীদের জীবনে এক বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সধবা নারীরা অলংকার পরিহিত অবস্থায় আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে। অন্যদিকে বিধবা রমণীরা অতীতের স্মৃতিচারণ করে অশ্রুধারা প্রবাহিত করে। কবির দৃষ্টিতে ঈদের প্রকৃত রূপ যেন কষ্ট ও বিষাদের এক হৃদয়বিদারক উপ্যাখ্যান। আর ঈদের দিনের হাসি-খুশি ও আনন্দ হল কৃত্রিমতা মাত্র। রুসাফি উক্ত কবিতায় ঈদের দিনের এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য তুলে ধরেন। কোনো এক ঈদে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি বাইরে বের হন। হঠাৎ তিনি উঠতি বয়সী বিবর্ণ চেহারার বাদামী রঙের কালো চক্ষু বিশিষ্ট এক ক্ষীণকায় বালককে দেখতে পান। যার পরনে ছিল জীর্ণশীর্ণ পোশাক। দুঃখ-দুর্দশায়পূর্ণ তার ধুলো ধূসরিত চেহারা থেকে দরিদ্রতা যেন বিন্দু বিন্দু করে ঝরে পড়ছিল। পাশেই সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী পরিবারের যুবক ও তরুণরা ঢোলের উচ্চশব্দের তালে নেচে-গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিল, কিন্তু পিতৃহীনতার ভীষণ ঝঞ্ঝা কবলিত ঐ বালককে এসবের কিছুই যেন স্পর্শ করছিল না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল চারপাশ প্রকম্পিত করা ঢোলের গগণবিদারী শব্দ যেন বালকটির কর্ণকুহুরে প্রবেশই করেনি। তীব্র ঠাণ্ডা আবহাওয়ার দরুণ সে ছিল

উপর্যুপরি কম্পমান। তার আশেপাশে সকলেই ছিল উন্নত ও দামি পোশাক পরিহিত। অথচ সে কনকনে শীত নিবারণের জন্য সামান্য চাদরও পাচ্ছিল না। বালকটির এহেন দুরবস্থা কবিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। কবির হৃদয় দুঃখে ম্রিয়মান ও ব্যথিত হয়ে পড়ে। কবির ভাষায়-

يرى حوله الكاسين من حيث لم يجد * على البَرد من بُرد به يتلفّع

فكان ابتسام القوم كالثلج قارساً * لدى حسرات منه كالجمر تَلذَع

فلما شجاني حاله وأفزّني * وقفت وكلّي مَجْزَع وتَوَجُّع[٢٠]

'ইয়াতিম বালক তার চারপাশে পোশাক পরিধানকারীদের দেখতে পাচ্ছে অথচ ঠাণ্ডা সত্ত্বেও সে নিজেকে আবৃত করার মত কোন চাদর পায়নি। বিদগ্ধকারী অগ্নিকুণ্ডের মত তার (বালকের) দুর্দশার নিকট সম্প্রদায়ের মৃদু হাসি ছিল বরফের ন্যায় কনকনে ঠাণ্ডা। তার অবস্থা আমাকে ব্যথিত ও বিচলিত করে তুলল। আমি তথায় দাঁড়ালাম আর আমার সমস্ত মন-প্রাণ দুঃখে ম্রিয়মান ও ব্যথিত হয়ে পড়ল।'

কবির বিদ্রোহী মনোভাব

'আল-ইয়াতিম ফিল ঈদ কবিতা'র শেষ স্তবকগুলোতে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহী ও সংক্ষুব্ধ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকনের পর ব্যাকুল ও ব্যথিত অন্তর নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতঃ ফিরে আসেন। পথিমধ্যে পরিচিতজনদের একটি সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনার বিবরণ দেন। সব শুনে উপস্থিত জনতা সাময়িক দুঃখ প্রকাশ করে এবং 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করে, কিন্তু তাদের মাঝে কোনোরূপ প্রতিবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যায় না। কবি এমন ভয়াবহ ব্যাপারে তাদের শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ ও ইন্নালিল্লাহ পাঠে আরও ব্যথিত হন এবং কৃত্রিম সমবেদনা প্রকাশ বন্ধ করতে বলেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আত্মজাগরণের আহ্বান জানান। কবির ভাষায়-

فقلت دعوا التأفيف فالعار لاصق* بكم واتركوا الترجيع فالأمر أفظع

ألسنا الأُلى كانت قديماً بلادنا *بأرجائها نور العدالة يسطع

فما بالنا نستقبل الضيم بالرضا* ونعنو لحكم الجائرين ونَخْضَع[٢١]

'আমি বললাম, তোমরা পরিতাপ ছেড়ে দাও। কারণ, দুর্নাম তোমাদেরকে পেয়ে বসেছে। আর ইন্না লিল্লাহ পড়াও পরিত্যাগ কর, কারণ ব্যাপারটি অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা কি সেই জাতি নই? অতীতে যাদের শহরগুলোর আনাচে-কানাচে ন্যায়নীতির শিক্ষা দীপ্তমান ছিল। আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে লাঞ্ছনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি এবং অত্যাচারী শাসকদের নিকট মস্তক অবনত করছি।'

এ কথা ধ্রুবসত্য, যে জাতি সম্মিলিতভাবে ন্যায়পরায়ণতা পরিহার করে, জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়-অপকর্মের প্রতিবাদ করা ছেড়ে দেয়, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার পরোয়া না করে কেবল ব্যক্তিস্বার্থের বিষয়টি হিসেব করে তখন তাদের উপর আসমানী গযব অবধারিত হয়ে যায়। তাদের জন্য অপমান, জিল্লতি ও ধ্বংস অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে। কুরআনুল কারিমে এমন বহু জাতির ঘটনা উল্লেখ রয়েছে, ন্যায়পরাণতা ও নীতি-নৈতিকতার পরিহার যাদের চূড়ান্ত পতন ও ধ্বংস অনিবার্য করে তুলেছিল।[২২]

অন্যায়-অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করা এবং জালেমের অত্যাচারী-হাত রুখে না দেওয়ার জন্য কবি স্বজাতিকে ভর্ৎসনা ও তাচ্ছিল্য করেন। এরপর তাদেরকে সুদৃঢ় সংকল্প ও স্বাধীনচেতা সাহসী মনোভাব নিয়ে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সামনে অগ্রসর হতে বলেন। অত্যাচারি-জালেম ও স্বৈরাচারীদের পদানত করে আত্মমর্যাদা ও সম্মানের সুউচ্চ আসনে সমাসীন হতে যদি মৃত্যু-পরোয়ানাও এসে যায় তবে তা হাসি-মুখে বরণের জন্য উৎসাহিত করেন। কবির ভাষায়-

شربنا حميم الذُلِّ ملُّ بُطوننا * ولا نحن نشكوه ولا نحن نَيْجَع

فلو أن عَيْر الحيّ يشرب مثلنا * هواناً لأمسى قالساً يتعوَّع

نهوضاً إلى الغرّ الصُراح بعزمة * تخِرّ لمرماها الطُغاة وتركع

ألا فاكتُبوا صكّ النهوض إلى العلا * فإنّي على موتي به لمُوَقِّع[٢٣]

'আমরা লাঞ্ছনার উষ্ণ বারি পান করে উদর পূর্তি করেছি। কিন্তু এ জন্য আমরা কোন অভিযোগ কিংবা দুঃখ প্রকাশ করছি না। গোত্রের কোন গর্দভও যদি আমাদের মত লাঞ্ছনার পানি পান করত, তবে সেও উহা উদর থেকে বের করার জন্য বমি করে ফেলত। তোমরা এমন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে প্রকৃত সম্মানের দিকে অগ্রসর হও; যার সম্মুখে উচ্ছৃংখল ও বিদ্রোহী নতজানু হয় এবং মস্তক অবনত করে। শোন! তোমরা উচ্চ মর্যাদার দিকে অগ্রসর হবার জন্য অঙ্গীকারনামা লিখে নাও। আমি এ ব্যাপারে মৃত্যুর জন্য স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত।'

জ্ঞানার্জন ও গবেষণা প্রসঙ্গে কবির দৃষ্টিভঙ্গি

শিক্ষা মানুষকে আলোলিক করে। সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। শিক্ষা মানুষকে সচেতন, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল হতে শেখায়। আধুনিক বিশ্বে পৃথিবীবাসী যেসকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করছে তার মূলে রয়েছে শিক্ষা ও গবেষণার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের মূলচালিকা শক্তি শিক্ষা। মূলত শিক্ষিত ও কর্মক্ষম জাতির মাধ্যমেই একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। কোনো ভূখণ্ডের রাজনৈতিক স্থীতিশীলতা, কূটনৈতিক সাফল্যের জন্যও দরকার শিক্ষা ও গবেষণার। রূসাফি অজ্ঞতাকে জাতীয় অধঃপতনের মূলকারণ এবং শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনকে উন্নতির মূল সিঁড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই একটি জাতি সুশৃঙ্খল হয়, দেশে শৃঙ্খলা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়। আর অজ্ঞতা ও অদক্ষতা মানুষকে কর্তব্য পালনে ফাঁকিবাজি শেখায়। কোনো জাতি যদি তার সন্তানদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা না করে তবে একসময় দেখা যাবে যে, তাদের পরিহিত বস্ত্রগুলো-ই হবে তাদের কাফন আর তাদের গৃহগুলো হবে কবরস্বরূপ। কবির ভাষায়-

بالعلم تنتظم البلاد فإنه * لرقي كل مدينة مرقاة[24]

إذا ما عق موطنهم أناس* ولم يبنوا به للعلم دورا

فإن ثيابهم أكفان موتى *وليس بيوتهم إلا قبورا[25]

'একটি দেশের সার্বিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মূল মাধ্যম হল শিক্ষা। এবং একটি জনপদের উন্নতি ও অগ্রগতির মূল সিঁড়ি হল শিক্ষা। কোনো জাতির দায়িত্বশীল লোকেরা যদি কর্তব্যপরায়ণ না হয় এবং জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও একাডেমি গড়ে না তোলে তাহলে দেখা যাবে একদিন তাদের পরিহিত বস্ত্রগুলোই হবে তাদের কাফন আর তাদের বসবাসের গৃহগুলোই হবে তাদের কবর।'

শিক্ষা ও সামাজিক তৎপরতায় নারীদের অংশগ্রহণ

কবি মারুফ আর-রূসাফির কাব্যদর্শনের একটি আলোকিত দিক হল তিনি ছিলেন নারী শিক্ষার পক্ষপাতী, পথপ্রদর্শক ও উৎসাহদাতা। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি জাতির অর্ধাংশ নারীদেরকে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে কোনো জাতি উন্নতি ও অগ্রগতির সুউচ্চ শিখরে আরোহন করতে পারে না। পুরুষদের মত নারীদের মেধা, সৃজনশীলতা ও কর্মক্ষমতাও এক প্রকারের অমূল্য সম্পদ। সুতরাং তাদেরকে শিক্ষা, গবেষণা ও দক্ষতা অর্জন থেকে দূরে রেখে তাদের কর্মক্ষমতাকে বিনষ্ট করা এই মূল্যবান সম্পদের অপচয়। ধর্মীয় জড়াবদ্ধতা ও গোঁড়ামির কারণে নারীদের শিক্ষাদীক্ষা থেকে দূরে রেখে তাদের যে দুরবস্থা ও শোচনীয় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তিনি তা অবলোকন করে ভীষণভাবে ব্যথিত হতেন। কেননা নারীরা ছিল একটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই জাতীয় জীবনে উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে নারীদের যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদান, দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের নিরাপদ অংশগ্রহণের জোরালো আহ্বান জানান তিনি। তিনি পূর্বের মহিয়সী মুসলিম রমণীদের কথাও তাঁর কবিতায় তুলে ধরেন, যারা জ্ঞানের জগতকে আলোকিত করার পাশাপাশি রণক্ষেত্রেও পুরুষযোদ্ধাদের সহযোগিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। নারীদের শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখাকে তিনি জাহেলি যুগের কন্যা সন্তানদের জীবন্তপ্রোথিত প্রথার চেয়েও ভয়ংকর হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কবির ভাষায়-

أليس العلم في الأسلام فرضاً * على أبنائه وعلى البنات

وكانت أمنا في العلم بحرا * تحل لسائليها المشكلات

لئن وأدوا البنات فقد قبرنا* جميع نسائنا قبل الممات

حجبناهن عن طلب العمالي* فعشن بجهلهن مهتكات[২৬]

'ইসলামে পুত্র ও কন্যা সন্তান উভয়ের উপর-ই কী জ্ঞান অর্জন আবশ্যক নয়? অতীতে আমাদের মায়েরা তো গভীর জ্ঞান ও বুৎপত্তি অর্জন করতেন এবং প্রশ্নকারীদের সমস্যার সমাধান দিতেন। তারা (জাহেলি যুগের কাপুরুষরা) তাদের কন্যাদেরকে (লোকলজ্জার ভয়ে) জীবন্ত করব দিতো। এখন আমরাও আমাদের রমণীদের (শিক্ষার আলো থেকে দূরে রেখে) মৃত্যুর পূর্বেই কবর দিয়ে দিচ্ছি। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে আরোহন করতে আমরা তাদেরকে বারণ করছি, ফলে তারা অজ্ঞতা ও অদক্ষতার কারণে কর্মহীন অবস্থায় লাঞ্ছনার জীবনযাপন করছে।'

কবির রাজনৈতিক দর্শন

রুসাফি ছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর কবিতার একটি বিশাল অংশ জুড়ে রাজনীতির নানা বিষয় উঠে এসেছে। তাঁর কবিতার অগ্নিঝরা শব্দাবলি ইরাকের রাজনৈতিক অবস্থাকে সার্থকভাবে চিত্রিত করেছে। পাশাপাশি সমগ্র আরববিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার পট-পরিক্রমাও স্থান পেয়েছে তাঁর সুবিস্তৃত কাব্যগাথায়। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষদর্শি কবি তাঁর কাব্যশক্তির পুরোটাই দেশীয় রাজনীতির পট পরিবর্তন ও গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে নিয়োগ করেন। ফলে তাঁর কাব্যভাষা অনেকাংশে বিপ্লবাত্মক ও বিদ্রোহী রূপ পরিগ্রহ করে এবং ইরাকের রাজনীতির বিচিত্র অনুষঙ্গকে ধারণ করে। তিনি কবিতার ভাষায় উপনিবেশবাদী বৃটিশ ও তাদের পুতুল সরকারের মুখোশ উন্মোচন করেন। সাধারণ জনগণকে অত্যাচারী বৃটিশদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক দেন। ঘুমন্ত ইরাকি জাতিকে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, বাক স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষায় উজ্জীবিত করেন। এই অনবদ্য ভূমিকা তাঁকে একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। পরবর্তীতে তিনি জনমানুষের একনিষ্ঠ মুখপাত্র ও রাজনৈতিক ভাষ্যকারে পরিণত হন। স্বৈরাচারী দুঃশাসনের ফলে স্বাধীন দেশের জাতীয় পতাকা যে স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব করে না, তাও তিনি তুলে ধরেন । কবির ভাষায়-

عَلَم ودستور ومجلس أمة * كل عن المعنى الصحيح محرف

مَن يقرأ الدستور يعلمْ أنه وَفقاً * لصكّ الانتداب مصنَّف[২৭]

'পতাকা, সংবিধান ও জাতীয় পরিষদ এখন নিসক শব্দ বৈ কিছু নয়। এগুলো তাদের প্রকৃত অর্থ থেকে বিচ্যুত। সংবিধানের পাঠক মাত্রই জানে যে, এর ধারাগুলো দাসত্ব ও গোলামীর চুক্তি অনুযায়ী লিখিত।'

ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে নিদ্রামগ্ন ইরাকের অধিবাসীদের সতর্ক করেন। জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আহ্বান জানান। স্বজাতির ব্যাপারে সকল প্রকার দ্বিধা ও সংশয় পরিহার করে দেশমাতৃকায় সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করে দেশের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করেন। কবির ভাষায়-

فما بالنا نستقبل الضيم بالرضا * و نعنو لحكم الجائرين ونخضع

نهوضا الى عز الصراع بعزمة * تخر لمرماها الطغاة و تركع[২৮]

'আমরা কেন হাসিমুখে জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়-অবিচার মেনে নিচ্ছি? আমরা কেন অত্যাচারী-জালেমদের দুঃশাসনের কাছে মস্তক অবনমিত করছি? আত্মসম্মান ও সুউঁচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শির উঁচু করে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াও। তাহলে দেখবে সকল অত্যাচারী-জালেমরা লজ্জিত হয়ে অবনত মস্তকে পালিয়ে যাবে।'

ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবি

মানবসৃষ্ট সংকট মাঝে সবচেয়ে ভয়াবহ হল ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি। যা একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অস্থীতিশীল করে তোলে; পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দবোধ বিনষ্ট করে; ভবিষৎ প্রজন্মকে এক অনিশ্চিত ও

অনিরাপদ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। তৎকালীন আরবসমাজে বিশেষত ইরাকে ধর্মের নামে এমন কিছু বিষয়ের আভির্ভাব ঘটে যা তাদের পশ্চাদপদতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশ্ব প্রতিযোগিতার মঞ্চে তাদেরকে পিছনে ফেলে দেয়। ধর্মের নামে একপক্ষের অন্ধবিশ্বাস, অপর পক্ষের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং অন্য এক পক্ষের ধর্মবিমুখতা একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রের ভীত নড়বড়ে করে দেয়। রুসাফি এ বিষয়টি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তিনি ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি ও এক পেশে নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের পক্ষে জোরালো আহ্বান জানান। চিন্তাধারা ও মনোভাবের ক্ষেত্রে তিনি সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধ রীতিনীতি পরিহার করে সঠিক ইসলামের অনুসরণে স্বজাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন।

ধার্মিকতা ও ধর্মান্ধতা এক বিষয় নয়। বরং এ দুটির অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। কল্যাণকামিতাই হল দীন। সুতরাং ধার্মিকতা মানুষের কল্যাণে কাজ করতে শেখায়। মানুষকে মানবিক গুণ সম্পন্ন করে। চিন্তাধারার ক্ষেত্রে উদার হতে শেখায়। পরোপকারী ও অন্যের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে ধর্মান্ধতা মানুষের মনে কপটতা, সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাভাবনার জগতকে কদর্য ও কলুষিত করে। ফলে ধর্মান্ধ ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিপদজনক ও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। তাই কবি ধর্মান্ধতা, দীনের নামে বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি পরিহার করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় বিচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন-

وخلوا جمود العقل فى أمر دينكم فإن جمود العقل للدين مفسد[২৯]

فمن قام باسم الدين يدعو مفرقا فدعواه فى أصل الديانة بهتان[৩০]

‘তোমরা তোমাদের ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাপারে জ্ঞানের জড়তা ও বুদ্ধির স্থবিরতাকে পরিহার কর। কেননা ধর্মের ক্ষেত্রে জ্ঞানের জড়তা ও বুদ্ধির স্থবিরতা ক্ষতি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। আর যে ব্যক্তির ধর্মের নামে বিভাজন ও বিভেদের আহ্বান জানায়, প্রকারান্তরে তার এ আহ্বান জঘন্য মিথ্যাচার বৈ কিছু নয়।’

উপসংহার

আধুনিক আরবি সাহিত্যের যুগস্রষ্টা কবি মারুফ আর-রুসাফি ইরাকিদের মুক্তিরদূত ও আলোর পথ প্রদর্শক হিসেবে এক ধ্রুবতারার ন্যায় আভির্ভূত হন। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও অন্যায় জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কলম হাতে তুলে নিয়ে নিদ্রামগ্ন জাতিকে সোচ্চার ও সতর্ক করেন। কবিতার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য জোরালো আহ্বান জানান। জাতীয় জীবনের বাস্তবতা, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সমাজ সংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামি, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও অবহেলিত নিম্নবিত্ত শ্রেণির কথাও বাস্তবনিষ্ঠভাবে উঠে আসে তাঁর কাব্যের সুরঝংকারে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি আর-রুসাফির চিন্তার স্বাতন্ত্র্য, বিষয়ের বিচিত্র বিন্যাস, নিজস্ব নির্মাণ কৌশল, বহুমাত্রিক চরিত্রের উপস্থাপন, ভাষারীতি, শব্দচয়ন-শব্দসৃজন, রূপক-উপমা ও চিত্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ আধুনিক আরবি কাব্য-সাহিত্যে যোগ করে ভিন্নমাত্রা। সর্বোপরি তাঁর এই তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পকর্ম ও অনবদ্য কাব্যসম্ভার আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে রূপান্তরিত হয়। যা কাব্যপ্রেমিদের অন্তরকে আলোকিত করবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

তথ্যনির্দেশ

১ মুহিউদ্দিন আল-খইয়্যাত, *মুকাদ্দামাতু দিওয়ানির রুসাফি* (বৈরূত: মাকতাবাতু আহলিয়্যাহ, ১৯১০ খ্রি.), পৃ. ১।

২ আব্দুল মান্নান খান, *মারুফ আর-রুসাফি ওয়া তাসিরুল কুরআনিল কারিম ফি শি‘রিহি*, *আল-মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: সংখ্যা-২, জুন ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৫৭।

৩ ইউসুফ ইজ্জুদ্দিন, *ফিল আদাবিল আরবি আল-হাদিস* (কায়রো: আল-হাইয়্যাতুল মিশরিয়্যা, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৬৯।

৪ হান্না আল-ফাখুরি, *আল-জামি‘উ ফি তারীখিল আদাবিল আরাবি*, খণ্ড ২ (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৮৬।

৫ ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবি কাব্যের ইতিহাস*, খণ্ড ১ (চট্টগ্রাম: আল-‘আকিব প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২১৬।

৬ সালমা খুদরি জয়ূসী, *আল-ইত্তিজাহাতু ওয়া হারকাতু ফিশ শি‘রিল আরাবিল হাদিস*, পৃ. ১৮৯।

৭ আহমাদ কাব্বিশ, *তারিখুশ শি‘রুল আরাবিল হাদিস* (বৈরুত: দারুল জীল, তাবি.), পৃ. ৪০০।

---

৮ *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, খণ্ড ১, পৃ. ২১৭।
৯ রুফাইল বাত্তি, *আল-আদবুল আসরি ফিল ইরাকিল আরাবি*, খণ্ড ১ (বাগদাদঃ প্রকাশনীর নামবিহীন, ১৯২১ খ্রি.), পৃ. ৭২।
১০ *তদেব।*
১১ *আল-জামি'উ ফি তারীখিল আদাবিল আরাবি*, *প্রাগুক্ত*, খণ্ড ২, পৃ. ৪৮৬।
১২ *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭।
১৩ *তারিখুশ শি'রুল আরাবিল হাদিস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০০।
১৪ *মারুফ আর-রুসাফি ওয়া তাসিরুল কুরআনিল কারিম ফি শি'রিহি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।
১৫ *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪।
১৬ *ফিল আদাবিল আরবি আল-হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
১৭ মুস্তফা আশ-শাকা, *দিওয়ানু মারুফ আর-রুসাফি*, খণ্ড ৪ (মিশরঃ মাকতাবাতু দারুল ফিকর, তাবি.), পৃ. ১৩।
১৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০১।
১৯ *তারিখুশ শি'রুল আরাবিল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০।
২০ *দিওয়ানু মারুফ আর-রুসাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
২১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১।
২২ সূরা আল-মায়িদা, আয়াতঃ ৭৯।
২৩ *দিওয়ানু মারুফ আর-রুসাফি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১।
২৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।
২৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।
২৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।
২৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬১।
২৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।
২৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।
৩০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

প্রাচীন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা
(The Concept of God in Ancient Religions)

Dr. F M A H Taqui*

Abstract: People have been involved in some form of religion or other since the dawn of human civilization. From that primitive age to the modern age there are no religions or rites where Gods or Goddesses do not exist. In the ancient civilization, many deities existed in religions and religious rites. Looking at the Stone Age, Babylonian, Sumerian, Assyrian, Canaanite, Persian, Ancient Egyptian, Ancient Greek and Roman rites, and African and American rites, one finds the presence of numerous Gods and Goddesses. Basically their religions were polytheistic. Patterns of different religions and cultures found in ancient civilizations show that they were nature-worshipers. Efforts of ancient mankind seemed to satisfy the deities, which seemed to them of utmost importance in the course of human life. The sun, moon, planets, stars and fire were worshipped as sources of light. In some places God had been thought of as a symbol of the power of fertility. Clouds, rain and sun were considered as Gods to help human beings in agricultural work. Special objects that seemed to their knowledge insurmountable and mysterious, such as rocks, mountains, rivers, etc., were imagined as deities. Somewhere the deity was the reservoir of human qualities. The Gods appeared in the world with anthropomorphic qualities and merged freely with the people to establish the lineage of the Gods. Elsewhere, rulers and Gods had become one and the same. In some places the God or deity was the symbol of justice, and the preventer of injustice and oppression; Mitra is an example. Worship, offering, oblation and sacrifice had been made to the innumerable natural objects as Gods and Goddesses considering them as doers of good and evil deeds. This article contains a detailed discussion of all the above issues.

ভূমিকা

ঐতিহাসিকদের নিকট প্রাচীন যুগের সীমা-রেখা যেমন অনির্ধারিত তেমনি সেযুগের ধর্মের প্রকার, প্রকৃতিও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই মহাসমুদ্র মন্থন করে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা উপস্থাপন করা বাংলা ভাষায় এটি প্রথম প্রয়াস বলে মনে করি। প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে ধাতব যুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতায় যে সব ধর্মাচারের সন্ধান পাওয়া যায় তার উল্লেখযোগ্য ধর্মাচারে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা বক্ষমান নিবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. প্রাকৃতিক ঈশ্বর

এই বিশ্বজগৎ-প্রকৃতি অসংখ্য উপাদানের অনবদ্য সমন্বিত রূপ এবং এই উপাদানসমূহ মানব সমাজের জীবন প্রবাহে বিচিত্র প্রভাবের দাবীদার। সব উপাদান সমান গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কিছু কিছু উপকরণ সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। যেমন সূর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক যা পৃথিবীকে আলো দেয়। চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী রাতের অন্ধকারে প্রদীপ স্বরূপ মানুষকে দিশা দেয়। পাহাড় মানুষকে আশ্রয় দেয়, নদী জল দেয়, আগুণ তাপ দেয়, বায়ু পৃথিবীকে শীতল রাখে। এই প্রাকৃতিক বস্তুগুলো মানুষকে কোন না কোন ভাবে উপকার সাধন করে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভক্তিবশত: মানুষ এসব প্রাকৃতিক উপাদানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং অতি শ্রদ্ধাবশত: তাদেরকে ঈশ্বর রূপে কল্পনা করে।

সুমেরিন ধর্মে 'শামাস' সূর্যদেবতা। এই দেবতা মানবকল্যাণে উত্তাপ ও আলোর ব্যবস্থা করে থাকে। আবার ইচ্ছা করলে কঠিন তাপদাহে পুড়ে ফেলতে পারে।[১] ব্যবিলনীয় ও এ্যাসিরিয়ান ধর্মাচারেও সূর্যদেবতার নাম

* Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh.

'শামাস'। মিসরীয় ধর্মাচারে সূর্য দেবতা 'আমুন রা'। এ দেবতার শক্তিময় আলোতে বিশ্ব জগৎ হয় আলোকিত এবং ভূ-পৃষ্ঠে শস্য উৎপন্ন হয়। সে প্রতিদিন পূর্বাঞ্চলে অন্ধকার দুরিভূত করে স্বর্ণময় জ্যোতি নিয়ে আসে। তার চোখ থেকে আলোক রশ্মির জন্ম হয়।[২] গ্রিক ধর্মাচারে সূর্যদেবতা 'আবুল্লু' রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্যদানকারী সত্য ও জ্যোতির ঈশ্বর।[৩] কেলটস ধর্মাচারে Belenos সূর্যদেবতার দিকে মুখ করে ঊষাকালে সূর্য রশ্মিকে চম্বুন করে।[৪] আজটেক ধর্মচারে সূর্যদেবতার নাম 'টোনাইটু'। মিসরীয় ধর্মাচারে প্রাকৃতিক শক্তির উৎস হিসেবে চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজীর পুজা করা হত। দক্ষিণ আমেরিকার ইনকারা সূর্যদেবতা ইন্তি, চন্দ্রদেবতা মামকিয়া এবং ছায়াপথ লামার আরাধানা করত।[৫] সুমেরিন ধর্মে চন্দ্রদেবতা 'নানা'; ব্যবিলনীয় ধর্মে 'সীন'; মায়া ধর্ম সংস্কৃতিতে চন্দ্র দেবতার নাম 'এক্সবেল'।[৬]

ব্যবিলনীয় ধর্মাচারে নভমণ্ডলের দেবতা 'অনু' (Anu), সমুদ্র বা পানির দেবতা 'ইয়া' (Ea) এবং বায়ুমণ্ডলের দেবতা 'এ্যানিল'। সূর্যদেবতা 'শামাস' ও চন্দ্রদেবতা 'সীন'। সমতল ভূমির তথা ধরিত্রীর দেবতা 'ইশতার'।[৭] রোমান ধর্মাচারে আকাশ দেবতা মহান জুপিটার (Jupiter) রাষ্ট্রের অভিভাবক; তার স্ত্রী জুনো (Juno) মাতৃত্বের দেবী; মার্স (Mars) যুদ্ধ দেবতা; ভেনাস (Venus) প্রেম দেবতা; নেপচুন (Neptunus) সাগর দেবতা; সার্টান (Sertenus) ফসলের দেবতা; প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্র ও প্রকৃতিক দেবতা পরিলক্ষিত হয়।[৮]

প্রাচীন পারস্যে মাজুসী ধর্মে অগ্নিকে ঈশ্বর জ্ঞানে পুজা করা হত। আগুণ সব কিছু পুড়ে ধ্বংস করে দেয়, আবার অন্ধকার দুরীভূত করে। আগুণে পুড়ে স্বর্ণ খাঁটি হয়। সকল অনাচার ও পাপাচার অন্ধকারের প্রতীক পক্ষান্তরে যাবতীয় মঙ্গল ও কল্যাণ আলোর প্রতিরূপ। যরথুস্ত্রের মতে, আগুণ অত্যন্ত পবিত্র, তবে ঈশ্বর নয়। বরং আহুরা মাযদা মঙ্গলের ঈশ্বর এবং আহরিমান অকল্যাণের স্রষ্টা। আহুরা মাযদা একমাত্র সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক, স্বয়ং জ্ঞানী বিশ্বপ্রভূ একেশ্বর।[৯]

২. কৃষি কাজের সহায়ক ঈশ্বর

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় সুমেরীন জাতির বাস। এ অঞ্চলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা বা খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ লেগেই থাকত। এই প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা কাল্পনিক মূর্তি তৈরী করে কিংবা মাটির ফলক অথবা পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য দেব-দেবীর ছবি অংকন করত। তাদের ধারণা এসব দেব-দেবীকে তুষ্ট রাখতে পারলে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।[১০] স্বর্গের দেবতা 'অনু' (Anu) হল দেবতাদের পিতা এবং ভূপৃষ্টের দেবী ইন্নীর স্বামী হওয়ার সুবাদে সে আসমান ও জমিনের অধিপতি দেবতা। তারই কতৃত্বে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে উদ্ভিদ ও ফসল জন্মায়। উর অঞ্চলে এ দেবতা বিশেষভাবে বরণীয় ও পুজনীয়।[১১] কেনানাইট ধর্মচারে উর্বরতার সাথে মেঘ ও বৃষ্টি বিজড়িত বিধায় তাদের নিকট মেঘ পরিচালক তথা আকাশ নিয়ন্ত্রক দেবতা এবং উর্বরতার দেবতা হিসেবে 'বাল' পরম পুজনীয়।[১২]

গ্রীক ধর্মাচারে 'ডেমিটার' উদ্ভিদ ও শস্য দেবী এবং জগৎমাতৃকার উর্বরতার দেবী।[১৩] রোমান ধর্মাচারে পৃথ্বীরাজ 'টেলাস মেটার' মূখ্য ঈশ্বর। সে ভূ-পৃষ্ঠের ঈশ্বর হলেও কৃষিকাজের ঈশ্বর হল Saturme, Pomona, Ceres ও Pales।[১৪] কেলটস ধর্মাচারে 'Cernunos' উর্বরতার দেবতা; Sucellos বজ্র, বিদ্যু ও আতিথিয়তার দেবতা; Esus উর্বরতার দেবী।[১৫] মায়ান ধর্ম সংস্কৃতিতে অর্থনীতি কৃষিকেন্দ্রিক হওয়ায় বনের দেবতা, বৃষ্টির দেবতা, সমতল ভূমির দেবতা, উর্বরতার দেবতা এবং পশুর দেবতা ছিল।[১৬]

৩. রহস্যময় শক্তিদেবতা

রোমান ধর্মাচারে নির্দিষ্ট পারিবারিক দেব-দেবী ছিল। প্রত্যেক বাড়ীর ছিল রক্ষাকারী আত্মা Janus। তারা দেবতাদেরকে অংশত মানবাত্মার অধিকারী দূর্জ্ঞেয় প্রেতাত্মারূপে গ্রহণ করত। তাদের ধারণায় প্রত্যেক বস্তুর আত্মা আছে, তাদের নিকট পবিত্র বস্তুও দেবতার আসনে সমাসীন।[১৭]

পলেনেশিয়া, ওসেনিয়া ও মেলানেশিয়া দ্বীপাঞ্চলের ধর্ম সংস্কৃতিতে ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাদের ঈশ্বর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া না গেলেও তারা প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী ছিল। কোন কোন প্রেতাত্মা দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছিল।[১৮] আদীম সমাজে যাদু ও মানা শক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব দেবতার প্রতিনিধি কিংবা স্বয়ং দেবতা বিবেচিত হত। যাদুকর যাদুর প্রদর্শনের মাধ্যমে সমাজে নিজেকে কর্তৃত্বের অধিকারী বলে জাহির

করে। কখনও কখনও সমাজে কর্তৃত্ব করতে গিয়ে নিজেকে ঐশীব্যক্তিত্ব বা ঈশ্বর বলে আনুগত্য দাবী করে। অথবা জন সাধারণ তাকে ঈশ্বরত্বে বরণ করে।[১৯] মেলানেশিয়ান অঞ্চলে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে মানা শক্তি ভর করলে ঐ ব্যক্তি বা বস্তু রহস্যময় শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। রহস্যময় মানা শক্তির অধিকারী ব্যক্তি বা বস্তু ঈশ্বরের মর্যাদায় উন্নীত হয়।[২০] অনুরূপভাবে সেমিটিক জাতির লোকেরা গোত্রবদ্ধ জীবন যাপন করত। তাদের বিশ্বাস প্রত্যেক গোত্রের উৎপত্তি হয়েছে কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে যাকে টোটেম বলা হয়েছে। এই টোটেম গোত্রীয় পিতা হিসেবে বিবেচিত হলেও ক্রমান্নয় এই টোটেম দেবতা বা ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত হয়।[২১] কোন কোন পাথর বা পাহাড় যখন যেখানে রহস্যময় বলে মনে হয়েছে তখনই সেখানে তাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ঈশ্বরের মর্যাদায়।

পারসিক ধর্মাচারে মিত্রা (Mithra) ছিল সকল সৃষ্টির জনক ও রাজাদের দেবতা। অন্যায়, জুলুম ও নির্যাতনের বিপক্ষে মিত্রা অতীব শক্তিধর ঈশ্বর। রাজারা রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের প্রতি ন্যায়বিচারের প্রতীক মিত্রাকে সাক্ষী রেখে শপথ গ্রহণ করত এবং তার সন্তুষ্টির জন্য ষাঁড় বলি দিত। ভারতীয় আর্যদের মধ্যে মিত্রাইজমের প্রসার ঘটে। গ্রীস ও রোমেও মিত্রাকে ঈশ্বর রূপ আরাধনা করা হত।[২২] হিন্দু ধর্মেও অনেক ঈশ্বর বা দেব-দেবী রয়েছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা ও শিব সংহারকর্তা এই তিন জন হল সব চেয়ে শক্তিধর মহা-ত্রিদেবতা।

৪. কাল্পনিক ঈশ্বর

প্রাচীন ধর্মাচারে প্রায় সকল ঈশ্বরই কাল্পনিক। তারা কল্প কাহিনীতে (Mythology) বিশ্বাসী ছিল। কবি হেসিয়ড (৭৫০-৭৮০ খ্রী. পূ:) দেববৃত্তান্তে (Theogony) অনেক দেব-দেবীর বংশানুক্রম বর্ণনা করেছেন। দেবতারা মানুষের ন্যায়; কিন্তু তারা জগৎসমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত। তারা মানুষের মতই গুণাবলীর ধারক হলেও মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে। তবে তারা অমর। মানুষ ও দেব-দেবীর সংমিশ্রনে দেবংশধারা বিস্তার লাভ করে। গ্রীকরা দেবতাদের বংশধর। স্রষ্টা প্রমিথিওয়াস (Prometheus) এর পুত্র ও পুত্রবধু গ্রীকদের পূর্ব পুরুষ। গ্রীকরা প্রতিটি সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টা কল্পনা করত।[২৩]

দেববৃত্তান্তে বর্ণিত আছে, স্বর্গদেবতা ইউরেনাস ও ধরিত্রীর দেবী গিয়ার (Gaea) বার জন সন্তান টাইটান নামে অভিহিত ছিল। এরা প্রত্যেকেই এক এক জন দেবতা ছিল। ঐ সময় টাইটানদের শাসন বলবৎ ছিল। ইউরেনাস স্ত্রী গিয়াকে তার সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখায় গিয়া টাইটানদের সাহায্য কামনা করে। কনিষ্ঠতম পুত্র করোনাস (Coronus) সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে এবং সংঘর্ষে ইউরেনাসের অন্তকোষ ছিঁড়ে যায়। সেই রক্ত গিয়ার দেহে পড়ে পরী ও উপদেবতাদের সৃষ্টি হয়। করোনাস হয় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বর।[২৪]

করোনাসের পুত্র জিয়াস (Zeus) পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজেকে ঈশ্বদের ঈশ্বর বলে ঘোষণা দেয়। সে স্বর্গের দেবতা মাউন্ট অলিম্পাস পবর্তশৃঙ্গে অবস্থান করে। বিদ্যুৎ ও বজ্রালোকের মধ্য দিয়ে সে আবির্ভূত হয়। দেবতারা এখান থেকে মানবীয় কার্য পরিচালনা করে।[২৫] জিয়াসের স্ত্রী হেরা (Hera) স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনের দেবী। জিয়াসের কন্যা এ্যাফোরডাইট (Aphordite) প্রেমদেবী, সে গোপনে ঈশ্বর এরেসের (Ares) সঙ্গে প্রণয়সূত্রে অবদ্ধ হয়ে অনেক সন্তানের জন্ম দেয়।[২৬] জিয়াসের পুত্র হারমেস (Hermes) গান বাজনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও হাট-বাজারের ঈশ্বর। সে দেবতাদের দূত এবং নরকের আত্মাসমূহের পরিচালক। জিয়াসের কন্যা কুমারী ইরতামিশ বন্যা ও বন্য প্রাণীদের ঈশ্বর। জিয়াসের পুত্র হিফাসতাস (Hefastes) নরকের দেবতা, তবে শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক।[২৭]

মিসরীয় কিংবদন্তীতে (Mythology) উল্লেখ আছে, ওসিরিস প্রথম মানুষের কল্যাণকামী রাজা যার মধ্যে ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান ছিল। মিসরীয়দেরকে সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষিকাজ শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ভগ্নি ইসিসের সহযোগিতায়। অবশ্য Osiris ও Isis পরিনয় সূত্রে অবদ্ধ হয়েছিল।[২৮]

ওসিরিসের জনপ্রিয়তায় ভ্রাতা সেট তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং লাশ টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। ইসিস স্বামীর বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো সংগ্রহ করে জোড়া দিয়ে পুনরায় জীবনদান করে। ওসিরিস পুনর্জন্মলাভ করে স্বাভাবিক জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে একটি সন্তানের জন্ম দেয় যার নাম হোরাস।

সে পরিণত বয়সে রাজক্ষমতায় বসে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ চাচা সেটকে হত্যা করে। এই কিংবদন্তীর মধ্য দিয়ে দেবতাদের মানবীয় রূপ ও প্রকৃতির স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। শরতকালে নীলনদের শুকিয়ে যাওয়া মৃত্যুতুল্য। অন্যদিকে বর্ষাকালে নদীর প্লাবন পুনর্জীবনকে স্মরণ করে দেয়। আবার সেটের হত্যা অশুভের বিরুদ্ধে শুভ শক্তির বিজয়।[২৯]

৫. মানবরূপী ঈশ্বর

সুমেরিয়দের ধর্মাচারে দেবতারা মানুষের মতই। তাদেরও রয়েছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা ও দৈহিক চাহিদা। পর্থক্যশুধু মানুষ মরণশীল, কিন্তু দেবতারা অমর। তাই দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য অর্ঘ্য, নৈবেদ্য, উপহার ও উৎস্বর্গ প্রয়োজন। দেবতাদেরকে তুষ্ট রাখতে পারলে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।[৩০] ব্যবিলনীয় ধর্মাচারে ধারণা করা হয়, দেবতারা বৃহৎ মানবাকৃতির এবং প্রচুর ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। তাদের অসংখ্য দেবতার মধ্যে প্রধান দেবতা ছিল মারদুক, সে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশ্ব পরিচালনা করে।[৩১]

মিসরীয় ধর্মাচারে ঈশ্বর এটেন (Aten) স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়ে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে। বায়ু দেবতা 'শূ' ও আগুনের দেবী 'টেকনেফ' পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে জন্ম দেয় ভূ-পৃষ্ঠের দেবতা 'জিব' ও আসমানের দেবী 'নূত'কে। জীব ও নূতের বৈবাহিক সূত্রে জন্ম গ্রহণ করে পুত্র 'ওসিরিস' ও 'সেট' এবং কন্যা 'ইসিস'। ওসিরিস ও ইসিসের বিয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় হোরাস। ওসিরিস ছিল মৃত্যু দেবতা, হোরাস ছিল আকাশ দেবতা এবং সেট ছিল অমঙ্গলের দেবতা।[৩২] এসব দেবতা যেমন দেব বংশ প্রতিষ্ঠা করেছে, তেমনি তারা মানুষ ও পশু পক্ষির সম্মিলিত অবয়বে নিজেদেরকে প্রকাশ করেছে। আকাশের দেবতা হোরাসের দেহ ছিল মানবাকৃতির; কিন্তু তার মস্তক ছিল ঈগল বা শকুন আকৃতির। পাতালের দেবতা অনু ছিল শৃগাল মুখাকৃতির; থথ দেবতা ছিল সারসের মস্তক বিশিষ্ট। গ্রীক কিংবদন্তীতেও দেবতারা মুনষ্য বংশধারা প্রতিষ্ঠা করেছে। রোমান ধর্মাচারেও দেবতারা মানুষের মতই একাধিক বিয়ে করে ও সন্তানাদির জন্ম দেয়। কেলটস (Celts) ধর্মাচারে কিছু দেব-দেবী আছে যাদের কিছু অংশ পশু আকৃতির এবং কিছু অংশ মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট।[৩৩]

৬. ঈশ্বর রাজ

এ্যাসিরিয়ান ধর্মাচারে দেবতা ও নৃপতি একাকার হয়ে যায়। নৃপতি নিজেকে দেবতার সরাসরি প্রতিনিধি ঘোষণা দিয়ে একই সঙ্গে শাসন কর্তৃত্ব ও ধর্ম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ব্যবিলনীয় প্রধান দেবতা মারদুক পুত্র নাবু (Nabu) শাসকদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দেখাশুনা করে। ফলে সে প্রশাসনিক দেবতা এবং সেই সঙ্গে হয়ে ওঠে প্রধান দেবতা, যদিও তাদের জাতীয় দেবতা 'আসুর'।[৩৪] মিসরীয় শাসকশ্রেণী নিজেদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য সূর্য দেবতা 'আমন-রে'-এর সন্তান হিসেবে নিজেদেরকে ঈশ্বররাজ ঘোষণা করে। প্রাচীন মিসরে ফারাওগণ ছিলেন ঈশ্বর।[৩৫] রোমান ধর্মে সম্রাট আগাষ্টাস নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেন এবং চতুর্দশ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল।

৭. একেশ্বর :

মিসরের রাজা চতুর্থ এমেনোফিস বহু ঈশ্বরের পরিবর্তে এক ঈশ্বর Aten-এর উপসনা চালু করেন এবং নিজের নাম পরিবর্তন করে Akhenaten (Aten is satisfied) রাখেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় Osiris ও Isis-এর উপাসনা ব্যাপকতা লাভ করে।[৩৬] আফ্রিকান ধর্ম সংস্কৃতিতে জান্দি ধর্মালম্বীরা মোবরী (Mobori) নামক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল।[৩৭] ভাগন ধর্ম সংস্কৃতিতে আম্মান (Amman) নামের এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা।[৩৮] কেনানাইট হিব্রুদের মাঝে 'জেহোভা' নামক একেশ্বরের ধারণা ছিল।[৩৯] 'জেহোভার' আরবী উচ্চারণ 'ইয়াহইয়া' (চিরঞ্জীব সত্তা)। মূসা (আ.) এই ইয়াহইয়া বা আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করেছেন।[৪০] যিনি অনাদি, অসীম, সর্ব শক্তিমান ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বর। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম এই ঐশী ধর্মগুলো একেশ্বর আল্লাহকে কেন্দ্র করেই প্রসার লাভ করেছে। হিন্দু ধর্মেও একেশ্বরের কথা আছে (এক অল্লম অদ্বিতীয়ম)। তবে তারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মহা-ত্রিবতা ছাড়াও আরও অনেক দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও বৌদ্ধ স্বয়ং ভগবান বা ঈশ্বর রূপে পুজিত হয়।

উপসংহার

মোটকথা কোথাও ঈশ্বরকে উর্বরতা শক্তির প্রতীক হিসেবে ধারণা করা হয়েছে, কোথাও কৃষি কাজের সহায়ক হিসেবে দেবতাকে কল্পনা করা হয়েছে। কোথাও শক্তির উৎস হিসেবে দেবতারা বরেণ্য হয়েছে। কোথাও দেবতা মানবরূপী গুণের আধার। আবার কোথাও ঈশ্বর ও শাসক একাকার হয়ে গেছে। তবে তারা প্রাকৃতিক বস্তুকে ঈশ্বর হিসেবে ধারণা করে পুজা, অর্ঘ্য, ও নৈবেদ্য নিবেদন করেছে। তারা ছিল বহু ঈশ্বরবাদী। হিব্রু জাতি জেহোভা নামক একেশ্বরে বিশ্বাসী ছিল। জেহোভার আরবী উচ্চারণ ইয়াহইয়া (চিরঞ্জীব সত্তা)। মূসা (আ:) এই ইয়াইয়া বা আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নবী রাসূলগণ অর্থাৎ আদম (আ:) হতে হযরত মুহাম্মদ (সা:) পর্যন্ত ঐশী ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ একই সাক্ষ্য বহন করে। কাজেই ঐশী ধর্মগুলো একেশ্বরবাদী এবং অনৈশী ধর্মগুলো বহু ঈশ্বরবাদী ও প্রকৃতি পুজারী। একেশ্বরবাদীদের মতে বহুঈশ্বরবাদীরা যে সব প্রাকৃতিক বস্তুকে দেব-দেবী বা ঈশ্বর রূপে গ্রহণ করেছে এগুলো সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই আল্লাহই চরম পরম, অনাদী, অসীম, সর্বশক্তিমান ও সর্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বর বা আল্লাহ। আল্লাহ এক না হয়ে একাধিক হলে জগতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

তথ্যনির্দেশ

১ আব্দুল হামিদ যায়েদ, *আশ্-শারকুল খালিদ* (বৈরুতঃ মু'আসসাসাতুর রাইয়্যান, তা.বি.), পৃ. ১৪৪; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *তুলনামূলক ধর্ম* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০২২ খ্রী.), পৃ. ৩৪৩।

২ হাবীব সাঈদ, *আদইয়ানুল আলম* (কায়রোঃ বুলাক প্রেস, তা.বি.), পৃ. ৩৮; *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৩২।

৩ *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৪৫।

৪ "At dawn, The Emperor Marched in Stately procession to the Holy Terracc, where the people prostrated themselves, resting upon their elbows, facing the sun and kissing the sunbeams in adoration of their god." Cf. J.E SWAIN, *A History of World Civilization* (New Delhi: Eurasia Publishing House (Pvt.), Ltd. 1997), p. 245.

৫ ড. মোঃ শাহজাহান কবির, *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি* (ঢাকাঃ দিক দিগন্ত, ২০০৯ খ্রী.), পৃ. ৩৭১।

৬ *আশ-শারকুল খালিদ*, পৃ. ১৪৪; *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৪৩,৩৩৮; হুসাইন তাওফীক, *দুরূসুন ফী তারীখিল আদইয়ান*, অনুবাদঃ আনওয়ার রূসাফী (তেহরানঃ আসীবান প্রেস, ১৩৮৮হি.), পৃ. ৪৩; *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, পৃ. ৩৬৭,৩৭১।

৭ *দুরূসুন ফী তারীখিল আদইয়ান*, পৃ. ৪৩; *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৩৮।

৮ *Man's Religion*, pp. 86-89; *বারান্দার, আল-মু'তাকাদ আদ-দীনিয়্যাহ লাদা আশ-শুউব* (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৯২; *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৪৭।

৯ John B. Noss, *Man's Religion* (New York: The Macmillan Compauy, 1958), p. 434; ড. আসআদ আস-সাহমারানী, *আল-যারাদিস্তাহ* (), পৃ. ৫০।

১০ *Man's Religion,* p. 60; Henry S. Lacas, *A Short History of Civilization* (New York: London: Mcgraw-Hiul Book Comany, INC, 1963), p. 68; ড. এ.এফ, এম. শামসুর রহমান, *প্রাচীন পৃথিবী* (জয়পুর হাটঃ যুগবাণী মুদ্রায়ণ অফসেট প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটারস, ২০০২ খ্রী.), পৃ. ১৫৩-১৫৪।

১১ ড. মুহাম্মদ আল-উরায়বী, *মাওসুয়াতুল আদইয়ানঃ আস-সামাবিয়্যাহ ওয়াল ওদাইয়্যাহ* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর আল-লুবনানী, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ২৫৫; *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৪২।

১২ *A Short History of Civilization*, pp. 97-98.

১৩ *Man's Religion*, p. 73; *A History of World Civilization*, p. 144.

১৪ *A History of World Civilization*, p. 182.

১৫ *Man's Religion*, p. 98.

১৬ *A History of World Civilization*, p. 240-241.

১৭ Ibid, p. 182; *Man's Religion*, p. 73; ড. সামীহ দাগীম, *মাওসুয়াতুল আদইয়ান*, পৃ. ২৫১।

১৮ বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি, পৃ. ৩৭৩।

১৯ ড. এফ.এম.এ.এইচ. তাকী, *ধর্মের ইতিহাস* (রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০১৮ খ্রী.), পৃ. ২৭।

২০ *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৬৮।

২১ John Middleton, *Studies in Social and Cultural Anthropology* (New York: Thoas Y Crowell Company, 1968), p. 30; *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৬০।

২২ "Mithra— A divine hero, a champion of the sun-god in the straggle against darkness—— was belived to have given life to the soil by slaying a sacred bull and allowing the blood to cover the earth." Cf. *A History of World Civilization*, p. 183; মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী, অনুবাদ: ড. মাজহার সিদ্দিকী, *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯১ খ্রী.), পৃ. ৪৭; *বিশ্বের ধম পরিচিতি*, পৃ. ৩৬১।

২৩ "Gods to them were glorified men, worldly, lustful and brawling. They were represented often as immoral, living and acting much the same as men, except that they were endowed with immortality." Cf. *A History of World Civilization*, p. 144; হাসান তাওফীক, *দুরূসুন ফী তারীখিল আদইয়ান*, পৃ. ৪২-৪৩।

২৪ *A History of World Civilization*, p. 143; *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, পৃ. ৩৫৪।

২৫ *A History of World Civilization*, p. 143-144; ড. সামীহ দাগীম, *মাওসুয়াতুল আদইয়ান*, পৃ. ২৪৮।

২৬ *মাওসুয়াতুল আদইয়ান*, পৃ. ২৪৮; "Daughter of Zeus by Dione." Cf. *Man's Religion,* p. 74.

২৭ *A History of World Civilization*, p. 88-89; "He led the spirits of the dead down to Hades." Cf. *Man's Religion,* pp. 73-74; *আদইয়ান ওয়া মু'তাকাদাতুল আরব কাবলাল ইসলাম*, পৃ. ২৫১-২৫২।

২৮ *Man's Religion,* p. 49.

২৯ *Man's Religion,* p. 50; ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন ও মো: আব্দুল কুদ্দুস সিকদার, *সভ্যতার ইতিহাস: প্রাচীন ও মধ্যযুগ* (ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রী.), পৃ. ১৪১-১৪২।

৩০ *Man's Religion,* p. 68; *প্রাচীন পৃথিবী*, পৃ. ১৫৩-১৫৪।

৩১ *A History of World Civilization*, pp. 75-76; *Man's Religion*, p. 61; *সভ্যতার ইতিহাস*, পৃ. ১৬১।

৩২ *A History of World Civilization*, p. 62; মুহাম্মদ আল-উরায়বী, *মাওসু'আতুল আদইয়ান*, পৃ. ১৪৮-১৫১; *সভ্যতার ইতিহাস*, পৃ. ১১১-১১২; *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৩৩।

৩৩ *Man's Religion*, p. 98; *ধর্মের ইতিহাস*, পৃ. ১০৫; *তুলনামূলক ধর্ম*, পৃ. ৩৩৪।

৩৪ *সভ্যতার ইতিহাস*, পৃ. ১৮০।

৩৫ *A History of World Civilization*, pp. 58,61; *Encyclopedia of Religion*, v-3, p. 184; মুহাম্মদ আল-উরায়বী, *মাওসূআতুল আদইয়ান*, পৃ. ১৪৮; *আদইয়ানুল আলম*, পৃ. ৩৮।

৩৬ *A short History of Civilization*, p. 58; *A History of World Civilization*, pp. 60-61.

৩৭ *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮; *ধর্মের ইতিহাস*, পৃ. ১২২।

৩৮ *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮; *ধর্মের ইতিহাস*, পৃ. ১২২।

৩৯ *The Holly Bible: Isaiah*, 7:20; *Man's Religion*, pp. 470-471; *তুলমানূলক ধর্ম*, পৃ. ৪৯৮-৪৯৯।

৪০ *A History of World Civilization*, pp. 88-89.

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম
(The Role of Islam in Establishing the Rights of Non-Muslims)

Dr. Mohammad Abdullah Al Mamun*

Abstract: Those who have not adopted the Islamic way of life, do not consider that Allah is the only lawgiver and do not accept the Prophet Muhammad (peace be upon him) as the last Prophet and Messenger of Allah, they are non-Muslims. There are four classes of non-Muslim citizens in an Islamic State. They are 1. Ahlus jimma, 2.Mu`ahad 3.Mustaman 4. Harbi.The Islamic State imposes certain types of taxes on non-Muslim citizens. 1.zijhiah 2. kharaj 3. `Ushur. By paying the mentioned taxes, they enjoy all the benefits of the citizens. They can trade as freely as the Muslim citizens can. However, traders who are forbidden in Islam but not forbidden in their religion can do business in their society secretly. In an Islamic society, one cannot do such business in public such as selling wine and pork. All Muslim and non-Muslim citizens are equal in the application of social penal code. Punishment for crimes such as theft, robbery, adultery etc. is the same for all citizens irrespective of Muslims and non-Muslims. Non-Muslims can enjoy security in establishing all religious rights. However, songs cannot be sung in front of any mosque during prayers. By abiding by the laws of the Islamic State and paying the prescribed taxes, non-Muslim citizens can enjoy all the benefits in personal, family, social, religious life as well as in politics, business, trade and justice.

ভূমিকা

ইসলাম একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। অমুসলিম নাগরিকগণ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পাশাপাশি জিযইয়া, খারাজ ও ব্যবসায়িক কর 'উশুর দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রের একজন সুনাগরিক হিসেবে সকল ধরনের নিরাপত্তা লাভ করে। যেমন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন, ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ, অমুসলিমদের ধর্মীয় বিষয়ে অনাকাংখিত মন্তব্য না করা, ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য না করা, পারিবারিক বিরোধ নিস্পত্তিতে নিজ নিজ ধর্মীয় আইনে বিচার ইত্যাদি। এজন্য অমুসলিম নাগরিকদের ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল হতে হয়। অমুসলিম নাগরিকের জন্য ইসলাম যে ইনসাফপূর্ণ ধর্মীয় অধিকার প্রদান করে সমাজের সকল নাগরিকের মাঝে সমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যেন পাঠক সমাজে এ বিষয়ে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর হয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠে।

অমুসলিম নাগরিকগণের শ্রেণী বিভাগ

অমুসলিম নাগরিকগণকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ

ক. আহলুয যিম্মা

الذمة শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হলো[১] الحرمة–الحق–الكفالة–الأمان–العهد যার অর্থ হলো অঙ্গিকার, নিরাপত্তা, দায়িত্বভার, সুরক্ষা, অধিকার, দায়িত্ব- কর্তব্য ইত্যাদি। এটি একবচন, যার বহুবচন হলো ذمم ইসলামের পার্থিব আইন-কানুন মেনে নেয়া এবং জিযইয়া আদায় করার শর্তে ইসলামী রাষ্ট্রে জান-মাল-'ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা ভোগকারী অমুসলিম নাগরিকদের আহলুয-যিম্মাহ বা যিম্মী বলা হয়।[২] মুহাম্মদ ইবন 'উসায়মাইন জিম্মির সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন,[৩] أهل الذمة هم الذين يخضعون لأحكام الإسلام، ويؤدون الجزية، 'ঐ সকল ব্যক্তিদের যিম্মি বলে যারা ইসলামের বিধানের প্রতি অনুগত হয়ে জিযইয়া প্রদান করছে।' যিম্মীরা হলো

* Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh.

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক। মুসলিমদের মতো তারাও রাষ্ট্রের সকল নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের জান-মাল-‘ইজ্জত-আব্রু ঠিক মুসলমানদের জান-মাল-‘ইজ্জত-আব্রুর মতই পবিত্র বিবেচিত হয়।[৪]

খ. মু‘আহাদ

معاهدة অর্থ চুক্তি, সন্ধি, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি।[৫] المعجم الوسيط অভিধানে معاهدة এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,[৬] ميثاق يكون بين اثنين أو جماعتين واتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم علاقات بينهما ‘দুজন ব্যক্তি অথবা দুটি দলের মাঝে চুক্তিবদ্ধ হওয়া অথবা দুটি রাষ্ট্র কিংবা অধিক সংখ্যক রাষ্ট্রের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করা।’ মু‘আহাদরা হলো, দারুল হারবের চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম[৭]। সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলিমদেরকে মু‘আহাদাহ বলা হয়[৮]। দুই বা ততোধিক দেশের মাঝে ব্যবসা-বানিজ্য কিংবা রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন ধরনের চুক্তিকেও মু‘আহাদাহ বলে।[৯]

গ.মুস্তা’মান

مستأمن অর্থ নিরাপত্তা, আশ্রিত। মুস্তা’মান হলো যে অমুসলিম সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা কোন মুসলিম নাগরিকের নিরাপত্তায় ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে। المعجم الوسيط অভিধানে مستأمن এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,[১০] أداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل فى نظير مقابل نقدى معلوم ‘নগদ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট শর্তে বা মেয়াদে কারো নিরাপত্তা প্রদানে সম্মত হওয়াকে مستأمن বলে।’ مستأمن এর সংজ্ঞায় فقه السنة গ্রন্থে বলা হয়েছে,[১১] ‘মুস্তা’মিন হচ্ছে সে অমুসলিম, যে মুসলিম শাসিত অঞ্চলে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে প্রবেশ করে, সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা কিংবা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবস্থান করার ইচ্ছেয় নয়; বরং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত থাকার ইচ্ছা পোষণ করে, যা এক বছরের অধিক নয়।’

ঘ. হারবীঃ হারবী হলো দারুল হারবের অমুসলিম নাগরিক। উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বাইরে যে সকল অমুসলিম রয়েছে তাদেরকে হারবী তথা ইসলামী রাষ্ট্রে শত্রুরূপে গণ্য করা হয়। তাদের জান-মাল-‘ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে কোন হারবী প্রবেশ করতে চাইলে রাষ্ট্র প্রধান বা তার প্রতিনিধির অনুমতি নেয়া আবশ্যক। অনুমতি ছাড়া কোন হারবী ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে তাকে দারুল হরবের গুপ্তচর হিসেবে গণ্য করা হবে।[১২]

অমুসলিমদের উপর আরোপিত বিশেষ করসমূহ

ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের যে দায়ভার গ্রহণ করে এবং তারা রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে, এর বিনিময় হিসেবে তাদের উপর বিশেষ কতিপয় কর আরোপ করা হবে। নিম্নে তা বিদৃত হলো-

ক. জিযইয়া

جزية শব্দটি الجزية শব্দ থেকে আহরণ করা হয়েছে। এর মূল অর্থ হলো বিনিময়, প্রতিদান, ভূমিকর ইত্যাদি। শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো جزاء [১৩] المعجم الوسيط অভিধানে جزية এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,[১৪] الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة ‘যিম্মীদের নিকট থেকে যে সম্পদ গ্রহণ করা হয় তাকেই جزية বলা হয়।’ সূতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপদে বসবাস এবং জান-মাল-‘ইজ্জত ও আব্রুর নিরাপত্তা লাভের বিনিময় হিসেবে তাদের উপর আরোপিত নির্দিষ্ট পরিমাণ করকে جزية বলে।[১৫] মূলত জিযইয়া হচ্ছে নিরাপত্তামূলক সামরিক কর। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই মুসলিম নাগরিকদের সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা ছিল আবশ্যক। অমুসলিমদের সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে রেহাই দেয়া হতো, তাদেরকে যুদ্ধ করতে হতো না। তাই এ কর অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে কেবল যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন লোকদের নিকট হতে দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্তি দানের বিনিময় হিসেবে প্রতি বছর আদায় করার বিধান দেয়া হয়। যারা অমুসলিম তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদানে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,[১৬]

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও শেষ বিচার বিসসের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ ও রাসূল সা. যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ মনে করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নতি স্বীকার করে স্বেচ্ছায় জিযইয়া দেয়।'

খ. খারাজ

অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত দ্বিতীয় কর হলো খারাজ। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগকৃত জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করতে হয়, তাকেই খারাজ বলে। খারাজ ফার্সী শব্দ, আরবী ভাষায় বলা হয় طسق এই আরবী طسق কেই ইংরেজীতে Task কিংবা Tax বলা হয়।[১৭] মুসলিম নাগরিকগণ যেমন তাদের ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের 'উশর আদায় করে থাকে, তেমনি অমুসলিমদেরকেও তাদের ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের একটি নির্ধারিত পরিমাণ শস্য খারাজ হিসেবে আদায় করতে হবে।[১৮]

গ. 'উশূর

'উশূর শব্দটি 'উশর শব্দের বহুবচন।[১৯] এর আভিধানিক অর্থ একদশমাংশ। 'উশূর হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে অমুসলিমদের উপর আরোপিত বাণিজ্য কর। ফসলের যাকাত অর্থে শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও অমুসলিমদের ব্যবসায়িক পণ্যের উপর আরোপিত কর অর্থেও ব্যবহার হয়। মুসলিমদের উপর যেমন বছরে একবার তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করা আবশ্যক, তেমনি অমুসলিমদের উপরও বছরে একবার তাদের বাণিজ্য পণ্যের কর আদায় করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. বলেন,[২০] إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ 'উশূর কেবল ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আরোপিত হবে। মুসলিমদের উপর কোন 'উশূর নেই।'

অমুসলিমদের অধিকার

অমুসলিমরা জিযইয়া, খারাজ ও 'উশূর প্রদানের পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করায় তারা নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে তারা তাদের জান-মাল-'ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার পাশাপাশি ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সম-অধিকার লাভ করবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণ যে সব ধর্মীয় অধিকার লাভ করবে নিম্নে তা আলোকপাত করা হলো-

১. ধর্মীয় বিধান পালনের অধিকার

ইসলাম সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল অমুসলিম নাগরিক নিজ নিজ ধর্মের অনুষ্ঠানাদী স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। অমুসলিম নাগরিকদের নিজ এলাকায় যদি তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় থাকে তাহলে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ঢোক-ঢাল পিটিয়ে স্বীয় ধর্মের অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরী করবে না; বরং পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করবে। আর যদি মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায় অমুসলিমদের কোন ধর্মীয় উপাসনালয় থাকে তাহলে স্বীয় উপাসনালয়ে তাদের অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। তবে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রকাশ্যে ক্রুশ ও প্রতিমাবাহী শোভা যাত্রা বের করতে পারবে না।

মুসলিমরা যে সব কাজকে পাপ ও অপরাধ মনে করে অমুসলিমরা এ ধরনের কোন কাজকে তাদের ধর্মীয় বিবেচনায় বৈধ মনে করে নিজেস্ব পরিমন্ডলে সে কাজ করলে তাদের বাঁধা দেয়া যাবে না। যেমন মদ সেবন, শুকর পালন, শুকর ক্রয়-বিক্রয় ও তার গোস্ত ভক্ষণ, ক্রুশ বহন, শঙখ ধ্বনি বাজানো, রমযান মাসে দিনের বেলায় পানাহার ইত্যাদি। খলীফা হযরত 'উমর ইবন 'আব্দুল 'আযীয রহ. এ বিষয়ে হাসান বসরী রহ. এর কাছে ফতওয়া চাইলে তিনি বলেন,[২১] إِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ ؛ لِيُتْرَكُوا ، وَمَا يَعْتَقِدُونَ ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مُتَّبِعٌ وَلَسْتَ بِمُبْتَدِعٍ 'তারা জিযইয়া কর দিতে এজন্যই সম্মত হয়েছে যে, তারা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুযায়ী মুক্তভাবে থাকতে চেয়েছে। আপনার পূর্ববর্তীরা যা করে গেছেন আপনাকে কেবল তার অনুসরণ করতে হবে। আপনাকে

এ থেকে বিচ্যুত হতে হবে না অথবা নতুন কিছুও করতে হবে না।' অনুরূপভাবে অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু, পুরোহিত যারা আছে তাদের নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণ ও প্রচারে বাধা দেয়া যাবে না। হযরত 'উসামাহ রা. এর নেতৃত্বে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণের সময় খলীফা হযরত আবূ বকর রা. তাঁকে অমুসলিমদের বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো,[২২] وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له 'যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এরূপ অনেক লোকেরও সাক্ষাৎ হবে, যারা তাদের জীবনকে উপাসনালয়ের মধ্যে উৎসর্গ করেছে। তাদেরকে তোমরা তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিবে।' যিম্মীদের ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার ও নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় প্রচারণা চালানোর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মের ভালো দিকগুলো প্রচার করতে পারবে ; কিন্তু ইসলামের সমালোচনা বা অবমানোনাকর বক্তব্য-মন্তব্য উপস্থাপন করতে পারবে না।

২. ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণের অধিকার

অমুসলিমরা তাদের জনপদের মধ্যে পুরাতন উপাসনালয়ের সংরক্ষণ ও সংস্কারের পাশাপাশি নতুন উপাসনালয় তৈরী করতে পারবে। আর মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায় তাদের পুরাতন উপাসনালয় সংস্কার করতে পারবে; কিন্তু নতুনভাবে উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না। তবে যেটি শতভাগ মুসলিম জনপদ নয় সে সকল জনপদে অমুসলিমদের ধর্মীয় উপাসনালয় তৈরী করা যাবে। মুসলিমদের হাতে যে সব জনপদের পত্তন হয়েছে যেমন বাগদাদ, কুফা, বসরা ইত্যাদি সে সব নগরীতে অমুসলিমদেরকে মদ সেবন ও শুকর ক্রয়-বিক্রয় করার সুযোগ দেয়া যাবে না।[২৩] এ বিষয়ে ইবন 'আব্বাস রা. বলেন,[২৪] أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا صليب ولا سنان ولا ينفخ فيها ببوق ولا يضرب فيها بناقوس ولا يدخل فيها خمر ولا خنزير وما كانت من أرض صولحوا صلحا فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم 'যে সমস্ত শহর মুসলিমরা তৈরী করেছে, সেখানে যিম্মীদের উপাসনার জন্য নতুন কোন গির্জা, উপাসনালয়, অগ্নিকুন্ড ও ক্রুশ স্থাপন করা যাবে না এবং বাদ্য ও শঙখ ধ্বনি বাজাতে পারবে না, কোন মার্কেট বা রাস্তায় মদ বা শুকরের মাংস প্রকাশ্যে বিক্রি করতে পারবে না। তবে সমঝোতার ভিত্তিতে অর্জিত ভূখণ্ডে মুসলিমগণ তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত পুরোপুরি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।'

৩. ধর্মীয় বিষয়ে অনাকাংখিত সমালোচনা না করা

অমুসলিমরা যে সব সৃষ্টবস্তুর পুজা-আরোধনা করে সে সব বস্তুর সমালোচনা বা গাল-মন্দ করা যাবে না। অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন অনাকাংখিত কোন মন্তব্য করা থেকে মুসলমানদের বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরূপ মন্তব্য করা হলে তারাও আল্লাহ ও রাসূলে আকরামকে সা. নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে পারে। এর ফলে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হবে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মের ও জনগোষ্ঠির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে সকলকে এমন সহনশীল আচরণ করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২৫]

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

'আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যার আরোধনা করে তোমরা তাদের গালি দিওনা, তাহলে তারাও শত্রুতা করে অজ্ঞতাবশত: আল্লাহকে গালি দিবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের কাজকর্মকে সুভোশিত করে দিয়েছি।'

৪. ইসলাম গ্রহণে বাধ্য না করা

অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে কোন ধরনের চাপ প্রয়োগ করা যাবে না, তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২৬] لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 'দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।' অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২৭] وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 'আর তোমার রব যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীর বুকে যারা আছে তারা সবাই ঈমান গ্রহণ করতো, তুমি কি লোকদেরকে মুমিন

হতে বাধ্য করবে?' একই দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২৮] فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ () لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 'আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনাকে তাদের উপর দারোগাস্বরূপ পাঠানো হয়নি।' তবে তাদের কেউ ইসলামের সুমহান আদর্শ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানে ইসলামের উদারতা এবং কুরআন ও সুন্নাহর হেদায়াতের অমীয় বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে তাতে আপত্তি উত্থাপন করা কিংবা বাঁধা প্রদান করা যাবে না।

৫.পারিবারিক আইনে বিচারের অধিকার

অমুসলিমদের পারিবারিক কর্মকান্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের উপর ইসলামী বিধি-বিধান কার্যকর করা যাবে না। মুসলিমদের পারিবারিক জীবনে যে সব বিষয় অবৈধ, সে সব যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয়, তাহলে 'আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফয়সালা করবে। যেমন বিয়ের সময় সাক্ষী থাকা, মহর নির্ধারণ করা, তালাকের বিধি-নিষেধ, কোন নারী স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্ত হলে 'ইদ্দত পালন করা কালীন সময় পুনরায় বিয়ে না দেয়া, ইসলামী শরী'আতে বিয়ে নিষিদ্ধ এমন নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া ইত্যাদি। ইয়াহুদীদের নিজস্ব ঝগড়া-বিবাদ তাওরাতের বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করার জন্য কুরআনুল কারীমে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[২৯] وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'ইনজীল গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার অনুসারীরা যেন তদনুসারে বিচার-ফয়সালা করে। আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিচার করে না, তারা ফাসিক।'

কোন ক্ষেত্রে যদি বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী নিজেদের মাঝে বিদ্যমান বিরোধ নিষ্পত্তি করতে চান এবং ইসলামী 'আদালতে বিচার প্রার্থী হন তাহলে বিচারক ইসলামী আইন মোতাবেক ফয়সালা করে দিবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৩০]

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

'আর তারা যদি তোমার নিকট (কখনো কোন বিচার নিয়ে আসে, তাহলে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করে দিবে কিংবা তাদের উপেক্ষা কর। যদি তুমি তাদের উপেক্ষা কর, তাহলে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে যদি তুমি তাদের বিচার-ফয়সালা কর তাহলে অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়নদেরকে ভালোবাসেন।' তা ছাড়া পারিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিবাদে যদি এক পক্ষ মুসলিম হয়, তাহলে ইসলামী আইন অনুযায়ী তাদের মাঝে ফায়সালা করতে হবে। যেমন কোন খ্রিস্টান মহিলার স্বামী যদি মুসলিম হয় এবং সে মারা যায়, তাহলে এ মহিলাকে ইসলামী আইন অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে পুনরায় বিয়ে করার পূর্বে 'ইদ্দত পুরোপুরি পালন করতে হবে। উক্ত মহিলা খ্রিষ্টান হলেও স্বামী মুসলিম হওয়ায় এক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহর বিধান প্রযোজ্য হবে। তাই 'ইদ্দতের মাঝে বিয়ে করলে তা শুদ্ধ হবে না।[৩১]

উপসংহার

ইসলামী শরী'আহ অমুসলিম নাগরিকগণকে রাষ্ট্রের অতিথি হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। তাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ে তাদের কোন দায়িত্ব না দিয়ে নাগরিকের সকল ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। ধর্মীয় বিধানাবলী পালন, ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ, ধর্মীয় বিষয়ে অনাকাংখিত মন্তব্য না করা, ইসলাম গ্রহণে বাধ্য না করা, পারিবারিক বিরোধ নিরসনে নিজ নিজ ধর্মীয় আইনে বিচার পাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুলিম নাগরিকের মাঝে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দুই একটি পদ ছাড়া অন্যান্য পদে কর্মকর্তা হিসেবে তাদের নিয়োগ দেয়া যাবে। ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল অপরাধীদের উপর সমহারে দন্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন হেরফের না করায় তা শুধু মুসলমানদের ধর্ম নয় বরং মানবতার ধর্ম হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ মিশরের 'আরবী ভাষা একাডেমী, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত* (কায়রো: মাকতাবাতুশ শুরূক আদ-দাওলিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ: ২২৭।
২ ড. মহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *আল-মুনীর- আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ,২০১০ খ্রি.), পৃ: ৩৩৬।
৩ মুহাম্মদ ইবন সালিহ আল-'উসায়মাইন, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া ওয়া-রাসায়িল*, খণ্ড-২৫ (http://www.shamela.ws), পৃ: ৪৯৩।
৪ ড. আহমদ আলী, *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১০।
৫ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *'আরবী-বাংলা অভিধান*, খণ্ড-২ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭৮২।
৬ আল-মু'জামুল ওয়াসিত, পৃ. ৬৫৬।
৭ দারুল হরব বলতে এমন অমুসলিম রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়, যার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সাময়িক বা স্থায়ীভাবে কোন রূপ শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়নি এবং যেখানে প্রকাশ্যে অনৈসলামী বিধি-বিধান চালু রয়েছে।
৮ আবুল ফজল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াবী, *মিনবাহুল লুগাত*, অনু: মাওলানা আহমদ করীম সিদ্দীক (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ৬৪৯।
৯ জুবরান মাস'উদ, *আর-রাইদ মু'জামুল ফাবায়ি ফীল-লুগাহ* (ঢাকা: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪৩৬ হি.), পৃ: ৮৩১।
১০ *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, পৃ. ২৮।
১১ সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, খণ্ড-৩, অনু: আকরাম ফারুক (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯৩-৯৪।
১২ আল-কাসানী, *বাদাই*, খণ্ড-৭, পৃ. ২৩৫।
১৩ *আরবী-বাংলা অভিধান*, খণ্ড-১, পৃ: ৭২৮।
১৪ *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, পৃ. ১২৬।
১৫ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৫৬ খ্রি.), পৃ. ২২৬।
১৬ সূরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৯।
১৭ 'আলী ইবন হাসান আদ-দীন আল-হিন্দী, *কানযুল 'আম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল -আফ'আল*, খণ্ড-৪ (http://www.shamela.ws), হাদীস নং-১১৬৮২, পৃ: ৫৭৩।
১৮ *আল-খিরাজু ওয়ান-নাজমুল মালিয়্যাহ*, পৃ. ৮।
১৯ *আরবী-বাংলা অভিধান*, খণ্ড-২, পৃ. ৩৬৩।
২০ *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল খারাজ, হাদীস নং-৩০৪৬, পৃ. ৩৯৭।
২১ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আস-সারাখসি, আল-মাবসূত, খণ্ড-৫ (http://www.al-islam.com), পৃ. ১৩২।
২২ আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খণ্ড-২ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭ হিঃ), পৃ. ২৪৬।
২৩ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা, পৃ. ২৭।
২৪ 'আব্দুর রাজ্জাক, মুসান্নাফু 'আব্দির রাজ্জাক, খণ্ড-৬ (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হিঃ), হাদীস নং-১০০২, পৃ. ৬০।
২৫ সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ১০৮।
২৬ সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত নং: ২৫৬।
২৭ সূরাহ ইউনুস, আয়াত নং: ৯৯।
২৮ সূরাহ আল-গাশিয়াহ, আয়াত নং: ২১-২৩।
২৯ সূরাহ আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৪৭।
৩০ সূরাহ আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৪২।
৩১ আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খণ্ড-৫, পৃ. ৩৮-৪১।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

نظرية التقريب بين الأديان: دراسة نقدية في رؤية الإسلام

(The Theory of Rapprochement among the Religions: A Critical Study in the Light of Islam)

Dr. Mohammad Belal Hossain*

Abstract: Rapprochements among religions have been a new movement in the present world. Continuous attempts are being made along this line. This doctrine was originated by some Muslim and non-Muslim scholars in the contemporary world, especially for the unity and convergence among the three great monotheistic religions shush as Judaism, Christianity and Islam. They are working regarding this doctrine as Abrahamic religions which advocate the unity of three religions on the basis of schismatic viewpoints that the three religions are all right, equal and there is no contradiction among them. The Muslim scholars stated that it is one of the dangerous strafes and conspiracies against Islam and Muslims. Because, these three religions are not equal in terms of beliefs, roots, shoots, rituals and practices. In this connection, the Muslims have unanimously agreed that there is no true religion in this world except Islam and signal the abolition of all the religions that came before it. So this doctrine is an idea that is absolutely rejected by Islamic shariah.

التمهيد

نظرية التقريب بين الأديان هي نظرية حديثة منبثقة من فكرة اليهود و النصارى وهي تهدف إلي وحدة الأديان وجعلها ديناً واحداً عموماً علي المبادئ والقيم الأخلاقية الإنسانية. وإن كانت أشكالها مختلفةً، وطقوسها متنوعةً. بل هدفها واحد، وهو الوصول إلي الحقيقة الإلهية التي هي واحدة عند جميع الأديان. وتُمَثِّلُ هذه الحقيقةُ هي الحقيقة المركزية في أديان العالم المعاصر، وهي وجهة الرحلة الروحية في كل دين و معتقد، وتتأكد دعاة هذه النظرية إذا تمت هذه الفكرة لكان الدين عاملاً سلامًا غير من أن يكون عاملَ إثارة فِتَنٍ و شحناءٍ و حروب بين الشعوب. و هذه النظرية نظرية مخادعة التي يعمل من ورآئها الهدف الوحيد وهو إرجاء المسلمين عن دينهم، و تفريغ المؤمن من عقيدته، وإيمانه، و زعزعةٌ عن مبادئ الإسلام. فالتحذير كلَّ التحذير عن هذه المؤامرة الخبيثة، و الحيلة الماكرة. وقد قسمت موضوع مقالتي إلي محوارين أساسين.

المحور الأول: التعريف بالتقريب بين الأديان و نشأته وتطوره:

أولاً: مفهوم التقريب بين الأديان: هو السعي إلى إزالة الفوارق بين الأديان و الحث في القيم و المبادئ المشتركة بينها، ثم البناء على هذا المشترك الديني بإشاعة قيمٍ مُصاغَةٍ بصيغ جديدة بين أتباع هذه الديانات و تفعيل العمل من خلالها و الدعوة إليها.[١]

و عرَّفه الكاتب الإسلامى الشهير الدكتور محمد مُحمَّد حسين "**بأنه مذهب يدعو إلى البحث عن الحقيقة الواحدة التي تمكن وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المتباينة، و يزعم أصحاب هذه النظرية أن ذلك هو السبيل إلى جمع الناس على مذهب واحد بإزالة خلافاتهم الدينية العنصرية، لإحلال السلام فى العالم كله محل الخلاف**"[٢]

---

* Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh.

ثانياً: نشأته وتطوره

هذه النظرية قد بدأت في غالب صورها بتخطيط اليهود و النصارى كما نشأت أولاً بشكل المنظمة كالماسونية و التبشير و الصهونية. قيل: **أن النصارى هم أول من دعا علناً و مجهراً إلى الحوار بين الأديان من أجل التوفيق و التقريب بينها،** قال الدكتور أحمد بن عبد الرحمن " **إنّ الدعوة التقريب بين الأديان التي هبت رياحها بقوة من الغرب النصراني، قبل أكثر من ثلاثة عقود، إثر المجمع الفتيكاني الثاني (١٩٦٢-١٩٦٥م)، لا تحمل مدلولاً اصطلاحياً محدداً، فضلاً أن تكون ذات حقيقة شرعية. فلفظ "التقريب" أو "التقارب" Rapprochement، يدل على مسألة نسبية هي "القرب" تتفاوت في حقيقتها و تطبيقاتها لدي مختلف الأطراف، بل وفي نظرة كل طرف على حدة، في فترة زمنية معينة، كما سيتضح لاحقاً، فقد تقتصر على حد أدنى من المجاملات الشكلية، وقد توغل في الاقتراب إلى درجة الاندماج والوحدة وسقوط الفوارق، وبين هذا وذاك مراتب عديدة.**[٣]

يقول الدكتور محمد محمد حسين "**وأما الدعوة إلى التوفيق بين المسيحية والإسلام فهي دعوة قديمة نرى طلائعها في مذاكرات "بلنت"، إذ أثبت فيها بتاريخ ٣ إبريل سنة ١٩٠٤م حديثاً جرى بينه و بين الشيخ محمد عبده قال فيه: "في أثناء نفي في دمشق سنة ١٨٨٣م، كان أحد القسيس في إنجلترا، واسمه "إسحاق تيلور" يقوم بالدعاية لتوحيد الإسلام و النصرانية ".**[٤]

تطورت هذه النظرية منذ بروزها إلى انعقاد مجمع الفاتيكان الثاني الذي عقد في روما بين عامي ١٩٦٢م و ١٩٦٥م. ثم جاءت هذه النظرية بشكل جديد بصورة أشد و أوسع، وذلك أن هذه المجمع كان بداية تحول عجيب في موقف النصارى من الأديان غير النصرانية، ذلك أن هذا المجمع الذي يعتبر آخر المجامع المسكونية المقدسة عند الكنائس الكاثوليكية، وكانت الموضوعات التي نوقشت في هذا المجمع قضايا كثيرة *مثل مصادر الوحي، وسائل الاتصالات الاجتماعية، وحدة الكنيسة، إصلاح الطقوس والكهنوت، الحرية الدينية، الأديان غير المسيحية في مواجهة العالم الحديث.*[٥]

وكذلك انعقد كثير المؤتمرات والندوات في البلدان المختلفة في العالم الحاضر للتلفيق بين الأديان، ومن بين أكثر من ثلاثمئة من الموتمرات حول التقريب بين الأديان، والعديد من المناسبات والاحتفالات المشتركة جرت في العصر الحديث،[٦]

ثالثاً: أهدافه

هدف هذه النظرية هو فتنة المسلمين عن دينهم، وهم لايألون جهدا في تحقيق هذا الهدف الخبيث، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة حِرْصَ أهل الكتاب على فتنة المسلمين عن دينهم حقدا وحسداً، قال عز وجل ﴿**وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**﴾[٧] وقال تعالى ﴿**وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ**﴾[٨] وقال تعالى ﴿**وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ**﴾[٩] فهذه الآيات توضح لنا أن كثيراً من أهل الكتاب يحبون ردة المسلمين عن دينهم، ولتحقيق هذا الهدف وهم يستخدمون جميع الوسائل، ربما يتخذون قراراً حاسما خلاف الإسلام و المسلمين، وأحياناً يرتفعون الأصوات للتقريب بين الأديان و وحدة الأديان الثلاثة.

رابعاً: أسبابه: أهم الأسباب التي أدّت إلي قيام هذه النظرية وهي:

١. **تجمع الناس تحت ظل الإسانية**: الحركات العالمية والإنسانية التي تَدَّعي أنها تريد تجميع البشر على أساس الجنس والوطن، أو الإنسانية دون اعتبار للدين كثيرة جداً منها: الماسونية، العالمية أو الإنسانية، الصهيونية، الروتاري، الأسود، التنصير، التغريب، العلمانية، والدعوات القومية والوطنية عموماً، وهذه اليطئفة كلها تعمل لتجميع الناس تحت رأية هذه النظرية، و أصحاب النظرية يقولون: نحن نريد بها تجميع الناس على الأساس الإنساني.[١٠]

٢. **الخوف من سطوة الكفار**: هذا من أهم الأسباب التي تفضي المسلمين إلى تشكيل هذه النظرية، لأنهم يخافون دائماً القوات المسلحة للكفار المعاندين، وهم يردون عيشة سالمةً لايتوقعون فى أية مصائب الدنيا. هذه هي من خصلة المنافقين.

٣. **المنافع الدنوية**: إن المصالح الدنوية تفضي زعماء العصر إلى تشكيل هذه النظرية، ليتمتع بها في رفاهة معيشهم، لذلق هن يسون لإقامة هذه النظرية.

٤. **الجهل بالدين**: هذا هو السبب الرئيسي لهذه النظرية لأن من له أدنى معرفة بالدين وأصوله ونواقضه لا يمكن أن يتصدى لمثل هذه الدعوة، وأن يدعو الناس إليها.

٥. **الانهزام النفسي**: فالمغلوب والمهزوم إن لم يتولاه الله لا يمكنه التمييز بين الحق والباطل والخير والشر، فهذا السبب يفضي إلى هذه النظرية.

خامساً: دعاته

ومن كبار الدعاة للتقريب بين الأديان في عالم الغرب الذين بذلوا جهودهم المشكورة في هذا الموضوع كأمثال **موسى بن ميمون[Moses ben Maimon]، لويس ماسينون [Louis Massignon]، الأب ميشال حايك [Father] [Michel Hayek]، مكسيم رودنسون [Maxime Rodinson]، إسحاق تيلور[Isaac Taylor]** وأما هذه النظرية عند المسلمين فقد وجدت هذه الفكرة قبولاً من رجال المدرسة العقلية الحديثة بدءًا من الشيخ المفتي محمد عبده إلى علماء العصر الحديث. وهاكم نماذج من هؤلاء العلماء على النحو التالي:

١. **الشيخ محمد عبده**: هو شيخ مصريٌ، عالم مشهورٌ ومغمورٌ فى أرجاء المعمورة، هو أول من سُخِّر للدعوة لتلك الفكرة، و أخطر آثاره التي تعد ركيزةً من ركائز العلمانية في العالم الإسلامي، إذ كان الشيخ أعظمَ من اجترأ عليه من المنتسبين للعلماء، لابتعاونه مع الحكومة الإنجليزية الكافرة فحسب، ولكن بدعوته الصريحة إلى موالاة الإنجليز وغيرهم، بحجة الأول التعاون مع الكافر ليس محرماً من كل وجه– وبدعوته إلى التقريب بين الأديان..حقيقة إن الرأي العام الإسلامي قد ثار على بعض فتاوي الشيخ التي أباح بها موالاة الكفار، فوقع تأثير هذا القول على العالم الإسلامي.[١١]

٢. **الشيخ عبد الرحمن الكواكبي**: هو من كبار العلماء فى العصر الحديث، هو الذي دعا إلى العلمانية ونَبْذِ الدين صراحةً، كما دعا للتعايش السلمي مع اليهود والنصارى، وترك الدين جانباً، وهو نفس ما يدعو إليه دعاة وحدة الأديان في العصر الراهن. وكتب فى هذا الصدد عدداً غفيراً من الكتب و الرسائل.[١٢]

٣. **الشيخ رفاعة الطهطاوي**: كان من قادة النهضة العلمية في مصر في عهد محمد علي باشا، وكان من أهم الدعائم الفكرية التي قامت عليها التي أرادها فى مصر. و هو كان من كبار الدعاة الذين اجتهدوا التوافق بين الرسالة السماوية وغيرها من أديان العالم الكبري. هو من الذين دعوا إلى ذلك بكتاباتهم وفكرهم، وهو دائما يمدح العلمانيين و تسامحهم الديني. و هو يزعم أننا فى حاجة ملحة إلى التلفيق بين الأديان السماوية، لأن مصدرها واحد. [١٣]

٤. **الشيخ علي عبد الرازق**: وهو من أبرز الشخصيات التي مهدت لقيام هذه الدعوة، إنه شيخ مفتون، ألّف كتاباً سمّاه *الإسلام وأصول الحكم*، جمع بين أسلوب المستشرقين في تحوير الفكرة، واقتطاع النصوص، وتلفيق الواهيات، وبين طريقة الباطنية في التأويل البعيد، و كان يزعم أن الإسلام كالمسيحيةِ المحرفةِ بينهما علاقة روحية. فلذا ينبغي لنا أن نجمع أهل هذه الديانة تحت راية واحدة. [١٤]

٥. **الدكتور محمد عمارة**: هو مفكر إسلاميّ مصريّ، ومؤلف و محقق و عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وهو كذلك من أبرز الدعاة لتجميع الناس تحت دين جديد واحد، وهو يزعم أن اليهود والنصارى اليوم مؤمنون مسلمون موحدون ولا يضرهم في شيء من إيمانهم، و كذلك أن التوقف لأهل الكتاب في نبوة نبي الإسلام لا يخرجهم عن إطار الدين الواحد[١٥].

٦. **الدكتور حسن حنفي**: هو مفكر مصري، أستاذ جامعي، يُعَدُّ واحدا من مناظري تيار اليسار الإسلامي و تيار علم الاستغراب، يزعم الدكتور حنفي أنه ليس هناك دين في ذاته، بل هناك تراث يمكن تطويره وتطويعه حسب الظروف والملابسات، و التراث القديم لا قيمة له في ذاته كغاية أو وسيلة، ولا يحتوي على أي عنصر من عناصر التقدم، وأنه جزء من تاريخ التخلف أو أحد مظاهره، وأن الارتباط به نوع من التغريب ونقص في الشجاعة وتخل عن الموقف الجذري ونسيان للبناء الاجتماعي الذي هو إفراز منه، وهذه نظريته قد أخذت من نظريات التي تسربت من الغرب[١٦].

٧. **الدكتور حسن الترابي**: هو مفكر وزعيم سياسي وديني سوداني، يُعتبر رائد مدرسة التجديد السياسي الإسلامي، و هو من أبرز الشخصيات لهذه الدعوة. وجدير بالذكر أن المتولين لهذه الدعوة هم على شاكلة واحدة، إنهم العصرانيون، المتغربون، المبهورون بالحضارة الغربية المادية و التأثرون بها. و كان الدعاة الأوائل لهذه النظرية مثل محمد عبده، ورفاعة الطهطاوي، ومحمد عمارة، وحسن حنفي، وكان حسن الترابي من أمثالهم. ويُعتبر أخطر من هؤلاء جميعا، و هو الذي يتقدم بمشروع علمي لم تتفق عنه أفكار الأولين. [١٧]

سادساً: خطره

إن النظرية التقريب بين الأديان تصطدم مع الإسلام وتتعارض معه تعارضاً واضحاً، و من أبرز مخالفتها للإسلام وأشدها خطراً على المنادين بها والداعين إليها، وعلى من وافقهم في ذلك إنها تقوم على نواقض الإسلام، وهدم أصول الدين و ثوابته. وهي أكبر الوسائل لباعث التنصير، و إسقاط جوهر الإسلام. بدأ أعداء الإسلام يحاولون محاولة جادة لإضلال المسلمين فى كل بلد من البلدان الإسلامية بهذه النظرية. كما حكى الله سبحانه و تعالي عن أفعالهم الشنيعة بقوله ﴿**وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**﴾ [١٨] وجدير بالذكر أن هذه الدعوة دعوة هجومية على الإسلام و المسلمين، لأن الإسلام هو خاتم الرسالات السماوية قد نسخت بها الشرائع كلها، فكيف هذا الدين يتفق مع الأديان المنسوخة؟ هذا أمر مستحيل.

المحور الثاني: دراسة نقدية لهذه النظرية من رؤية الإسلام

إن نظرية التقريب بين الأديان نظرية خادعة، لاتعنى في الحقيقة إلا اعتراف المسلمين بهذه الأديان بوضعها الحالى، وإنزال الإسلام إلى مستوى اليهودية والنصرانية المنحرفة، بل إلى مستوى الأديان الوضعية الوثنية كالبوذية والهندوسية، لأجل ذلك هذه الفكرة فكرة خبيثة، كما تقرر اللجنة الدائمة لدار الإفتاء من المملكة العربية السعودية "**أنه أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لايحتاج إلى التقريب، كما يتبين أن اليهود و النصارى قد حرفوا و بدلوا ما نزل إليهم من ربهم حتي صارت ديناتهم زوراً و بهتاناً و كفراً وضلالا، ومن أجل ذلك أرسل إليهم الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة، يبين ما كانوا يخفون من الحق و يكشف لهم عما كتموه، ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد و الأحكام، ويهديهم و غيرهم إلى سواء السبيل،**[١٩] قال تعالى: ﴿**يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ**﴾.[٢٠]

قال الدكتور يوسف القرضاوي: إن التقريب بين الأديان بعضه مرفوض و بعضه مقبول، **أما مفهوم المرفوض** فهو يقصد به إذابة الفوارق الجوهرية بين الأديان المختلفة بعضها بعضاً. كما بين التوحيد في الإسلام و التثليث في النصرانية، وما بين (التنزية) في العقيدة الإسلامية (والتشبيه) في العقيدة اليهودية. **وأما المفهوم المقبول** للتقريب بين الأديان، وخصوصاً في الديانة السماوية، فيراد به التقريب بين أصحاب الأديان في ضوء الحقائق التالية: [٢١]

١. **الحوار بالحسنى:** إن المسلمين مأمورون من الله سبحانه و تعالي بجدال المخالفين بالتي هي أحسن. وهذا الجدال أو الحوار بطريقة الحسنة، هو إحدى وسائل الدعوة التي أمر بها القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿**ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ**﴾.[٢٢] فالموافقون لك في الدين تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، أي بما يقنع العقول، وما يحرك القلوب والعواطف، والمخالفون يجادلون بالتي هي أحسن. و واضح أن القرآن الكريم قد اكتفى مع الموافقين بأن تكون الموعظة حسنةً، ولم يرض مع المخالفين إلا أن يكون الجدال بالتي هي أحسن. وقد نص القرآن الكريم، على ذلك في خصوص أهل الكتاب،[٢٣] فقال تعالى ﴿**وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ**﴾[٢٤].

٢. **التركيز على القواسم المشتركة بين المسلمين و بين أهل الكتاب:** جآء ذكره في مجادلة أهل الكتاب ﴿**وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ**﴾.[٢٥] ففي مجال التقريب والحوار بالتي هي أحسن، ينبغي ذكر نقاط الاتفاق، لا نقاط التمايز والاختلاف[٢٦]. كما أشار إليه قول الله عز وجل ﴿**قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ**﴾.[٢٧]

خلاصة القول

وبعد هذا العرض الموجز أن هذه النظرية لا تتنفذ أبداً لأنها تنافي الإسلام وتُوَقِّعُ في فتنة و فساد كبير،و تَجُرُّ إلى خلط في عقيدة الإسلام و ضعف فى الإيمان، ومؤالاة لأعداء الله تعالى. [٢٨] و التقريب بين الأديان أمر مستحيل لأسباب التالية:

١. والإسلام دين كاملٌ في صفائه وضيائه ونوره وإشراقه وعدالته وسماحته وشموله وسمو أخلاقه وعمومه للإنس والجن، و بينما اليهودية في عنصريتها وضيقها وحقدها على البشرية وانحطاط أخلاقها وظلماتها وطمعها فكيف يَقبل المسلم أن تُرْمَى مريم الصديقة العابدة بالزنا الذي يرميه بها اليهود وكيف يقبل المسلمون أن يرمي اليهود المسيح بن مريم بأنه ولد الزنا و العياذ بالله.
٢. **ايستحيل التقريب بين القرآن وتلمود الشيطان؟** لأن فيه قرارآت شيطانية لهدم العالم غير اليهود، والسيطرة على العالم كله، و القرآن الكريم ليس كذلك. فجآء لإقامة الأمن و السلام في الأرض.
٣. تسقط هذه النظرية جوهر الإسلام واستعلائه وظهوره و تمييزه و هو الدين الكامل المحكم والمحفوظ من التحريف و التبديل في مرتبة متساوية مع غيره من الأديان المحرفة الباطلة.
٤. **إن الإسلام هو دين عالمي،** فُرِضَ فيه الجهاد و القتال لدفع الظلم والاضطهاد، وكذلك لإزاحة الطواغيت و اصطدام العقائد الفاسدة الباطلة واظهار دين الله على مكانها كما قال تعالى: ﴿**هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.** ﴾[٢٩] فكيف يكون التقريب بين الأديان.

الخاتمة:

فمن خلال بحثي هذا توصلت إلى أهم النتائج التالية:

١. إن هذه النظرية هي هجومة في ثوابت هذ الدين في أصوله وأسسه العظيمة، آلا وهو التوحيد والبرآءة من الشرك وأهله.
٢. دين الله واحد وليس عدة أديان كما قال تعالى: ﴿**إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.** ﴾[٣٠] ﴿**وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.** ﴾[٣١]
٣. نسخ الله جميع الأديان بشريعة الإسلام، وهي شريعة خالدة مستمرة إلى قيام الساعة.
٤. لايتحد شيئان متضادان، فكيف يجتمع التوحيد القائم على عبادة الله وحده لاشريك له مع الشرك القائم على عبادة غير الله.
٥. كيف يجتمع من يقول: (**قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**) [٣٢] **مع من يقول:** (**إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍۘ**).[٣٣]

٦. وكيف يتقارب مع من يقول الله عز وجل عنه و عن شناعة مُعتقَدِه، ﴿**وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا.أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.** ﴾[٣٤]

٧. إن فكرة الوحدة أو التقارب بين الإسلام و الكفر مستحيلة عقلا و شرعاً.

٨. إن الصورة المقبولة من الحوار مع أهل الكتاب و غيرهم من الكفار هو دعوتهم إلى التوحيد و دخولهم في الإسلام.

٩. أما الصورة المرفوضة من الحوار مع الكفار وهي دعوتهم إلى المؤتمر أو الندوة للتقارب مع أديانهم الباطلة و السكوت عن كفرهم.

إن الدعوة إلى وحدة الأديان كفر صريح و أمرٌ مستحيلٌ و بُعدٌ كُلَّ البُعد في رؤية الإسلام.

الهوامش

[١] "الدين الخالد" مجلة الأديان، العدد (صفر)، خريف ٢٠٠٩م، مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، قطر، ص: ٧٤-٧٥.

[٢] د. محمد محمد حسين، *الإسلام و الحضارة الغربية* (بيروت: دار الفرقان، ٢٠٠٦م)، ص: ١٧١.

[٣] *المصدر السابق*، ص: ٣٣٥.

[٤] د. أحمد عبد الله جود، *علم الملل و مناهج العلماء فيه* (الرياض: دار الفضيلة، ٢٠٠٥م)، ص: ٣٧٦-٣٧٧.

[٥] محمد هلال، *مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام* (بيروت: دار البشير، ١٩٩٢م)، ص: ٧٤.

[٦] الدكتور أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي، دعوة، التقريب بين الأديان، ج: ١ (بيروت: دار ابن الجوزي: ٢٠٠١م)، ص: ٣٣٤.

[٧] سورة البقرة: ١٠٩.

[٨] سورة آل عمران: ٧٩.

[٩] سورة البقرة: ١٢٠.

[١٠] أُخذت هذه المعلومات من مقالة "التقارب الديني: خطره - أسبابه - دعاته"، نشرت في *الشبكة العنكبوتية* بتاريخ ٣٠-٠٧-٢٠٠٨م.

[١١] سفر بن عبد الرحمن الحوالي، العلمانية (القاهرة: مكتبة الطيب لخدمة التراث، ٢٠١١م)، ص: ٥٧٨-٥٧٩.

[١٢] عباس محمود العقاد، *عبد الرحمن الكواكبي* (مصر: مؤسسة الهنداوي ٢٠١٣م)، ص: ١١١-١١٥.

[١٣] انظر: المزيد: جرجي زيدان، *تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر*، ج: ٢ (بيروت: دار لبنان، ٢٠١٢م)، ص: ٣١؛ الدكتور عمارة، *الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي*، ج: ١ (مصر: مؤسسة الهنداوي ٢٠١٢م)، ص: ١١١؛ "التقارب الديني: خطره أسبابه دعاته"، مقالة نشرت في الموقع، *طريق الإسلام*، بتاريخ ٢٠٠٧/٠٧/٣٠م.

[١٤] "التقارب الديني: خطره أسبابه دعاته"، مقالة نشرت في الموقع، *طريق الإسلام*، بتاريخ ٢٠٠٧/٠٧/٣٠م.

[١٥] محمد عمارة، *الإسلام والوحدة الوطنية* (القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٦م)، ص: ٥٠-٨٢.

[١٦] د. حسن حنفي، *التراث والتجديد* (القاهرة: مؤسسة الهندوي، ١٩٨٠م)، ص: ٢٢.

[١٧] دعوة، التقريب بين الأديان، ج: ١، ص: ٧٣٢.

[١٨] سورة البقرة: ١٣٥.

[١٩] *فتاوى اللجنة الدائمة*، ج: ١٢ (الرياض: دار المؤيد للنسر و التوزيع، ٢٠١٠م)، ص: ٢٨٤-٢٩٧.

[٢٠] سورة المائدة: ١٥-١٦.

[٢١] الدكتور يوسف القرضاوي، "التقريب بين الأديان"، مقالة نُشرت في، موقع *سماحة الشيخ يوسف القرضاوي* (بتصرف)؛ د. محمد مهدي، "الدعوة إلي وحدة الأديان وتقاربها في ميزان الوسطية"، مقالة نشرت في *الموقع الألوكة*، بتاريخ: ٢٠١٢/٠٥/٣١م،

[٢٢] سورة النحل: ١٢٥

[٢٣] الدكتور يوسف القرضاوي، "التقريب بين الأديان"، مقالة نُشرت في، موقع *سماحة الشيخ يوسف القرضاوي* (بتصرف).

[٢٤] سورة العنكبوت: ٤٦

[٢٥] سورة العنكبوت : ٤٦

[٢٦] الدكتور يوسف القرضاوي، "التقريب بين الأديان"، مقالة نُشرت في، موقع *سماحة الشيخ يوسف القرضاوي* (بتصرف).

[٢٧] سورة آل عمران: ٦٤.

[٢٨] فضيلة الشيخ على بن عبد الرحمن الحذيفي، *تقارب الأديان و تقارب مع الرافضة*، مقالة نشرت في الشبكة العنكبوتية.

[٢٩] سورة الصف: ٩.

[٣٠] سورة آل عمران: ١٩.

[٣١] المصدر السابق: ٨٥.

[٣٢] سورة الأنعام: ١٦٢.

[٣٣] سورة المائدة: ٧٣

[٣٤] سورة مريم: ٨٨-٩٥.

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্মিত মডেল মসজিদের ভূমিকা
(The Role of Model Mosques in Developing Islamic Education and Culture in Bangladesh Built by Government Management)

Dr. Muhammad Mahbubur Rahman*

Abstract: The mosque is the house of Allah. This is the best place for prayer and worship. Heavenly blessings are showered on the people centred on the mosque. The virtues of a mosque are immense. Whoever builds a mosque on earth for the purpose of gaining Allah's pleasure, Allah has announced that He will build a house in Paradise (Zannah) for him. Allah loves those who build and maintain mosques. Islam should not be confined only to the mosque. I would like to point out that this is a full life provision model mosque. Where there will be regular practice of religious knowledge for the purpose of preaching Islam. With this goal in mind, the present Prime Minister Sheikh Hasina, daughter of Bangabandhu, has decided to establish 560 model mosques with all modern facilities in all the upazilas of the country. The simultaneous construction of so many model mosques for devouted Muslims is a symbol not only for this country but for the entire Muslim world. This achievement will be the story of Sheikh Hasina's achievement and her love and affection towards Muslims. Its importance and significance from the religious point of view is immense. The construction of so many mosques and various facilities will help the devouted Muslims all over the country to take Islam further. History will testify the achievement of building these model mosques bySheikh Hasina. The Prime Minister said in his speech,

> "These mosques will play a role in the propagation of Islam as well as in raising public awareness about the prevention of terrorism and violence against women."

The significance of this statement of the Prime Minister is very meaningful and far-reaching. She wants to convey the true message of Islam to every worshiper. To this end, an individual has the opportunity to study the true essence of Islam in these mosques. Arrangementshe have also been made for the Imams and Muazzins so that they can be educated in the true Islamic teachings and carry the message of Islam to the worshipers. The article in question highlights the message of spreading Islam and its message to all through the construction of model mosques in Bangladesh.

ভূমিকা

ইসলাম ধর্মের অন্যতম উপসানালয় হলো মসজিদ। তাই ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্র। ফলে এদেশ মসজিদে পরিপূর্ণ একটি দেশ। এদেশে প্রকৃত ইসলামের প্রচার প্রসারে ও তার মর্মবাণী উপলব্ধিকরণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫৬০টি মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। সে অনুযায়ী দেশে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং হচ্ছে। ইসলামের কৃতিত্ব সমুন্নত রাখতে দেশনেত্রী শেখ হাসিনার এ অবদান দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সারাদেশে এক সাথে এতগুলো মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ফলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইসলাম পালনে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করবে। সর্বোপরি বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ এক মাইলফলক হিসেবে ইতিহাস হয়ে থাকবে।

---

* Professor, Departman of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh-6205.

মডেল ও মসজিদ পরিচিতি

মডেল (Model) শব্দটি ইংরেজি। এর অর্থ হলো, আদর্শ। আইডিয়াল (Ideal) শব্দটিও অনুরূপ অর্থ বুঝিয়ে থাকে। এছাড়া মডেল শব্দটির অর্থ নকশা, গঠন করা, আদরা, ছাঁচ, প্রতিমান, অনুকরণীয় ব্যক্তি, অনুকরণীয় বস্তু, সদৃশ ব্যক্তি, সদৃশ বস্তু, প্যাটার্ন,[১] সামর্থ্য[২] আদর্শ[৩] ইত্যাদি।

মসজিদ (مَسْجِد) শব্দটি আরবী।[৪] এটি স্থানবাচক বিশেষ্য, س+ج+د শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। মসজিদ শব্দটি একবচন, বহুবচনে মসাজিদ (مَسَاجِد)। মসজিদের অর্থ সিজদা করার স্থান[৫], কপাল ও নাক মাটির উপর রাখার স্থান[৬], অনুনয় বিনয়ের সাথে অবনত হওয়ার স্থান।[৭]

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মসজিদ বলা হয় আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনার্থে মস্তক বা মাথা ভূলুণ্ঠিত করার স্থান। ইবাদতের উদ্দেশ্যে কপাল ও নাক মাটির উপরে রাখা, মাটির উপরে কপাল ঠেকানো এবং বিনম্রভাবে অবনত হওয়ার স্থান।[৮]

ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ মসজিদের পরিচয় বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি অভিমত প্রদান করা হলো:

১. ইবনুল আরবী (র) (মৃত ৫৪৩ হি.) বলেন,

> مُصَلَّى اَلْجَمَاعات مَسْجِد، وَالْمَسَاجِدْ أَيْضًا، الأآرَاب الَّتِيْ يَسْجِدُ عَلَيْهَا وَالآراب السَّبْعَة مَسَاجِد.
>
> "জামাআত সহকারে নামায আদায়ের স্থানকে মসজিদ বলে। যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সিজদা করা হয় সেগুলোকে মাসাজিদ বলা হয়। শরীরের সাতটি অঙ্গকে মাসাজিদ বলা হয়।"[৯]

২. ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী (র) (মৃত ৬৩০ হি.) আয্-যুজাজ (র)-এর মত উদ্ধৃত করে বলেন,

> كُلُّ مَوْضِعُ يَتَعَبُّدُ فِيْهِ فَهُوَ مَسْجِد، أَلاترى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جُعِلَتْ لِيْ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْراً.
>
> "যে জায়গায় সিজদা করা হয় তাকে মসজিদ বলা হয়। কেননা নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১০]

অতএব মসজিদ বলতে বুঝায় আল্লাহর নিকট অবনত হওয়ার স্থানকে। যে স্থানে মানুষ সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে। যা ইট, পাথর বা অন্যকোনো বস্তু দ্বারা বর্গাকারে নির্মিত। সর্বাগ্রে মাধ্যখানে ইমাম দাঁড়ানোর জন্য এবং উভয় পার্শ্বে সাধারণদের দাঁড়ানোর জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়। মসজিদকে বলা হয় *বায়তুল্লাহ্* তথা 'আল্লাহ্ ঘর'।

মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিচিতি

ইসলামের চিরায়ত ঐতিহ্যকে ধারণ করে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও সিটি করপোরেশনে একটি করে মোট ৫৬০টি দৃষ্টিনন্দন মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। শুধু নামায আদায় নয়, এই মসজিদগুলো হবে গবেষণা, ইসলামী সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। মসজিদসমূহে প্রতিদিন ৪ লাখ ৯৪ হাজার ২০০ জন পুরুষ ও ৩১ হাজার ৪০০ জন নারী একসঙ্গে নামায আদায় করতে পারবেন। ১০ জুন ২০২১ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে একযোগে সারাদেশে নির্মিত ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মুসলিম বিশ্বের এই প্রথম কোনো দেশের সরকার ৫৬০টি মসজিদ নির্মাণের এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে সারাদেশে এই দৃষ্টিনন্দন মন জুড়ানো মসজিদগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে উল্লেখ করেন। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও মূল্যবোধের প্রচার, উগ্রবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার এই পদক্ষেপ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মডেল মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিটি জেলা-উপজেলায় একটি করে মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। যার ব্যয় ধরা হয় ৮ হাজার ৭২২ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই মডেল মসজিদ তৈরির পিছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা। যা ইসলাম বা মুসলমানদের জন্য সুখকর বার্তা বয়ে আনবে। কয়েকটি পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

১. বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৫-এর বাস্তবায়ন। দেশব্যাপী মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সারাদেশে শক্তিশালী ইসলামী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।
২. প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবিত মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র জেলা-উপজেলা পর্যায়ে নির্মাণ করে সারাদেশে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও প্রকৃত মূল্যবোধের প্রচার ও দীক্ষা দান।
৩. সন্ত্রাস ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ও এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৪. পুরুষ-নারী মুসল্লিদের জন্য নামায, ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দ্বীনী দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করা।
৫. সর্বোপরি ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসার করা এবং সততা ও ন্যায়বিচারের প্রতি মানুষের আনুগত্য সমর্থন সৃষ্টি করা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সর্বমোট মসজিদ রয়েছে ২ লাখ ২৮ হাজার ৪শ ৮৭টি। এগুলোর সঙ্গে যোগ হচ্ছে *'মডেল মসজিদ প্রকল্পের'* আওতায় তৈরি আরো ৫৬০টি মসজিদ।

মডেল মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের মেয়াদে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে ৬৪টি ও ৪৯৪টি উপজেলায় একটি করে সর্বমোট ৫৬০টি আধুনিক স্থাপত্য সৌন্দর্যের মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ৮টি বিভাগের ৯টি জেলায় *'মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের'* ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো হলো, গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঝালকাঠি, খুলনা, বগুড়া, নোয়াখালি এবং রংপুর। উক্ত মসজিদ উদ্বোধনকালে ভিডিও কনফারেন্সে ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব আনিসুর রহমান, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা বেগম রওশন এরশাদ, বাংলাদেশ ইমাম সমিতির সভাপতি কাজী শাকের আহমেদ বক্তৃতা করেন। এছাড়া মন্ত্রী পরিষদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য, সরকরের পদস্থ কর্মকর্তা এবং আলেম-উলামা, মাশায়েখ ও সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন,

> "ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাটা যেন মানুষ পায় এবং ইসলামী সাংস্কৃতি যেন ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে, চর্চা করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এ উদ্যোগ নিয়েছি। প্রতিটি জেলা-উপজেলায় আমরা ৫৬০টি মডেল মসজিদ তৈরি করে দেব। যেখানে সত্যিকারভাবে ইসলাম ধর্মের চর্চা হবে।"

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্মিত মডেল মসজিদের ভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মসজিদের কার্যক্রম শুধুমাত্র নামায আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে বানূ-ছাকীফের প্রতিনিধি দলকে তিনি এই উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করতে দিয়েছিলেন যে, তারা মুসল্লিদের কাতার দেখতে ও রাতে আল-কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত শুনতে পাবে। কেননা ইসলামের প্রারম্ভিকাল থেকে মসজিদে আল-কুরআন তিলাওয়াত করা হতো। আল-মাকদিসীর যুগে নায়শাপুরের কারীগণ জুমু'আর দিন তাড়াতাড়ি মসজিদে এসে উপস্থিত হতেন এবং অর্ধ প্রহর (চাশ্‌ত) পর্যন্ত আল-কুরআন তিলাওয়াতে নিয়োজিত থাকতেন। মিশরের বহিরাগত কারীগণ প্রত্যেক দিনই 'জামি আমরে' হালকায় বসে আল-কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর সময় বানূ উমাইয়্যাদের মসজিদে ফযর ও আসর নামাযের পরে আল-কুরআন তিলাওয়া করতেন। তিলাওয়াতের পর তাসবীহ্ পড়তেন। তাসাওউফপন্থিগণ মসজিদে যিক্‌রের মজলিস বসাতো। দামিশকের বানূ উমাইয়্যাদের মসজিদ ও অন্যান্য

মসজিদে প্রতি জুমু'আর সকালে যিক্র হতো। মাসজিদুল আকসায় হানাফীগণ নিয়মিত যিক্র করত এবং কিতাব থেকে কিছু অংশ পড়ে শুনাতেন। আহমদ ইব্ন তূলূন ও খুম্যারাওয়ায়হ্ মিশরের মীনারা মসজিদের সন্নিকটে একটি কক্ষে বারজন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে মসজিদের সন্নিকটে অবস্থান করার অনুমতি দেন যে, তারা সেখানে আল্লাহ্র যিক্রে লিপ্ত থাকবে। এই বারজন পালাক্রমে চারজন করে পূর্ণ রাত্রি যিক্র ও তাসবীহ্ পাঠে নিয়োজিত থাকত এবং সেসাথে আল-কুরআন তিলাওয়াত ও দীনী কাসীদা পাঠ করত। সালাহুদ্-দীনের সময় মু'আয্যিন রাত্রে দীনী মাসআলা, আকীদা পাঠ করে শুনাত।[১১]

৫৬০টি মডেল মসজিদগুলোতে নামায আদায়ের পাশাপাশি ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে অন্যান্য যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে তা হলো: ১. পঞ্চাশ জন ছাত্রের হিফয খানা; ২. ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র; ৩. ইসলামী লাইব্রেরী, ৪. উপজেলায় ইমামদের প্রশিক্ষণ; ৫. হজ্জ মৌসুমে হাজীদের প্রশিক্ষণ; ৬. গণশিক্ষা কেন্দ্র; ৭. অটিজম কর্ণার; ৮. বই বিক্রয় কেন্দ্র; ৯. মৃতের গোসল ও জানাযার ব্যবস্থা; ১০. কার পার্কিং; ১১. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র; ১২. মেহমানদের আবাসন ও বিদেশী পর্যটকদের পরিদর্শন। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

১. পঞ্চাশ জন ছাত্রের হিফ্যখানা

৫৬০টি মডেল মসজিদে কুরআন হিফ্য করার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা সম্প্রসারণ হবে। ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্বাচিত হাফিয ও কারীগণ সৌদি আরব, আরব আমিরাত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, মিসর, জর্ডান, তুরস্ক, আলজেরিয়া, ভারত ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফজ, কিরাআত ও তাফসীর প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে প্রায় ৫১ কোটি টাকা ও ৪৪১ ভরি স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার হিসেবে অর্জন করেছে। যা মডেল মসজিদের মাধ্যমে আরোও সম্প্রসারিত হবে।

২. ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র

মডেল মসজিদসমূহে ব্যাপকভাবে ইসলামী গবষেণা কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে দেশের আপামর জনগোষ্ঠি ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে। যা সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষকে প্রকৃত ইসলামের বিষয়সমূহ সম্পর্কে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে বলে আশা করা যায়।

৩. ইসলামী লাইব্রেরী

ইসলামী মূল্যবোধের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, মসজিদে পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মসজিদ পাঠাগারে বাস্তব ও দুনিয়াবী প্রয়োজন এবং সুবিধাও যথেষ্ট। কারণ মসজিদ আমাদের নামায এবং ফালাহ্-রূহানী ও জাগতিক, দ্বিবিধ কল্যাণেরই কেন্দ্র। এ.জেড.এম. শামসুল আলম 'ইসলামী প্রবন্ধমালা' গ্রন্থে লিখেছেন,

> "লাইব্রেরী করার জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ, বই চুরি হবে কম। দান পাওয়া যাবে বেশি। জায়গা পাওয়া যায় বিনা ভাড়ায় আরও বহু সুবিধা আছে।"[১২]

৫৬০টি মডেল মসজিদে ইসলামী লাইব্রেরীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মডেল মসজিদসমূহে সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত ইসলামী লাইব্রেরী স্থাপন করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের প্রতিটি মানুষকে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মুসলিম জনগণ কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং গবেষণার সুযোগ লাভ করেছে।

৪. উপজেলায় ইমামদের প্রশিক্ষণ

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে দেশের মসজিদসমূহের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একজন ইমামকে যেমন শিক্ষক ও প্রশিক্ষক বলা যায় তেমনি মসজিদকে শিক্ষালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলা যায়। উপজেলা পর্যায়ে ইমাম প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ.জেড.এম. শামসুল আলম 'ইসলামী প্রবন্ধমালা' গ্রন্থে লিখেছেন,

> "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিভাগ ও জেলায় ফাউন্ডেশনের শাখা অফিস খুলেছে এবং প্রতিটি জেলা সদরে তাদের শাখা খুলেছে। প্রতি উপজেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা খুলে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে উৎসাহ এবং প্রেরণা দান করা উচিত। "[১৩]

ইমামগণের প্রশিক্ষণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে ৫৬০টি মডেল মসজিদে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যা দ্বারা ইমামগণের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

৫. হজ্জ মৌসুমে হাজীদের প্রশিক্ষণ

হজ্জ ইসলামের বুনিয়াদী বিধান ও পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থান যিয়ারত করাকে হজ্জ বলা হয়।[14] হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ৫৬০টি মডেল মসজিদে উপজেলা পর্যায়ে হজ্জ মৌসুমে হাজীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। এতে করে গ্রাম পর্যায়ের হাজীগণ হজ্জের মাসয়ালা, মাসাইল থেকে শুরু করে হজ্জ বিষয়ক সকল কার্যক্রম সম্পর্কে সহজে অবহিত হতে পারবে। যা হাজীদের হজ্জে গমন, সেখানে গিয়ে অবস্থান, ইবাদত, মীনা, আরাফায় অবস্থান, মদীনা যিয়ারতসহ সকল বিষয়ে জ্ঞানদানে সহযোগিতা করবে।

৬. গণশিক্ষা কেন্দ্র

মসজিদ হবে মুসলিম শিশুদের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। নারী-পুরুষ-শিশু-নির্বিশেষে সকলের জন্য গণশিক্ষা কেন্দ্র। বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র এবং অবহেলিত শ্রেণির জন্যে শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদান, বাংলা-ইংরেজিসহ প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্যে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন,

> "প্রত্যেক উপজেলা ও জেলায় মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করব। যেখানে প্রকৃত ইসলামের ধারণাটা মানুষে পেতে পারে।"[১৫]

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের আওতায় বর্তমান সরকারের আমলে প্রতি বছর রমযান মাসে সারাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষকে আল-কুরআনুল কারীম শিক্ষা প্রদান করা হয়। এজন্য প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ বোগদাদী কায়দা বিতরণ করা হয়।

ই'তিকাফের স্থান

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ই'তিকাফকে নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত করার জন্য মসজিদের ভিতরে একটি স্থান নির্ধারণ করতেন এবং সেখানে অবস্থান করতেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বলেন,[১৬]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> "রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমাযানের শেষ দশেকে ই'তিকাফ করতেন।' নাফি' বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার আমাকে ঐ জায়গাটি দেখিয়ে দেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ই'তিকাফ করতেন।"[১৭]

বাংলাদেশের প্রায় সকল মসজিদেই মসুল্লিগণ রমযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করে থাকেন। তবে কোনো মসজিদেই ই'তিকাফকারীদের জন্য আলাদা কোনো স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। ৫৬০টি মডেল মসজিদে ই'তিকাফকারীদের জন্য আলাদ স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। যা মসুল্লিগণকে ইবাদতের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

৭. অটিজম কর্ণার

প্রতিবন্ধীদের একটি অংশ অটিজম বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধী শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধাযুক্ত, বাধাজনক, বিকলাঙ্গ, বিকল, অক্ষম, ক্ষমার্হ, দৈহিক শক্তির একান্ত অভাব বা অঙ্গহানী হেতু যারা আশৈশব বাধাপ্রাপ্ত, মূক, বধির, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি।[১৮] ইবনুল আছীর (র) বলেন,

المُقْعَد: الَّذِي لَا يَقْدِر على القِيَامِ لِزَمَانَةٍ بِهِ، كأَنَّه قد أُلْزِم القُعُودَ.

> "অটিজম বা প্রতিবন্ধী বলা হয়, যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থতার ফলে দাঁড়ানোর সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন যেন তা তাকে বসতে বাধ্য করেছে।"[১৯]

দেশজুড়ে নির্মিত হতে যাওয়া ৫৬০টি মডেল মসজিদের নিচতলায় অর্টিজম বা প্রতিবন্ধীদের জন্যও বিশেষ সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে। কেউ হুইলচেয়ার নিয়ে এলে র‌্যাম্প দিয়ে উঠে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় নামায পড়তে পারবেন। প্রতিবন্ধীদের ওযূর জন্যও রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা।

৮. বই বিক্রয় কেন্দ্র

৫৬০টি মডেল মসজিদ স্থাপিত হলে এই সকল মসজিদেই বই বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এতে বহু সংখ্যক ইসলামী বই প্রেমিক অতি সহজেই উপজেলা বিক্রয় কেন্দ্র 'মডেল মসজিদ' থেকে অতি সহজেই বইসমূহ ক্রয় করতে পারবে। এ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় ইসলামী বই পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৯. মৃতের গোসল ও জানাযার ব্যবস্থা

মানুষ মরণশীল। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কেউ একে অবিশ্বাস করতে পারবে না। মৃত্যু বরণ করার পর মৃত ব্যক্তিকে যারা গোসল করান তারা অশেষ সাওয়াবের অধিকারী হন। মৃত ব্যক্তির জানাযার উদ্দেশ্যে হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা। জীবতদের মধ্যে যারা মৃত্যু সংবাদ শুনবে তাদের জন্য জানাযার নামায আদায় করা ফরযে কিফায়া।[২০] ৫৬০টি মডেল মসজিদের প্রত্যেকটিতে মৃত ব্যক্তির গোসল ও জানাযার জন্য পৃথক স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি উত্তম কাজ বলে প্রতীয়মান হয়।

১০. কার পার্কিং

বড় শহরগুলোতে যেখানে যানবাহন চলাচল বেশি, সেখানে রাস্তার পাশে যান রাখার জায়গা নির্দিষ্ট করা থাকে, যার বাইরে অর্থাৎ অন্যত্র যান রাখা নিষেধ করা হয়। নির্ধারিত স্থানে বা যত্রতত্র ইচ্ছামতো কার পার্কিং করতে না পারেন ও পার্কিং ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে ৫৬০টি মডেল মসজিদের আন্ডারগ্রাউন্ডে কার পার্কিং ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১১. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মসজিদে যখন থেকে রাত্রিকালীন মজলিস ও রাত জাগরণের বেশি প্রচলন হয়, তখন থেকে আলোর ব্যবস্থাও জরুরি হয়ে পড়ে। উকবা ইবনুল আয্‌রাক সর্বপ্রথম কা'বাগৃহে আলোর ব্যবস্থা করেন।[২১] মসজিদুন নববীতে সর্বপ্রথম বাতি দিয়েছেন উমর (রা)।[২২]

৫৬০টি মডেল মসজিদের জন্য 'সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন' করা হয়েছে। যাতে বিদ্যুৎ চলে গেলেও মসজিদ অন্ধকার না থাকে। সাথে সাথে সৌর বিদ্যুৎ চালু হয়ে যাবে। এটি বর্তমান সরকার প্রধানের একটি অসামান্য অবদান। যা ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মান ও মর্যাদা আরও বাদিয়ে দিন। আমীন!

১২. মেহমানদের আবাসন ও বিদেশি পর্যটকদের পরিদর্শন

মসজিদের মধ্যে উলামায়ে কিরাম ও মেহমান বসার জন্য বিশেষ কক্ষ থাকা উত্তম। বহিরাগত উলামায়ে কিরাম, মেহ্‌মান, বিদেশী পর্যটক যারা মসিজদের লাইব্রেরী দেখতে এবং তা থেকে উপকার গ্রহণের জন্য আসবেন তারা যেন নিরিবিলি বসে লেখাপড়া করতে পারেন সে জন্য মসজিদে আলাদা কক্ষ থাকা অতীব জরুরী। এ প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার ২৪০ জন দেশি-বিদেশি অতিথির আবাসন ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হবে।

১৩. অন্যান্য সুবিধা

মডেল মসজিদসমূহে উন্নত মানের ওযূখানা ও টয়লেটের ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে। মসজিদে কুরআন পড়ার জন্য রেহাল বা কুরআন রাখার কাঠামো থাকতে পারে। উঁচু স্থানে রেখে পাঠ শেষে যেন তা গুটিয়ে রাখা যায় এবং মুসল্লিদের নামাযে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। তাছাড়া অক্ষম লোকদের জন্য গুটিয়ে রাখার মতো কিছু সংখ্যক চেয়ার রাখা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, শান্তির ধর্ম ইসলামের শাশ্বত রূপ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যথাযথভাবে বাংলাদেশের জনগণের সামনে তুলে ধরা একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় ইসলামের প্রকৃতরূপ জনগণের মাঝে তুলে ধরতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিটি জেলা-উপজেলায় একটি করে মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। সে অনুযায়ী মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যা ইসলামের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী মাইলফলক স্পর্শ করেছে। আর এটি আমাদের দেশ ও দেশের বাহিরে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, "বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্মিত মডেল মসজিদসমূহ অসামান্য ভূমিকা পালন করেব ইনশাআল্লাহ্।" এ মসজিদগুলোর মাধ্যমে সর্বসাধারণ ইসলামের বাণীসমূহ জানতে, বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারবে। যা মুসলিম সমাজের সকল মানুষকে বিভিন্ন প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, যুলম ও নিস্পেষন থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামী ভাবাদর্শিত জীবন দিতে পারবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫ খ্রি./১৪২১ ব.), পৃ. ৯৪৭; Editorial Board, *Bangla Academy English-Bangla Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, Second Edition, 2015/1422 B.), p. 453.

২ আহমাদ ইবনুল ফারিস, *মাকাইসুল লুগাহ,* ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ফিকর, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ১০৫; মুহাম্মাদ আয-যুবায়দী, *তাজুল উরূস,* ৩৭শ খণ্ড (বৈরূত: দারুল হিদায়াহ, তা.বি.), পৃ. ৭৫।

৩ ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরাব,* ১৪শ খণ্ড (বৈরূত: দারুস সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৩৫; মাজদুদ্দীন ফিরুজাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত* (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৮ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি.), পৃ. ১২৫৯; আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৫।

৪ Time Chamber's Learner's Dictionry, Vol. 9, p. 368; *Shorter Oxford English Dictionary,* Vol. 1 (London: Oxford University Press, Fifth Edition), p. 1837.

৫ নাশওয়াদ বিন সা'ঈদ আল-হুমায়রী বলেন, موضع السجود من الأرض "জমিনে সিজদার স্থান।"

দ্র. নাশওয়াদ বিন সা'ঈদ আল-হুমায়রী, *শামসুল উলুম ওয়াদাউ কালামিল আরাব মিনাল কুলূম,* ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২৯৭৪।

৬ ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্যরা বলেন,.اَلْمَسْجَدُ: اَلْجَبْهَةُ حَيْثُ يَكُوْنُ نَدَبُ السُّجُوْد. "আল-মাসজাদু অর্থ কপাল, কেননা কপাল দ্বারা সিজদা করা হয়।"

দ্র. ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (ইউ.পি: কুতুবখানায়ে হুসায়নিয়্যাহ্, তা.বি.), পৃ. ৪১৬।

৭ মুফতি মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৯১ হি./১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৪৮৩-৪৮৪; সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১৫৫; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১৮শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৫৭; ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১; আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক, *মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১; মো. আব্দুল করিম, *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামী শিক্ষা ও দা'ওয়াহ-এর সম্প্রসারণ: প্রখ্যাত আলেমদের অবদান (১৯০৫-১৯৪৭)* (কুষ্টিয়া: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৮৬।

৮ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১০৭; ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস কাল'আজী ও ড. হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা* (পাকিস্তান: ইদারাতুল-কুরআন, তা.বি.), পৃ.

৪২৮; *ব্যক্তি সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা*, পৃ. ৬৭; *মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব*, পৃ. ১; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৭; *কাওয়া'ইদুল ফিকহ*, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪।

৯ *লিসানুল আরাব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

১০ ইসমা'ঈল ইব্ন হাম্মাদ আল-জাওহারী, *আস্-সিহাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ফিক্‌হ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪১৩; *লিসানুল আরাব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

১১ সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৮শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৭৫-৪৭৬।

১২ এ.জেড.এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, আল-আমীন সংগঠনের কর্মসূচি (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২১২।

১৩ পূর্বোক্ত।

১৪ মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, ২য় খণ্ড (আল-মানসূরাহঃ দারুল-জাদীদ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৪১০; *রাদ্দুল-মুহতার*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮; *কিতাবুল-ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৫-৫৯৬; *আল-বাহরুর-রাইক ফী শারহি কানযুদ্-দাকাইক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২।

১৫ ২০১৭ সালের হজ্জ কার্যক্রম উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম থেকে সংগৃহীত।

১৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাজাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, তাহ্‌কীক: ইউসুফ আলহাজ আহমাদ (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, ১ম সং., ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), হাদীস নং ১৭৭৩।

১৭ পূর্বোক্ত, অধ্যায় নং ৬১, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৩।

১৮ *বাংলা সংসদ অভিধান*, পৃ. ৩৮২; *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ৭৮০; *Autism Enplaning the Enigma*, p. 5.

১৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয্-যাবায়দী, *তাজুল আরূয মিন জাওয়াহিরিল কামূস*, ৯ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকার, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪৭।

২০ সম্পাদিত, *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃ. ৩৯৩।

২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ আল-আযরাকী, *আখবারু মাক্কাহ্* বৈরূত: দারুল আনদালুস, তা.বি.), পৃ. ২০০।

২২ ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী তামঈযিস্ সাহাবা*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি.), পৃ. ৩০।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ (Corruption Prevention and Value Development: An Islamic Perspective)

Dr. Md. Shafiqul Islam*

Abstract: Corruption is a severe worldwide problem. At present, the evil circle of corruption is spread in all spheres of our lives including politics, economy, administration, social, religious and educational activities. Corruption has gripped our society, politics and economy like an octopus. When people are unconcerned to moral values individually, collectively and nationally, Satan lures them to live a life of unlawful luxury. Even people do not hesitate to consume state and other wealth as their own wealth, forgetting the accountability of the hereafter. Human life's peace in this time and freedom and success in the hereafter are rooted in moral values and complete adherence to Islam. History is a witness; the world's first corruption-free state was gifted by Prophet Muhammad (PBUH). Even today, if we truly want to establish a corruption-free society and state, Islamic moral training must be made mandatory for all citizens and for those working at all levels of government. In order to overcome this great crisis of the nation, every responsible individual should continue the required efforts to improve themselves and make others better in their own way. In this case, it should be noted that until the fear of Allah is created in the mind of people, until the mentality of accountability in the afterlife is created, it is not possible to eradicate corruption. Corruption free society, state and world are the demand of all people of the world. Therefore, prevention of corruption and development of values is the hope of building a happy and prosperous ideal society. In this article, corruption prevention and value development on the basis of Islamic perspective will be discussed along with appropriate examples.

ভূমিকা

দুর্নীতি বিশ্বব্যাপী একটি ভয়াবহ সমস্যা। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কবলে আজ বিপন্ন মানব সভ্যতা। বর্তমানে দুর্নীতির অশুভ বলয় বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, সামাজ, ধর্ম ও শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত। তাই বিশেষজ্ঞরা দুর্নীতিকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দুর্নীতি বিরোধী বিশ্ব সংস্থা Transparency International (TI) ২০০১ সাল থেকে প্রতি বছর দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রকাশ করে থাকে। দুর্নীতির জন্য জরিপকৃত দেশের সংখ্যা প্রথমে ছিল ৯১টি, বর্তমানে যা বেড়ে হয়েছে ১৮০টি। ২০২২ সালের ২৫ জানুয়ারি (TI) তাদের বার্ষিক দুর্নীতির ধারণাসূচক (সিপিআই) প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছে যে, বিশ্বের কোনো দেশই দুর্নীতিমুক্ত নয়। তবে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হলো যৌথভাবে ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। তারপর রয়েছে নরওয়ে, সিঙ্গাপুর ও সুইডেন। আর সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হলো দক্ষিণ সুদান। তারপর সিরিয়া, সোমালিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইয়েমেন, উত্তর কোরিয়া, আফগানিস্তান, লিবিয়া ইত্যাদি। টিআইবি রিপোর্টে বাংলাদেশ চারবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দুর্নীতির দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ২০১২ সালে যা ছিল, ১০ বছর পরেও একই রয়েছে। অর্থাৎ ২০১২ সালে বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে ১৩তম হয়েছিল এবারেও ১৩তম হয়েছে।

মানুষ কেন দুর্নীতি করে তার উত্তর খুঁজতে ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মানসিকতা, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষই

* Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh.

কেবল দুর্নীতি করতে পারে। দুর্নীতির ভয়াল ছোবল থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হলে একজন পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষের জন্যে যে গুণ সবচেয়ে জরুরী তা হল নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হওয়া। তাই ইসলামের নৈতিক শিক্ষাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হবে, তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং আখিরাতের বিশ্বাস ও পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি অন্তঃকরণে সৃষ্টি করতে হবে। রাসূল (স.) প্রদর্শিত তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষাই পারে মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এবং দিতে পারে উন্নত নৈতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ একদল দক্ষ জনসম্পদ।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব গড়া সকলেরই দাবী। এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন হতে হবে এবং এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে লেখা-লেখি প্রয়োজন। এটি সময়ের দাবি। তাই একটি সুখী সমৃদ্ধ আদর্শ সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে ***দুর্নীতি প্রতিরোধ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ*** শীর্ষক এ প্রবন্ধে দুর্নীতির পরিচয়, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুর্নীতির অবস্থা, কারণ এবং তা প্রতিরোধে ইসলাম নির্দেশিত নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১. দুর্নীতির পরিচয়

নীতির বিপরীত হলো দুর্নীতি। নীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Moral, Ethics, Justice, Morality, policy, practice ইত্যাদি।[১] আভিধানিকভাবে দুর্নীতি শব্দের অর্থ নীতিহীনতা, নীতিবিরুদ্ধ আচরণ, কুনীতি, অসদাচরণ ইত্যাদি।[২] দুর্নীতি যে করে সে দুর্নীতিবাজ হিসেবে পরিচিত। দুর্নীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো- Corruption, unmorality, Bad Conduct or Morals, wicked policy, Misconduct ইত্যাদি।[৩]

দুর্নীতি হলো দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে কৃত অপরাধমূলক আচরণ। সহজ কথায় বলা যায়, দুর্নীতি হলো সমাজের প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরণের অপরাধমূলক আচরণ।

Social work Dictionary- তে দুর্নীতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-রাজনৈতিক ও সরকারী প্রশাসনে সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার এবং ব্যক্তি বিশেষকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা ব্যক্তি সুবিধা অর্জনই দুর্নীতি।”[৪]

বৃটিশ শাসনের অবসানের পর হতে অদ্যবধি এদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময় প্রণীত আইনে দুর্নীতির যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা এক্ষেত্রে উল্লেখের অবকাশ রাখে, The prevention of corruption Act. 1947- এ দুর্নীতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।[৫]

বাংলাদেশেও দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ পাশ হয়েছে। ঐ আইনের তফসিলে দণ্ডবিধির- ২৯ ধারাতে বর্ণিত অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] এসব অপরাধগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে, এগুলো অধিকাংশই অর্থ বা সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত।

২. বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপি দুর্নীতির অবস্থা ও ব্যাপকতা

দুর্নীতি বিরোধী বিশ্ব সংস্থা Transparency International (TI) প্রতি বছর দুর্নীতির ১০০ নম্বরের একটি ধারণা সূচক স্কেল প্রকাশ করে থাকে। বিশ্বে কোন দেশে কতটা দুর্নীতি হয়, সেটি যাচাই করতে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে শূন্য থেকে ১০০ পর্যন্ত নম্বর দেয়া হয়। সেই নম্বরের ভিত্তিতে ওই দেশের দুর্নীতির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যে দেশ যত কম নম্বর পায় সে দেশ তত বেশী দুর্নীতিগ্রস্থ বলে বিবেচিত। ২০২২ সালের ২৫ জানুয়ারি Transparency International (TI) তাদের বার্ষিক দুর্নীতির ধারণাসূচক (সিপিআই)-২০২১ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ ১০০-এর মধ্যে ২৬ স্কোর পেয়েছে। দুর্নীতির দিক থেকে বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থান ২০১২ সালে যা ছিল, ১০ বছর পরেও একই রয়েছে। ২০১২ সালেও বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে ১৩তম হয়েছিল। গত ১০ বছরে বাংলাদেশের স্কোর ২৫ থেকে ২৮ এর মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে টানা চার বছরসহ ছয় বছর বাংলাদেশের স্কোর হয়েছে ২৬, দুইবার ২৫ এবং একবার করে ২৭ ও ২৮। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান বরাবরের মতো এবারও দ্বিতীয় আর প্রথম আফগানিস্তান।

সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশ চারবার ১৩তম, দুইবার ১৪তম, একবার করে ১২তম, ১৫তম, ১৬তম ও ১৭তম হয়েছে। এই শতকের প্রথম দশকে অবশ্য বাংলাদেশ টানা তিনবার বিশ্বের সবচাইতে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছিল।

কোনো দেশই শতভাগ স্কোর পায়নি, অর্থাৎ বিশ্বের কোনো দেশই দুর্নীতিমুক্ত নয়। ১৩০টি দেশ ৫০-এর কম স্কোর পেয়েছে। ৮৮ স্কোর পেয়ে তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে যৌথভাবে ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। অন্য যেসব দেশ ৭৫ এর বেশি স্কোর পেয়ে ভালো ফল করেছে, তারা হচ্ছে নরওয়ে, সিঙ্গাপুর ও সুইডেন (৮৫), সুইজারল্যান্ড (৮৪), নেদারল্যান্ডস (৮২), লুক্সেমবার্গ (৮১), জার্মানি (৮০), যুক্তরাজ্য (৭৮) ও হংকং (৭৬)। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বরাবরের মতো ভুটান ৬৮ স্কোর এবং ওপর থেকে ২৫তম অবস্থান নিয়ে সবচেয়ে ভালো ফল পেয়েছে।

মাত্র ১১ স্কোর পেয়ে সর্বনিম্ন অবস্থানে দক্ষিণ সুদান। অন্যান্য যারা তালিকার সর্বনিম্নে, তারা হলো সিরিয়া, সোমালিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইয়েমেন, উত্তর কোরিয়া, আফগানিস্তান, লিবিয়া তুর্কমেনিস্তান, ডি আর কঙ্গো ও বুরুন্ডি; যাদের অনেকেই হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত অথবা ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত।

Transparency International Bangladesh (TIB) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, নভেম্বর ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে এবারের সূচকটি প্রণীত হয়েছে। আর ২০১৮ সালে সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহার প্রকাশ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার ঘোষণা করেছিলেন। মন্ত্রিসভা গঠনের পর তিনি মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। পরে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে শুদ্ধি অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের দলের নেতা-কর্মীসহ কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাস্তবে যা ঘটেছে, তা সম্পূর্ণ বিপরীত। দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার পেছনে অন্যতম অবদান রয়েছে রাজনীতির সঙ্গে অর্থ, দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতির ক্রমবর্ধমান ওতপ্রোত সম্পর্ক, যা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করছে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহির মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণের কারণে ক্রমবর্ধমানভাবে অকার্যকরতার পথে চলছে। যার কারণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকারের বাস্তবায়নের দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত, তাদের মধ্যেই বিচরণ করে দুর্নীতির অনুঘটক, অংশগ্রহণকারী, সুবিধাভোগী ও সুরক্ষাকারী। বিগত ২১ বছরের TI কর্তৃক বাংলাদেশের দুর্নীতির রির্পোটের সারণী নিম্নে প্রদত্ত্ব হলো

সারণী- ১

৩. দুর্নীতির কারণসমূহ

সকল দেশের দুর্নীতির কারণ এক নাও হতে পারে। অর্থনৈতিক কারণে বা অর্থনৈতিক সচ্ছলতার অভাবই যদি দুর্নীতির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে সামর্থ্যবান লোকেরা দুর্নীতি করার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, যার যত

বেশি আছে-তার লোভও যেন তত বেশি। সুতরাং অর্থের অভাব দুর্নীতির একটি কারণ হতে পারে, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। দুর্নীতির প্রসার বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। কারণগুলো নিম্নরূপ-

এক. ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধের অভাব: মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে, দলগতভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) নির্দেশিত আইনের প্রতি উদাসীন হয়, শয়তান তখন তাদেরকে অবৈধ ভোগ-বিলাসী জীবনযাপনের প্রতি আকৃষ্ট করে। ধর্মীয় মূল্যবোধ বর্তমানে সমাজে প্রায় অনুপস্থিত। মৌলিক তিনটি বিষয়কে আমরা দুর্নীতির জন্য প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। ক. মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন থেকে বিচ্যুতি। খ. রাসূলের (সা.) নেতৃত্বের প্রতি দুর্ভাগ্যজনক বিমুখতা। গ. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার প্রতি অনীহা।[৭]

দুই. উচ্চাভিলাষী জীবন যাপনের প্রবণতা: অতীতকাল থেকেই একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে উচ্চভিলাষী জীবন যাপন করার প্রবণতা বিদ্যমান। উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহ দুর্নীতি বৃদ্ধি করে। এছাড়া অপরের তুলনায় নিজে ভাল থাকার প্রতিযোগিতা মানুষকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

তিন. অর্থ-সম্পদের মাপকাঠিতে সামাজিক মর্যাদা নিরূপ: সারা পৃথিবীতেই যেন আজ অর্থের দ্বারা সামাজিক মান-মর্যাদা পরিমাপ করা হচ্ছে। সেই কারণে যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনই এখন মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাকওয়া।[৮]

চার. আর্থিক অসচ্ছলতা ও পারিশ্রমিকের স্বল্পতা: পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে উপার্জন করে তাদের প্রয়োজন মিটাতে যখন ব্যর্থ হচ্ছে তখন তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতেও দারিদ্রতা মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যায়।[৯]

পাঁচ. বেকারত্ব: বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণেও দুর্নীতি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বেকার যুবক অনেক সময় দুর্নীতিসহ বিভিন্ন সমাজিক অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। ফলে দেশে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ছয়. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ: দেশের পারিপার্শ্বিক পরিবেশও দুর্নীতির জন্য যথেষ্ঠ অনুকূল। দেশে এমনও সরকারী অফিস আছে যেখানে দুর্নীতি ছাড়া টেকাই দায়। ফলে কেউ কেউ দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে এক পর্যায়ে দুর্নীতি দেখেও না দেখার ভান করেন, অথবা নিজেও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে রেহায় পেতে চান।

সাত. প্রশাসনিক দুর্বলতা: দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবার অন্যতম কারণ হলো সরকারের তরফ থেকে অন্যায়-অপকর্ম দমন করার সদিচ্ছার অভাব। এদেশের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পদের পরিমান আয়ের সাথে দারুনভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও এসব ক্ষেত্রে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে শোনা যায় না।

আট. ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা: আইনের অস্পষ্টতার কারণেও সামাজিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে গাজী শামসুর রহমান যথার্থ বলেছেন, "বাংলাদেশে অপরাধ দূরীকরণের ব্যাপকতর কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেই। মারাত্মক অপরাধী দুর্নীতিপরায়নদের কঠোর শাস্তির বিধানের ব্যবস্থা থাকলে অনেককাংশে দুর্নীতি কমানো সম্ভব।[১০]

নয়. ব্যয় বহুল নির্বাচন: বাংলাদেশে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা খুবই ব্যয়সাধ্য। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিলে চাঁদা দিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। অর্থ প্রদান করার বিনিময়ে তারা অন্যায় উপায়ে বিভিন্ন অবৈধ সুযোগ-সুবিধা শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে আদায় করে।

৪. দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়

ইসলাম মানুষের জৈবিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যথোচিতভাবে পূরণ করার পাশা-পাশি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আত্মিক পরিশুদ্ধ করণের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে তোলে। এরপরও কেউ দুর্নীতি করলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

এক. নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।[১১]
দুই. দূর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা ও অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে।[১২]
তিন. অপরের অধিকার আদায় করতে হবে।[১৩]
চার. লোভ পরিহার ও আখেরাতমুখী জীবন গঠনের প্রতি জনগণকে উৎসাহ প্রদান করা দরকার।[১৪]
পাঁচ. প্রশাসনে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ দান আবশ্যক।[১৫]
ছয়. শ্রমের নায্য মজুরী প্রদান করতে হবে।[১৬]
সাত. দুর্নীতি পরায়নদের ইসলামী শরী'আহ মুতাবিক শাস্তি প্রদান করতে হবে।[১৭]
আট. অসৎ ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।[১৮]
নয়. দুর্নীতি বিরোধী জনমত গঠন ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।[১৯]
দশ. সত্যিকার অর্থে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কয়েম করা দরকার।[২০]

৫. মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধ একটি অলিখিত সামাজিক বিধান। সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবীয় অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ভিত্তিতে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। সমাজ জীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ইত্যাদি পর্যায়ে মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়।

মূল্য বা মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Value।[২১] আর আরবী প্রতিশব্দ الأخلاق। সাধারণভাবে মূল্যবোধ বলতে বোঝায়–আমাদের আচরণের ভালো-মন্দের দিক মূল্যায়ন করা।

নীতিবিজ্ঞানে মূল্য বা মূল্যবোধ (Value) কথাটির আক্ষরিক অর্থ- যোগ্যতা বা উৎকর্ষতা। নীতিবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'মূল্যবোধ (Value) হচ্ছে এমন একটি যোগ্যতা বা উৎকর্ষতা, যা আমাদের আচরণের লক্ষ্য ও কাম্য বস্তুকে গঠন করে।'[২২] আর সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায়- 'মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি আদর্শের মাপকাঠি যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও আকাঙ্খার নৈতিক, নান্দনিক এবং যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে।'[২৩]

মূল্যবোধের পরিচয় সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করেছেন।[২৪] অতএব বলা যায় যে, মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি মাপকাঠি, যার আদর্শে সমাজে বসবাসরত মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়; যার মাধ্যমে মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয় এবং যা মানুষের কাঙ্ক্ষিত আচরণ গঠন করে। মূল্যবোধ মানুষের নীতিবোধ, আদর্শ, জীবনাচরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সদগুণাবলির ইত্যাদির সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ।

৬. নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও উপায়

মূল্যবোধ মানব জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব জীবনে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, আদর্শ, কাঙ্ক্ষিত আচরণ ও নৈতিক ভাবধারা গঠনে মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ জন্য মহান আল্লাহ মানব জীবন সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কতগুলো নৈতিক নীতিমালা দিয়েছেন সেগুলোর যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে মানব জীবনে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ এবং অবক্ষয়রোধ সম্ভব। পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সুন্দর সমাজ। সমাজকে সুন্দর করতে হলে দরকার সমাজে বসবাসরত মানুষের ভালো আচার-আচরণ ও উত্তম চরিত্র। নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন- ১. সত্যবাদিতা ২. সাহসিকতা ও নৈতিক দৃঢ়তা ৩. হক অবলম্বন ৪. স্থির চিত্ততা ৫. ধৈর্য-সহনশীলতা ৬. বিনয়-নম্রতা ৭. কোমলতা-মানবিকতা ৮. সরলতা ৯. লজ্জাশীলতা ১০. ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা ১১. লজ্জা স্থানের হিফাযত ১২. যবান সংযত ১৩. বিবেক ও বুদ্ধি প্রয়োগ ১৪. অল্পেতুষ্টি, আখিরাতকে অগ্রাধিকার ১৫. বদান্যতা-আত্মত্যাগ ১৬. সময় ও সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার ১৭. হালাল ভক্ষণ ও হারাম বর্জন ১৮. ভ্রাতৃত্ব বজায় ১৯. পারস্পরিক সহযোগিতা ২০. অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা ২১. সৎ ও পূণ্যবান ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বন ২২. আমানত ও অঙ্গীকার পুরণ ২৩. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ২৪. আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশির অধিকার আদায় ২৫. অধীনস্থ ব্যক্তিদের সাথে সদাচারণ এবং তাদের অধিকার প্রদান ২৬. দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের অধিকার আদায়

২৭. সৃষ্টির সেবা ও মানব কল্যাণ ইত্যাদি।

আল্লাহ মানুষকে যেসব ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন সে সকল ইবাদাত যথাযথ ভাবে পালনের মাধ্যমে মানুষ তার চরিত্রকে উন্নত করতে সক্ষম হয়। সততা ও সত্যবাদিতা মানব চরিত্রের অনন্য গুণ। মিথ্যাবাদীরা বিপদে সাহায্য পায়না এবং তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করে না। সত্যবাদিতার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথী হও।"[২৫] তাকওয়াকে সচ্চরিত্রতার মূল বলা যায়। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বহুবার তাকওয়াবান হতে বলেছেন।[২৬] অতএব নৈতিক গুণসমূহ মানুষের জীবনের প্রত্যেক দিক এবং বিভাগের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। নৈতিক গুণ অর্জন ব্যতীত কেউ চারিত্রিকভাবে উন্নত হতে পারে না।

উপসংহার

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীনতার দীর্ঘ অর্ধশত বছরেও জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ হয়নি। আমরা যদি স্বাধীনতার সময়ে উন্নয়নের সমপর্যায়ে থাকা দেশগুলোর অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের উন্নয়ন তুলনা করি তাহলে দেখতে পাই, গত পাঁচ দশকেরও বেশী সময়ে বাংলাদেশর অগ্রগতির হার কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়ার তুলনায় খুবই শ্লথ। সুশাসনের অভাব ও দুর্নীতি যে এর অন্যতম কারণ, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। দুর্নীতি আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে অক্টোপাসের মতো ঝাঁপটে ধরে রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)। আজও যদি সত্যিকার অর্থে আমরা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে সব নাগরিকের এবং প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরে কর্মরত লোকদের জন্য ইসলাম নির্দেশিত নৈতিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। জাতির এ মাহসঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল পর্যায়ের প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে নিজে ভালো হওয়া ও অন্যাকে ভালো বানানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, যতক্ষন পর্যন্ত মানুষের মনের গহিনে আল্লাহভীতি সৃষ্টি না হবে, পরকালের জবাবদিহিতার মানসকিতা সৃষ্টি না হবে ততদিন দুর্নীতি সমূলে নির্মুল করা সম্ভব নয়।

তথ্যনির্দেশ

১ *Students Favourity Dictionary Bengla to English* (Dhaka: Faiguddin Pallabi, Mirpur, 1999), p. 707.

২ মোসলেম উদ্দীন আহমদ, আধুনিক বাংলা অভিধান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ৪১৩।

৩ *Students Favourite Dictionary*, p. 707.

৪ সৈয়দা ফিরোজা বেগম, ও মিঁয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক সমস্যা : স্বরূপ ও বিশ্লেষণ* (ঢাকা: প্রফেসর'স প্রকাশন, ২০০৪ খ্রী.), পৃ. ২৫০ ; ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল্-হাদীসের অবদন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রী.), পৃ. ৪০৭-৪০৮।

৫ *The prevension of corruption Act 1947*, Section- (4).

৬ বাংলাদেশেও দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ -এ বর্ণিত অপরাধগুলোর মধ্যে রয়েছে। ১. ঘুষ গ্রহণ এবং ঘুষ প্রদান ২. সরকারী কর্মচারীকে অপরাধে সহায়তা করা ৩. সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূল্যবান বস্তু বিনামূল্যে গ্রহণ ৪. কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রদর্শন ৫. কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বে-আইনীভাবে কোন ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত হওয়া ৬. কোন ব্যক্তির শাস্তির বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্য ৭. অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র প্রস্তুত ৮. অসাধু উদ্দেশ্যে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ ৯. মৃত্যুকালে আত্মসাৎকরণ ১০. অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ। ১১. অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করা ১২. নথি জাল করা ১৩. খাঁটি দলিলকে জাল হিসেবে ব্যবহার করণ ১৪. হিসাব বিকৃতকরণমূলক কর্মকাণ্ড ১৫. দুর্নীতিতে সহায়তা, ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টাকরণ। দ্র. *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন- ২০০৪, ধারা ২ (ঙ)।*

৭ দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২১ জুলাই, ২০০৭।

৮ সূরাহ আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩।

৯ মাও. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল্-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ৩১৬।

১০ মো. আনছার আলী খান, *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন* (ঢাকা : নিউ ওয়াসী বুক করপোরেশন,২০০৪ খ্রী.),পৃ. ১৩ ; *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৫, পৃ. ২৫৩।

১১ যে শিক্ষা অর্জন করলে একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে এরূপ শিক্ষা অর্জন করা অবশ্যক। ইসলাম নৈতিক

মানোন্নয়নমূলক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। যে সমাজের মানুষ সৎচরিত্রবান হয় সে সমাজে দুর্নীতি থাকতে পারে না। তাই সমাজ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করতে হলে সর্বপ্রথম অহীভিত্তিক শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যক। মহান আল্লাহ প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পর তাঁকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। দ্র. সূরাতুল বাকারাহ, ২ : ৩১। মহান আল্লাহ প্রথম নবীকে সৃষ্টি করে তাঁকে যেমন জ্ঞান শিক্ষা দিলেন, তেমন পরবর্তী সকল নবী-রাসূলদেরকেও এই শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাঁদের ওপর রিসালাতের মহান দায়িত্ব অর্পন করেন। নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার সর্বশেষ প্রান্তে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট প্রেরিত প্রথম বাণীও ছিল শিক্ষার তাকীদ সম্বলিত। দ্র. সূরাতুল 'আলাক, ৯৬ : ১-৫।

১২ এ পৃথিবীতে মহানবীর (স.) আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখানো, হালাল হারামের শিক্ষা প্রদান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করা। দুর্নীতির অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহকে ইসলাম হারাম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। দ্র. সূরাতুল বাকারাহ, ২ : ১৬৮।

১৩ হক বা অধিকার দুই প্রকার। এক. আল্লাহর হক (অধিকার), দুই. বান্দার হক। দুর্নীতির মাধ্যমে যে সমস্ত পাপ বা অন্যায় করা হয় তার অধিকাংশ বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট। ঘুষের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে চাকুরী প্রদান, স্বজনপ্রীতি, অন্যের সম্পদ আত্মসাতের সুযোগ প্রদান। বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট হক যথাযথভাবে আদায়ের জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। দ্র. সূরাতুল নিসা, ৪ : ৫৮।

১৪ সম্পদের প্রতি মোহ মানুষে স্বভাবজাত। এই মোহ যখন সীমালঙ্ঘন করে তখন তার অন্তর কলুষিত হয়ে যায়। ফলে সে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ উপার্জনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এ পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসের জন্য যে সামগ্রী রয়েছে, তা নিতান্তই স্বল্প, আখেরাতের তুলনায় খুবই তুচ্ছ। তাই আল্লাহ বলেন, (أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ) "তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।" দ্র. সূরাতুত তাওবাহ, ৯ : ৩৮।

১৫ রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যন্ত যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয় তাদের সততা, ন্যায়পরায়নতা, নৈতিকতা, খোদাভীতি, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশাত্ববোধ, যোগ্যতা, অর্থলোভ বিমুখতা, সৎ চরিত্রতা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না। ফলে প্রশাসনের সকল স্তরে অসৎ ও অযোগ্য লোক নিয়োগ লাভ করছে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেশে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ইসলাম দেশের প্রধান পদ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পদ পর্যন্ত লোক নিয়োগে উপরোক্ত গুণাবলীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) "যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহর স্মরণ শূন্য এবং স্বীয় কামনা বাসনার অনুসারী, আর যার কাজ-কর্ম বাড়া-বাড়ি পূর্ণ তুমি কখনই তার অনুসরণ করবে না।" দ্র. সূরাতুল কাহফ, ১৮ : ২৮।

১৬ প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্পমুজুরী বা বেতন প্রদান দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। তাই ইসলাম সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করেছে। শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরী দিয়ে দিবে।" দ্র. ইবন মাজাহ।

১৭ ইসলাম একদিকে যেমন দুর্নীতি দূরীকরণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তেমনি প্রতিকারের পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। ইসলাম সকল প্রকার দুর্নীতিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে তার জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছে। অতএব, ইসলামী শরী'আহ অপরাধসমূহের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা নির্দ্ধারন করেছে। এ শাস্তি গুলো যদি সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করা যায় তবে অবশ্যই সমাজ থেকে অপরাধ ও দুর্নীতি দূর হবে।

১৮ হারাম দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়, মুজদদারী, চোরামাল ক্রয়, বাজার স্বাধীনতায় কৃত্রিম হস্তক্ষেপ, মোনাফাখোরী, ধোঁকাবাজী, ওজনে কম দেয়া, সুদ খাওয়া ইত্যাদি কার্যক্রয় অর্থনেতিক দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম এ সমস্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলাম যে সমস্ত দ্রব্যাদি হারাম বলেছে তা ক্রয় বিক্রয় করতেও নিষেধ করেছে। দ্র. *সহীহুল বুখারী*, কিতকাবুল বুয়ূ, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ২০৮৩।

১৯ বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি দূর করতে হলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। তাই মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্যতা করো না।" দ্র. সূরাতুল মায়িদাহ , ৫ : ২।

২০ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই একমাত্র সুষ্ঠ ও কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষের মনগড়া আইন অচল। দ্র. সূরাতুল মায়িদা, ৫ : ৪৪, ৪৭, ৪৯; সূরাতুল আ'রাফ, ৭ : ৫৪। আল্লাহ বলেন, (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ) 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম দেওয়ার অধিকার নেই।' দ্র. সূরাহ ইউসুফ, ১১ : ৪০।

২১ ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে মূল্য বা মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত Value শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Valeo শব্দ থেকে, এই Valeo শব্দটি একাধারে শক্তি (strength) ও স্বাস্থ্য (health) উভয়কেই বুঝায়। অতঃপর বাংলা ভাষায় এ শব্দটির অর্থ গিয়ে দাঁড়ালো– ফলপ্রসূ ও উপযুক্ত হওয়া (effective and adequate)। আবার শব্দটির ফরাসি প্রতিশব্দ হচ্ছে Valeur, বাংলা ভাষায় যার অর্থ হলো–উৎকর্ষ (excellence); ইটালি প্রতিশব্দ Valuta, যার বাংলা অর্থ হলো–দাম; জার্মান প্রতিশব্দ wert, যার বাংলা অর্থ মূল্য। এভাবে শব্দটির প্রকৃত নিহিতার্থ নিয়ে দার্শনিকদের মতভেদ থাকলেও নিরপেক্ষ

দৃষ্টিতে শব্দটির প্রকৃত অর্থ–বস্তু বা ব্যক্তির মূল্যাবধারণ বা মূল্যবিচার। দ্রষ্টব্য : ড.এম মতিউর রহমান ও ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *দর্শনের মূলনীতি* (ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০০৯ খ্রি.), পৃ.২৩১।

২২ ড. এম. আবদুল হামিদ, *সমকালীন নীতি বিদ্যার রূপরেখা* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড, ২০০১), পৃ.১৫।

২৩ সম্পা দাস, *সমাজ কর্ম: প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা: বুক চয়েস, ২০০৫), পৃ.১৩৭।

২৪ মূল্যবোধের পরিচয়ে আলী খলীল মুস্তফা *আল-কীমাহ আল-ইসলামিয়্যাহ গ্রন্থে* বলেন, মানুষ, জীবন এবং বিশ্বজগত সম্পর্কে মৌলিক ইসলামী চিন্তা থেকে উৎসারিত এমন কিছু বিধান ও মানদণ্ড যা জাগতিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও অবস্থার আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের সামনে গঠিত হয়, যা তাকে তার সম্ভাব্যতা অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বেছে নিতে সক্ষম ও যোগ্য করে তোলে এবং যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহারিক রীতি-নীতি ও ব্যবস্থাপনার মাঝ থেকে রূপ পরিগ্রহ করে। দ্র. *মাওসু'আতু নাদরাতুন নাঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম*, ১ম খণ্ড (জেদ্দা : দারুল ওসীলাহ লি নাশরি ওয়াত তাওযী'), পৃ.৭৯।

স্পেফার মতে, "ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক ও কাঙ্খিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নামই মূল্যবোধ।" দ্র. ড. শওকত আরা, *উচ্চতর সমাজ মনোবিজ্ঞান* (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ.২১৯।

A value is a standard of judgment by which people decide on desirable goals and outcomes. David M. Newnan, *Sociology, exploring the Architecture of Everyday Life* (California : SAGE Publication Inc.) P.36.

Values Identify a group's ideals its ultimate aim and most general standards for assessing good and bad or desirable and undesirable. Rodney Stark, *Sociology* (California : Wadsworth Publishing Company) p.34.

Values broad cultural principles embodying ideas about what most people in a society consider to be desirable are not same as norms. Jon.M Shepard, *Sociology* (NewYork :West Publishing Company, 1981) P.65.

A value is an idea shared by the people in a society about what is good and bad, right and wrong, desirable and undesirable. David Popenoe, *Sociology* (Newjersey: Prentice Hall, 6th ed. 1986) p.57.

এন. আর. উইলিয়াম বলেন,"মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড, যার আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।" দ্র. মো: আতিকুর রহমান, *সমাজ কল্যাণ* (ঢাকা: কোরআন মহল, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৫৮; *উচ্চতর সমাজ মনোবিজ্ঞান*, পৃ. ২১৯।

২৫ আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ দ্র. সূরাতুত তাওবা, ৯: ১১০।

২৬ তাকওয়ার গুরুত্ব বুঝাতে পবিত্র কুরআনের কিছু নির্দেশনা হলো: সূরাহ আলে ইমরান, ৩: ১০২; সূরাহ আত-তাওবা, ৯ : ৪; সূরাতুল হুজরাত, ৪৯: ১৩; তাকওয়া অবলম্বন কারীর সফলতা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, সূরাহ আল আনফাল, ৮:২৯; সূরাতুত তালাক, ৬৫ : ২-৫; তাকওয়া না থাকলে মানুষ দুশ্চরিত্র, নির্লজ্জ ও ধৃষ্ট হয়।তাকওয়ার তথা খোদাভীরুতার গুরুত্ব বুঝাতে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (হে মুমিনগন! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভাবে ভয় করো এবং প্রকৃত মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা।) দ্র. সূরাহ আলে-ইমরান, ৩: ১০২।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কূটনৈতিক তৎপরতা: একটি পর্যালোচনা
(Diplomatic Practices of Prophet Muhammad (sm.) : An Overview)

Dr Md. Masud Alam*
Muhammad Abdur Rakib**
Md. Rabiul Awal***

Abstract: Muhammad (sm.), last and final messenger of Allah was sent to all humanity. He (sm.) is a role model for the whole mankind in all aspects of life. All through his life, he tried to establish peaceful and cordial relations between Muslims and other nations. The Prophet (sm.) was the most successful diplomat in the world history. He (sm.) introduced a communication method such as communication among national leaders or other tribal leaders by the way of assigned envoys, letters, or by visiting them personally. During his life time Prophet Muhammad (sm.) received many envoys from different heads of states for making an agreement of peace with Muslims after the defeat in Wars. The Prophet also sent envoys to the Arab and non-Arab rulers. He (sm.) presented excellent examples receiving, sending delegations and appointing protocol for the purpose of peaceful environment in surrounding territories and to spread the message of Allah to the whole mankind. In the modern world, Diplomacy is known as the lubricant for the machinery of international relations. It is a science of communication, dealing and negotiation among nations. Diplomacy plays very important and significant role in diffusing tension, signing treaties to make peace with enemy, exchanging prisoners of war and establishing contact with other countries. This paper tries to focus on the diplomatic practices of the Prophet (sm.) and his significant role in it. A special attention is given to reawaken the readers on how he preserved peace, how he conducted war, how he dealt with the non-Muslims, how he treated his allies and enemies and on how Islamic principles and values could be the best foundation for modern diplomacy and International Relations.

ভূমিকা

মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) হলেন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অনুপম আদর্শ বিদ্যমান। কূটনৈতিক তৎপরতা তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কূটনৈতিক জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা ছিল কল্পনাতীত। একজন আদর্শ কূটনীতিকের পরিচয় তাঁর নাবূওয়্যাত পূর্ব ও পরবর্তী জীবনে লক্ষণীয়। তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আরব জাহানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সামনে ইসলামের সুমাহন আদর্শ তুলে ধরে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মিত্র খুঁজে বের করা, কূটনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইনসাফভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পরস্পরের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিবাদগুলোর শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ সমাধানের চেষ্টা করা। এছাড়াও তিনি শত্রুদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্যও কূটনীতিকে ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতায় অবস্থাভেদে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছেন, বা নম্রতা প্রদর্শন করেছেন। নবী (সা.) এর সফল কূটনৈতিক তৎপরতার অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় চির অম্লান হয়ে রয়েছে । আলোচ্য প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

* Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205.
** Assistant Professor, Department of Arabic and Islamic Studies, Rajshahi College, Rajshahi.
*** Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Naogaon Govt. College, Naogaon.

১.১ কূটনীতির ধারণা

কূটনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে এর উদ্ভব। আবহমান কাল থেকেই প্রচলিত ছিল কূটনৈতিক দূত ও প্রতিনিধি প্রেরণের প্রথা। কূটনীতির সূচনা হয় প্রাচীন *গ্রিক* নগর রাষ্ট্রে। তারা নিজেদের প্রয়োজনে একে অন্যের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করত। *গ্রিক 'ডিপ্লোমা'* শব্দ থেকে *'ডিপ্লোম্যাসি'* শব্দটির সৃষ্টি বলে মনে করা হয়। *ডিপ্লোমা* শব্দটি গ্রিক ক্রিয়াশব্দ *'ডিপ্লোন'* থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো সেই নথি যা কর্তৃপক্ষ এবং শহরের রাজনৈতিক প্রধানদের দ্বারা জারি করা হয় এবং এর বাহক বিশেষাধিকার প্রদান করে।[১] বাংলা *কূটনীতি* শব্দটি সংস্কৃত শব্দ '*কূটানীতি*' থেকে আগত। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রথম মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের উপদেষ্টা চাণক্য কৌটিল্যর নাম থেকে কূটানীতি শব্দটির উদ্ভব। তিনি তার প্রণীত কিছু নীতিকে রাজনীতির প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা কূটনীতি হিসেবে পরিচিত।[২]

ইসলাম পূর্ব আরবে গোত্রীয় শাসন কাঠামোর মধ্যেও *সিফারাহ* বা কূটনীতি সম্পর্কিত কার্যক্রম চলমান ছিল। প্রথাগতভাবে কুরাইশ গোত্রের বনূ আদী পরিবারের লোকেরাই এ পদে নিযুক্তি পেয়ে আসছিল এবং ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারাই এ পদে বহাল ছিল। পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্র মুশরিক আরবদের নিকট থেকে সিফারাহ বা রাষ্ট্রদূতের কার্যক্রম উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করেছে এবং নতুন মাত্রা যোগ করে একে উন্নত করেছে। *সিফারাহ* নামক পুরাতন প্রতিষ্ঠানটি যা ইসলামী যুগে এসে নাম ধারণ করেছে *রিসালাহ* বা দূতাবাস নামে।[৩] সাধারণ অর্থে কূটনীতি বলতে কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সরকারি কার্যক্রমকে বুঝানো হলেও। পণ্ডিতগণ নানাভাবে কূটনীতির সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস চালিয়েছেন। ড. আদনান আল-বাকরীর মতে, কূটনীতি এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যা রাষ্ট্র এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যক্তিদের সাথে তার বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়নে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে একে অপরের সাথে তার অফিসিয়াল সম্পর্ক পরিচালনায় রাষ্ট্র দ্বারা ব্যবহৃত হয়।[৪] কূটনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য পরিচয় তুলে ধরে বেরিজ (Berridge) বলেন, `Diplomacy is the conduct of international relations by negotiation rather than by force, propaganda, or recourse to law, and by other peaceful means.

‘কূটনীতি হলো বলপ্রয়োগ, প্রচার বা আইনের আশ্রয় নেয়ার পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে এবং অন্যান্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করা।’[৫]

১.২ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কূটনৈতিক তৎপরতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রাসূল (সা.) এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন মানবজাতিকে সরল-সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ী করতে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে বলেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

‘তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এ দীনকে অন্য দীনের ওপরে বিজয়ী করে দেন: মুশরিকদের নিকট তা যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।’[৬] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- ادْعُ

إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

‘আপন পালনকর্তার পথের আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়।’[৭] উপর্যুক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের সুমহান বাণী সমগ্র বিশ্বমানবতার নিকট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও কৌশল অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। যা কূটনৈতিক উপায়-উপকরণের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। অতএব আবহমানকাল থেকে কূটনৈতিক তৎপরতা ইসলামের দাওয়াত প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত।

১.৩ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কূটনৈতিক তৎপরতার ধরণ

রাসূল (সা.)-এর জীবনে কূটনৈতিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা, হিকমত, মেধা ও মননের এক অপূর্ব সমন্বয় ছিল। তিনি তাঁর সুতিক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিবেচনা, নির্ভুল নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানব সমাজের প্রকৃত অবস্থা, দল বা

গোত্রসমূহের গতিবিধি ও মন-মানসিকতা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। যেমন নাবুওয়্যাত লাভের পূর্বে ৩৫ বছর বয়সে কা'বা ঘর সংস্কার লগ্নে হাজরে আসওয়াদ পুন:স্থাপনকে কেন্দ্র করে এক অনিবার্য সংঘাতের সম্ভবনা তৈরি হলে তিনি তাঁর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে অত্যন্ত সহজ, সুশৃংখল ও ন্যায়সঙ্গত পন্থায় জলন্ত একটি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছিলেন।[৮] তেমনিভাবে নাবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর মক্কার কাফির-মুশরিকদের সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের জীবন ও ঈমানের নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে হাবশায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন। হিজরতের জন্য দেশ হিসেবে হাবশাকে নির্বাচন করাও রাসূল (সা.)-এর কূটনৈতিক কর্মতৎপরাতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। শুধু তাই নয় তিনি এমন কিছু সাহাবীদের হিজরতের জন্য বাছাই করেছিলেন যারা একদিকে ছিলেন নির্যাতিত তেমনি অপরদিকে ছিল উন্নত নৈতিকতার অধিকারী, সাহসী ও বিচক্ষণ। হাবশায় হিজরতের পর নাজ্জাশীর রাজ দরবারে যখন তাদেরকে ডাকা হয় তখন তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে বাদশার সামনে আল-কুরআনের আয়াত ও ইসলামকে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেন। বিভিন্ন প্রশ্নে জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা.) জাহিলি যুগের সমাজ চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি আল্লাহর রাসূলের শিক্ষায় তাদের জীবন যে অর্থবহ ও বাস্তবসম্মত পরিবর্তন এসেছে তা তুলে ধরেন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় যা নাজ্জাশীর অন্তরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।[৯] কুরাইশ দূত 'আমর ইবনুল আসের (রা.) মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির কূটনৈতিক চালের মোকাবিলায় 'ঈসা (আ.)-এর নিখুঁত পরিচয় যেভাবে জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা.) তুলে ধরেন তা একদিকে তাঁর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক এবং অন্যদিকে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে হিকমাত অবলম্বন করার আল-কুরআনের নির্দেশনার বাস্তব প্রতিফলন।[১০]

১.৪ মদিনার সনদ প্রণয়ন

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার অব্যবহিত পরেই মদীনায় বসবাসরত মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ সমঝোতা করে কতগুলো নীতিমালার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হন। যা মদিনা সনদ নামে খ্যাত।[১০] পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত এ সনদ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ সনদের মাধ্যমে মহানবী (সা.) একজন সফল রাষ্ট্রনায়কের স্বীকৃতি লাভ করেন। এটির মাধ্যমে তিনি দ্বিধাবিভক্ত মদিনাকে গেঁথেছিলেন এক সুতোয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কূটনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত মদিনাবাসীকে তিনি একত্রিত করেন শান্তি ও সম্প্রীতির ডোরে। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সৌহার্দ-সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেন। মদিনা সনদের পরতে পরতে শান্তি, সম্প্রীতি, সহাবস্থান, মানবাধিকারের যে বার্তা রয়েছে তা অনুসরণ করলে বর্তমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত বিশ্বও পেতে পারে শান্তির অমীয় সুধা।[১১]

১.৫ হুদাইবিয়ার সন্ধি ও রাসূল (সা.) এর কূটনৈতিক তৎপরতা

মহানবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় গমন করলে মক্কার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে দ্বীন প্রচারের জন্য কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা ছিল অতীব জরুরি। এজন্য ৬২৮ সালে নবী করিম (সা.) প্রায় চৌদ্দ শত সাহাবীকে নিয়ে হজ্জব্রত পালনের জন্য মক্কার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু মক্কাবাসী প্রথা লঙ্ঘন করে তাদেরকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয় এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়। এ সময় মহানবী (সা.) হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করে বুদাইল ইবন ওয়ারাকার মধ্যস্থতায় কূটনৈতিক তৎপরতার আশ্রয় নেন। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানকল্পে মহানবী (সা.) মক্কায় খিরাশ ইবন উমাইয়্যাহ আল-খুজাইকে দূত হিসেবে পাঠালে কুরাইশরা তার উটকে হত্যা করে এবং মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য লোক পাঠায়। তারা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তবুও মহানবী (সা.) প্রতিশোধ না নিয়ে কূটনৈতিকভাবে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। এরপর তিনি পুনরায় উসমান (রা.)-কে দূত হিসেবে মক্কায় পাঠান। কুরাইশরা তাকেও আটক করে রাখে এবং কয়েকদিন পর গুজব রটে যে, উসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। এই খবর পাওয়ার পর সাহাবিদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা এই হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অবশেষে

মহানবী (সা.) সাহাবিদের নিয়ে দূত হত্যার বদলা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক তখনই শান্তি আলোচনার জন্য কুরাইশ কর্তৃক প্রেরিত দূত সুহাইল ইবন ‘আমর, হুয়াইতিব ইবন আব্দুল উয্যা ও মিকরায ইবন হাফস এসে উপস্থিত হয়। অনেক আলোচনার পর বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়, যা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।[১১] রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশদের সাথে আলোচনায় সবচেয়ে বেশি কূটনৈতিক সফলতা অর্জন করেন হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। এটিকে মহান আল্লাহ ফাতহুম মুবিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১২] উপর্যুক্ত আলোচনায় নবি করিম (সা)-কে আমরা একজন বিজ্ঞ কূটনীতিক হিসেবে দেখতে পাই। অত্যন্ত নাজুক ও বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও স্বীয় মর্যাদা ও অবস্থান বজায় রেখে এবং দ্বীনি মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে আদর্শের বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে আল্লাহর নবী কতটা পারদর্শী ছিলেন তা তাঁর এসব কর্মকাণ্ড থেকে অনুধাবন করা যায়।

১.৫ পত্র ও দূত প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাবুয়্যাতি জীবনের বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনা ও বৈদেশিক যোগাযোগের সোনালি অধ্যায়। হিজরি ষষ্ঠ সালে ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হলে আরব উপদ্বীপে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকে। সে সুযোগে প্রিয় নবী (সা.) ইসলাম প্রচারে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। শান্তি, সহযোগিতা, সহাবস্থান ও সৌহার্দ-সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে মুসলিম দূতরা পৌঁছে যান তদানীন্তন বিশ্বের পরাশক্তি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শাসক ও প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকটে। তবে এসব শাসক ও তাদের কাছে প্রেরিত দূতদের মধ্যে যাদের নাম হাদীস ও সীরাহ গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে রোম সম্রাট (কায়সার) হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত দূত দিহয়াহ ইবন খলীফা আল-কালবী (রা.), আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশির নিকট ‘আমর ইবন উমাইয়া আল-যামুরী (রা.), পারস্যের অধিপতি (কিসরা) খসরু পারভেজের নিকট ‘আব্দুল্লাহ ইবন হুযায়ফা আস-সাহমী (রা.), মিসর রাজ মুকাওকিসের নিকট হাতিব ইবন আবি বালতা (রা.), ইয়ামামার গভর্নর হাওযা ইবন আলীর নিকট সাবিত ইবন ‘আমর (রা.), বাহরাইনের গভর্নর মুনযির ইবন সাওয়ার নিকট আল-‘আলা ইবন আল-হাদরামি (রা.), ওমানের গভর্নর জাফর ইবন জুলান্দির নিকট ‘আমর ইবন আল-আস আস-সাহামি (রা.)ও দামেস্কের গভর্নর হারিস ইবন আবি শামর গাসসানির নিকট শুজা ইবন ওয়াহাব আল-আসাদি (রা.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১৩]

মহানবি (সা.) তাঁর নবুয়তকালের সমসাময়িক রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের আহবান সম্বলিত যেসব পত্র পাঠিয়েছিলেন তার সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক বলে মিসরীয় গবেষক ড. হামিদুল্লাহ উল্লেখ করেছেন।[১৪] উক্ত পত্রগুলোর মধ্যে তৎকালীন সময়ের সর্বাধিক ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে যে পত্রটি পাঠিয়েছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহর বান্দা ও রাসুল মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস বরাবর। ন্যায়ের পথের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যদি শান্তি লাভ করতে চান, তবে ইসলামে দীক্ষিত হোন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দেবেন। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আপনার সব প্রজাসাধারণের ভ্রষ্টতার দায় আপনার ওপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! বিতর্কিত সব বিষয় স্থগিত রেখে এসো, আমরা এমন এক বিষয়ে (তাওহিদের বিষয়ে) ঐকমত্যে পৌঁছি, যাতে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। আর তা হলো আমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না... যদি এই বিষয়গুলো আপনি অস্বীকার করেন, তবে শুনে রাখুন, সর্বাবস্থায় আমরা আল্লাহর একত্বের বিশ্বাসে অবিচল থাকব।’[১৫]

রাসূল (সা.) তদানীন্তন বিশ্বের পরাশক্তি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শাসকগণ ও প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তাদের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে শান্তি চুক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূত্রপাত করে গেছেন তা ভবিষত প্রজন্মের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

১.৬ উপসংহার

রাসূল (সা.)-এর পুরো জীবনের সমস্ত কর্মতৎপরতাই ছিল হিকমাতে ভরপুর ও চমৎকার কর্মকৌশলে পরিপূর্ণ।

যার যুক্তি ছিল অত্যন্ত ধারালো এবং আবেদন ছিল চিত্তাকর্ষক। ফলে অতি অল্প সময়ে মক্কায় অংকুরিত ইসলাম নামক সেই ছোট্ট চারা গাছটি পরিণত হয় বিশাল মহীরুহে। কূটনৈতিক পারদর্শিতা ও দক্ষতা দিয়ে আল্লাহর নবী অনেক ক্ষেত্রে বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর এই কূটনৈতিক তৎপরতায় ছিল না কোন কূটকৌশল; বরং এতে ছিল নৈতিকতা ও সততার পরম বাস্তবতা। তাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় রয়েছে শাশ্বত ও সর্বজনীন জ্ঞানের আধার। তা থেকে যেকোনো দেশ নির্যাস সংগ্রহ করতে পারে। করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বর্তমান বিশ্ব একটি সংকটকাল পার করছে। ফলে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারসাম্য রক্ষা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ সমর্থ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন জরুরি। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় খাদ্যসামগ্রী, ভোজ্য ও জ্বালানি তেলের বৈশ্বিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার কম-বেশী প্রভাব বিশ্বের প্রায় সকল দেশে পড়েছে। এই বৈশ্বিক বাস্তবতায় আমরা যদি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর অনুশীলিত কূটনৈতিক তৎপরতাকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে বিশ্ববাসী বর্তমান সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১ বাংলা উইকিপিডিয়া, 'কূটনীতি' শিরোনামে ০৯:০৮, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২; প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে তথ্য সংগৃহীত।

২ মতিউর রহমান চৌধুরী, *কূটনীতির অন্দরমহল*, https://www.rokomari.com/book/13013/kutnitir-ondormohol|

৩ ড.মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *অর্গানাইজেশন অব গভর্ণমেন্ট আন্ডার দি প্রফেট (সা.)*, অনুবাদ: মুহাম্মাদ ইবরাহীম ভুঁইয়া (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ.২১৯-২২০।

৪ ড. 'আদনান আল-বাকরী, *আল-'আলাকাতুদ দিবলূমাসিয়্যাহ* (কুয়েত: কাযিমাহ, ১৪০৫হি./ ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ.৪২।

৫ Berridge, GR, *Diplomacy: theory and practice,* 2nd edn, (New York :Palgrave, 2002), p.1.

৬ সূরাহ আত-তাওবাহ: ৩৩।

৭ সূরাহ আন-নাহল: ১২৫।

৮ রহমান আল-মুবারকপূরী, *আর-রাহীক আল-মাখতূম* (কায়রো: দারু ইবনুল জাওযী, ২০০৭ খ্রি.), পৃ.৪৭।

৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭।

১০ প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৭-১৪৮।

১১ আস-সুহায়লী, *আর-রাওদূল উনূফ*, ৪র্থ খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ.৪৩-৪৫;আল-ওয়াকিদী, *কিতাবুল মাগাযী*, ১ম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ.৬০৮; *আর-রাহীক আল-মাখতূম*, পৃ.২৯৪-৩০৪।

১২ সূরাহ আল-ফাতহ: ১।

১৩ ইবন হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ),পৃ. ৬০৭; *আর-রাহীক আল-মাখতূম*, পৃ.৩১৩-৩২৭।

১৪ https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2017/12/01/572175

১৫ ইমাম বুখারী, আল-জামিউস*আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুস সাফা, ১৪২২ হি./ ২০০৩ খ্রি.), পৃ.১১-১২; ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ*, ৯ম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ.২৩৫; হা-৩৩২২, সাহীদুল বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ.৪০৩-৪০৪, হা-৪৫৫৩।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

زواج المسلم من المشركة أو الكتابية:دراسة تحليلية

(Advices of Luqman (A.): Teachings and Implementation)

Dr. A. N. M. Masudur Rahman*

Abstract: Allah (SWT) mentioned some persons in the holy Quran; they were the pioneers and models of the society. Hazrat Luqman (A) was one of them. He was a pious and wise man and seems to be a prophet to somebody. He was an African. On account of his knowledge and intelligence he became a judge in the period of Daud (A.). He led his life in the light of Islam properly. He thought about the future of his beloved son. So, he advised him to lead his life accordingly. There is a chapter (*Surah*) in the Quran named 'Surah Luqman'. Allah described a lot of advice given by Luqman (A.) to his son so that human beings can learn and adapt those in their practical life. This article tries to focus on the advice of Luqman (A.) mentioned in the holy Quran and also find out the teachings of them. It is also an attempt to implement them in human life.

Introduction

Al-Quran is the main and principal source of knowledge. According to the Quranic views some persons are mentioned in this book for their contribution to the society and world. Also they were the pioneer and model of the society or country. Luqman (A.) was one of them. He was a pious and wise man and seems to be a prophet to somebody. He wanted a good future of his son. So he selected some advices for his son and advised him accordingly. He started the advices with belief in One Allah. He also makes clear that joining others in worship with Allah is the only unforgivable sin. Next, after laying the foundations of faith, Luqman (A.) reminds his son of the essential values a believer must strive to acquire, while simultaneously shunning pride and arrogance. His advices have significance in human life. Teachings of these advices are important to make a family or a society accordingly. For that, these advices are applicable now and can be followed and used in this century.

Luqman (A.) in a brief

He was Luqman Ibn Baura Ibn Nahur Ibn Azar. He was a son of sister of the Prophet Ayub (A.). He was an African who was caught as a slave and sold in Arab country; then, he was freed. So, somebody said that he was from the people of Madyan and Ayka. He lived during the period of Prophet Dawud (A.). He issued *fatwas* (Islamic law) beforehand but when he met Prophet Dawud (A.), he stopped it. It is stated that his profession was tailoring and carpentry.[1]

There is a controversy whether Luqman was a prophet or not. According to some scholars, he received revelation, so, he was a prophet. According to some other scholars, he was a righteous slave who was given wisdom. He was a slave who thought a lot, who had foresight and who kept silent a lot. He loved Allah and Allah loved him. Famous historian Al-Waqidi (R.) said, `Luqman (A.) was a judge for Bani

* Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi.

Israil.' Every Islamic scholar commented that he was a wise man. But, according to Ekarama's (R.) opinion, he was a prophet of Allah.[2]
According to a Hadith, once Luqman was asked, "What has brought you to what we see?", referring to his high rank. Luqman said, "Truthful speech, fulfilling the trust, and leaving what does not concern me."[3]

Advices of Luqman (A.) to his son

Luqman (A.) advised his son to do something in the practical life. We found these advices in the Qur'an in the chapter named 'Lqman' chapter 31 and verses 12-19. These advices were not applicable for the certain time, but also more essential for every bringing up children of every era on account of its quality and nature. So, Allah mentioned these advices in the Qur'an for human being to do best and to be modest in the world. Therefore, these advices are also applicable nowadays and can be followed and used by any parents who want to make their children in the light of Islam, and who want to establish this issue as the vital key to success in this life and on the Day of Judgment. The advices are mentioned below:

1. **Allah has no partners**

   Firstly, Luqman (A.) advised his son about Allah, who is the creator of everything. He said to him that Allah has no partners or associates to lead any kinds of His actions. Nobody can assist and help Him in any sector. He is the Almighty. Then he took his son's attention to what is the most necessary action in the eyes of Allah. Anybody who associates others with Him, he performs the biggest wrong and the greatest sin to the Creator and Director of the universe. The performer of the greatest sin, ultimately he involves himself with the anger of Allah and a dangerous punishment in hereafter. Allah says,

   'Behold, Luqman said to his son by way of instruction: O my son! Join not in worship others with Allah. Verily! Joining others in worship with God is a great wrong indeed.'[4]

   Also Allah does not forgive and release them who take any kinds of associates with Him.

   The above verse indicates that there are no options to do sin by taking any kinds of associates with Allah. Everybody should worship only for Him. He is the only one creator, sustainer and owner of the whole universe and He is also owner of the Day of Judgment. [5]

2. **To do good behaviour to the parents**

   Luqman (A.) advised his son to be dutiful and to do modest behaviour to the parents. Because, they suffer and tolerate a lot of difficulties for fostering their children. There are no demoniacs and nearest relatives without parents in the world. Only they do everything for their children being unselfish and selfless. Islam mentioned very kinds of rights to the parents. Such as: good behaviour, honouring, feeding, respecting to them. Those encourage us to be more dutiful and obedient to them. Allah says,

   'And We have enjoined on man (to be dutiful and good) to his parents. His mother carried him, (increasing her) in weakness upon weakness, and his weaning is in two years.'[6]

In this verse Allah mentions mother's difficulty which is faced to raise their children. So, Allah demands that the child gives thanks to his parents. Allah reminds us then that it is to Him that we will return so our first allegiance is to Allah alone, followed by devotion and kindness to our parents.

To be dutiful to the parents is the most important work after offering worship to Allah. It's cleared in the Qur'an.

The above verse mentions the rights of parents in the same sentence as the most important aspect of Islam, worshipping Allah alone. These indicate that being kind to parents, honouring and respecting them, is extremely important in the way of life that is Islam.

3. To be grateful to Allah

Luqman (A.) advised his son to be grateful to Allah. He is the Almighty, Creator and Lord of the Day of Judgment. Allah mentions this matter in the Qur'an and teaches us to be thankful and obliged to Him. Allah says,

'*Give thanks to Me and to your parents. Unto Me is the final destination.*'[7]

Narrated Abu Juhair (R.): The Messenger of Allah said,

'Whoever does not give thanks to Allah, he will be deprived from more blessings of Him.'[8]

The above verse and Hadith indicate that everybody should be thankful to his creator. It's also one of the most important duties of human being to Allah. If a man does not give thanks to his creator, then he will be asked in Day of Resurrection.

4. To be disobedient to the parents in special case

Everyone should obey his parents. There are no ways to be disobedient to them. But if they compel their children to take associates with Allah in worshiping, then the children will not be obliged to obey their orders. In this connection, Islam suggests to show them good behaviour in the earth. Allah says,

'But if they both strive with you to make you join in worship with Me others that of which you have no knowledge, then obey them not, but behave with them in the world kindly.'[9]

5. To follow the ways of those who love Allah

Luqman (A.) advised his son to follow those paths who obey Allah properly. Those persons are the nearest by Allah. Allah also teaches and orders mankind to follow their paths. Allah says,

'And follow the path of him who turns to Me in repentance and in obedience.'[10]

This subject also declared in the Qur'an as the prayer of human being.

The indication of above verse is more important to lead a life by following activities of all Prophets and all Messengers and their companions. We should do that properly.

6. Return of everybody is to Allah

After departure, everybody will come back to Allah. There are no other ways to go. So, everyone should be presented him on the Creator as the good performers and good workers in the earth. Allah says,

'*Unto Me is the final destination.*'[11] *'Then to Me will be return, and I shall tell you what you used to do.*'[12] '

The mentioned verses indicate that every creature will be come back to Allah after its death. Only human being and Zinn will be asked about their own activities.

7. To inform Allah's Power

Allah is the almighty. Luqman (A.) advised his son to remember the mighty and power that belongs to Allah. He knows everything. He is the only one wisest in the universe.[13] On account of perfectness of His knowledge, anything that happens or will happen in this world is already known by Allah. Allah's might is absolute and should not be questioned, challenged or ignored by anyone. So, Allah is able to present every deed of human being on the Day of Judgment. Allah says,

'*O my son! If it be (anything) equal to the weight of a grain of mustard seed, and though it be in a rock, or in the heavens or in the earth, Allah will bring it forth*.'[14]

8. To establish regular prayer

Offering prayer is one of the five pillars of Islam. It has great importance to build up an ideal man and to make an amicable society. Also it encourages to utilizing the time properly. For this reason Luqman (A.) advised his son to pray regularly and in the right time frame. Prayer is our way of connecting with and maintaining a connection with Allah. Allah says,

'O my son! Offer prayer perfectly.'[15]

The above discussion encourages to offering prayer properly in time. It's also a symbol of an active believer.

9. To enjoin what is Just and to forbid what is wrong

Human beings are vicegerent on the earth. So, they are responsible to perform good actions and enjoining what is just and good. Besides this, they should forbid mankind from evil. According to the Islamic Shariah, those are important responsibilities on every believer; rulers and subjects, men and women. So, Luqman (A.) advised his son to enjoin what is just and to forbid what is wrong. Allah says,

'*Enjoin on people all that is good and forbid them from all that is evil*.'[16]

The above verse indicates that, calling to the just and forbidding from the evil are the major duties of a best nation, who is believer completely and successful in Hereafter. So, we should perform the duties and responsibilities accordingly.

10. To bear with patient constancy

Patience is a divine virtue gifted by Allah. Those bodies who took this virtue will be succeeding in the world and Hereafter. Also Allah stays with patients. Luqman (A.) advised his son to be constant with patience in the crisis moment. Particularly, when dealing with people for this purpose and in all matters. Allah says,

'And bear with patience whatever befalls you.'[17]

The above verses indicate that the remembering of Allah and contemplating His greatness is the key to patience, and patience is a key to Paradise everlasting. Therefore, this was a wise advice indeed. So, Allah mentioned this in the Qur'an as a royal teaching.

11. Not to be arrogant

According to Islam, all people are equal in society. For being honourable, Islam does not permit any race, colour or language. Only *taqwa* is the template of honour. On the other hand, arrogance can lead into Hell. On account of Satan's arrogance, Allah expelled him from Paradise. So, Luqman (A.) advised his son to be humble in society and also ordered him to dignify all people equally. Allah says,

`And turn not your face away from men with pride nor walk in insolence through the earth. Verily, Allah likes not any arrogant boaster.' [18]

The above verses suggested that there are no ways without being humble and gentle to mankind. Believers should be known for the humility, gentleness and mercy in their behaviour. On account of their fault, Allah will seize them on the Day of Resurrection.

12. To be moderate and lower own voice

Moderate pace and lower voice are symbol of beauty and modesty. On the other hand, loud and raising voices cause making noise and crack. Even, Allah loves them who walk in moderate pace and speak by lower voice. So, Luqman (A.) advised his son to be moderate in motion and lower voice in speaking. Allah says,

'And be moderate in your walking and lower your voice. Verily, the harshest of all voices is the braying of the asses.' [19]

The mentioned verse indicates that, Luqman (A.) advised his son to walk gently on this earth and not to crash into situations with heavy boots. Finally he ordered him to be lower his voice. Being loud and harsh voice is compared with a voice of donkey that is disliked to all.

Teachings and Implementation

Luqman (A.) was not a prophet but he was a wise man that Allah had blessed with wisdom. His advices to his son have significance in our practical life. Teachings and moral of these advices are important to make a family or a society accordingly. For that, these advices are applicable now and can be followed and used by any parent wanting to raise a child in the light of Islam. It is said that if all parents implemented advices of Luqman (A.) then there would be no need to worry about the fate of the children in the Hereafter because they have been shown the path that leads to Paradise. In the few short verses of the Quran that contain Luqman's advice to his son is the key to success in this life and on the Day of Judgment.

Conclusion

Luqman (A.) the wise counsels his son with some advices. It is important to note that Luqman (A.) begins with the most important lesson; belief in One Allah. He also makes clear that joining others in worship with Allah is the only unforgivable sin. Next, after laying the foundations of faith, Luqman (A.) reminds his son of the essential values a believer must strive to acquire, while simultaneously shunning pride and arrogance. Luqman (A.) wanted the best for his son and gave him advice that would hold him in good stead in both this world and the Hereafter. When today's parents can convey these advices to their children they are laying the foundations for a happy life. If children can model this behaviour as demonstrated by their parents

and caregivers it is even better. These advices hold true in any era and century. So, implementations of all teachings of the advices are obligatory and most essential for a family, society or the country in this century. If we implement these advices in our practical life, we will be benefited in the world and Hereafter.

References

[1]. Abu Zakaria An-Nawabi, *Tahzibul Asma wal-Lughat*, V 2 (Bairut: Darul Kutubil Ilmiah, without Date), P 71; Ahmad As-S'alabi, *Al-Kashfu wal Bayanu Un Tafsiril Quran*, V 7 (Bairut: Daru Ihyait Turasil Arabi, 1422 H.), P 312; Husain Ibn Muhammad Bekri, *Tarikhul Khamis*, V 1 (Bairut: Daru Sader, without Date), P 78; Hafiz Ibn Kathir, *Tafsirul Quranil Azim*, V 6 (Bairut: Daru Taiyabah, 1420 H.), P 330.

[2]. Abul Muzaffar As-Sam'ani, *Tafsirul Quran*, V 4 (Riyadh: Darul Watan, 1997), P 229; *Tahzibul Asma wal Lughat*, V 2, P 71 .

[3]. *Tahzibul Asma wal Lughat*, V 2, P 71; *Tafsirul Quranil Azim*, V 6, P 333 .

[4]. Al-Qur'an, Surah Luqman, 31:13.

[5]. This subject is also said in the Qur'an. Cf: Surah al-Fatiha, 1:4-5.

[6]. Surah Luqman, 31:14.

[7]. *Ibid*

[8]. Surah Ibrahim, 14:7.

[9]. Surah Luqman, 31:15.

[10]. Surah Luqman, 31:15.

[11]. Surah Luqman, 31:14.

[12]. Surah Luqman, 31:15.

[13]. Allah says, 'but over all those endowed with knowledge is the All-Knowing (Allah).' cf: Surah Yusuf, 12:76.

[14]. Surah Luqman, 31:16.

[15]. Surah Luqman, 31:17.

[16]. *Ibid*

[17]. Surah Luqman, 31:17.

[18]. Surah Luqman, 31:18.

[19]. Surah Luqman, 31:19.

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

ভারত উপমহাদেশে আরবী ভাষায় তাফসীর চর্চা, ধারা ও প্রকৃতি
(The Trend of Arabic Tafsir in the Indian Subcontinent)

Dr. Md. Barqullah-Bin-Dur*

Abstract: The subcontinent is located on the eastern side adjacent to the Arabian Peninsula. From ancient times the people of Central Asia have been travelling through the northern border of India, the people of West Asia through the western border and the west coast for commercial and political purposes. It is difficult to say for sure when this practice started in the Indian subcontinent and who started it. Since there is no complete history of the Indian Muslims, the biography and bibliographic information from the inception to the present are not available. From the very beginning of complete Islam, the companions of the prophet (PBUH) came out intending to spread Islam. When the Qur'an reached a country, the scholars of that country considered it their religious duty to translate the Qur'an into their mother tongue. Thus, as soon as Islam entered the subcontinent, the practice, translation and interpretation of the Qur'an began. Numerous translations and commentaries of the Qur'an were published in Bengali, English, Arabic, Urdu, Persian and other languages prevalent in the region. The number of unpublished manuscripts of translations and commentaries is not meagre either. This article discusses the context and analysis of the practice of tafsir in the Indian subcontinent.

ভূমিকা

আল-কুরআন ‘আরবী ভাষায় নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। সাহাবাগণ আল-কুরআন শ্রবণ করা মাত্রই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বুঝতে পারতেন। তবে আয়াতের সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনের জন্য সাহাবা-ই-কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি জিজ্ঞাসিত বিষয়ের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সাহাবাদের সামনে উপস্থাপন করতেন। ফলে সাহাবাগণ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন। এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাফসীর অভিজ্ঞানের সূচনা হলেও কালের পরিক্রমায় প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে আজ তাফসীর শাস্ত্র ইসলামী জ্ঞান গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তাফসীরের জ্ঞান ব্যতীত আল-কুরআনের পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। কুরআন যখন কোন অনারব দেশে পৌঁছে, সে দেশের ‘আলিমগণ’ মাতৃভাষায় কুরআনের ভাষান্তর করা ঈমানী দায়িত্ব ভেবেছেন। এভাবে ইসলাম উপমহাদেশে প্রবেশ করার পরপরই কুরআনের চর্চা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ আরম্ভ হয়।

তাফসীর পরিচিতি

অভিধানবেত্তাদের মতে تفسير (তাফসীর) শব্দটি একবচন, বহুবচন تفاسير (তাফাসীর)।[১] বাবে تفعيل এর ক্রিয়া মূল। এর আভিধানিক অর্থ প্রসঙ্গে ইমাম যুরকানী (রহ) বলেন, "التفسير فى اللغة الايضاح و التبيين" তাফসীর অর্থ স্পষ্ট করা, বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।[২] যেমন মহান আল্লাহ বলেন, و لا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق و احسن تفسيرا. তারা আপনার নিকটে এমন কোন বিস্ময়কর সমস্যা নিয়ে আসেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনাকে আমি দান করিনি।[৩] আবু হাইয়্যান বলেন, الاستبانة و الكشف বা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা, উন্মুক্ত করা।[৪] আল্লামা শিহাবুদ্দিন আলুসী বলেন, البيان و الكشف অর্থ বর্ণনা করা, উন্মুক্ত করা।’[৫] কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী বলেন, মূল ف، س، ر বর্ণ থেকে তাফসীর শব্দটি উদ্ভূত। فسر অর্থ উন্মুক্ত করা, অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা।[৬] মান্না‘ আল কাত্তান বলেন,

---

* Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh.

"التفسير في اللغة تفعيل من الفسر بمعنى الابانة و الكشف و اظهار المعنى المعقول، فعله: كضرب و نصر، يقال فسر الشى يفسر و يفسره بالضم فسراً و فسره: ابانة، و التفسير و الفسر: الابانة و كشف المغطى."

আভিধানিক দৃষ্টিতে তাফসীর শব্দটি বাবে তাফয়ীল এর الفسر ক্রিয়া মূল থেকে উদ্ভূত। অর্থ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা, খোলা, বুদ্ধি ভিত্তিক অর্থ প্রকাশ করা। ক্রিয়ারূপে তাফসীর শব্দটি বাবে ضرب ও نصر এতদুভয় থেকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭] প্রফেসর মিঞা মনজুর আহমদ এর মতে: "আভিধানিক দৃষ্টিতে তাফসীরের মূল ধাতু হচ্ছে فسر 'ফাসারা' যার অর্থ খুলে দেয়া, বিশ্লেষণ করা, প্রকাশ করা। কোন গ্রন্থের উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করাকেই তাফসীর বলে।"[৮] আল্লামা সুয়ূতী বলেন,

"التفسير تفعيل من الفسر و هو البيان و الكشف. و يقال هو مقلوب السفر. تقول اسفر الصبح: اذا اضاء و قيل و خوذ من التفسيرة و هى اسم لما يعرف به الطبيب المرض."

'তাফসীর শব্দটি বাবে তাফয়ীলের الفسر 'আল ফাসরু ক্রিয়া মূল থেকে গৃহীত। অর্থ বর্ণনা করা, উন্মুক্ত করা। 'ফাসরু শব্দটি الفسر শব্দের পরিবর্তিত রূপ। প্রভাত আলোকিত হলে বলা হয় اسفر الصبح। কেউ কেউ বলেছেন, এ শব্দটি تفسرة থেকে নেয়া হয়েছে। যার সাহায্যে ডাক্তার রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারেন তাকে 'তাফসিরা' বলে।[৯]

আল্লামা আবু হাইয়্যান বলেন, এটা فسر এর বিপরীত শব্দ سفر থেকে উৎপন্ন। যেমন আরবরা বলে: سفرت المرئة - কোন নারী যখন তার চেহারা থেকে ঘোমটা সরায় তখন বলা হয় - سفرت المرئة। অনুরূপ সুফ্‌রাকে (দস্তরখানাকে) সুফ্‌রাহ্ বলার কারণ এই যে, তাকে খুললে তার মধ্যে যা আছে তা প্রকাশ করে দেয়।[১০] আল্লাহর বাণী, و الصبح اذا اسفر 'উষার কসম যখন তা আলো বের করে দেয়।'[১১]

তাফসীর শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা যারকাশী বলেন,

"التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم و بيان معانيه و استخراج احكامه و حكمه."

তাফসীর হল এমন বিদ্যা যা দ্বারা নাবী মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতারিত আল্লাহর কিতাব-কুরআনের বুঝ অর্জিত হয় এবং কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, তার আহকাম ও হিকমাতসমূহের তথ্য উদ্‌ঘাটন করা যায়।[১২] আল্লামা শিহাবুদ্দিন আলুসীর মতে, তাফসীর হল এমন বিদ্যা যার মধ্যে কুরআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, এর বিষয় বস্তু, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের রীতিনীতি ও সেসব অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অনুরূপ কুরআনের আয়াতের নাসিখ, মানসূখ, শানে নুযূল এবং অস্পষ্ট ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সে সব অর্থ উপলব্ধি করার জন্য তাফসীর শাস্ত্র পরিশিষ্টের কাজ দেয়।[১৩] যুরকানী (রহ) বলেন,

"علم يبحث فيه عن احوال القران الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية."

তাফসীর এমন বিদ্যা যাতে মানুষের সাধ্যানুপাতে আল কুরআনুল কারীমের কোন আয়াত বা কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[১৪] আবু হাইয়্যান বলেন, "তাফসীর এমন বিদ্যা যাতে কুরআনের শব্দাবলীর গঠন পদ্ধতি, এর প্রকৃত অর্থ ও নির্দেশাবলী, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের মর্মার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।"[১৫] আল্লামা জুরজানী বলেন, 'আয়াতের অর্থ, অবস্থা, কাহিনী ও শানে নুযূল সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনাকে তাফসীর বলে।'[১৬] আল্লামা তাফতাযানী বলেন,

"هو العلم الباحث من اصول كلام الله من حيث الدلالة على المراد."

তাফসীর এমন বিদ্যার নাম, যার মধ্যে আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্যাবলী যথাযথভাবে আলোচনা করা হয়।[১৭] মুফতী আমীমুল এহসান বলেন, "তাফসীর এমন বিদ্যা যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণের ধারা, সনদ, আদাব, শব্দসমূহ, আর বিধান ও বর্ণনার সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা করা হয়।"[১৮]

প্রেক্ষাপট ও বিশ্লেষণ

'আরব উপদ্বীপ সংলগ্ন পূর্ব পাশে এ উপমহাদেশ অবস্থিত। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের উত্তর সীমান্ত দিয়ে মধ্য এশিয়ার মানুষ, পশ্চিম সীমান্ত ও পশ্চিম উপকূল দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার মানুষ বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কারণে এ উপমহাদেশে যাতায়াত করত। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের সূচনা থেকেই ইসলাম পারস্য, উপমহাদেশ এবং ইউরোপ আফ্রিকার দিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে সাহাবায়ে কিরাম বেরিয়ে পড়েন চতুর্দিকে। কুরআন যখন কোন অনারব দেশে পৌছে, সে দেশের 'আলিমগণ' মাতৃভাষায় কুরআনের ভাষান্তর করা ঈমানী দায়িত্ব ভেবেছেন। এভাবে ইসলাম উপমহাদেশে প্রবেশ করার পরপরই কুরআনের চর্চা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ আরম্ভ হয়। এ অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ. ফার্সী ইত্যাদি ভাষায় কুরআনের অসংখ্য অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়নি, এমন অনুবাদ ও তাফসীরের পান্ডুলিপির সংখ্যাও কম নয়।

বিশ্বের যে কোন অঞ্চলেই কোন সাহাবা, তাবি'ঈ, তাবি-তাবি'ঈ বা কোন মুসলমান পৌছেছেন। কুরআন হাদীসও তাঁদের সাথে সেখানে পৌছেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে, ভারতে রাসূলে করীম (সা.) এর সময় কালেই ইসলাম পৌছেছিল।[১৯]

হাদীস হচ্ছে কুরআনের আর ফিকহ হচ্ছে কুরআন-হাদীস উভয়ের ব্যাখ্যা। এ দুই তাফসীরের মূল উৎস। যে দেশে এমন যোগ্য অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস গত হয়েছেন, যারা মুজতাহিদগণের প্রথম সারিতে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেখানে এমনও মুহাদ্দিস জন্মগ্রহণ করে এ ভূমিকে ধন্য করেছেন, যাঁদের প্রশংসা করেছেন ইমাম হাকীম, যেখানে কানযুল উম্মাল এর ন্যায় গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেখানে হাদীস ও তাফসীরের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে এটাই বাস্তবতা।[২০]

ভারতে এমন একখানা তাফসীর প্রণীত হয়েছে, সমগ্র ইসলামী দুনিয়া যার নযীর উপস্থাপন করতে পারেনি। তাফসীরখানার নাম হচ্ছে সাওয়াতি'উল ইলহামী লিল ফায়যী।[২১]

এ অঞ্চলে কখন থেকে তাফসীর রচনার কাজ আরম্ভ হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। ড. সালিম দিকওয়াই তাঁর গবেষণা গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন,

'ভারতীয় উপমহাদেশে এ বিষয়টি কবে শুরু হয়েছে, কে শুরু করেছেন, এটা নিশ্চিত বলা মুশকিল। কারণ, ভারতীয় মুসলমানদের পরিপূর্ণ এমন কোন ইতিহাস নেই, যাতে প্রথম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত জীবন বৃত্তান্ত এবং গ্রন্থাবলীর তথ্য রয়েছে। এতদঞ্চলে লিখিত 'আরবী তাফসীর গ্রন্থের কথা আলোচিত হলে সাধারণত মনে করা হয়, এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থের সংখ্যা নামকাওয়াস্তেই আলোচিত হয়ে থাকে।'[২২]

ড. যুবায়দ আহমদ তার Contribution Of India to Arabic Literature ভারতে আরবী তাফসীরের সংখ্যা ৭৪টি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ড. সালিম দিকওয়াই ১৫৬ খানা গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে দাবী করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, ৮৩ খানা ভারতের গ্রন্থাগার গুলোতে রয়েছে, ১০ খানা ইন্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে আছে, বাকী ৬৩ খানা তাফসীরের সন্ধান পাওয়া যায়নি।[২৩]

ড. আহমদ খান সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ কুরআনে করীমকে উর্দূ তারাজীম এ শুধুমাত্র উর্দূ ভাষায় ১০১১ খানা অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে তিনি বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে ৪৪২ খানা সম্পূর্ণ, ৫৬৯ খানা অংশত।[২৪]

এ ছাড়া ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় রয়েছে অনেক তাফসীর গ্রন্থ। ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান বাংলা ভাষায় কুরআনের ১১৭ খানা অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা রচিত ও অনূদিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫]

জানা যায় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভায়ায় কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের সংখ্যা দেড় সহস্রাধিক। তাফসীর সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং যে গতিধারা আমরা ইতোপূর্বে লক্ষ্য করেছি, তা ছাড়িয়ে গেছে উনিশ ও বিশ শতকে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দিহলভী নতুন ধারায় ফার্সী ভাষায় কুরআনের তাফসীর করেন। তিনি আল ফাওযুল কবীর নামে উসূলুত তাফসীর রচনা করে তাফসীর সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিভ্রান্তির অপনোদনও করেন। এ ছাড়া ওয়ালী উল্লাহর খান্দানের কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরের ক্ষেত্রে অবদান অনস্বীকার্য। শাহ্

রফী উদ্দীন এবং শাহ্ 'আবদুল কাদীর দিহলভী কুরআনের অনুবাদ। শাহ্ 'আবদুল আযীয দিহলভী রচনা করেন ফার্সীতে তাফসীর আযিযী। তাঁদের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যার ধারা পরম্পরা বর্তমান কাল পর্যন্ত চলছে।

উনিশ শতকে উপমহাদেশে অনেকটা ভিন্ন ধরনের তাফসীর (অংশত) রচনা করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ। সূরা নহল পর্যন্ত ১৪ পারা কুরআনের নির্বাচিত তাফসীর রচনা করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আধুনিক চিন্তা চেতনা এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে তাফসীর রচনা করেন।

তিনি মনে করতেন, প্রকৃতির বিধান ও ধর্মের বিধানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাঁর সিদ্ধান্ত এই ছিল, ইসলাম মানে প্রকৃতি, আর প্রকৃতি মানে ইসলাম।[২৬]

স্যার সৈয়দের ব্যাখ্যা অনেক মু'তাযিলার ব্যাখ্যার অনুরূপ ঃ তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের চাইতেও প্রকট। কারণ, মু'তাযিলা সম্প্রদায় বুদ্ধির মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর করেছেন। যেখানে বুদ্ধি ও যুক্তির সংগে কুরআনের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে, সেখানে তাঁরা কুরআনের ভাষার প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে দিয়েছেন। স্যার সৈয়দও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেছেন। তার উপর কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআনের ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর রচিত তাফসীর পূর্ববর্তী তাফসীর থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।[২৭]

স্যার সৈয়দ ৫২টি বিষয়ে জমহুর উলামার বিরোধিতা করেন, তন্মধ্যে ৪১টিতে কোন কোন বড় আলিম তাঁর মতের সপক্ষে ছিলেন। ১১টি বিষয়ে কেউ তাঁর সমমনা ছিলেন কি না, তা নিশ্চিত বলা কঠিন।[২৮]

এ তাফসীর প্রণয়নের ফলে 'আলিম সমাজ স্যার সৈয়দের সমালোচনা করেন। তাঁর জীবনীকার মাওলানা আলতাফ হোসেন হালী 'হায়াতে জাভীদে' লিখেছেন,

'স্যার সৈয়দ এ তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে হোঁচট খেয়েছেন।[২৯] সৈয়দ নাসির উদ্দীন মুহাম্মদ আবুল মানসূর তানকীহুল বয়ান শীর্ষক গ্রন্থে স্যার সৈয়দের তাফসীরের কঠোর সমালোচনা করেন। এ গ্রন্থ দিল্লীস্থ মুসরত আল মাতাবী থেকে (১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়।[৩০]

সমালোচকগণ স্যার সৈয়দের বিরূপ সমালোচনা করে। মাওলানা 'আবদুল হক হাক্কানীর (মৃত্যু ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে) "তাফসীর ফাতহুল মান্নান" ছিল সৈয়দের তাফসীরের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। তিনি তাফসীরের সুদীর্ঘ ভূমিকায় স্যার সৈয়দের যুক্তির সমালোচনা করেন। তিনি তাফসীরে হাক্কানীর ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

'তাফসীরুল কুরআন স্যার সৈয়দ আহমদ খা বাহাদুর দিহলভীর অসম্পূর্ণ রচনা। তাফসীরে তিনি যে সব বাতিল ধ্যান ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, যা তিনি পাশ্চাত্যের নাস্তিকদের থেকে অর্জন করেছেন। তিনি পাশ্চাত্যের অনুকরণ অনুসরণ করা জাতীয় অগ্রগতি এবং ইসলামের কল্যাণ বলেও অভিহিত করেছেন। মূলত এ গ্রন্থ হচ্ছে কুরআনের অপভাষ্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটি কোন অর্থেই তাফসীর নয়।[৩১]

এ প্রসংগে জে.এম.এস. ব্যালজন বলেছেন, তাঁর (আবদুল হক হাক্কানীর) সমালোচনায় বুদ্ধিমত্তা ও মৌলিকত্বের চেয়ে ভাবাবেগই বেশী ফুটে উঠেছে।[৩২]

স্যার সৈয়দের প্রভাব কেবল তাঁর মতাবলম্বীদের উপর নয়, বিরুদ্ধ বাদীদের উপরও যথেষ্ট পড়েছে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী লাহোরী বায়ানুল কুরআন, মাওলানা আহমদ এ দীনের (উম্মতে মুসলিমা) বয়ানুল কুরআন, ইনায়েতুল্লাহ্ খা মাশরিকীর তাযকিরা, হাকীম আহমদ শুজার তাফসীরে আইয়ুবী, আল্লামা রশীদ রিযার তাফসীরুল মানার এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর তফসীরুল কুরআন, এমনকি 'আবদুল মজিদ দরিয়াবাদীর তাফসীরে মাজিদীতেও স্যার সৈয়দ আহমদের যুক্তিবাদধর্মী চিন্তাধারার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৩৩]

এ সময়কালের বর্ণনা ভিত্তিকউল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে তাফসীরে হাক্কানী । তিনি কুরআন হাদীস, ফিকহ ছাড়াও নিজ তাফসীর গ্রন্থে রসায়ন, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় দলিলসহ আলোকপাত করেছেন। ড. সালিহা বলেন: "তাঁর অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে কেবল তাফসীর না বলে বিশ্বকোষ বলা যায়।"[৩৪]

আট খণ্ড বিশিষ্ট তাফসীরের প্রথম খণ্ডে ১৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী রয়েছে ভূমিকা। ভূমিকায় তিনি তাঁর তফসীরের ১০টি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তিনি দলীল দিয়ে ফিরিশতাকুল এবং মু'জিযার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্যার সৈয়দের তাফসীরের নিন্দাবাদের পাশাপাশি তিনি পাদ্রী ইমাম উদ্দীনের অপবাদগুলোর জবাবও দিয়েছেন।

এ তাফসীর প্রসংগে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী লিখেছেন: এ অধমের পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও নেই; এ সব বিষয় আমি তাফসীরে হাক্কানী থেকে হুবহু উল্লেখ করে দিয়েছি।[৩৫]

মাওলানা 'আবদুল মজীদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, এ তাফসীর অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে বহসকারীদের জন্য উপকারী।[৩৬]

এ শতকের তাফসীরের মধ্যে শাহ্ রউফ আহমদ রাফাত নকশবন্দী মুজাদ্দিদীর 'তাফসীরে রউফী: তাফসীরে মুজাদ্দিদী নামে প্রসিদ্ধ, তরজমা ও তাফসীর ফয়জুল করীম, মাওলানা মুহাম্মদ ইহতিশাম উদ্দীন মুরাদাবাদীর তাফসীরে ইকসীরে আ'জাম, তাফসীরে কাদিরী, গায়তুল কুরআন, খুলাসাতুত তাফসীর, তাফসীরে সানাই, মাওয়াহিবুর রাহমান, গারাইবুল কুরআন, তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

তাফসীর রচনার গতি ধারায় উনিশ ও শতক বিশ শতককে প্রভাবিত করে। এ শতকে বুদ্ধি ভিত্তিক এবং বর্ণনাধর্মী অনেক তাফসীর প্রণীত হয়েছে। তন্মধ্যে মওলানা আকরাম খাঁ তাফছীরুল কুরআন, মুহাম্মদ আলী লাহোরীর হোলি কুরআন ও বয়ানুল কুরআন এবং আবদুল মজীদ দরিয়াবাদীর তাফসীরে মাজীদী, হোলী কুরআন বুদ্ধি ভিত্তিক ধারার তাফসীর গ্রন্থ।

বর্ণনাধর্মী তাফসীরের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর বয়ানুল কুরআন, মাওলানা মওদূদীর তাফহীমুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মদ শফীর মা'আরিফুল কুরআন, আমীন আহসান ইসলাহীর নব্বইয়ের দশকের তাদাব্বুরুল কুরআন উল্লেখের দাবী রাখে।

এ ছাড়া এ শতকে রচিত হয়েছে মাওলানা আহমদ রিযা খান বেরলবীর কানযুল ঈমান ফী তরজমাতিল কুরআন, মাওলানা ওহীদুজ্জামানের তাফসীরে ওহীদী, মৌলবী মুহাম্মদ ইনশা আল্লাহর কুরআনে হামীদ, মীর্যা মুহাম্মদ উমরাউ হায়রাত দিহলভীর কুরআন মজীদ মুতারজম ম'আ তাফসীর, মাওলানা 'আবদুল বারী ফিরীঙ্গীমহল্লীর আল তাফুর রহমান বি তাফসীরিল কুরআন, মাওলানা মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম জুনাগড়ীর তরজমা ও তাফসীরে মুহাম্মাদী, মৌলবী ফিরোজুদ্দীনের তরজমা ওয়া তাফসীর তাসহীলুল কুরআন, মাওলানা আহমদ সাঈদ দিহলবীর তরজমা কাশফুর রহমান মা'আ তায়সীরুল কুরআন ওয়া তাসহীলুল কুরআন এবং মুহাম্মদ 'আলী হাসান. আবদুল হাকীমের তাফসীর ও বঙ্গানুবাদ ও ভাই গিরীশ চন্দ্র সেনের কুরআন শরীফ।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর তাফছীরুল কুরআনে স্যার সৈয়দের চিন্তাধারার সবচেয়ে বেশী প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁকে কেউ কেউ 'বাংলার স্যার সৈয়দ বলেও অভিহিত করেছেন।[৩৭]

মুহাম্মদ 'আলী লহোরীর হোলি কুরআন এবং বায়ানুল কুরআনও স্যার সৈয়দ দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়।

মুফতী মুহাম্মদ শফীর ৮ খণ্ডে মা'আরিফুল কুরআন বর্ণনাধর্মী তাফসীর। এতে তাফসীরে মাযহারীর ন্যায় ফিকহী মাসআলা প্রাধান্য পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমূদ হাসান মুজিহি ফুরকানী হামীদ নামে কুরআনের অনুবাদ করেন। তাঁর ছাত্র মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী পাদটীকা লিখেন। তা ফাওয়ায়েদে ওসমানী নামে খ্যাত। এ সম্পর্কে ড. এ. এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,

'শায়খুল হিন্দের অনুবাদ অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়; অনুবাদ সংক্ষিপ্ত ও সহজ বোধ্য, কুরআনের শব্দসমূহের সঙ্গতি রেখে শব্দগত ও অর্থগত সামঞ্জস্য বিধান এবং তাৎপর্যগত অর্থ, অর্থাৎ বাক্যের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।'[৩৮]

মওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদীর তাফসীর সনাতনপন্থী হলেও তিনি কুরআনের চিরাচরিত ব্যাখ্যাগুলোকে বিবেক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পেশ করেছেন।

মাওলানা 'আব্দুল মজীদ' দরিয়াবাদীর তাফসীরে মাজিদী বুদ্ধিভিত্তিক এবং বর্ণনাধর্মী তাফসীরের সংযোগস্থল বলে মনে হয়।[৩৯]

উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের বহু অনুবাদ রয়েছে এবং প্রচুর ব্যাখ্যা গ্রন্থ হয়েছে। এসবের মধ্যে কতকটা রয়েছে অসমাপ্ত ও অপূর্ণাঙ্গ। এর মধ্যে যেমন রয়েছে পরম্পরা মতভিত্তিক তাফসীর, তেমনি রয়েছে বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীর। পৃথিবীতে নিত্যদিন নানা সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। এগুলোর সমাধানকল্পে যুগোপযোগী তাফসীর রচিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

উপসংহার

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন আল-কুরআনের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাকারী। কুরআনের মর্মার্থকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য। এ ছিল তাঁর নবুওয়াতি জীবনের অন্যতম মিশন। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে রাসূল (সা.) উপস্থিত সাহাবাদের তিলাওয়াত করে তা শুনাতেন, আর সাহাবাগণ তা মুখস্থ করে নিতেন অথবা তা অনুধাবন করে তদানুযায়ী কাজ করতেন। কোন আয়াতের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট থেকে জেনে নিতেন। তাফসীর হচ্ছে দ্বীনের সকল বিদ্যার মূল বা চাবিকাঠি; যা মানুষকে সংশোধন করার জন্য অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। কেননা কুরআনের সঠিক বুঝ আসে তাফসীর অভিজ্ঞানের মাধ্যমে। তাফসীরের জ্ঞান ব্যতীত বিদ্যার ধন ভান্ডারে পৌছা সম্ভব নয়। সমাজের নব নব প্রয়োজন পূরনের উদ্দেশ্যে কুরআনের মূলনীতিকে অটুট রেখে নতুন আঙ্গিকে ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর রচনা হবে। এ নীতির উপর ভিত্তি করেই তাফসীর রচনায় সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধারা। এই চলমান ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

তথ্যনির্দেশ

১. তাফসীর শব্দটির মূল শব্দ ফাসারা (فسر) অর্থ বর্ণনা করা, উন্মুক্ত করা, অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা। জাস্টিস তাকী ওসমানী, ***উলুমুল কুরআন***, ২য় খণ্ড (দেওবন্দ: যাকারিয়া বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ২৮১; শামসুল হক দৌলতপুরী, তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৯), পৃ. ৯-১০; আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানিপথী, ***তাফসীর মাযহারী,*** সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭), পৃ. ভূমিকা ১১-১২; লুইস মালুফ, ***আল মুনজিদ*** (করাচী: দারুল ইশায়াত, উর্দূবাজার, ১৯৭৫), পৃ. ৭৪৭; আহমাদ বিন মুহাম্মদ, ***আল মিসবাহুল মুনির*** (বৈরূত: দারুল কুতুব, ১৪০৫ হি.), পৃ. ১৮০; ইবরাহীম মাযকুর ও অন্যান্য, ***আল মুজামুল ওয়াসিত***, ২য় খণ্ড (দেওবন্দ: আল মাকতাবাতুল হুসাইনিয়া, তা.বি.), পৃ. ৬৮৮; ইবনে মানযুর, ***লিসানুল আরব***, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল আরাবী, ১ম সং, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ১০৯৫; ইসমাইল জাওহারী, ***আস সিহাহ তাজুল লুগাহ ওয়া সিহাহুল আরাবিয়া***, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৩৭৬ হি./ ১৯৫৬ খ্রী.), পৃ. ৭৮৯।

২. যুরকানী, ***মানাহিলুল ইরফান***, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব, ১ম সং. ১৯৮৮ খ্রী./ ১৪০৯ হি.), পৃ. ৪।

৩. সূরাহ আল ফুরকান, আয়াত : ৩৩।

৪. আসসাব্‌ত, ***কাওয়ায়িদুত তাফসীর,*** ১ম খণ্ড (কায়রো: দারু ইব্‌ন আফফান, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি.), পৃ. ২৭।

৫. আলুসী, ***রুহুল মাআনী***, ১ম খণ্ড (পাকিস্থান: মাকাতাবা, মুখবন্ধ), পৃ. ৪।

৬. কাযী সানাউল্লাহ্ পানি পথী, ***তাফসীর মাযহারী,*** (বাংলা অনুবাদ) ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭), পৃ. মুখবন্ধ; অধ্যাপক মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী, ***কুরআন ও তফসীরের ইতিবৃত্ত*** (কলিকাতা: সুফিয়া প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯৮), পৃ. ৬৭।

৭ মান্না'আল কাত্তান, ***মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন*** (রিয়াদ: মাকতাবা আল মাআরিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ৩৩৪।

৮. প্রফেসার মিঞা মনজুর আহমদ, ***তারিখুত তাফসীর ওয়া উসুলুত তাফসীর*** (লাহোর: ইলম কুতুব খানা, তা. বি.), পৃ. ৭।

৯. সুয়ুতী, ***আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন,*** ২য় খণ্ড (দিল্লী: কুতুব খানা ইশা'আতে ইসলাম, তা.বি.), পৃ. ২২১।

১০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮-৬৯।

১১. সূরাহ আল মুদ্দাসসির, আয়াত : ৩৪।

১২. যারকাশী, ***আল বুরহান,*** ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১২ হি./ ২০০১ খ্রী.), পৃ. ১৩; সুয়ুতী, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

১৩. আলুসী, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪।

১৪. যুরকানী, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪।

১৫. যাহাবী, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪; সুয়ুতী, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

১৬. শরিফ আলি, ***কিতাবুত তারিফাত*** (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ৬৩।

১৭. আবদুল মালেক, ***কামুসুল মুসতালাহাত*** (কুমিল্লা: দারুল মাতাআ, ১৯৯৭), পৃ. ১৪২।

১৮. মুফতী আমিমুল এহসান, ***আত্‌তানবির ফি উসুলিত তাফসীর,*** পৃ. ৪১।

১৯. আবদুস সামাদ সারিম আল আযহারী, ***তারীখুত তাফসীর***, লাহোর, পৃ. ৩০-৩১।

২০. ***তারীখুত তাফসীর***, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

২১. ড. যুবায়দ আহমদ, ***আবদিয়ত মেঁ পাক ওয়া হিন্দ কা হিসসাহ্***, শহীদ হুসাইন রাযযাকী অনুদিত (লাহোরঃ ইদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৭৩ খ্রী.), পৃ. ৫০।

২২. ***হিন্দুস্থানী মুফাসসিরীন আওর উনকী আরবী তাফসীরেঁ*** (লাহোরঃ ইদারায়ে মাআরিফে ইসলামী, ১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ১১-১২।

২৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।

২৪. ড. আহমদ খাঁন, ***কুরআনে কারীম কে উর্দূ তারাজিম*** (ইসলামাবাদঃ মুকতাদারা কাওমী যবান, ১৯৮৭), ভূমিকা, পৃ. ১৮।

২৫. ***ইসলামী বিশ্বকোষ*** (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.) ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৭৪ - ৬৮৫।

২৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুলাহ্, ***মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*** (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮০ খ্রী.), পৃ. ২৭০।

২৭. মুহাম্মদ ইসমাইল পানিপথী, ***মাকালাত স্যার সৈয়দ***, ২য় খণ্ড, ***তাফসীর মাযামীন*** (লাহোরঃ ১৯৬১ খ্রী.), পৃ. ১৯৭।

২৮. শাহ্ মুহাম্মদ ইকরাম, ***মওজ - ই - কাওসার***, (লাহোরঃ ইদারায়ে সাকাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৬৮ খ্রী.), পৃ. ১৫৬- ১৬০।

২৯. মওলানা হালী, ***হায়াতে জাভীদ,*** ১ম খণ্ড (আগ্রাঃ মুফীদ আ'ম, তা.বি.), পৃ. ১৮৪।

৩০. ড. সালিহা 'আবদুল হাকিম' শরফুদ্দীন, ***কুরআনে কারীমকে উর্দূ তারাজীম, তারীখ-তা-আরুফ-তাবসিরা-তাকাবুলি জাইযা*** (করাচীঃ কাদিম খুতুব খানা, তা.বি.), পৃ. ৪৮।

৩১. মাওলানা 'আবদুল হক হাক্কানী, ***তাফসীরে ফাতহুল মান্নান***, দেওবন্দ, পৃ. ১৫২।

৩২. Balion S. M. S. ***Reforms and Religious ideas of Sir Sayyid Ahamad Khan*** (Lahore: 1958.), P. 93.

৩৩. ড. মুহাম্মদ আবদুলাহ, ***স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা*** (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮২ খ্রী.), পৃ. ১২৩।

৩৪. ড. সালিহা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬।

৩৫. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, ***বায়নুল কুরআন***, ১৯০৫ খ্রী. ভূমিকা।

৩৬. ***তরজমা ও তাফসীরে কুরআন*** (ঢাকাঃ তাজ কোম্পানী, ১৯৫২ খ্রী.), (পূর্বোক্ত, দ্র. মুখবন্ধ)।

৩৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুলাহ্, ***মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক*** পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৬।

৩৮. ড. এ, এইচ, এম, মুজতবা হোছাইন,***শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান ও তাঁর রাজনীতি*** (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপ্রকাশিত পি, এইচ, ডি, অভিসন্দভ, ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ৮০।

৩৯. ***তাফসীরে মজিদী***, পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

The Role of Islamic Education in Establishing Public-welfare Society in Bangladesh

Dr. Shah Mukhtar Ahmad*

Abstract: The public welfare society is a community where the people live peacefully maintaining the rights of others by the help of Islamic teaching-learning. The purpose of this study is to explore the main factors of Islamic Studies to establish a public welfare Society in Bangladesh. This paper also has demonstrated the impact of submission to Allah, avoidance of sin, good relations with neighbours, justice and the equitable distribution of resources in a public welfare society. Islamic studies stresses that people of all classes should have consciousness about their duties and responsibilities so that they can achieve the ultimate goal in the worldly and eternal life. In this study, a survey method has been adopted to collect the primary data. Purposive sampling has been used in this study to choose 130 Muslims people as the respondents. Nine experts were selected based on their expertise and experience to collect qualitative data. Empirical data has been analysed with the help of SPSS software where descriptive and inferential statistics are used. The result shows that Islamic teaching-learning practices have great importance to launch a public welfare society. Even the components of Islamic studies have significant positive impact on public welfare; respectively submission to Allah ($p = 0.00 < 0.05$); avoidance of sin ($p = 0.001$), good relations with neighbours ($p = 0.015$), justice ($p = 0.02$). The implication of this research could be a guide line to the citizens who are learning as a practitioner in their practical life.
Keywords: Islamic education, Public Welfare, Society and Bangladesh.

1. Introduction

Most of the activities of some people of the current age are creating enormous social, political, and environmental problems in their worldly lives. So, they are undergoing concerned and tense situations. A public welfare society is expected at every level of society and culture around the globe. Islamic education is a very important component in the information technology era to promote the welfare of society. (Ashraf, 1994).In the context of Islam, the meaning of education is the combination of the terms Tarbiyyah, Ta'lim, and Ta'dib. Literally, Tarbiyyah means 'educate', Ta'lim means 'knowledgeable' and Ta'dibis derived from the word 'adaba' which means 'moral'. These terms comprehensively are concerning the multilateral relationship of humans and their society; humans and the environment; society and environment; and in relation to Allah (Louay, 1996). Almighty Allah says in the holy Quran "Allah grants wisdom to whom He pleases and to whom wisdom is granted indeed he receives an overflowing benefit." (2:269). Another verse is mentioned "Those truly fear God, among His Servants, who have knowledge: for God is exalted in Might, Oft-Forgiving." (Al Quran, 35:28). It is stated the paramount importance of education and supremacy in the Qur'an, "Allah will exalt those who believe among you, and those who have the knowledge, to high ranks. Allah is informed of what ye do."(Al- Mujadalah: 11). In this verse Allah grants high ranks to those who obtain

* Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh.

knowledge and if a human being wants to rise one’s dignity he should attain knowledge. So, Knowledge and wisdom are able to bring peace and a harmonious environment publicly in society.

Public welfare is the welfare of an individual or group that is measured based on certain substantial availability in our individual and community lives related to economic, social, and other measures. It also clarifies that public welfare is measured personally in the form of satisfaction and happiness. Happiness can be described and analyzed by asking the person concerned about how to satisfy his life. Individuals are good judges of their overall quality of life (Frey & Stutzer, 2004). Ismail et al. (2014) stated that the measurement of welfare need pay attention to the balance between substantial and non-material components. The substantial element consists of the fulfillment of basic human needs which consist of physical needs, namely food, clothing, and shelter, as well as social needs, namely education, health, communication, and transportation. Meanwhile, the fulfilment of non-material elements is related to the fulfilment of spiritual needs, the safety of the soul, and the purity and perfection of reason. The welfare of individuals or society is closely related to individual abilities/capabilities. Capability can be defined as the ability or empowerment of individuals or organizations that are able to create welfare for individuals or for society. Empowerment is the result of an empowerment process so that there is an increase in the ability and independence of the community in improving the quality of life and welfare (Mardikanto & Soebiato, 2015).

Islamic education plays a significant role to accomplish physical need and spiritual needs which is able to promote a completely harmonious and public welfare society in the worldly and hereafter. Even if education can meet up physical needs but it cannot fulfill the mental harmony in human being life (Farhan, 1989). Moreover, ninety percent of people are not interested to learn Islamic education because of the lack of job facilities and adversity in western countries. Besides, the presence of public welfare is out of commission at the family, society, and state levels. There are several kinds of causes behind the present situations of public welfare and harmony in society such as inadequacy of morality development, obstruction of the equitable distribution of resources, lack of good relations with neighbors, averse to submission to Allah, overwhelmed in sin, not to consider justice (Kamal, et al. 2021).

AlKayasi, (1986) has discussed that Islamic education emphasizes peaceful socializing by fulfillment of spiritual needs which cover many areas, including education, healthcare, promotion of mass media, human rights, and personal freedoms, increasing awareness of human welfare and empowerment for individuals or society. At the same time, it has made modifications in living styles, customs, and habits of individuals or unitedly. In these circumstances, Islamic education has become an important factor to establish peace and harmony in Bangladesh. However, only Islamic learning requires and demands balance and sincerity in all aspects of worldly and eternal life. The Islamic teaching-learning process calls for peace, tolerance, and kindness, which convey physical, mental, spiritual, and social harmony in the state. In the present society, Islamic education is the fundamental right of all Muslim citizens because it promotes the formation of well-organized and well-

socialized human life with appropriate social norms and values (Saliba, 1957). Allah says in the Holy Quran, “Are those equal, those who know and those who do not know? It is those who are endowed with understanding that receives admonition.” (Al Quran, 39:9). Hence, the present research intended to examine the relationships among the equitable distribution of resources, good relations with neighbours, submission to Allah, avoidance of sin whether the relationship between justice and public welfare society is significantly interconnected.

2. The specific research objectives of this study as follows:

1. To depict the association between the equitable distribution of resources and public welfare society;
2. To examine the impact of good relations with neighbors on the public welfare of society;
3. To assess the influence of submission to Allah on the public welfare of society;
4. To illuminate the effect of avoidance of sin on public welfare society;
5. To measure the importance of justice to all on public welfare society.

4. Methods

Due to the Variation of data, different kinds of research approaches are used. In this study, the researcher used a quantitative approach to analyzing the results. Without diminishing their value, the researcher believes that the quantitative approach cannot adequately illustrate all the complexity inherent in analyzing processes (Mehrad&Tahriri, 2019; Streefkerk, 2019). Therefore, in this study, the researcher has used quantitative and qualitative approaches to reveal a better understanding of the nature of this study (Creswell & Poth, 2018).).Using purposive sampling, the researcher has selected the sample. In this study, a self-designing Google Forms-based questionnaire is used to collect data from the respondents through online and offline surveys. On the other hand, the researcher collected qualitative data from the KIIs face to face inter views through a semi-structured questionnaire. Quantitative data have been analyzed using SPSS software where ANOVA and regression analysis were adopted. On the other, hand qualitative data have been interpreted through textual analysis.

3. Results and Discussion

In order to achieve the research objectives, a multiple regression analysis was run to predict each component of Islamic education acquisition with the outcome factors in the analysis. Table 1 shows the results of the regression analysis. The research results are presented in the order of research objectives, respectively mentioned as follows:

Table 1: Results of multiple regression analysis

Independent **variables**	Non-standardized coefficients	Standardized coefficients	T	Sig.
EDR	0.216	0.214	2.667	0.009
GRN	0.335	0.387	5.028	0.000
SA	0.110	0.223	2.678	0.008
AS	0.118	0.187	2.164	0.001
JA	.90	.219	2.547	0.003

EDR: Equitable distribution of resources; GRN: good relations with neighbors; SA: submission to Allah; AS: avoidance of sin, and JA: justice to all.

From the results of the study applying the multiple regression model in Table: 1,it can be explained that equitable distribution of resources has a significant impact on the public welfare of society because of the p-value of 0.009<.05.Sabatini, (2017) has depicted that Mental illness, drug and alcohol abuse, homicides, overconsumption of resources, and the lack of social mobility, all these health, and social problems have strong links to inequality of wealth and resources. Besides, Friedman, (2010) also mentioned that there is a strongly negative effect on public welfare society due to inequality of resource distribution. A good number of key informants explain that inequitable distribution of wealth creates many problems and unwanted situations which is a barrier to public welfare in society. Respectively good relations with neighbors have a significant effect on the public welfare of society because of the p-value of 0.000 <.05. Moreover, most of the interviewee explains that good communication with the neighbors plays a positive role to promote peace and harmonious society that always exists in a peaceful environment. Submission to Allahhas a positive effect on the public welfare of society because of the p-value of 0.008<.05. Avoidance of sin has a significant effect on the public welfare of society because of the p-value of 0.001 <.05. Moreover, justice to all significant effect on the public welfare of society because of the p-value of 0.000 <.05.The Islamic view has given the emphasis on justice where three basic elements are considered: i) guarantee of fulfilment of basic needs to all, ii) equity but not equality in personal incomes, and iii) elimination of extreme inequalities in personal income and resource (Putri, 2019).The Qur'an further says, 'O you who believe, be upright for Allah, and (be) bearers of witness with justice!'(Al-Qur'an, 5:8). Likewise, the research results from Xu et al. (2018) stated that surrendering to Allah is positively associated with social harmony and peaceful situations.

Table 2: Outcome of Equitable distribution of resources, good relations with neighbours, submission to Allah, avoidance of sin, and justice to all on public welfare society

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.676	0.418	0.512	12.252

Table 2 indicates that the value of coefficients of determination (R2) is 0.418 which means 41.8% variance in public welfare society is predictable from the Equitable distribution of resources, good relations with neighbours, submission to Allah, avoidance of sin, and justice. It can be said that the public welfare society is influenced by 58.2% of other factors. So finally, we conclude that if we increase equitable distribution of resources, good relations with neighbors, submission to Allah, avoidance of sin, and justice, then the public welfare of society must be improved.

4. Conclusion and recommendation

Islamic education ensures a strong peaceful environment in society as well as provides complete guidance and direction to establish a pacific social life where is available the complete integration of cultural diversity. It helps to attain a complete faith that can achieve ultimate intellectuality, ethical dimensions, freedom of mind, and knowledge for meaningful actions.The purpose of social security and public welfare society has been to ensure the social rights of those who are unable to realize their creator and protect their rights & liberties. This study shows that there is a positive correlation among variables such as social justice, as well as submission to Allah, good relations with neighbors, and public welfare society. This study proved that the issue of Islamic education to establish the public welfare society is mostly a personal obeying factor such as good relations with neighbors, submission to Allah, and avoidance of sin. Moreover, there are some factors as comprehensive group community factors. All of the factors are interrelated to each other and the public welfare society is significantly influenced by the independent factors.

Based on the finding of this study, the researcher formulate some recommendations which are the following here:

- It should be a prerequisite for the every Muslim to learn the holy Quran and hadith so that they can obey every order of Allah and apply it in their practical life.
- Justice should be applied in family life, social life, and every corner of a state, as well as the authority, would arrange a mass awareness system to follow up on the people’s perceptions.

5. Limitations and future research

This research was only conducted on Rajshahi City Corporation, especially regarding Islamic education and public welfare society from the perspective of the welfare state. So, there are so many other factors that could be integrated into the other research. Due to time limits research is also only conducted in Rajshahi city. It is possible to carry out research in areas outside Rajshahi city with a more developed model.

Reference

1. Abu Sulayman, A. (2004). *Crisis in the Muslim mind*. International Institute of Islamic Thought (IIIT). p.23
2. Amako, S. (2017). Methods for area studies and contemporary China study. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, *6*(1), 2-28.
3. Ashraf, S. A. (1994). Faith-based education: A theoretical shift from the secular to the transcendent. *Muslim Education Quarterly*, *11*(2), 1-4.
4. Dovbenko, S., Naida, R. G., Beschastnyy, V. M., Bezverkhnia, H. V., &Tsybulska, V. V. (2020). The problem of resistance to the introduction of distance learning models of training in the vocational training of educators. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, *19*(2), 1-12.
5. Farhan, I. (1989). Islamization of the Discipline of Education. *American Journal of Islam and Society*, *6*(2), 307-318.
6. Frey, B. S., &Stutzer, A. (2005). Happiness research: State and prospects. *Review of social economy*, *63*(2), 207-228.
7. Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. *World and I*, *10*, 264-268.
8. Hair, B., &Babin, A. Tatham (2006), Multivariate Data Analysis. *Aufl. Upper Saddle River, NJ*. p.21
9. Isma'il, M., Santosa, D. B., &Yustika, A. E. (2015). *Sistemekonomi Indonesia: tafsiranPancasila& UUD 1945*. PenerbitErlangga. p.76
10. Knack, S. (2003). Groups, growth and trust: Cross-country evidence on the Olson and Putnam hypotheses. *Public Choice*, *117*(3), 341-355.
11. Mehrad, A., &Zangeneh, M. H. T. (2019). Comparison between qualitative and quantitative research approaches: Social sciences. *International Journal For Research In Educational Studies, Iran*.p.34
12. Palley, T. I. (2010). The relative permanent income theory of consumption: a synthetic Keynes–Duesenberry–Friedman model. *Review of Political Economy*, *22*(1), 41-56.
13. Putri, A. M. D., Sri, B. M. K., Suyana, U. M., &Murjana, Y. I. G. (2019). The influence of government role, community participation and social capital on the quality of destination and community welfare in the tourism village of Badung Regency Province of Bali. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, *92*(8), 235-251.
14. Sabatini, F. (2007). The role of social capital in economic development. *AICCON Cultura Cooperazione*.p.9
15. Safi, L. (2014). *The Foundation of knowledge: A comparative study in Islamic and Western methods of inquiry*. International Institute of Islamic Thought (IIIT). p.45
16. Saliba, D. J., & Tomah, G. (1957). Islam: The Year Book of Education. *New York: World Book Company*.p.75
17. Salleh, M. J. (2009, November). The integrated islamic education: Principles and needs for thematic approaches. In *An Integrated Islamic Education: Need for Thematic Approaches, Singapore Islamic Education System (SIES) Seminar, Wisma MUIS, Singapore, On* (Vol. 14). p.32
18. Tahir, M., &Zubairi, S. U. (2017). Towards the role of Islamic education in promoting peace and harmony in society: an analysis. *Tahdīb al-Afkār, Research Journal of Islamic Studies, Abdul Wali Khan University*, *4*(1), 25-36.
19. Veenhoven, R. (2015). Social conditions for human happiness: A review of research. *International Journal of Psychology*, *50*(5), 379-391.
20. Xu, Y., Liang, Q., & Huang, Z. (2018). Benefits and pitfalls of social capital for farmer cooperatives: Evidence from China. *International Food and Agribusiness Management Review*, *21*(1030-2019-603), 1137-1152.

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

Public Administration in Islam: Nature and Scope

Dr. Md. Hafizur Rahman*

Abstract: An Islamic State is a welfare state. All the activities and activities of the administrative system of the state are dedicated to the welfare of the people. Administrators, officials and employees at all levels of the state act as servants of the people. Transparency and accountability are the hallmarks of governance. The main objective of the administration of the Islamic State is to establish equitable justice and fairness for the people of all sections of the Islamic State. In order to achieve this goal, the Islamic State introduces timely and up-to-date administrative principles while maintaining the principles of Islamic rule. Therefore, the administrative system of the Islamic state is progressive in nature in comparison to the administration system of all other states and is beneficial to the citizens of the country. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) migrated from Makkah to Madinah.When Rasul (SM) left for Medina, Islam accepted many sacrifices for a long time and Allah Tala was able to establish an Islamic administration on this planet exclusively. Following this, Abu Bakr Radiyallahu and other caliphs were able to present a beautiful administration.Besides, Omar Ibn Abdul Aziz Rahmatullah, one of the caliphs of history, has left an excellent example in this regard. The ummah-based state collapsed at the beginning of the seventh century, when the Islamic nomadic system of the time united the nomads and desert dwellers involved in tribal strife through the power and dedication of an organisation of outstanding political wisdom.Through this the equality of human beings was established only in the sovereignty of Allah. All traces of shirk were eradicated from the society. Man upon man was the end of man. To govern the state through revelation, the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) continued to enforce all the necessary rules and regulations in consultation with his companions. In a short time, a beautiful administrative system was formed. According to historians, this state of Medina was the first constitutional and public welfare state in human history. One of the main reasons for this is the Islamic public administration system. The following is an overview of the nature and nature of Islamic public administration.

ভূমিকা

ইসলামে জনপ্রশাসন একটি জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা। এ রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে নিবেদিত। ইসলামে রাষ্ট্রীয় প্রশাসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনগণের সেবক। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ইসলামী জনপ্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য হলো, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সকলের জন্য সমানভাবে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং নাগরিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব-কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করা। তাই ইসলামে জনপ্রশাসন ব্যবস্থা অন্য সব প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে হয় প্রগতিময় এবং দেশ জাতি ও নাগরিকদের জন্য হয় কল্যাণধর্মী। মহানবী সা. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রটি ছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। উক্ত রাষ্ট্রে ধর্মীয় আইনই রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। তবে মহানবী সা. রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিক সাধারণের মতামতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতেন। জরুরী পরিস্থিতিতে তিনি জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[১] মদীনা রাষ্ট্রে কোন অফিস বা নিয়মিত বেতনভুক্ত কোন কর্মচারী ছিল না। সকল ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল মসজিদ। এতে মহানবী সা. ও পরবর্তীতে খলীফাগণ প্রার্থনা করতেন, উপদেশ প্রদান করতেন, সাক্ষাৎপ্রার্থী ও বিদেশী পর্যটকদের সাথে দেখা করতেন। সমাজের নানাবিধ কার্যক্রম সম্পর্কে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং সমসাময়িক রাজা, সম্রাট ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে প্রেরণের জন্য পত্রাদি রচনা করতেন। সুতরাং ইসলামে প্রশাসনিক ব্যবস্থা মূলত জনকল্যাণমূলক।

* Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh.

ইসলামে জনপ্রশাসনের প্রকৃতি

প্রশাসন বলতে মানুষের অভিযোগ প্রদান ও সমস্যা সমাধানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষকেও বোঝানো হয়। আবার প্রশাসন সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের হতে পারে। প্রশাসন সবসময় অন্যের কল্যাণে কাজ করে থাকে। কারণ অন্যায়-অবিচার রোধ করা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রশাসনের জরুরী কর্তব্য। অন্যথায় সমাজব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে না এবং এক্ষেত্রে প্রশাসনকে নিজস্ব নীতিমালায় অটল থাকা অপরিহার্য। এমনকি অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ থেকে প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা আবশ্যক। এতে প্রশাসন হয়ে উঠবে জনপ্রশাসন। যার মাধ্যমে দেশ-জাতি ও নাগরিক জীবন সহজ হয়ে উঠবে। নানা কারণে, ভিন্ন অজুহাতে বা রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ লোকদের কাছে 'অপরিণামদর্শী ও অসৎ' ব্যক্তিরা পৌঁছে যায়। ফলে প্রশাসনের নিরপেক্ষ ও ধারাবাহিক উন্নয়নের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই প্রশাসন নিজস্ব নীতি ও আদর্শে অটুট থাকার পাশাপাশি সততা-নিষ্ঠা ও নিয়ম-রীতি দ্বারা পরিচালনা অব্যাহত রাখলে, প্রশাসনে কোন অপশক্তির অনুপ্রবেশ করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে যদি আল-কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা উপহার দেয়া যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ ও অধীনস্থরা সহজে ন্যায্য অধিকার লাভ করতে পারে এবং সবদিক থেকে সুরক্ষা পায়। পারস্পরিক বিবাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিপরীতে সহনশীলতা ও হৃদ্যতা তৈরি হয়। আল-কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবৃত হয়েছে।[২]

জনপ্রশাসন বিভাগ মূলত জনগণের অধিকার আদায়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। এটি এ বিভাগের মৌলিক কাজ। কোন ধরনের আইন বহির্ভূত ও অন্যায় কাজ অগ্রহণযোগ্য। যারা ন্যায় ও সততার সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও পদের ব্যবহার করেন, আখিরাতে তাদের মহা পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। এ প্রসঙ্গে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সুদূরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে মহানবী সা.- এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। যেমন তিনি বলেন, "ন্যায় বিচারক আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বারের উপর অবস্থান করবে। তবে আল্লাহ তা'আলার উভয় পার্শ্বই ডান। তারাই সে সমস্ত বিচারক বা শাসক, যারা নিজেদের বিচার-বিধানে, নিজেদের পরিবার-পরিজনদের মাঝে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।"[৩] এছাড়া তিনি আরো বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর কিয়ামত দিবসে তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর পুরুষ তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরসংসার ও সন্তানের দায়িত্বশীল, তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গোলাম তার মনিবের মালসম্পদের ওপর একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই একেকজন দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই কিয়ামত দিবসে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৪]

অতএব দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রশাসনিক শক্তির যেন কেউ অপব্যবহার না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কেননা যারা ইচ্ছাপূর্বক ক্ষমতার অপব্যবহার করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত অসৎপন্থা অবলম্বন অন্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, ধোঁকাবাজি ইত্যাদিই শাস্তির কারণ হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে কঠোর সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে।[৫]

ইসলামী জনপ্রশাসনের উৎসসমূহ

ইসলামী প্রশাসন কোন মানুষের আবিষ্কার বা যুগের চাহিদা মাফিক বক্তব্য নয়; বরং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল উৎস হচ্ছে আল-কুরআন ও রাসূল সা.-এর দিক নির্দেশনা। ইসলামী জন প্রশাসন ব্যবস্থার মূল উৎস ৪টি। যথা: ১. আল-কুরআন, ২. সুন্নাহ, ৩. ইজমা ও ৪. কিয়াস বা ইজতিহাদ।[৬] উল্লেখ্য, রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল কোন বিষয় নয়; বরং তা যুগ ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল। তাই আল-কুরআন ও হাদীসে কেবল ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য খুঁটিনাটি বিষয় রচনা করার ভার যুগের বিশেষজ্ঞদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁরা ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থাকে যুগের চাহিদা মোতাবেক আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রচনা করবেন।

ইসলামে জনপ্রশাসন ব্যবস্থার স্বরূপ

ইসলামে জনপ্রশাসনের স্বরূপ দু'টি ভাগে বিভাজন করা যেতে পারে। যথা: এক. রাসূল সা.-এর জনপ্রশাসন এবং দুই. খলীফাগণের জনপ্রশাসন। নিম্নে এ দু'টি জনপ্রশাসনের বিবরণ উপস্থাপিত হলো:

এক. রাসূল সা.-এর জনপ্রশাসন ব্যবস্থা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মহানবী সা.-এর অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি মানব জাতির একমাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকরণীয় আদর্শ। আরবরা তখন ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের বিভক্ত ছিল। মহানবী সা. মদীনায় হিজরত করে বিভিন্ন

জাতি ও গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টির প্রয়াস পান। তিনি মদীনা সনদের মাধ্যমে জাতিকে সংঘবদ্ধ করেন। এ সনদের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ রচিত হয়। এ সনদের প্রতিটি ধারায় আল্লাহর সার্বভৌত্বের মর্মকথা অনুরিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে যে, 'ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আল্লাহ তা'আলাই হলেন একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী।' রাসূল সা.-এর জনপ্রশাসন ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব ছিল রাষ্ট্রের অন্যতম একটি প্রধান অঙ্গ।[৭] পৃথিবীতে মহান আল্লাহর অবিভাজ্য, শাশ্বত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল রাসূল সা. এর প্রশাসন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।[৮]

রাসূল সা. এর প্রশাসন ব্যবস্থায় *মজলিশে শূরা* এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, যোগ্যতা, দ্বীন ও আমানতদারিতা হলো *মজলিশে শূরার* সদস্যগণের মূল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী। রাষ্ট্রীয় আমীর তাঁর রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সর্বদা *মজলিসে শূরা*-র পরামর্শ নেবেন। পরামর্শ ভিত্তিক কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনার কর্মকাণ্ডে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপরে ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তার উপরে ভরসাকারীদের ভালবাসেন'।[৯] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর (৭০১-৭৭৪ হি.) (রহ.) বলেন, 'রাসূল সা. সকল কার্যে সাহাবীদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং এটি তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল'।[১০]

রাসূল সা.-এর প্রশাসনে কোন স্থায়ী ও বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিল না। মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য রাসূল সা. তিন ধরণের সরকারী কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করেন। যেমন, ওয়ালী বা গভর্ণর মদীনা ছিল মহানবী সা. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবরাষ্ট্রের রাজধানী। তৎকালীন বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য গোটা আরবদেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। অতঃপর উক্ত বিভক্ত প্রত্যেক প্রদেশের জন্য পৃথক পৃথক একজন ওয়ালী বা প্রাদেশিক গভর্ণর নিয়োগ প্রদান করেন।[১১] যেমন, '*আমিল* বা কর আদায়কারী,[১২] ও *কাযী* বা বিচারক।[১৩] রাসূল সা. এর প্রশাসনে মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে রাজস্ব সংগ্রহ ও আয়-ব্যয়ের জন্য পৃথক কোন অর্থ বিভাগ বা রাজস্ব বিভাগ ছিল না। রাজস্ব সংগ্রহের মূল উৎস ছিল *যাকাত*, দান ও *সাদাকাহ*। অতিরিক্ত উৎসসমূহের মধ্যে ছিল *খারাজ* বা ভূমিকর, *ফাই* বা ভূমি রাজস্ব, *গানীমাহ* বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং *জিজিয়া*।[১৪] অনুরূপভাবে রাসূল সা. এর দ্বারা গঠিত মদীনা রাষ্ট্রে কোন সু-সজ্জিত, বেতনভুক্ত সামরিক বাহিনী ছিল না। ইসলামের শত্রুদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য তিনি জাতিকে আহ্বান করতেন। সেনা নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, অস্ত্র সজ্জিত করণ, প্রতিপালন ও গোটা মুসলিম সামরিক বাহিনীর নির্দেশনা সংক্রান্ত সকল কাজ রাসূল সা.-এর উপর ন্যস্ত ছিল।[১৫]

দুই. খলীফাগণের জনপ্রশাসন ব্যবস্থা

ইসলামী খিলাফত তথা চারজন খলীফার সময়কাল শুরু হয় ১১ হিজরী মোতাবেক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের পর এবং শেষ হয় ৪১ হিজরী মোতাবেক ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবনু আবী তালিব রা.-এর গুপ্ত হত্যার পর থেকে। মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের মাধ্যমে গোটা ইসলামী সাম্রাজ্য একটি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করে সাহাবীগণ একজন নেতার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। যেহেতু আল-কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার নাম হলো খিলাফতভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, তাই এ ব্যবস্থায় মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি 'খলীফা' নামে পরিচিত হন। যে খলীফা জাতির ভাল-মন্দ দেখাশুনা করবেন, জনজীবনে ইসলামী শরী'আহ প্রয়োগ করবেন, তাঁর শাসানাধিন অঞ্চলে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন, জনগণের প্রয়োজন পূরণ করবেন, নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা প্রতিষ্ঠা করবেন, বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করবেন এবং ভিন্ন ধর্মালম্বীদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিবেন।[১৬] উক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরপর চারজন খলীফা নিয়োগপ্রাপ্ত হন। মহানবী সা. কর্তৃক জনপ্রশাসন ব্যবস্থা এবং তৎপরবর্তীকালে সুপথপ্রাপ্ত চারজন খলীফার জনপ্রশাসন ব্যবস্থাই মূলত ইসলামের জনপ্রশাসন ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত। এক্ষণে খলীফাগণের জনপ্রশাসন ব্যবস্থার স্বরূপ আলোকপাত করা হলো:

ক. খলীফা নির্বাচন

আল্লাহর রাসূল সা.-এর মৃতদেহকে সামনে রেখে নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতার দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে সকল সাহাবীর ঐকমত্যে আবূ বকর সিদ্দীক রা. ইসলামের প্রথম খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন। এক্ষেত্রে ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। খলীফা আবূ বকর রা. খলিফা নির্বাচিত হয়ে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন- যা ছিল জন প্রশাসনের ক্ষেত্রে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন-

'জনগণ! আমাকে আপনাদের দায়য়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু আমি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নই। আমি ভালো কাজ করলে আমাকে সাহায্য করবেন, অন্যায় করলে সংশোধন করে দিবেন। সত্যবাদিতা হলো আমানাত, আর মিথ্যাবাদিতা খিয়ানত। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করব, ততক্ষণ আপনারা আমাকে মেনে চলবেন। আমি যদি (তাদের) অবাধ্য হই, তবে আপনাদের আনুগত্য লাভের কোনো অধিকার আমার নেই। এখন সালাত আদায় করার জন্য উঠে দাঁড়ান। আল্লাহ আপনাদের উপর দয়া করুন'।[১৭] খলীফার এ ভাষণটি খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও উক্ত ভাষণে আবূ বকর রা.-এর শাসন পদ্ধতির রূপরেখা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।[১৮]

খ. আইনের উৎস

ইসলামী জনপ্রশাসনে আইনের উৎস মূলত সেটিই, যে উৎসের উপর ভিত্তি করে রাসূল সা. ও খলীফাগণ তাঁদের রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে নির্ভরশীল ছিলেন। বিশেষ করে আবু বকর রা.-এর শাসনামলে তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসরণ করেই রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন।[১৯]

গ. প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যঃ

ক. মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা, খ. নেতার কাজকর্ম মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতা, গ. জনগণের মাঝে ন্যায়পরয়ণতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, ঘ. সত্যবাদিতা, ঙ. জিহাদকে আঁকড়ে ধরার ঘোষণা, চ. অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা, ছ. পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা, জ. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।[২০], ঝ. মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ঞ. জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতনতা, ট. ব্যবসা ও বাজার ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্য রক্ষা।[২১]

ঘ. বিচারব্যবস্থা

ইসলামী খিলাফতের বিচারব্যবস্থা নতুন কোন পদ্ধতি ছিল না; বরং তা ছিল রাসূল সা.-এর বিচার ব্যবস্থারই অনুরূপ। তবে পরবর্তীতে এক্ষেত্রে অনেক নতুন পদ্ধতি ও রীতির প্রচলন প্রচলিত হয়েছে। যেমন, রায় প্রদানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলা, একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি প্রণয়ন, যার সাহায্যে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্র নতুন ও বিচিত্র পরিস্থিতিতে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগ করতে পারে।[২২] বিচার ব্যবস্থায় আইনের উৎস হলো *কুরআন, সুন্নাহ ইজমা* ও কিয়াস।[২৩]

ঙ. বিচারক নিয়োগ

বিচারকের নিয়োগের সময় তার যোগ্যতা চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করে দেখা হতো। বিচারককে যেসব অপরিহার্য গুণের অধিকারী হতে হতো সেগুলো হচ্ছে, তাঁকে আল-কুরআন সম্বন্ধে সুপণ্ডিত হতে হতো, তাঁকে হাদীসশাস্ত্রে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হতে হতো, তাঁকে সাহাবীদের পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী হতে হতো, তাঁকে পূর্ণ বয়স্ক, পুরুষ, মুসলমান, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন, স্বাধীন, সচ্চরিত্র, দৃষ্টিশক্তি ও পূর্ণ শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হতে হতো, ধার্মিকতা ও আল্লাহভীরুতা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, বুদ্ধিমত্তা, কর্কশ না হয়ে কঠোর হওয়া এবং দুর্বল না হয়ে দয়ালু হওয়া, দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া এবং সচ্ছল ও উচ্চবংশীয় হওয়া।[২৪] বিচারকগণ এমন চারিত্রিক মাধুর্য ও উন্নত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন যে, খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে কোন বিচারকের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ বা পক্ষপাতমুলক বিচারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদূন সরকার বিচারকদেরকে উপযুক্ত বেতন প্রদান করতেন।[২৫]

চ. প্রশাসক নিয়োগ

একজন প্রশাসককে বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, জুমু'আর খুতবা প্রদান, লোকজনকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া প্রভৃতি। এ কারণে রাসূল সা. তাঁর জানামতে সবচেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে এ সমস্ত কাজের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তারা ছিলেন ধার্মিক, জ্ঞানী, বিচক্ষণ এবং নেতৃত্বে দানে দক্ষ। আবু বকর রা.ও তাঁর শাসনামলে প্রাদেশিক প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।[২৬]

জনপ্রশাসনে নতুন ধারা উদ্ভাবনে যাদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ওমর রা. তন্মধ্যে অন্যতম। ওমর রা. আধুনিক ইসলামী জনপ্রশাসনের সে বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দিয়েছেন তা হলো-

ছ. ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন ও অগ্রগতি

ইসলামে জনপ্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তার শাসনামলে রাজ্যের সকল অঞ্চলের ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন ও অগ্রগতির নীতিমালা ছিল এক ও অভিন্ন। নিম্নের ঘটনায় সেটা প্রমাণিত হয়। 'একদা ওমর রা. বললেন যে, ইরাকের পাহাড়ী পথ থেকে কোন খচ্চর যদি পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলে, আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা তিনি ঐ এলাকায় রাস্তার পাদদেশ তৈরি করেননি'।[২৭]

জ. সরকারী সেবা বৃদ্ধিকরণ

ইসলামী জনপ্রশাসনের প্রকৃত অর্থ হলো সরকারী সেবার পরিধি বাড়ানো। ওমর ফারুক রা. জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'আমি তোমাদের জন্য গভর্ণর ও প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছি, তোমাদের শারীরিকভাবে আঘাত করা বা তোমাদের অর্থ আত্মসাত করার জন্য নয়, বরং তোমাদের শিক্ষা দিতে ও সেবা করতে'।[২৮]

ঝ. প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার

সরকারীভাবে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কারে ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় খলীফা ওমর রা.-ই ছিলেন প্রথম মুসলিম শাসক। যিনি প্রশাসন ব্যবস্থায় অনেকগুলো পদ্ধতি নতুনভাবে প্রচলন, গ্রহণ বা প্রবর্তন করেন। যেমন, পুলিশ বাহিনী, নৈশ প্রহরা ও করাগার প্রতিষ্ঠা, শাস্তি হিসেবে নির্বাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, খেলাফতের দপ্তরে আগত অভিযোগ তদন্তের জন্য বিশেষ দপ্তর প্রতিষ্ঠা। খুবই বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে উক্ত দপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিতকরণ, হজ্জের সময় মক্কায় বাৎসরিক একটি সভার আয়োজন করা। কর আদায়ের লক্ষ্যে ভূমি জরিপের প্রচলন করেন এবং *দীওয়ান আল-খারিজ* নামক একটি ভূমিকর বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সাধারণ লোকের পরামর্শে *বাইতুল মাল বা সরকারী কোষাগার* প্রতিষ্ঠা করা, মদীনা ও কূফায় (ইরাকের একটি প্রদেশ) সরকারী মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা।[২৯]

ঞ. জনপ্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ইসলামী জনপ্রশাসনে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, *খিলাফত*, *উইজারাহ* (মন্ত্রণালায়), *ঔলাত* (প্রাদেশিক গভর্ণর), *দীওয়ান* (সচিবলায়), *হিসবাহ* (বাজার পরিদর্শক) এবং *মাজালিম* (অভিযোগ তদন্তকারী) ইত্যাদি।[৩০]

ট. সামরিক বিভাগ

ইসলাম পূর্ব জগতে অনেক শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই বিরাট শক্তিগুলোর মধ্যে কোথাও সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী ছিল না। পরবর্তীতে ইসলামী খিলাফতে সুশৃঙ্খল ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পৃথক সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়। এক্ষেত্রে খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ভূমিকা সর্বাগ্রে। যেমন, সাম্রাজ্যকে জেলায় বিভক্তকরণ, অনুরূপভাবে খলীফা ওমর রা. সেনাবাহিনীকে পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, বাহক, সেবক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করেন এবং সৈনিকদের বেতন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেন। এছাড়া মওসুম অনুযায়ী সৈন্য চালনা, বসন্তকালে সৈন্যদের অবস্থান, সেনানিবাসের আবহাওয়া, বিশ্রাম, বার্ষিক ছুটি ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং গুপ্তচর বিভাগ : খলীফা ওমর রা. শত্রুপক্ষীয়দের গোপন খবর উদ্ধারের জন্য একটি দক্ষ গুপ্তচরের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩১]

ইসলামের তৃতীয় খলীফা উসমান ইবনু আফফান রা. তাঁর সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি ওমর রা. কর্তৃক গৃহীত সকল পদক্ষেপ অনুসরণ করেন। ওসমান রা. অধিক বয়োবৃদ্ধের কারণে খলীফা ওমর রা.-এর গৃহীত পদক্ষেপের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে তাকে সহায়তাকারী গভর্ণর এমনকি ওসমান রা.-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি তার অত্মীয়দের গর্ভনর নিযুক্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রে গভর্ণর ও সরকারী কর্মকর্তাগণ ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে থাকে। ফলে তৃতীয় খলীফার শাসনকালের শেষ এক বছর প্রশাসন ব্যবস্থা এক নাজুক পরিস্থিতিতে পতিত হয়। অতঃপর উসমান ইবনু আফফান রা.-এর ইন্তেকালের পর আলী ইবনু আবী তালিব রা. চতুর্থ খলীফা হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তৎকালীন বিরাজিত গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সরকার ও প্রশাসন পরিচালনার দিকে ভালোভাবে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে মিশরের গভর্ণরের প্রতি তাঁর লেখা চিঠি, যা প্রশাসন, রাজনীতি, ন্যায়বিচার, সরকারী কর্ম এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর দর্শনকে প্রস্ফুটিত করে।[৩২]

উপসংহার

ইসলামে জনপ্রশাসনিক ব্যবস্থা বর্তমান লোক-প্রশাসকদের পথের দিশারী। বর্তমানে লোক-প্রশাসনের ধারণায় যে সাম্য, ন্যায়বিচার, ও দরিদ্রের জন্য যেভাবে সহানুভূতির কথা উচ্চারণ করা হচ্ছে, তা আজ থেকে দেড় হাজার পূর্বে মদীনা রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিচালনা করার জন্য ইসলাম অনেক সুদূরপ্রসারী দিক নির্দেশনা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছে, যা বিশ্ব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অথচ আধুনিক উন্নত ও সুসংহত লোক-প্রশাসনের আইন ও যন্ত্রাংশ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিশ্বে কোথাও শান্তি নেই, নেই নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা। সুতরাং রাসূল সা. ও তার নির্দেশিত পথে পরিচালিত মহামান্য চার খালীফার নীতি-আদর্শ ভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা আধুনিক জনপ্রশাসন ব্যবস্থার জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

তথ্যনির্দেশ

১ S.A.Q. Husaini, *Constitution of the Arab Empire* (Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1958), p. 2-4.

২ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: আল-কুরআন, সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৮; সূরাহ আন-নিসা : ১৩২-১৩৩।

৩ মূলভাষ্য: إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَّمِيْنِ الرَّحْمَنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا. দ্র: মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশায়রী আন-নায়সাপুরী, *আস-সাহীহ*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১৪৫৮, হাদীস নং-১৮২৭।

৪ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ১৪৫, হাদীস নং-২৯২৮।

৫ যেমন রাসূল সা. বলেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ দ্র: ইমাম মুসলিম, *আস-সাহীহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫, হাদীস নং-১৪২।

৬ ড. 'আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *সীরাতু আবী বাকর আস-সিদ্দীক শাখসিয়াতিহি ওয়া আসরিহি* (কায়রো : মুওয়াসসাসাতু ইকরা, ১ম সংস্করণ, ১৪২৭ হি./২০০৬), পৃ. ১০৩; ড. 'আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *'ওমর ইবনুল-খাত্তাব*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : সিয়ান পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৩৮৮-৩৯১।

৭ ইবনু হিশাম, *সীরাতুন্নবী (সঃ)*, প্রথম খন্ড, পৃ. ৯৬৫।

৮ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য* (ঢাকা : ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, তেজগাঁও ১৯৮৫), পৃ. ১৬।

৯ সূরাহ আলে 'ইমরান : ১৫৯।

১০ হাফিয আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবনু কাসীর আল-কুরাশী আদ-দিমাশক্বী, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল মা'আরিফাহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হি./ ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৪২৯ 'সূরাহ আলে 'ইমরানের ১৫৯-এর ব্যাখ্যা' দ্রষ্টব্য।

১১ আবদুন নূর, *লোক প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৯), পৃ. ১০৪।

১২ *প্রাগুক্ত*।

১৩ *প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, পৃ. ২৪২-২৪৩।

১৪ *লোক প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা*, পৃ. ১০৫।

১৫ *প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, পৃ. ২৪৩।

১৬ ড. 'আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী, *আবু বকর আস-সিদ্দীক* (ঢাকা : সিয়ান পাবলিকেশন্স, ২০১৮), পৃ. ২০৫।

১৭ *সীরাতু আবী বাকর আস-সিদ্দীক শাখসিয়াতিহি ওয়া আসরিহি*, পৃ. ১০১।

১৮ *আবু বকর আস-সিদ্দীক*, পৃ. ২১২।

১৯ *সীরাতু আবী বাকর আস-সিদ্দীক শাখসিয়াতিহি ওয়া আসরিহি*, পৃ. ১০৩; *'ওমর ইবনুল-খাত্তাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮-৩৯১।

২০ *সীরাতু আবী বাকর আস-সিদ্দীক শাখসিয়াতিহি ওয়া আসরিহি*, পৃ. ১০৪-১১৬।

২১ *'ওমর ইবনুল-খাত্তাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০-১৬২, ২১৯, ২৩৪-২৩৬।

২২ ড. মুহাম্মাদ আয-যুহাইলী, *তারীখুল কাযা ফিল ইসলাম* (বৈরূত : দারুল ফিকরিল মু'আসির, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৮৪।

২৩ *আল-খালীফাতুল আওয়াল আবু বকর আস-সিদ্দীক শাখসিয়্যাতুহু ওয়া 'আসরুহু*, পৃ. ১৪২।

২৪ *'ওমর ইবনুল-খাত্তাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮০-৩৮২।

২৫ *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০-১৬২, ২১৯, ২৩৪-২৩৬।

২৬ *আবু বকর আস-সিদ্দীক*, পৃ. ২৪৩-২৪৪।

২৭ *প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, পৃ. ২৪৫-২৪৬।

২৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৬।

২৯ আল্লামা শিবলী নোমানী, *আল-ফারুক* (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, মে ২০০৭ ইং), পৃ. ১৫২-১৫৩, ১২৭-১২৮, ১৯৫-১৯৬, ২২৫-২২৬।

৩০ *প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, পৃ. ২৫৫।

৩১ *আল-ফারুক*, পৃ. ১৬৬-১৮১।

৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

মুসলিম বিজ্ঞানচর্চার সূচনা ও বিকাশ (৭৫০-১৫১৭): একটি পর্যালোচনা
(The Beginning and Development of Muslim Science (750-1517): A Review)

Dr. Abul Bashar Muhammad Sorowar Alam*

Abstract: The practice of science has started since the birth of human beings. The Persians, Greeks and Romans have made significant contributions to the progression of science. The science of the past was emotional and incomprehensible. There were no testing facilities. The practice of science was confined to special classes. Prior to the advent of Islam, the practice of science in Persia, Greece, Rome, Egypt, Syria and India had come to a standstill. This is why the period before the advent of Islam is called the Dark Ages. After the advent of Islam, science took on a new dimension and continued till the fifteenth century. Inspired by the Holy Qur'an and Hadith, Muslims concentrated on the study of science. Although the practice of science did not take an institutional form in the time of the Prophet (peace be upon him), Khulafay Rashaydeen and Umayya, the practice of science continued. The Scientific works took on a multidimensional form during the Abbasid rule. The practice of science has entered a new age. After the establishment of Baitul Hikma in Baghdad under the patronage of Abbasid Caliphs, texts in different languages were translated into Arabic in all branches of science under it which paved the way for formal education. This is why the Abbasid rule is called the golden age of science. Muslim rule in Spain (Al Andalus) began in 711 AD under the leadership of Tariq bin Ziad. Under the leadership of the Andalusian rulers, mosques, schools, universities, libraries were established in various cities including Cordova, Granada, Seville, and branches of medicine, mathematics, chemistry, geography, astronomy and philosophy flourished. Muslim rulers ruled Spain for a long period of 781 years, bringing education, culture and science to the forefront. The Fatimid Empire was established by Saeed Ibn Hussain in Tunisia in 909 AD. Fatimid rulers conquered North Africa and Egypt in stages. The Fatimid rulers established mosques, Darul Hikmah, Observatories, Colleges, Universities and Libraries for the development of science. After the Fatimids, the development of science in collaboration with the Seljuks, Ayyubis and Mamluks continued through ups and downs. When the Ottoman Empire was established in Egypt in 1517 AD, the path of science was blocked. The beginning of the practice of science in Spain and Sicily created a renaissance and paved the way for modern science in Europe.
Key Word: Muslim Science, Emergence, Depelopment.

১.১ ভূমিকা

ইসলাম আগমনের পর মুসলিম শাসক ও বিজ্ঞানীরা পারসিক, গ্রিক, রোমান, চীন প্রভৃতি জাতির উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় নব উদ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। রাসূল (সা.), খুলাফায়ে রাশিদীন ও উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ প্রশস্ত হয়। আব্বাসীয় আমলে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়। একইভাবে স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ধারা ষোল শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ষোল শতকের প্রারম্ভে মুসলিম শাসনের অবসান হলে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নেতৃত্ব দেয় এবং ইউরোপে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা হলেও মুসলিমদের অবদান আজ অবহেলিত ও অস্বীকৃত। মুসলিমদের বিজ্ঞান চর্চায় অবদান ইতিহাসের অতল

* Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Bangladesh.

গহ্বরে নিমজ্জিত। এমন অবস্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিমদের ইতিহাস উম্মোচিত হলে পাঠক সমাজ ও শিক্ষার্থীদের নিকট মুনলিমদের অতীত গৌরব উদ্ভাসিত হবে এবং মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ প্রশস্ত হবে।

১.২ বিজ্ঞান-এর পরিচয়

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান দ্বারা 'বিশেষ জ্ঞান' বুঝায়।[১] বিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Science, যা *ল্যাটিন* শব্দ Scientia শব্দ থেকে এসেছে, এর অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান'। Scientia শব্দটির ব্যবহার মধ্যযুগে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের রচনায় পরিলক্ষিত হয়।[২] বিজ্ঞান শব্দের আরবি প্রতিশব্দ 'ইলম (علم)'। ইলম শব্দের অর্থ জানা, বুঝা, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি।[৩] এছাড়া বিজ্ঞান শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে আরবি হিকমাহ (حكمة) শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যার অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, তত্ত্ব, বিজ্ঞান, যুক্তিসহ ব্যাখা প্রভৃতি।[৪] ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও যাচাইযোগ্য, তার সুশৃঙ্খল নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা এবং সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান। ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কোন বিষয়ে প্রাপ্ত ব্যাপক ও বিশেষজ্ঞানের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানবিদ বা বৈজ্ঞানিক নামে অভিহিত করা হয়।[৫] আধুনিককালে মুসলিমদের বিজ্ঞান বলে একটি বিজ্ঞান শাস্ত্রের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যেখানে মুসলিমদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আট থেকে পনেরো শতক পর্যন্ত বা ইসলামের স্বর্ণযুগে ইসলামী সভ্যতার অধীনে বিকাশপ্রাপ্ত বিজ্ঞানকে ইসলামী বিজ্ঞান বলে।[৬] প্রফেসর আব্দুল হামিদ ও মহসিন মাহদীসহ আধুনিক যুগের লেখকেরা ইসলামী বিজ্ঞানকে আরবি বিজ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন। কেননা এ সময়ের অধিকাংশ গ্রন্থ ইসলামী সভ্যতার সার্বজনীন ভাষা আরবীতে প্রণীত হয়েছে।[৭]

১.৩ ইসলামের আলোকে বিজ্ঞান চর্চা

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান উৎস আল কুরআন ও হাদীস। আল কুরআন ও হাদীস এককভাবে বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। কাজেই এগুলোকে বিজ্ঞানের গ্রন্থ মনে করা ঠিক হবে না। আল কুরআনের মোট আয়াতের প্রায় নয়ভাগের একভাগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে হাদীসে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা স্থান পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ফল-ফলাদি ও ঔষধি গাছের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। একইভাবে রাসূল (সা.)-এর হাদীসে ঐ সকল জিনিসের বিস্তারিত তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিদর্শন ফুটে উঠেছে। আল্লাহ পাক বলেন, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ "শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যায়তুনের"।[৮] রাসূল (সা.) যায়তুন ফল ও তৈল সম্পর্কে বলেন, كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ "তোমরা যায়তুনের ফল খাও এবং এর তৈল ব্যবহার কর। কারণ এটি বরকতপূর্ণ বৃক্ষ"।[৯] অনুরূপভাবে হাদীসে যায়তুনকে উপকারী গাছের ফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত যে, যায়তুনের ফল এবং তৈল মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও ফলদায়ক। হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি করে। যায়তুনের ফল এবং তৈল খাদ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহার হয়ে থাকে।[১০] যায়তুন ফল ও তেলের মধ্যে বহুগুণের উপস্থিতির কারণে মহানবী (সা.) একে বরকতময় বলে অভিহিত করেছেন।

১.৪ মুসলিম বিজ্ঞান চর্চার সূচনা ও বিকাশ

তিন থেকে পনেরো শতক পর্যন্ত সময়কালকে মধ্যযুগ বলা হয়। মধ্যযুগের প্রথমার্ধকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্ধকার যুগ বলা হয়। মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধে ইসলাম আগমনের পর থেকে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা হয় এবং তা পনেরো শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

১.৪.১ আব্বাসীয় আমলে বিজ্ঞান চর্চা

রাসূল (সা.), খোলাফায়ে রাশিদীন ও উমাইয়া শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল আব্বাসীয় যুগে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। খলিফা আবু জাফর আল মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) নিজেই একজন প্রথিতযশা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। খলিফা গ্রীক, রোম, আর্য প্রভৃতি সভ্যতার দর্শন ও বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদকর্ম সম্পাদনের জন্য ইসহাক আল ফাজারী, ইয়াকুব ইবন তারিক, আবূ ইয়াহিয়া আল বাতরিক,

নওবখত, মাশাল্লাহ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নিযুক্ত করেন।[১১] আবূ ইয়াহিয়া খলিফার নির্দেশে গ্যালেন ও হিপোক্রেটিসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসহ ইউক্লিডের এলিমেন্টস ও টলেমির অ্যালমাজেস্ট গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন।এছাড়া আল ফাজারী ভারতীয় গ্রন্থ সিদ্ধান্ত, আবূ ইয়াহিয়া আল বাতরিক টলেমির টেট্রাবিবলস গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন।[১২] আল মাহদী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর শাসনামলে অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ সিরিয়া ভাষা থেকে আরবীতে অনূদিত হয়।[১৩] খলিফা হারুন-অর-রশীদ পূর্বসূরীদের ন্যায় গ্রীক ও ভারতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। তাঁর রাজত্বকালে ইউক্লিডের জ্যামিতির কিয়দাংশ আরবিতে অনূদিত হয়। এছাড়া আঙ্কারা ও অ্যামোরিয়াম থেকে সংগ্রহকৃত গ্রন্থ বখতিশুর পুত্র জিব্রিল ও ইউহান্না অনুবাদ করেন।[১৪]

খলিফা আল-মামুন নিজেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতেন।[১৫] খলিফা হারুন-অর-রশীদ-এর সময় প্রতিষ্ঠিত খাজানাহ্ আল-হিকমাহকে সম্প্রসারণ করে আল মামুন ‘*বায়তুল হিকমাহ*’ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬] *বায়তুল হিকমায়* গবেষণাগার, অনুবাদ ও শিক্ষায়তন নামে তিনটি পৃথক বিভাগ ছিল। আল মামুন ভূগোলশাস্ত্রের উন্নয়নে মুহাম্মদ ইবন মুসা আল খাওয়ারিজমীর নেতৃত্বে ৬৯/৭০ জন পণ্ডিতকে পৃথিবীর বৃহত্তম মানচিত্র অঙ্কনের দায়িত্ব প্রদান করেন।[১৭] তাঁর বহুমুখী তৎপরতা ও উদ্যোগের কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, অংক, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থ, দর্শন প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।[১৮] খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ-এর সময় বিদেশ থেকে গ্রন্থ এনে সেগুলো অনুবাদ করা হয়। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের আমলে বিদেশী ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলো অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়। ছাবিত ইবন কোরাসহ তাঁর শিষ্যরা গ্রীক ভাষার গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সাবিতের পুত্র সিনান, দুই পৌত্র সাবিত ও ইব্রাহিম এবং প্রপৌত্র আবূ আল ফারাজ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন।[১৯] আব্বাসীয় আমলের প্রারম্ভে যে অনুবাদকর্ম শুরু হয়েছিল দশ শতকে তা পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৫০ বছরের অধিক সময়ে বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয় এবং বিজ্ঞান চর্চা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে।[২০]

আব্বাসীয় আমলে সফল অনুবাদের পর মৌলিক গবেষণার সূচনা হয়। দশ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকগুলো মৌলিক গ্রন্থ আরবীতে রচিত হয়। এজন্য এ সময়কালকে মুসলমানদের জ্ঞান চর্চার গৌরবময় যুগ বলা হয়।[২১] চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলী ইবন সাহল, আল কিন্দি, আর-রাজী, ইবন সিনা, আল মাসউদী; জ্যোতির্বিদ্যা ও অংকশাস্ত্রে আবূ মাশার, আল বাত্তানি, আবুল ওয়াফা, আল খাওয়ারিজমী, বানু মুসা, আল বেরুনী, ওমর খৈয়াম; ভূগোলশাস্ত্রে ইবন খোরদাদবিহ, ইবনুল ফকীহ, আল মাকদিসী, কুমাদা বিন জাফর, ইবন রুস্তা, আল ইস্তাখরি; রসায়নে জাবির ইবন হাইয়ান প্রমুখ গ্রন্থ রচনা করে বিজ্ঞন চর্চাকে বেগবান করেন।[২২] আব্বাসীয় শাসনামলের শেষ সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে। বিশেষ করে হালাকুখান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হলে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়।[২৩] পরবর্তীকালে মোঙ্গলেরা রুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

১.৪.২ স্পেনে বিজ্ঞান চর্চা

উমাইয়া শাসক প্রথম ওয়ালিদের সময় তারেক বিন যিয়াদ-এর নেতৃত্বে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে (আন্দালুস) মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। স্পেনের উমাইয়া আমিরী শাসক আব্দুর রহমান আল দাখিলের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে পরবর্তী তিনশো বছর মুসলিম স্পেন বিশ্ব সভ্যতার অন্যতম পাদপীঠে পরিণত হয়েছিল। স্পেনীয় মুসলিম শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমান এবং তাঁর উত্তরসূরী দ্বিতীয় আল হাকামের আমলে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে। তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্ডোভায় বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উত্তরসূরী আল হাকাম রাজধানী কর্ডোভাতে ২৭টি অবৈতনিক স্কুলসহ কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতো।[২৪] ধর্মতত্ত্ব, আইন ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যা, অংক ও চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হতো।

দ্বিতীয় আল হাকাম পূর্বসূরীদের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারকে সম্প্রসারণ করে রাজকীয় গ্রন্থাগারের রূপ দেন। সেখানে ৪ লক্ষ গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। এছাড়াও কর্ডোভার বিভিন্নস্থানে ৭০টি গ্রন্থাগার ছিল।[২৫] স্পেনীয় শাসক আবূ ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর মাররাকেশে বিশ্বমানের একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬] জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে সেভিল, মালাগা ও গ্রানাডায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সপ্তম নাসরীয় ইউসুফ আবুল হাজ্জাজ (১৩৩৩-৫৪ খ্রি.) গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব, আইন, দর্শন, চিকিৎসা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো।[২৭] স্পেনে মুসলিমদের সুদীর্ঘ ৭৮১ বছরের শাসনকালে চিকিৎসা, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা রসায়ন, দর্শন, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি শাখায় আবূ উবাইদা মুসলিম আল বালানসি, আল বাকরি, ইবন জুবায়ের, আল ইদ্রিসী, ইবন বতুতা, ইবন খালদুন, আল মাজরিতি, আল জারকালি, আল বিতরাজি, ইবন রুশদ, ইবন বাজ্জা, ইবন তোফায়েল, আল জাহরাবী, ইবন যুহর, আল গাফিকি, ইবনুল বায়তার প্রমুখ অনবদ্য অবদান রাখেন।[২৮] স্পেনে পনেরো শতকের শেষে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

১.৪.৩ উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে বিজ্ঞান চর্চা

৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবী বংশের জিয়াদত উল্লাহকে পরাজিত করে সাঈদ ইবন হুসাইন তিউনিসিয়ায় ফাতিমিয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ফাতিমিয় শাসকরা পর্যায়ক্রমে উত্তর আফ্রিকা ও মিসর জয় করে শাসনকার্য অব্যাহত রাখেন। আল মুয়িজ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব অবদানের জন্য 'পাশ্চাত্যের মামুন' এবং মুসলিম আফ্রিকার 'ম্যাসিনাস' নামে পরিচিত ছিলেন।[২৯] তিনি মুনসরি ও কায়রোতে গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ আল-তামিমী, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, আল কিন্দি, মুসা বিন গাজান, সাঈদ ইবনুল বাওয়ারিক প্রমুখ তাঁর দরবারের উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন। খলিফা আল আজিজ এর রাজপ্রাসাদের পাঠাগারে দুষ্প্রাপ্য দুই লক্ষ গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। তিনি কায়রোর আল আজহার মসজিদ সংলগ্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩০] খলিফা আল হাকিমের শাসনকালে অনেকগুলো মসজিদ, মহাবিদ্যালয় এবং মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। আল হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে '*দারুল হিকমাহ*' বা '*দারুল ইলম*' প্রতিষ্ঠা করেন।[৩১] অত্র প্রতিষ্ঠানে জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হতো। পদার্থবিজ্ঞানের জনক ইবনুল হাইসাম গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা এবং আম্মার ইবন আলী মুসেলী চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন।[৩২]

ফাতিমিয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে সালজুকরা সিরিয়া দখল করে। পরবর্তীতে সিরিয়া অঞ্চলে নূরের বংশধরদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। নূর-আল দীন-এর শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি দামেস্কে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।[৩৩] সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী মিসর, সিরিয়া, জেরুজালেম প্রভৃতি অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠার পর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ কায়রোতে দু'টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৪] আইয়ুবীয় শাসনের অবসান ঘটলে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে মিসরের মামলুকরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। মামলুকীয় শাসকদের সুদীর্ঘ ২৬৭ বছর রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিকাশ ঘটে। তেরো শতকের প্রারম্ভে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল তার উত্থান ঘটে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি, গণিত, চিকিৎসা, জীবন চরিত, দর্শন প্রভৃতি শাখায় বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। সুলতান কালাউন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সুপরিকল্পিত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৫] এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন বিশ্বখ্যাত চিকিৎসক ইবন আল নাফিস। পশুচিকিৎসায় ইবন আল বায়তার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তেরো শতকে সিরিয়া ও মিসরে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় চক্ষু চিকিৎসার অনুশীলন হতে থাকে।[৩৬] ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত প্রভৃতি শাখায় ইবন আবি আল মাহাসিন, সালাহউদ্দীন ইবন ইউসুফ, আহমদ ইবন আবি উসাইবিয়া, আব্দুল লতিফ আল বাগদাদী, ইবন খাল্লিকান, ইবন খালদুন, আবুল ফিদা, আল মাকরিযি প্রমুখ বিশেষ অবদান রাখেন।[৩৭] ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে উসমানিয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উসমানিয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা রুদ্ধ হয়ে যায়।

১.৫ উপসংহার

মধ্যযুগে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, রাসূল (সা.)-এর সময় থেকে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা হয়ে খুলাফায়ে রাশিদিন ও উমাইয়া শাসনামলে অব্যাহত থাকে এবং আব্বাসীয় যুগে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকুখান কর্তৃক বাগদাদ নগরী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় এবং আব্বাসীয় শাসনের অবসান ঘটে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ বাধাগ্রস্ত হয়। অপরদিকে সুদীর্ঘকাল ধরে উমাইয়াগণ স্পেন (আন্দালুসিয়া) শাসন করে আন্দালুসিয়াকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাতিঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। একইভাবে উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতিমিয়, আইয়ুবীয় ও মামলুকদের শাসনকালে স্বল্প পরিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা চলমান থাকলেও ষোল শতকের প্রারম্ভে মামলুকদের পতনের মধ্যদিয়ে মধ্যযুগের মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বিকাশের অবসান ঘটে এবং ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নবজাগরণ সৃষ্টি হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ রাজশেখর বসু (সংকলিত), *আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান* (কলিকাতা: ১৩৩৮ বাং), পৃ. ৫০৭-৫১০; জামিল চৌধুরী (সম্পা.) *বাংলা একাডেমী আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৯৬৫।

২ শ্রী সমরেন্দ্রনাথ সেন, *বিজ্ঞানের ইতিহাস* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫।

৩ Hans Wehr, *A Dictonary of Modern Written Arabic* (London: Macdonald & Evans Ltd, 1980 A.D.), p. 775.

৪ *A Dictionaryof Modern Written Arabic*, p. 197; M. Akbar Ali, *Science in The Quran* (Dhaka: The Malik Library, 1976 A.D.), p. 1.

৫ J.L. Heilbron, *The Oxford Companion to the History of Modern Science* (New York: Oxford University Press, 2003, A.D.), p. VI.

৬ বাংলা উইকিপিডিয়া, 'ইসলামী_বিজ্ঞান', শিরোনামে, 21.09.2022 তারিখে প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে তথ্য সংগৃহীত।

৭ Abdelhamid Sabra, The exact Sciences, *in the Genius of Arab Civilization: Source of Renaissance* (Phaidon Oxford: 1975 A.D.), p. 121; Roshdi Rashed and Regis Morelon (ed), *Encyclopaedia of the History of Arabic Science* (New York: 1996 A.D.), Vol 3, p. 1027.

৮ সূরাহ ত্বীন: ১

৯ মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *তিরমিযি আস-সুনান* (মিসর: মুস্তাফা আল-বাকী আল-হালবী, ১৯৭৫ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯।

১০ হাফিজ নযর আহমদ, মাওলানা মুহাম্মদ নূরুয্যমান অনূদিত, *তিব্বে নববী (সা.)* (ঢাকা: হক লাইব্রেরী, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৯২-১৯৩

১১ এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান* (ঢাকা: দি মালিক লাইব্রেরী, ১৯৯৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৫; নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্বসভ্যতায় মুসলিম অবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৮।

১২ Fuat Sezgin, *Science and Technology in Islam* (Germany; The Institute for the history of Arabic-Islamic Science, 2010 A.D.), Vol. 1, p. 8.

১৩ Muzaffor Iqbal, *Science and Islam* (London: Greenwood Press, 2007, A.D.), p. 25.

১৪ Philip K Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan press Ltd, 1970, A.D.), p. 311-312.

১৫ হাফিজ ইবুন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.), ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৩১।

১৬ সেলিম টি এম আল হাসসানী, *আলফু ইখতিরাইন ওয়া ইখতিরাউত তুরাসিল ইসলামী ফী আলামিনা* (ইউ কে: ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স টেকনোলজি এ্যান্ড সিভিলাইজেশন, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৪৬।

১৭ ড. মুহাম্মদ সাউদ, ড. সিরাজুল ইসলাম অনূদিত, *ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন* (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১০৫।

১৮ Syed Ameer Ali, *Ashort History of the Saracens* (London: Macmillon and Company Limited, 1916 A.D.), p. 279.

১৯ *History of the Arabs*, p. 314.

২০ Syed Ashraf Ali, *Men of Letters Men of Science* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2004. A.D.), p 24.

২১ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান, *আরবের ইতিহাস* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ২৩৪; মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১ খ্রি), পৃ. ১৪৪।

২২ Parvez Hoodbhoy, Islam and Science (London: Zed Books Ltd., 1991 A.D.), p. 85.
২৩ Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam* (Culcutta: S.K. Lahiri & Co, 1902 A.D.), p. 352.
২৪ *আরবের ইতিহাস*, পৃ. ৪১৯।
২৫ *Men of Letters Men of Science*, p. 21.
২৬ *The Encyclopaedia of Islam* (London: Luzac & Co. 1961 A.D.), Vol. 1, p. 1224.
২৭ *A short History of the Saracens*, p. 569-570; *History of the Arabs*, p. 563.
২৮ *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১৫১-১৬০।
২৯ *The Spirit of Islam*, p. 342.
৩০ *History of the Arabs*, p. 342.
৩১ *আলফু ইখতিরাইন ওয়া ইখতিরাউত তুরাসিল ইসলামী ফী আলামিনা*, পৃ. ৪৮; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন* (কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৫৬।
৩২ *History of the Arabs*, p. 629.
৩৩ Shami Khalaf Hamarneh, *Health Science in Early Islam* (Zahra Publication, 19983 A.D), Vol. 2, p. 100.
৩৪ *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৫৮।
৩৫ Edward G. Browne, *Arabian Medicine* (London: Cambridge University Press, 1921 A.D.), p. 101.
৩৬ *History of the Arabs*, p. 685-686.
৩৭ *আরবের ইতিহাস*, পৃ. ৫১০-৫১১; *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস*, পৃ. ১৭১-১৭২।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

যাহাবীর কবিতায় আলংকারিক সৌন্দর্য
(Rhetoric Beauty in the Poems of Zahawi)

Dr. Imtiazul Alam Mahfuz*

Abstract: The modern era of Arabic literature started from the last half of the nineteenth century. The society and culture of Arab was tremendously influenced by the touch of modernism. Arabic poetry found a new way with this profound change. Modern Arabic poetry is mainly classified into three levels. The last level is called the glorious phase of Arabic Poetry. In that time, the Renaissance poets did not give much more importance on rhetoric rather they concentrated on the development and advancement of Arabic Poetry. But that does not mean the poets of that time did not maintain rhetoric quality in their poems, Zahawi's poems are the great example of it. Jamil Sudqi az-Zahawi (1863-1936) was an Iraqi poet, critical figure in the development of Arabic literary modernism, and a scholarly and outspoken contributor to political and social debates during the early part of the twentieth century. He was also a writer, philosopher, educationist, journalist and politician. He occupied a strong place in the modern realm of poetry as a philosophical poet. Diversity of theme, strong narrative technique and representation of contemporary society brought for him the highest pick of fame. Conversion of knowledge and philosophical thought as the subject of poetry was his noteworthy contribution. With the use of diction, rhythm, symbol and imagery, he represented the poem in such a way that readers become mesmerised by it and the rhythm of his poems create an aura. This article will discuss the rhetorical beauty of the poems of Zahawi.
Key words: Rhetorical Beauty, Poems of Zahawi.

১.১ ভূমিকা

আরবি সাহিত্যের রেনেসাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ইরাকের জামীল সুদকী আয-যাহাবী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। দার্শনিক কবি হিসেবেই তিনি আধুনিক কাব্যজগতে সমধিক পরিচিত। কবিতায় বৈচিত্রময় বিষয়াবলী, সাবলীল বর্ণনা-রীতি এবং সমসাময়িক সমাজের প্রতিনিধিত্ব তাঁকে খ্যাতির শিখরে আরোহন করিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে কবিতার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। কাহিনীকাব্য ও মহাকাব্য রচনায় তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।তিনিই প্রথম মিত্রাক্ষরের প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কবিতা রচনা করেছেন।কবি যাহাবী ১৮ জুন, ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ মুতাবেক ১২৭৯ হিজরীর যুলহাজ্জা মাসের শেষ বুধবার ইরাকের বাগদাদ নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।যাহাবীর জীবনের শেষদিনগুলো কাটে একাকিত্বে। পঁচিশ বছর বয়সে মেরুদন্ড ও পোলিও রোগে আক্রান্ত হওয়া কবি শেষ বয়সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগে আক্রান্ত হন। ফলে সারাক্ষণ কবিকে ঘরে বসেই কাটাতে হত। এভাবেই একদিন কবির জীবন প্রদীপ নিভে যায়। দিনটি ছিল ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ।

১.২ অলংকারপূর্ণ কবিতা ও যাহাবী

কবি যাহাবী যুগপৎ আহ্বান জানিয়েছেন "الشعر المرسل" (মুক্ত ছন্দের কবিতা) রচনা প্রতি। المرسل কবিতা রচনার আহ্বান জানালেও তাঁর রচনা শৈলী প্রশংসনীয়এবং আলংকারিক নৈপুণ্যে ভরা। কবিতার জন্য তিনি সহজ শব্দ চয়ন করলেওতাঁর কিছু কবিতায় আভিধানিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আবার তিনি তাঁর কবিতায় লোকজ শব্দও ব্যবহার করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রূপকের আশ্রয়ও নিয়েছেন। তাঁর কবিতায়

---

* Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Pundra University of Science & Technology, Gokul, Bogura, Bangladesh.

আলংকারিক উপাদান التكرار (পুনরুক্তি), التشبيه (উপমা), উৎপ্রেক্ষা এবং الاستعارة(রূপক), التناص(অন্যের দ্বারা প্রভাবিত), التضاد(বৈপরীত্য) প্রভৃতির বহুল ব্যবহার বিদ্যমান। সার্থকভাবেই তাঁর কবিতা এই সব অলংকারে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছে। الصورة (চিত্রকল্প) উপস্থাপনেও তিনি শিল্প দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনীকাব্যগুলোর الشخصية(চরিত্র), الحدث(ঘটনা), البيئة(পরিবেশ) ও الهدف(উদ্দেশ্য) অংকনেও কবি যাহাবী নৈপুন্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে। যা তাঁর কাব্যকাহিনীগুলোকে চমৎকারিত্ব প্রদান করেছে। নিম্নে কবি যাহাবীর কবিতার আলংকারিক সৌন্দর্য তুলে ধরা হলোঃ

১.২.১ শব্দচয়ন[اقتباس اللفظ]

কবির আবেগ-অনুভূতি-স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে পাঠকের অনুভব-উপলব্ধি-চিন্তা-কল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় কবিতার শব্দের মাধ্যমে। একজন কবি শব্দের প্রচলিত ব্যবহারজনিত জরা-জীর্ণতাকে বাদ দিয়ে তার একটি ভিন্নতর অর্থময়তা দান করেন।[১]যাহাবী কবিতার শব্দ চয়নে কঠিন ও দুর্বোধ্যতা থেকে দূরে থেকেছেন।যাহাবীর কিছু কিছু কবিতায় স্বল্প প্রচলিত ও আভিধানিক শব্দের ব্যবহার হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করে তার রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। তবে এর সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়। যেমনটি পরিলক্ষিত হয় তাঁর "اسماء" কবিতায়। এ কবিতায় কবি "بضبعيه"শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার আভিধানিক অর্থ "দুই বাহু" কিন্তু কবি এখানে এ শব্দের মাধ্যমে একজন অসহায় যুবতীর দু:খ-কষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এছাড়াও শব্দটির সাথে মিলে পূর্ববর্তী ক্রিয়াপদ "تأخذ" (গ্রহণ করা) শব্দটি নতুন একটি অর্থ গ্রহণ করেছে, আর তা হল "يساعده" (সহায়তা করা)। "أسماء"কবিতায় যাহাবী বলেন:

إذا أنت لم **تأخذ بضبعيه**موصلا * إلى الملأ الأعلى فما أنت تنفع[২]

'উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে তুমি যদি তাকে সার্বিক সহযোগিতা না কর, তবে তুমি তার কোন উপকারই করনি।'

অনুরূপ ভাবে একই কবিতায় কবি দু:খ-কষ্ট বুঝাতে "إرنان"শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[৩] যার অর্থ "العويل" (বিলাপ, আর্তনাদ), ও "الصياح" (চিৎকার)[৪]। এ ধরণের আভিধানিক শব্দের ব্যবহার আরো দেখা যায় "أرملة الجندى" কবিতায়।[৫] কবি তাঁর সময়ের শাসকবৃন্দের অন্তর বুঝাতে "جندل" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার প্রকৃত অর্থ "الصخر"(পাথর)[৬]। একই কবিতায় "سجف"শব্দটি অর্থ পর্দা বা ঘোমটা[৭] হলেও কবি তা গভীর অন্ধকার প্রকাশে ব্যবহার করেছেন।[৮] এ কবিতাটিতে "حنظل"শব্দটির অর্থ তিক্ত ফল বিশেষ[৯] (মাকাল ফল) যা দু:খ-কষ্ট অর্থে কবি ব্যবহার করেছেন।[১০]কবি যাহাবীর কবিতায় আঞ্চলিক, লোকজ, বহুল প্রচলিত শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। । যেমন কবি বলেন:

كان حياتي حين أبصر لونها * سراب ببيداء بدا يتلعلع[১১]

(আমার জীবনের বিভিন্ন রং যখন আমি দেখি তখন মনে হয় তা যেন মরীচিকা, যা কখনও দৃশ্যমান, কখনও আবার লুকায়িত)

এ বাক্যে ব্যবহৃত "يتلعلع"শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল, যা কখনও প্রকাশ্যমান আবার কখনও লুকায়িত। কবি যাহাবী এখানে আভিধানিক অর্থ 'মরীচিকা'[১২]গ্রহন করেছেন।

১.২.২ পুনরুক্তি [التكرار]

কবিতায় পাঠকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি শব্দ"التكرار"করা হয়ে থাকে, যা অলংকারের অন্যতম একটি উপদান। যাহাবীর কবিতায়"التكرار"(পুনরুক্তি) কখনও হয়েছে শব্দের, কখনও বাক্যের আবার কখনও বর্ণের। যেমন "أرملة الجندي"কবিতায়"جعادة"শব্দটি পর পর তিনটি লাইনে এসেছে। যেমন:

جعادة أن ابنى تغيب نفســـــه * من الجوع إن الجوع ويلى يقتل

جعادة إن ابنى الوحيد هو الذي * بـــــه في ليالي وحدتي أتـــعلل

جعادة أن الأمر جد فـــــأدركي * وللجار حق واجب ليس يغفل[১৩]

১.২.৩ ছন্দ[بحر]

ছন্দ হল শব্দের সুমিত ও সুনিয়ত বিন্যাস।[১৪] 'পঙক্তির বিভিন্ন অংশের যে পারিপাট্য ভাষায় এক অনির্বচনীয় দোলা উৎপন্ন করে ভাষাকে শক্তিশালী ও মনোজ্ঞ করে তাকে ছন্দ বলে।'[১৫] আরবী কবিতার ছন্দ তথা বাহ্‌র ষোলটি। আরবী কবিতার ওজন নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। প্রাচীন আরবী কবিতাগুলো এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচীন কবিগণ বিভিন্ন বিষয় তাদের কবিতাসমূহে রচনা করেছেন কবিতার নানান বাহারে। প্রাচীন কবিরা কবিতার জন্য নির্দিষ্ট একটি ওযনকে বেছে নিতেন না; বরং তারা কবিতা রচনা প্রারম্ভে উপস্থিত কবিতার (ছন্দ) নির্বাচন করতেন।কবি যাহাবী তাঁর কবিতার জন্য কোন "بحر" (ছন্দ) কে নির্দিষ্ট করেননি। তবে তাঁর অধিকাংশকবিতা-ই "بحر الطويل" (ত্বৰীল) এ রচিত। তা ছাড়াও তাঁর কবিতায় "بحر الكامل"(কামেল), "بحر الخفيف" (খফীফ) এবং "بحر البسيط" (বাসীত) এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। "بحر الطويل"এ রচিত কবিতার উদাহরণে উল্লেখ করা যায় "أسماء"কবিতাটি[১৬],"بحر الخفيف"এ রচিত হয়েছে "طاغية بغداد"কবিতাটি[১৭], "بحر الكامل"এ রচিত কবিতা হল "مقتل ليلى والربيع"কবিতাটি।[১৮]

১.২.৪ অন্তমিল [القافية]

আরবি কবিতার অন্যতম একটি আলংকারিক দিক হলো অন্তমিল(القافية)। যাহাবীর কবিতাতেও অন্তমিল পরিলক্ষিত হয়, তবে এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি ক্বাফিয়াকে কবিতার জন্য অবশ্যম্ভাবী মনে করতেন না। আর এ জন্য তার কিছু কবিতায় দেখা যায় তিনি একাধিক ক্বাফিয়ার ব্যবহার করেছেন। যদিও এ পরিবর্তন ছিল একই কবিতায় একাধিক মর্মার্থ তুলে ধরার প্রয়াসে। একাধিক ক্বাফিয়ার ব্যবহার হয়েছে এরকম কবিতার মধ্যে একটি হল রাসূল (সা.) এর শানে রচিত "ياخير من عزم"কবিতাটি। সাতটি অংশে বিভিক্ত সত্তর চরনের এ কবিতাটিতে আটটি ক্বাফিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

১.২.৫উপমা [التشبيه]

যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে একজন কবি তাঁর বক্তব্যকে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রকাশ করেন, তার মধ্যে উপমা একটি আশ্চর্য কৌশল।[১৯]দুইটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্যপুর্ণ বৈশিষ্টের তুলনা করাই হলো উপমা (التشبيه)। যেমন সাহসী ব্যক্তিকে সিংহের সাথে তুলনা করা।[২০] আর তুলনা হবে একটি দিক থেকে বা অনেকগুলো দিক থেকে, তবে কখনোই পুরোপুরি নয়। কেননা সম্পূর্ণ দিক থেকেই সাদৃশ্য থাকলে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না, উভয়টিই একই জিনিষ হিসেবে পরিগণিত হবে।[২১]কবি যাহাবী উপমাগুলো কখনো তা সাধারণ ভাবনাকে ঔজ্জ্বল্য দেয়, আবার কখনো তা সাধারণের সাথে সুদূর কোন বস্তুর সাদৃশ্য রচনা করে পাঠকচৈতন্যে জ্বেলে দেয় স্বপ্ন কল্পনা। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আনিত হিদায়েতকে কবি যাহাবী আলোর সাথে তুলনা করেছেন। যে আলোর বদৌলতে পুরো বিশ্বে ইসলাম বিজয়ী হয়। "في فرقانه" কবিতায় এ উপমা দিয়ে কবি বলেন:

اكبر باصلاح اقـــام مناره * يهدى به والجهل في طغيانه

وبنى به رب العباد لحزبه * دينا سيظهر عـــــلى اديانه[২২]

‘সবচেয়ে বড় সংস্কার হল তার আলোর প্রতিষ্ঠা, যার মাধ্যমে তিনি হেদায়েত দিয়েছেন, অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তার দলকে এমন একটি দ্বীন দান করেছেন যা সারা পৃথিবীর সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করেছে।’

১.২.৬ উৎপ্রেক্ষা

কবিতার আলংকারিক আরেকটি দিক হল, উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার। উপমা এবং উৎপ্রেক্ষার উদ্দেশ্য প্রায় একই। তবে উপমার সাথে এর পার্থক্য হলো, উৎপ্রেক্ষায় কবিচিত্ত কেবল সংশয়ে দোলায়িত হয় যা কবি পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত করেন।[২৩]কবি যাহাবীরকবিতায় ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষার একটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

- الموت। কবিতায় কবি বলেন-

ان للنازلين في القبر نوما * تنتهى في سكونه الحركات

منهل الموت واحد واليـــه * طرق الواردين مختلفات[২৪]

‘নিশ্চয় কবরে অবতরণকারীরা ঘুমন্ত, যাদের নড়াচড়া স্তব্ধ হয়েছে। মৃত্যুর থলে একটায়, তবে এতে যাওয়ার মাধ্যম অনেক।হয়তো কারও মৃত্যু হবে সম্মানের, আর কারওটা হতাশার।’

১.২.৭ রূপক [الاستعارة]

কোন শব্দ যখন কবি এবং অন্যরা প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে অন্য একটি অর্থ বুঝাতে ব্যবহার করেন, তখন তা হবেরূপক(الاستعارة)।[২৫]কবিতায় কবি রূপকের আশ্রয় নিয়ে থাকেন কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। রূপকের সাহায্যেই প্রকৃত অর্থে ভাষার উপর কবির দখল সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। যাহাবীর কবিতায় ব্যবহৃত রূপকের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ-

وقلت له (انا غريبان ههنا * وكل غريب للغريب نسيب)[২৬]

‘আমি তাকে বললাম, নিশ্চয় আমরা দুইজন এখানে ভিনদেশী; ভিনদেশীরা একে অন্যের আত্মীয়।’

১.২.৮চিত্রকল্প [الصورة]

চিত্রকল্প কবিতার মর্মে প্রবেশ করে কবির অনুভব-আবেগ-অভিজ্ঞতাকে আস্বাদনের আনন্দ সুযোগ করে দেয়। যাহাবীর কাহিনীকাব্যে এরকমটি দেখা যায়। যেখানে কবির কল্পনার সাথে পাঠকের অনুভূতির যোগ হয়।[২৭]যাহাবীর কবিতাসমূহের উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্পসমূহের নিম্নরূপ :

ক. ভালবাসা [الحب]

মানব মনে ভালবাসার সৃষ্টি ও তার চূড়ান্ত পরিণতির একটি চক্র কবি কাব্যদৃশ্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যেমন-

أول الحب في القلوب شراره * تـــــــــخفي تارة وتظهر تارة

ثم يرقي حتى يكـون سراجا * لذويه فيه هـــــــدى واناره[২৮]

‘ভালোবাসা প্রথমে বাসা বাধে প্রেমিক অন্তরে, যার স্ফুলিঙ্গ কখনো গোপন আবার কখন প্রকাশ পায়।
অত:পর এটি প্রদীপে রূপ নেয়, যা প্রেমিক মনকে পথ-নির্দেশ ও আলোকিত করে।’

খ. বসন্তকাল [الربيع]

বসন্তের রক্তিম প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি বসন্তের মুগ্ধতায় কবি হারিয়ে যান প্রকৃতির মাঝে-

حبذا الروض في زمان الربيع * ان حسن الأزهار فيه طبيعي

مر فيه النسيم غير سريع * فوق سطح مثل السماء بديع

فيه تزهو النجوم بالأنوار[২৯]

'বসন্তের উদ্যান কতই না সুন্দর, যখন স্বাভাবিক নিয়মেই দৃষ্টিনন্দন ফুলসমূহে ফুটে। ধীরস্থির ভাবে বয়ে চলে মৃদু বাতাস, চমৎকার আকাশে তারকারাজি শোভা পায়।'

গ.অন্যের দ্বারা প্রভাবিত[التناص]

التناص আরবী সাহিত্যে একটি চমকপ্রদ অলংকার হিসেবে বিবেচিত হয়।[২৩]এ পরিভাষাটি নতুন হলেও এর ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয়। التناص হল পূর্ববর্তী কোন চিন্তা বা তথ্যে প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য রচনা করা। সাহিত্যিকরা التناص এর আশ্রয় নেন, কখনো সেই বক্তব্য বা ঘটনার উদ্ধৃতির প্রদানের মাধ্যমে অথবা তার অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে অথবা পরোক্ষ নির্দেশনার মাধ্যমে কিংবা ইঙ্গিত প্রদানের মাধ্যমে। কবি যাহাবীর কবিতাতেও التناص এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তিনি কবিতায় কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববীর ভাষ্যের অর্থ যেমন গ্রহণ করেন তেমনি পূর্ববর্তী বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তা-চেতনার একটা প্রভাব তার কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। যার মাধ্যমে তার কবিতা হয়েছে সমৃদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ। কবি যাহাবীর "طاغية بغداد" কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিটি পড়লে দেখা যায় তিনি কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।তিনি বলেন,

تحسب المبصرين أعينها النجل * سكاري وما هم بسكارى[২৪]

'তার ডাগর চোখ দুটো, তার দর্শনকারীদের মাতাল করে দিতো, অথচ তারা মাতাল নয়।'

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ[২৫]

'তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়। তবে আল্লাহর আযাবই কঠিন।'

কবি যাহাবী আলোচ্য কবিতার চরনে কুরআনুল কারীমের উপরিউক্ত আয়াত হতে سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ'তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়'। অংশটি হুবহু তার কবিতায় উদ্ধৃত করেছেন।

ঘ.বৈপরীত্য [التضاد]

التضاد বলা হয় আরবী কবিতায় পরস্পর বিপরীত অর্থ বোধক দুইটি শব্দ একত্রে ব্যবহার। যেমন পূর্ব-পশ্চিম, শান্তি-সংঘর্ষ ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনুল কারীমেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, يُخْرِجُالْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ (তিনি মৃত হতে জীবিতের আবির্ভাব ঘটান।)।[২৬]কবি যাহাবী বেশ কিছু কবিতায় এ ধরনের বৈপরীত্য শব্দের ব্যবহার করেছেন। যা তার কবি-কৃতির ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছে। যেমন- বাদশাহ ১ম ফয়সাল এর প্রশংসায় রচিত "نشيد فيصل المعظم" কবিতায়ও কবি এই শব্দ দুইটি ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও এ কবিতাটিতে السلم والحرب (শান্তি-যুদ্ধ) বিপরীত অর্থবোধক শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঙ. প্রতীক [الرمز]

বাক্যে 'প্রতীক' ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো, ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি সাধারণ জনগনের আড়াল করে নিদির্ষ্ট একটি শ্রেণির নিকট বোধগম্য করে তোলা। এ জন্য ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির প্রকৃত নাম উল্লেখ না করে কোন পশু-পাখি কিংবা অন্য কোন প্রাণীর নামে তার নামকরণ করা হয়, অথবা আভিধানিক কোন শব্দ চয়ন করা হয়, যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। যার অর্থ শুধুমাত্র ইঙ্গিতকারী ও নির্দিষ্ট শ্রেণীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্যদের কাছে তা অস্পষ্ট থাকে।[২৭] কবি যাহাবী কবিতা ও জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে নিয়েছিলেন। সমাজের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার ভাষা যেমন তার কবিতা, তেমনি সম্ভাবনা ও সমাধানের চিত্রল উপস্থাপনার কাজেও তার কবিতা দৃপ্ত বাকভঙ্গি অর্জন করেছে। তার প্রধান প্রতীকসমূহের আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়। প্রতীক যাহাবীর শিল্পবোধ ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভীতকে প্রজ্জল করেছে। তার কবিতায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতীক হলো,غزال (হরিণ), سيف(তরবারী), فراشة (প্রজাপতি)ইত্যাদি।

১.৩ উপসংহার

কবি যাহাবী তাঁর যুগে কবিতায় সরল সহজ শব্দের প্রয়োগে পথিকৃত ছিলেন।তিনি কবিতায় অর্জিত গুণের স্তরকে স্বাভাবিক গুণে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন, যা একজন কবির জন্য অপরিহার্য বিষয়। তার মতে, প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসার টানে কবির মনে যে রোমান্স সৃষ্টি হয়, তার বহিঃপ্রকাশই হল কবিতা।[৩৫]যাহাবীর কবিতায় অনুভূতির শাখা-প্রশাখার বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়, যেমন- ব্যক্তি অনুভূতি, গণ অনুভূতি, ইত্যাদি। যাহাবীর কবিতায় স্থান পেয়েছে উদারতা, মাত্রা মাফিক ছন্দ, যা বাস্তবতা বিবর্জিত হয়নি। যেখানে স্থান পায়নি অতিরঞ্জন, যা কৃত্রিমতার ছায়া মুক্ত এবং শাব্দিক ও আর্থিক সব দিক থেকেই স্বচ্ছ। তবে শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ ছিল কম। ফলে তাঁর কাব্য শ্রুতিমধুর ছিল না। তবে ঘুমন্ত সমাজকে জাগিয়ে তুলে আন্দোলনের রূপ তৈরিতে তাঁর কবিতা বড়ই কার্যকর ছিল এতে সন্দেহ নেই।

তথ্যনির্দেশ

১ তারেক রেজা, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিমানস ও শিল্পরীতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০), পৃ: ৪৩।
২ জামীল সুদকী আয-যাহাবী, *দিওয়ানুয যাহাবী* (মিশর : মাতবা'তুল আরাবিয়্যাহ, ১৯২৪), পৃ: ৬৮।
৩ *প্রাগুক্ত*,পৃ: ৬৮।
৪ মুস্তাফিজুর রহমান, ড. মুহাম্মদ 'সম্পাদিত', *আল-মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : দারুল হিকমাহ, ২০১০), পৃ: ৫৪৩।
৫ *দিওয়ানুয যাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৩।
৬ *আল-মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ: ৫১৮।
৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৪২৮।
৮ *তদেব*।
৯ *আল-মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ: ২৩৩।
১০ *তদেব*, পৃ: ৮৪।
১১ *তদেব*, পৃ: ৭০।
১২ *আল-মুনীর আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ: ৮৯৫।
১৩ *দিওয়ানুয যাহাবী*, পৃ: ৮৬।
১৪ আবদুল কাদির, *ছন্দ সমীক্ষণ* (ঢাকা : মুক্ত ধারা, ১৯৭৯), পৃ: ৯।
১৫ শ্রী সুধী ভূষণ ভট্টাচার্য, *বাংলা ছন্দ* (কলিকাতা : এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, ১৩৬২ ব.), প্রথম সংস্করণ, পৃ: ২।
১৬ *দিওয়ানুয যাহাবী*, পৃ: ৬৮।
১৭ *তদেব*, পৃ: ৭৩।
১৮ *তদেব*, পৃ: ৯৩।
১৯ সৈয়দ আলী আহসান, *কবিতার রূপকল্প*, দ্বিতীয় প্রকাশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ: ৬৪।
২০ ইবন মানযূর আল-ইফরিকী, *লিসানুল আরব*,৩য় খন্ড (বৈরুত : দারু সদের, তা.বি), পৃ: ৭২।
২১ ইমাম আবু আলী আল-হাসান বিন রাশীক আল-কায়রোয়ানী, *আল-উমদাহ ফী মাহাসানিশ শি'র ওয়া আদাবিহি*, ১ম খন্ড (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০১), পৃ: ২৩৭।
২২ জামীল সুদকী আয-যাহাবী,*আল-আওশাল* (বাগদাদ : মাতবা'আতু বাগদাদ, ১৯৩৪), পৃ: ৫৯২।
২৩ মাহবুব সাদিক,*বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১),পৃ: ২২৮।
২৪ *তদেব*, পৃ: ২৪।
২৫ আবদুল কাহের আল-জুরজানী,*আসরারুল বালাগাহ* (ইস্তাম্বুল : মাতবা'আতু ওযারাতিল মা'আরেফ, ১৯৭৯),পৃ: ৩৬৯।
২৬ *দিওয়ানুয যাহাবী*, পৃ: ১২২।
২৭ *তারেক রেজা*,পৃ: ১০৫।
২৮ *দিওয়ান ও আওশাল*, পৃ: ৪৬১।
২৯ *তদেব*, পৃ:১২৩ ।
৩০ মুহাম্মদ খালেদ, *আল-বিনা আল-ফাননী ফী শি'রে উমার আবু রিশাহ* 'মাস্টার্স থিসিস' (আম্মান : মিডলইষ্ট ইউনিভার্সিটি, ২০১০-২০১১), পৃ: ৮৮।
৩১ *দিওয়ানুয যাহাবী*, পৃ: ৭৪।
৩২ সূরা আল-হজ্জ, ২২ : ০২।
৩৩ সূরা আর-রূম, ৩০ : ১৯।
৩৪ কুদামা ইবনু জা'ফর,*নাকদুন নাসর* (কায়রো : মাকতাবাতুল খানেজী, ১৯৮৪), পৃ: ৩৩।
৩৫ *তদেব*।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম শিক্ষার আবশ্যকতা
(The Need for Islamic Education in the National Education Curriculum)

Md. Rashedur Rahman*

Abstract: Education is the backbone of the nation. The more educated a nation is, the more developed it is. Religious education is an ideological education. Religion has been a major force in the history of mankind since time immemorial. Religion has guided man to the path of honesty and virtue. Religion is the curiosity, the amazement, the curiosity about the unknown that has aroused people and made it the core of all kinds of scientific knowledge. The purpose of education is the full and balanced development of the human body, mind and soul. Fundamental, moral and spiritual values are the foundation of human civilization. It needs to be developed through education and all human endeavours should be focused on this. It may or may not be realistic for the present generation to be educated in general education but it is natural for everyone to question how much religious education it carries. Due to inadequate implementation of Islamic teachings in the national education curriculum and lack of importance towards it, the people of this country are gradually being deprived of ethics and mental values. People are immersed in corruption, illicit earnings, hatred, violence, arrogance, adultery, deception, etc. which has become an epidemic everywhere. This is mainly due to the lack of ideological education. If Islamic education is fully implemented at every level in the national education curriculum, people will have a clear idea about the basic human values and ethics of Islam. The nation will be freed from depravity. Because Islamic education is historically and realistically recognized in solving all the problems of humanity. Therefore, if the outline of Islamic education is properly discussed in the national education curriculum of Bangladesh, the future generation will develop as good citizens which is desirable for everyone.

ভূমিকা

শিক্ষা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মেধা-মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিক্ষার মধ্য দিয়েই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ হওয়া প্রয়োজন এবং এ দিকেই মানুষের সকল কর্ম প্রচেষ্টা নিবদ্ধ থাকা উচিত। বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রমে ইসলামী শিক্ষার যে উদ্ভব ঘটেছে তা যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ায় এবং এর প্রতি গুরুত্ব না থাকায় ক্রমশঃই এদেশের মানুষ নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বঞ্চিত জাতিতে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী করতে গেলে বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রমে ইসলামী শিক্ষা পূর্ণভাবে কার্যকর করার বিকল্প কোন পথ নেই।

জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম শিক্ষা মূলতঃ সামগ্রিকভাবে ইসলামী শিক্ষায় বিদ্যামান। ইসলামী শিক্ষা বলতে বুঝায়- যে শিক্ষার প্রতিটি বিভাগই কুরআন ও হাদীসভিত্তিক, অর্থাৎ যার কোন একটি দিকও ইসলামী আক্বীদাবিরোধী নয় এমন শিক্ষার নামই হল ইসলামী শিক্ষা।[১] ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার কোন স্তর ইসলামের দিক-নির্দেশনা বহির্ভূত নয়। ইসলামের সঙ্গে সংস্কৃতি (Culture), মনোবিদ্যা (Psychology), নৃতত্ত্ব (Anthropology), প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান (Archeology), দর্শন (Philosophy), ইতিহাস (History),

---

* Ph.D. Researcher, Department of Islamic Studies, Rajshahi University & Lecturer, Department of Islamic Studies, Govt. Sayeed-Altafunnesa College, Khetlal, Joypurhat. Bangladesh.

ভূগোল (Geography), সমাজবিজ্ঞান (Sociology) সহ পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান শাখার সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।[২] মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তিনি সমস্ত জ্ঞানের স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বজ্ঞানের সকল বিষয়ই তিনি মানুষের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। যেহেতু তিনি সকল জ্ঞানের উৎস সেহেতু প্রদত্ত ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব সমস্ত জ্ঞানের মানদন্ড। সততা ও আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাসসহ মানব কল্যাণের জন্য নবী করীম (ছাঃ) নির্দেশিত পথে মানুষ সমগ্র জ্ঞানের সুষ্থ ও নৈতিকচর্চা করে যাবে-এটিই মানুষের নিকট মহান আল্লাহ নির্দেশ।[৩] অতএব বাংলাদেশের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি আরবী ও ইসলাম শিক্ষাকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে, যেন একজন ছাত্র জ্ঞানের ব্যাপক পরিপেক্ষিত লাভ করতে পারে এবং বিশেষায়িতের স্তরে প্রবেশ করার আগে জীবন ও সমস্যাবলীর প্রতি সুসংহত দৃষ্টিকোণ অর্জন করতে পারে।[৪] যেন একজন শিক্ষার্থী জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বদর্পে বিচরণ করতে সক্ষম হয়। দেশের আনুগত্যশীল সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে; সত্য, ন্যায় আর ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পরিশীলিত সমাজ গঠনে সক্ষম হয়। তাই জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব অপরীসিম।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি বিশ্লেষণ

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা অর্জন করে অনেক মেধাবীরা দেশ-বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে। আবার বেশ কিছু ত্রুটির কারণে জাতি শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেগুলো আমাদের মেধাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে দিচ্ছে না। ফলে শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার গতি এখনো খুবই ধীর। সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের পর এমন একটি শাসকগোষ্ঠী বিজয়ী শক্তির আসনে অধিষ্ঠিত হলো তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল দুনিয়াবী জীবনের সফলতা। তাদের ভোগ- বিলাসিতা ও অগ্রগতির মূলকথা ছিল শুধুই বৈষয়িক উন্নতি। ক্ষমতা দখলের পর তারা মুসলিমদের চেতনা বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারই অংশ হিসেবে এ উপমহাদেশের সভ্যতা, ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার ভাগ্য নির্ধারন হয়ে যায়। উর্দু ও ফরাসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করা হয়। শিক্ষার বিষয় বস্তুকেও ইংরেজরা তাদের সভ্যতা ও আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করে নেয়। ১৮৩৬ সালে লর্ড মেকলে কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশমালার ভূমিকায় বলেন,

'We must at present do our best to form a class, who may be interpreters between us and millions, whom we govern, a class of persons, indian in blood and colour but English in taste, in opinion, in morals and intellect'.[৫]

মূলতঃ এ শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল রাজ্য শাসন বিস্তার ও নিজেদের চিন্তা-চেতনার উপযোগী লোক তৈরি করা। ফলে আমাদের দেশ থেকেই তৈরি হয়েছে ব্রিটিশ শাসন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুগত সেবাদাস মানুষ। অথচ স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রম করেও সেই বিদেশী শক্তির দাসত্বের মন-মানসিকতা ও গোলামী চেতনা থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারিনি আজও। নিম্নে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক যে ত্রুটিগুলো পরিলক্ষিত হয় উল্লেখ করা হল:

- আল্লাহবিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা
- আল-কুরআন ও হাদীছবিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা
- ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা
- নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা
- দুনিয়ামুখী শিক্ষা ব্যবস্থা
- সহশিক্ষা
- নৈতিকতা বিধ্বংসী শিক্ষা ব্যবস্থা
- ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা
- মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বৈষম্য
- প্রশ্ন ফাঁস ও অসদুপায় অবলম্বন

- ভর্তি বাণিজ্য
- জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা
- প্রকৃত মেধার অবমূল্যায়ন
- দুর্নীতির প্রসার
- কর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা
- জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টিতে ব্যর্থতা
- অপরাধ প্রবণতার লেজুর বৃত্তি বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা
- নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ব্যর্থতা।[৬]

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব

মানুষের জ্ঞানগত পরিধি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার সমস্যা ততই জটিল হতে জটিলতার হয়ে যাচ্ছে। মানুষ বস্তুগত অগ্রগতি যত বেশি লাভ করছে, নিত্য-নতুন কামনা-বাসনা, নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতা এবং নানারূপ নৈরাশ্য ও বঞ্চনার হাহাকার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সভ্য সমাজে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অপরাধের হার বেড়েই চলেছে। কেননা উন্নতির সোপান হিসেবে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্যবস্থা নেই। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ক. মূল্যবোধের অবক্ষয়

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করা হলেও প্রচলিত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে কেউ তা অর্জন করতে পারছে না। পৃথিবীর অগ্রযাত্রার সাথে সাথে মানুষের প্রতি মানুষের মূল্যবোধ হ্রাস পাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের মায়া-মমতা, মহব্বত ইত্যাদি। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ক্রমশই বাড়ছে সমাজ মূল্যবোধের অবক্ষয়। অথচ যে সমাজে মূল্যবোধ যত বেশি নিরাপদ হবে, সে সমাজে তত বেশি শান্তি ও সুখ নিশ্চিত হবে। এমন অবস্থা হবে যে, কেউ কারো প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ করবে না। কেউ কারো জান-মাল ও ইযযতের কোন ক্ষতি করবে না। বরং প্রত্যেকে হবে প্রত্যেকের জন্য রক্ষাকবচ। কারো অসাক্ষাতেও কেউ কারো অমঙ্গল চিন্তা করবে না। বরং তার কল্যাণের জন্য দু'আ করবে যা ফিরিশতাগণ লিখে নিবেন ও ক্বিয়ামতের দিন তাকে উত্তম পুরস্কার দিবেন।[৭]

মানুষের মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন ও উন্নত করার জন্য এযাবৎ মনুষ্যকল্পিত যত পথ-পন্থা এবং শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি বের হয়েছে এবং কথিত ধর্মসমূহে যেসব নীতি ও বিধান প্রণীত হয়েছে, সে সবের ঊর্ধ্বে আল্লাহ প্রেরিত বিধানই সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত।[৮]

খ. মনুষ্যত্বের বিনাশ

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব সত্তার চরম উৎকর্ষ সাধিত হলেও প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। মনুষ্যত্ব বিকাশের ব্যাপারে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আজ ব্যর্থ। অথচ আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ও মনুষ্যত্বের বিকাশে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন গোত্রের নিকট মহামানবদের পাঠিয়েছেন, যাঁরা অহীর মাধ্যমে মানব জাতির শান্তি নিশ্চিত করতে আমৃত্যু কাজ করেছেন। বিভিন্ন নবী ও রাসূলকে বিভিন্ন গোত্রের জন্য বা নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রেরণ করলেও রাসূল (সা.)-কে শেষ নবী হিসাবে সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি'।[৯]

মূলতঃ মনুষ্যত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষ নামের প্রকৃত স্বার্থকতা। আর মনুষ্যত্বের বিকল্প সাধনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে শিক্ষা। তাই একটি জাতির উত্থান- পতনের অনেকটাই নির্ভর করে সেই জাতির শিক্ষাব্যবস্থার উপর। শিক্ষা ব্যবস্থা যদি পূর্ণভাবে জাতির মধ্যে মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে তাবেই সম্ভব একটি আদর্শ জাতি তথা আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা।

গ. নৈতিকতার অধঃপতন

নৈতিকতার অধঃপতন বর্তমানে সমাজের সবক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। বিচ্যুতি নেই এমন স্থান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষকতা, ছাত্র ও অভিভাবক সকল স্তরেই নৈতিকতার অধঃপতন আজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। এখন প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর যৌন হয়রানির ঘটনা। আবার অভিভাবক যখন তাঁদের ছেলেমেয়েকে অনৈতিক পন্থায় পরীক্ষায় পাস বা সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য সমর্থন করেন, তখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিকতার কোন বিকাশ হবে না, এটাই স্বাভাবিক। যখন এ রকম পরিস্থিতি ক্রমশ বাড়তে থাকে, তখন শিক্ষাঙ্গনে একটা অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় ফেল করলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের মিছিল, শিক্ষকের পদত্যাগ দাবি করা, শ্রেণিকক্ষে তালা দেয়া, ব্যবহারিক পরীক্ষা/থিসিস নম্বরের সুযোগ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি, প্রাইভেট টিউশন নিতে বাধ্য করা, যাবতীয় নৈতিক অধঃপতনের কলা কৌশল এ দেশে প্রচলিত আছে। এভাবেই প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নৈতিকতাকে প্রতিনিয়ত দুমড়েমুচড়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে আর কলুষিত করছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। শিক্ষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রেও এ রকম অবনতি স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। নৈতিকতার চরম ব্যত্যয় দেখা যায় খাবারে ভেজাল ও কেমিক্যাল ব্যবহারে। গুঁড়া মসলায় মেশানো হয় অস্বাস্থ্যকর ইটের গুঁড়াসহ নানা রঙের কেমিক্যাল। রান্না করা খাবারেও বিপত্তি। পচা-বাসি খাবার মিশিয়ে দেয়া, পোড়া তেলের ব্যবহার, নোংরা পরিবেশে রান্না ও সংরক্ষণ করা সহ সবকিছুতেই নীতিবর্জিত কাজ আজ অহরহ সর্বত্র দৃশ্যমান। নিয়োগ-বাণিজ্যের মাধ্যমে অদক্ষ লোকবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেমে নেই। পুরোদমে চলে সরকার ও অন্যের অর্থ কীভাবে লোপাট করে নিজের করা যায় সেই ফন্দি। মানুষ এতটাই দিশেহারা হয়ে গেছে যে ঠিক-বেঠিকের মধ্যে কোনো তফাত খুঁজে পায় না।

উক্ত পরিস্থিতিতে বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার বদলে অনৈতিক শিক্ষা দেয়া, ইতিহাসকে বার বার বদলে দেয়া, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করার মাধ্যমে এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভুল পথেই বেশি নেয়া হচ্ছে যার ভয়াবহ চিত্র আজ সমাজে দৃশ্যমান।

ঘ. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে না পারায় মানুষ তাদের নিজস্ব আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ভুলে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করছে। যা দেখছে সেটাই গ্রহণ করছে। ভাল-মন্দের পার্থক্য তাদের বিচার-বিবেচনার বাইরে। ভিনজাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ না করার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা সুস্পষ্ট। বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূল (সা.) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১০]

ঙ. যুব সমাজের অধঃপতন

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করার পরও অত্যন্ত সাধারণ অনেক বিষয়েও কোন রকম জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না। সকল বিষয়ে মুখস্থ বিদ্যার দিকে মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু টেকনিক্যাল ও লজিক্যাল বিদ্যা গুরুত্ব পাচ্ছে না। কারণ পাঠ্যসূচীকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে, গৎবাঁধা মুখস্থ না করলে কোনভাবেই ভাল ফলাফল করা সম্ভব না। আবার গত কয়েক বছর ধরে পাবলিক পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি এক প্রকার open secret-এ রূপ নিয়েছে। পরীক্ষার সময় টার্গেট নির্ধারণ করে দেয়া হয়, যাতে কেউ পরীক্ষায় ফেল না করে। আর সমাপনী পরীক্ষায় নাকি এমনও নির্দেশ দেয়া থাকে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারুক বা না পারুক যেভাবেই হোক শতভাগ পাস নিশ্চিত করতে হবে। এবিষয়টি দেশে চলমান P.S.C, J.S.C, S.S.C ও H.S.C পরীক্ষায় পাসের হার বাড়িয়ে দিলেও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার মান বেড়েছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। কেননা সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর থেকে জানা যায় যে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ গ্রেড জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৮০% ছাত্র-ছাত্রীই ন্যূনতম পাস মার্ক পায়নি'।[১১]

চ. প্রকৃত মেধার অবমূল্যায়ন

প্রকৃত শিক্ষা অর্জন না করে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে পাস করেছে। যেমন নকল, পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস, রাজনৈতিক ক্ষমতা, শিক্ষকদের দুর্বলতা, প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে আজ প্রকৃত মেধাবী মুখ বাছাই করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে এবং প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন করা হচ্ছে না যার ফলে দেশ ও জাতির উন্নতির পথ চরম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ একটি দেশের উন্নতির জন্য দরকার মেধাবী জনশক্তি। পৃথিবীর সব উন্নত দেশগুলোই মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন করতে হলে তাই দরকার মেধাবী জনশক্তি ও তার সঠিক মূল্যায়ন।

ছ. ইসলামী জ্ঞানের ক্রমশ হ্রাস

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি- নৈতিকতা ঈমান আকীদা আমল ইত্যাদি বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা। যদিও নামে মাত্র ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয় তাও সঠিক নয়, ভ্রান্ত দিনে দিনে ইসলামী শিক্ষার ক্রমশ হ্রাসই হচ্ছে। ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি হচ্ছে। মনুষ্যত্ববোধ কমে যাচ্ছে। নীতি-নৈতিকতা বলতে সমাজে কিছু থাকছে না।

জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম শিক্ষার অপরিহার্যতা

ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয়। মোটকথা মানব জীবন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং ন্যায়-নীতি ভিত্তিক শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রগতিশীল সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা প্রথম যে অহী সূরাহ আল-আলাকের ১-৫ পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেছেন, তা জ্ঞান অর্জন বা শিক্ষা অর্জন সম্পর্কিত। তাইতো আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।[১২] শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো যোগ্য নাগরিক তৈরি করা। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে শুধু যোগ্য নাগরিক নয় বরং 'যোগ্য মানুষ' গড়ার ব্যাপক লক্ষ্য অর্জন করতে চায়।[১৩]

ইসলামের এই শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, আত্মা, বৈষয়িক ও নৈতিক সবদিকে ব্যাপৃত। একজন খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সাম্য, উদার মানবতাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে চলতে হয়। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী চলতে হলে ইসলাম বিষয়ক জ্ঞানার্জন এবং ইসলাম শিক্ষা বিষয়ক অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত আবশ্যক।

ক. ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা ফরযে আইন তথা আবশ্যক

ইসলামের আক্বীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণ এবং ইবাদত সুসম্পূর্ণ করতে ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ইসলাম শিক্ষা অর্জন করা ফরযে আইন তথা আবশ্যক। এ ব্যাপারে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের সমাজ থেকে এক একটি দল কেন বেরিয়ে আসে না, এ উদ্দেশ্যে যে, তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের লোকদের সেই জ্ঞান দ্বারা সতর্ক করে তুলবে'।[১৪] হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয'।[১৫]

খ. আল্লাহর পরিচয় ও আল্লাহভীতি অর্জন করা অপরিহার্য

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বা আল্লাহ তা'আলাকে চেনা হলো ইসলাম শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। কেউ আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবগত হতে পারলে তার পক্ষে কোন অন্যায় ও অপকর্ম করা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে'।[১৬]

গ. জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রথম অহীতেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে আমরা জ্ঞান অর্জন তথা ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। অজ্ঞতা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে 'ইলম[১৭] অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। 'ইলম আল্লাহ প্রদত্ত এক অফুরন্ত নি'আমত। অজ্ঞতা থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) উৎসাহিত করেছেন।[১৮]

ঘ. দ্বীন ইসলামকে সমুন্নত রাখা

দ্বীনের প্রচার, প্রতিষ্ঠা, সমুন্নত ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য ইসলাম শিক্ষা অপরিহার্য। ইসলাম শিক্ষা ছাড়া দ্বীনের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবন সম্ভব নয়।[১৯]

ঙ. ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়নের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।[২০] রাসূলের ইন্তিকালের পর এ দায়িত্ব আলিমগণের উপর বর্তায়। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ইসলামী জ্ঞানের একান্ত আবশ্যক। জ্ঞান ছাড়া এ পার্থক্য করা অসম্ভব।

চ. সম্মান-মর্যাদার মাপকাঠি

শিক্ষাই সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে ফিরিশতাদের উপরেও মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তার মানদণ্ড ছিলো শিক্ষা। ফিরিশতামণ্ডলী আদম (আ.)-এর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েছিল।[২১]

ছ. হালাল উপার্জন

হালাল উপার্জনে সহায়তা এবং আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলাম শিক্ষা প্রয়োজন। কেননা ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম এটিকে অত্যাবশ্যক (ফরয) কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন, 'ফরয আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনের অন্বেষণ করা ফরয'।[২২]

জ. চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন ও মানবতার বিকাশ

মানুষের মেধা, মননশীলতা শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত হয়। এর মাধমে আত্মার উন্নতি হয়। মানুষের মধ্যে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি মানবীয় গুনাবলি উৎকর্ষিত ও বিকশিত হয়। আচার-আচরণ পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়। এতে চারিত্রিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, মানবিক গুনাবলির বিকাশ ঘটে। মানবতা সমুন্নত হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে উন্নত জাতিরাষ্ট্র হিসাবে দাঁড়াতে চাইলে মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য মানবসম্পদ তৈরির কোন বিকল্প নেই। অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী গঠনে প্রয়োজন কোয়ালিটি এডুকেশন। শুধু সংখ্যার ভার দিয়ে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছানো কখনোই সম্ভব নয়। বরং প্রয়োজন শিক্ষার সকল স্তরে ইসলাম শিক্ষাকে সমন্বিত করে নতুনভাবে শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করা।

তথ্যনির্দেশ

১. খন্দকার আবুল খায়ের, *ইসলামী জীবন দর্শন*, প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ১৮।

২. ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, "ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি", *সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন* ২০২২ (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জানুয়ারী ২০১৩), পৃ. ১০১।

৩. ডক্টর রহমান হাবিব, *ইসলাম ও জ্ঞানতত্ত্ব* (ঢাকা : প্রকাশক বিহীন, ২০১১), পৃ. ১৩-১৪; *সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন* ২০২২, পৃ. ১০১।

৪. *সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন* ২০২২, পৃ. ১০৮।

৫. ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, *ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন* (রাজশাহী : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ২য় সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৮৫।

৬. https://alaponblog.com/post/1516/.

৭. *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৯৪, হাদীস নং-২৭৩৩; *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২, হাদীস নং-২২২৮।

৮. সূরাহ আলি 'ইমরান : ১৯।

৯. সূরাহ সাবা : ২৮।

১০. সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ৪৪১, হাদীস নং-৪০৩১।

১১. https://alaponblog.com/post/1516/.

১২. আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আল-ক্বাযভীনী, *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ৮০, হাদীস নং-২২০।

১৩. সূরাহ আল-হুজুরাত : ১৩।
১৪. সূরাহ আত-তাওবাহ : ১২২।
১৫. *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১, হাদীস নং-২২৪।
১৬. সূরাহ আল-ফাতির : ২৮।
১৭. 'ইলম' আরবী শব্দ العلم মাসদার থেকে উৎকলিত। অর্থ إدراك الشيء 'কোন কিছু উপলব্ধি করা'। -'আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি.), পৃ. ১৯৯; *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৪।
১৮. *সুনানু আবী দাঊদ*, পৃ. ৬৫৫, হাদীস নং-৩৬৪১; মাজদুদ্দীন আবুস সা'আদাত আল-মুবারক ইবনুল আসীর, *জামি'উল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত : মাকতাবাতুল হালওয়ানী, ১ম সংস্করণ ১৩৯২ হি./১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৪, হাদীস নং-৫৮২৫।
১৯. মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা *আবূ ঈসা* আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উস সহীহ সুনানুত তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ.৪৮, হাদীস নং-২৬৮২; 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্দির রহমান আবূ মুহাম্মাদ আদ-দারিমী, *সুনানুদ দারিমী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪০৭ হি.), পৃ. ১১০, হাদীস নং-৩৪২; আবূ বাকার আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, ২য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১০ হি.), পৃ. ২৬২, হাদীস নং-১৬৯৬।
২০. সূরাহ ইবরাহীম : ১।
২১. সূরাহ আল-বাক্বারাহ : ৩১-৩৩।
২২. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮, হাদীস নং-২৭৮১।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

رومی و فلسفهٔ عرفان او
(Rumi and His Spiritual Philosophy)

Dr. Md. Nurul Houda*

Abstract: Maulana Jalal Uddin Rumi was the greatest and eminent sufi and philosopher-poet of Iran. He was born in 1207 A.D. in a respectable and educated family at Balkh in Iran. Rumi died in 1273 A.D. at the age of 68 and was buried at Qownya in Turkey. Rumi is one of the most celebrated and very popular spiritual saints and humanist poets of both the East and the West. His life and philosophy is like an ideal and symbol of devotion, spiritual love and attainment of divine Grace. The most important and glorious achievements of Maulana Rumi are Masnavi and *Diwan-i-Shams Tabrizi*. His *Masnavi* is called an Encyclopedia of Rather Bible of Sufism and Theosophy. It was not composed only for the Iranians, but also for all those who are in love with God. It's also called the Quran of the Persian Language. Rumi had shown in Masnavi, a philosophy of life, a vision of moral and spiritual needs of a man and the society, a fine spiritual sensibility and a powerful imagination made his description of delicate spiritual experiences a magical performance. The spiritual and metaphysical philosophy of Rumi will be discussed in this article.

چکیده:
جلال الدّین رومی (۱۲۰۷- ۱۲۷۳م) شاعر عرفانی ، فیلسوف ودانشمند مشهور در دورانِ منگول بود. او درمیان صوفی های اسلام مشهورترین شاعرصوفی بود. مثنوی مولانا، او را درشرق و غرب در جهان شهرت داده است. مثنوی مولانا یکی از مشهورترین و تحسین برانگیزترین کتابهای ادبیات ایران است. این فقط برای فارسی زبانان نیست بلکه برای همه کسانی که عاشق خدا هستند. مثنوی مولوی را قرآن در زبان پهلوی گفته می شود. اشعار غزلیات مولانا دیوان شمس تبریزی نام دارد که یکی از شگفت انگیزترین دست آورد های شعر فارسی است. مولانا دارای فلسفهٔ ندگی ، بینشی از نیازهای اخلاقی و معنوی انسان و جامعه، حس ذهنی خوب و تخیّل قدرتمندی بود که توصیف تجربیات روحی ظریف را به صورت جادویی در آورد. فلسفهٔ عشق، فکرعرفان و فکر روح شناسی مولوی در سراسر جهان شناخته شده است. در جهان کنونی، ما به فلسفه مولانا برای انسان بسیار مهم است و ما به آن بسیار نیاز داریم. بنابر این، من فلسفه ی عرفانی او را در این مقاله توضیح داده ام. من فکر می کنم انسان و جامعه از این مقاله بهره مند خواهند شد.

آشنائی با مولانا جلال الدیّن رومی:
مولانا جلال الدیّن رومی در قرن سیزدهم میلادی دوران سلطهٔ منگول، شاعر مشهور متصوفانه و عرفانی ایران بود. وی پیرکامل وعالم بزرگان دین آن زمان بود. او در سال ۱۲۰۷ میلادی در بلخ به دنیا آمد و در سال ۱۲۷۳ میلادی از دنیا رفت.[۱] در طول زندگانی وی بسیاری شعر عرفانی ساخت. کتابهای مشهور شعر او" دیوان شمس تبریزی" و "مثنوی رومی" است. وی در سراسر جهان برای مثنوی خود شناخته شده است.
دیوان شمس تبریزی کتابی است که بنام " دیوان کبیر " یا "دیوان غزلیات شمس تبریزی" هم معروف است. آخرین بیت هرغزل این کتاب مولانا رومی اسم خودشان استفاده نکرد. بجای اسم او نام شمس الدین تبریزی را استفاده کرد، از این لحاظ اسم این کتاب را "دیوان شمس تبریزی" می

* Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Bangladesh.

گویند.[۲] در این کتاب رومی، مبلغ ۴۰۳۲۶ بیت است که مضوع اصلی این تصوف و عرفان است. اینجا ذکر می شود که مولانا رومی علم تصوف و علم عرفانی از پیر کامل شمس تبریزی آموخته بود.

کتاب مشهورعرفانی رومی مثنوی است . مثنوی یکی از مفصل ترین منظومه های فارسی است، ابیات شش دفتر مثنوی از نظر دکتر محمد استعلامی ۲۵۶۸۵ بیت است. مولانا رومی سرودن مثنوی را از سال ۱۲۵۹ میلادی آغاز کرد و در سال ۱۲۶۹ میلادی تمام کرد. مولوی درمیان این ده سال مثنوی را سروده است .[۳] دربارۂ مثنوی مولانا رومی خود نوشت:

هَذَا الكِتَابُ المَثنَوِیُ، وَ هُوَ اُصول اصول الدین فی کشف اسرار الوصول الیقین و هو فقه الله اکبر و سرع الله الازهر و برهان الله الاظهر مثل نوره کمشکوة فیها مصابح،...[٤]

دربارۂ مثنوی رومی، عبد الرحمن جامی گفت:

مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی[٥]

انسان جهان برای کتاب مثنوی ، جلال الدّین رومی را شناخت. تا حال حاضر در نظر ایرانیان بعد از قرآن و حدیث ، با اهمیت مثنوی رومی را می خوانند. در زمان کنونی فلسفۂ زندگی مولانا رومی ارزش خوبی دارند و راه خدا را می تواند بشناسد.

فلسفۂ عرفانی مولوی:

گفته می شود که فلسفۂ اسلامی در جهان امروز، امام غزّالی (رح) تأسیس کرده بود و امام ال رازی آن را مقام بلا رسانیده بود. از ایشان تا امروز کتابهایی که نوشته شده است، اگر آن کتابها ما مقایسه می کنیم تاکه می بینیم ، فلسفۂ عرفانی رومی در کتاب مثنوی او اینقدر بیان شده است، که در دل و جگرِ مردم تأثیر بسیاری دارد. در جهان امروز فلسفۂ رومی اهمیات و نیازمندی بسیاری دارند. مردم جهان اگر راهِ مولانا رومی بگیرند امیدواریم همه مصیبت های آسمانی و زمینی از دنیا خواهند رفت.

صحبت من در مورد عرفانی مولانا است، نخست باید بدانیم که عرفان چیست؟ عرفان به معنی شناختن است، شناخت حق تعالی و مراد از عرفان شناسایی حق است. عرفان نام علمی است برای رسیدن معرفت الهی. شناسایی حق یا شناخت خدا تعالی را به دو طریق میسر می شود. یکی به طریق استدلال توسط علما و دیگری بطریق تصفیه و مکاشفۂ باطن که راه عرفا و اولیا است. رومی عارف کامل ، شاعرصوفی، عالم دین، ولی کامل و دانشمند بزرگ جهان هم بود. براینکه ایشان هرچه گفتند از استدلال قرآن و حدیث گفتند. بنابراین در فلسفۂ عرفانی مولانا رومی بطریق تصفیه و مکاشفۂ باطنی و استدلال قرآن و حدیثی دارد. از این
لحاظ فلسفۂ عرفان مولوی به چند بخش تقسیم شده و مورد بحث قرار گرفته است.

فلسفۂ مولانا دربارۂ خدا:

درمیان آسمان و زمین هرچه اتفاق می افتاد از حکم خدا می شود. چونکه بدون حکمِ خدا برگ درخت هم نمی لرزد. انسان یقین دارند که خدا جهان و درمیان این هرچیزی است همه را آفرید. در دنیا شب و روز ترتیب می دهد، آفتاب و ماهِ آسمان طلوع می شود و غروب می شود، باد می راند، رود خانه و دریا می رود. پشت این چه قوتمندی است، کی اینرا انجام می دادند ؟ در نظر مولوی و در نظر انسان آن قوتی خداوند متعال است. در قرآن کریم خدا می فرماید:

سَنُرِيَهُم آيَتُنَا فِی الأَفَاقِ و فِی اَنفُسَهُم ....عَلَی کُلّ شَئٍ شَهِید.[٦]

مولانا جلال الدّین رومی دربارۂ خدا در مثنوی خودش می سرود:

ای خدا، ای قادر بی چون و چند از تو پیدا شد چنین قصر بلند[٧]

در نظر رومی اگر خدا را می خواهید بینید پس مخلوقات او را ببینید، چونکه خدا همه چیز را آفرید. برای شناختن خالق نشانهٔ او کافی است، همانطور که وجود آفتاب، روشنی او کافی است، دربارهٔ این رومی گفت:

خود نباشد آفتابی را دلیل — جز که نور آفتاب مستطیل [۸]

دربارهٔ ذات الله، نبی اکرم (ص) فرمود:" تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الله" رومی هم اشارهٔ این حدیث نبی اکرم (ص) گفت:

زین وصیت کرد مارا مصطفی — بحث کم جوید در ذات خدا [۹]

ما دربارهٔ خدا و ذات الله بسیار حرف نمی زنیم. چونکه در قرآن کریم خدا فرمود: " وَ هُوَا مَعَكُم اَيۡنَمَا كُنتُم" [۱۰] یعنی الله با شما هست، هر جایی که شما هستید. اگر خدا را ظاهر نبینی پس از اظهار اثر او فهم کن، درزبان رومی:

گر تو او را نبینی در نظر — فهم کن آن را به آظهار اثر [۱۱]

ما در نظر خدا را نمی بینیم ولی از اثر او می فهمیم که وجود خدا ست و خدا در نزدیک ما هست. الله تعالی خودش را در قرآن کریم در سورهٔ اخلاص آشنایی کرد ، الله فرمود:
" قُل هُوالله اَحَد ، اللهُ الصَّمَد، لَم يلِد ولَم يُولَد، ولَم يَكُن لَّهُ كُفُوا اَحَد." مولانا جلال الدين رومی هم تشریح این سورهٔ اخلاص می سراید:

لَم یلد لم یُولد است او از قِدم — نه پدر دارد ، نه فرزند و نه عُمّ
لَم یلد لم یُولد، او را لائق است — ولِد و مولود را او خالِق است [۱۲]

بدون شک ما ایمان داریم که اللهُ اَحَدٌ یعنی الله یک ، او از کسی مولود نشده است .

فلسفهٔ روحانی رومی:

رسول پاک صلّی الله علیه وسلّم فرمود: " مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ " . در قرآن کریم آمد: يَسئَلُونَكَ عَنِ الرُح قُلِ ..... اِلاَ قَلِيلاَ. [۱۳] یعنی انسان شما را (محمد ص.) دربارهٔ روح سوال می کند ، شما بفرمائید روح امرِ ربِّ من ، دربارهٔ این شمارا علم کوتاه داده است.
در نظر رومی، خدا خود روح آفرید، همه عرفاء این آیت کریم را قبول فرمایند. رومی گفت:

پس له الخلق و له الامرش بدان — خلق صورت، امر جان، راکب بر آن [۱۴]

وَهُوَ الَّذِى اَنشَاءَ كُم مِن نَفسٍ وَاحِدَةٍ . [۱۵] یعنی الله شمارا از یک نفس(روح) آفرید.
بلکه در نظر رومی این نیست که آدم یعنی انسان مثل خدا است.

فلسفهٔ عشقی رومی:

تعریف عشق گونا گون است ،افلاطون می گوید: عشق ، واسطه انسان ها و خدایان است وفاصله آنها را پر می کند. رومی می گوید: عشق در همه کائنات جاری است.. رومی از پیر کامل شمس تبریزی عشق الهی را آموخت. او خود گفت:

مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم — دولت عشق آمدم و من دولت پانده شدم [۱۶]

رومی در تعریف عشق می گوید: اساسا چیزی بجز عشق نیست. عشق نتیجهٔ محبت حق است و محبت صفت حق، مثنوی رومی پراز عشق الهی است. براینکه مثنوی را دائره معارف عشق الهی می گویند. رومی گفت:

هرچه گویم عشق را شرح و بیان — چون به عشق آیم خجل باشم از آن
گرچه تفسیر زبان روشنگر است — لیک عشق بی زبان ، روشن تر است. [۱۷]

نی از جدا شدن عالم ارواح گریه می کند و می خواهد به عالم ارواح برمی گردد. دانشمندان می گویند که از میان باد در رادیو و تلویزیون خبر و عکس می آید. و مقابلهٔ آن صوفیان می گویند، در

میان جهان یک قوتی غیب است که اسم آن قوت عشق می گویند. در قرآن کریم این را گاهی " حُبّ" گاهی "عشق" گفته می شود. مولانا رومی گفت:

آتش است این بانگ نی و نیست باد .... جوشش عشق است کاندر می فتاد [۱۸]

عشق چیزی است که بین عاشق و معشوق کار می کند. در قرآن کریم سورهٔ مائده (آیت: ۵۴) آمد: "یُحِبُّهُم و یُحِبُّونَهُ " یعنی آنهایی که ایماندار هستند، خدا ایشانرا محبت می کند و ایشان هم خدا را محبت می کنند. رومی اعتقاد دارد که موجب تأسیس جهان " عشق" است. رومی گفت:

گر نبودی بهر عشق پاک را کی وجودی داد می افلاک را [۱۹]

در این بیت مولانا رومی حدیث قدسی " لولاک لمّا خلقت الافلاک " یعنی اگر شما (محمد ص.) نه باشید، پس آسمانها تأسیس نمی کردم. تشریح این حدیث قدسی این است ، حضرت محمد (ص.) خدا را اینقدر محبت می کند که آلله آسمانها و جهانرا آفریده است. در نظر رومی اگر عشق الهی نبود پس آسمان و زمین هم نبود ، جهان هم نبود. عاشق جهان رومی دربارهٔ قوت عشق گفت:

جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چلاک شد [۲۰]

مولانا رومی در این بیت، مصراع اول سفرمعراج حضرت محمد (ص) را و در مصراع دوم قصّهٔ حضرت موسی علیه وسلم که در سورهٔ اعراف بیان شده است ، اشاره کرد. در قرآن کریم عشق و محبت اینجوری بیان شده است.

" والَّذِینَ اَمَنُوا اَشَدّ حُبًّا الله " [۲۱] یعنی آنهایی که ایماندار هستند خدا را بسیار دوست داشتند. رومی بشر را دعوت به این عشق و محبت کرد و گفت:

از محبت تلخها شیرین شود از محبّت مسّها زرّین شود

از محبّت درد ها صافی شود از محبّت درد ها شافی شود [۲۲]

فلسفهٔ عشق رومی همهٔ سوسائتی ما را می تواند تبدیل کند.

فلسفهٔ رومی دربارهٔ وحدت الوجود:

جلال الدین رومی دربارهٔ وحدت الوجود در کتاب مثنوی خود بیان کرد، او گفت:

مثنوی ما دکّان وحدت است غیر وحدت هرچه بینی آن بُت است [۲۳]

اکثر نویسندگان عرفان رومی را وحدت الوجود (Pantheism) یا وحدت الشهود نامیده اند.. در قرآن کریم آمد: فَاَینَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللهِ [۲۴] یعنی هرطرفی که شما دهان را حرکت کنید، آن طرف وجود خدا ست. و جای دیگر هم خدا فرمود: وَ نَحنُ اَقرَبُ اِلَیهِ مِن حَبلِ الوَرِیدُ. [۲۵] یعنی خدا نزدیک رگِ گلوی ما است.

مو لا نا رومی گفت:

جمله معشوق است و عاشق پرده ای زنده معشوق است و عاشق مرده یی [۲۶]

استاد فروزانفردر تفسیر این بیت به وحدت الوجود اشاره کرد. اگر وحدت الوجود در زندگی مردم نبود پس خدا را فراموش بکنند و خود را خدا بفهمند. مثلا فرعون گفته بود- اَنَا رَبُّکُمُ الأُعلَی. اگر هر کسی وحدت الوجود بفهمد ، او خود را درمیان خدا فنا می کند. مثلا صوفی اسلام منصور حلاج گفته بود " انَا الحَق " درمیان گفتهٔ فرعون و منصور حلاج تفاوت این است که فرعون وحدت الوجود نفهمد و منصور حلاج وحدت الوجود کاملاً فهمد. رومی در تفاوت آن گفت:

گفت منصور انا الحق گشت مست گفت فرعون انا الحق گشت [۲۷]

در این بیت منصور حلاج انا الحق (یعنی من در راه خدا هستم) گفت، و دیوانهٔ خدا شد. و فرعون انا الحق (یعنی من خدا هستم) گفت، و نابود شد. دربارهٔ این رومی جای دیگر گفت:

رحمت الله آن انا را بر وفا لعنت الله این انا را در قفا [۲۸]

اینجا انا الحق اول یعنی من در راه خدا هستم ، بر آن رحمت خدا است، زیرا که اساس این فنا فی الله در عشق خدا بود. و انا الحق دوّم ، یعنی من خدا هستم. بر آن لعنت الله چونکه اساس آن دلگیر شدن از خدا ست.

تفاوت بین منظور وحدت الوجود منصور حلاج و فرعون بود . چونکه رومی دربارۀ این تفاوت، جای دیگر گفت:

بود انا الحق در لب منصور نور　　　بود اَنَا الله در لبِ فرعون زور [۲۹]

در دهان منصور انا الحق یعنی نور الهی، و در دهان فرعون انا الله یعنی قوت و زوراست.

آخر کلام:

این مقالۀ عرفانی رومی راه زندگی بشر را مفصل بیان کرده است. بشر در این دنیا مهمان چند روزی است. زندگی این دنیا خیلی کوتاه است. اگر کسی می خواست از اینجا علم معرفت بیاموزد اگرچه این مثل باغ بهار است. رومی این جهان را مثل باغ گلشان تشبیه داده است. اگر کسی از این جهان می خواست علم معرفت بیاموزد پس می تواند علم معرفت بگیرد. ولی اگر کسی می خواست از این گلشان گل بگیرد پس ایشان نبود می شود. اگر حق را می خواهد طلب کند پس خیلی خوش می گذرد. اگر انسان راه رومی را اطاعت کنند. پس انسان نمی توانند کاربدی را انجام بدهند و عرفان مولوی می تواند بنده را به نزدیک حق برساند و ما همه می توانیم خدا را بشناسیم.

منابع و مأخذ

[۱] عبدالله رازی ،*تاریخ کامل ایران*، تهران: چاپخانۀ اقبال ، ۱۳۷۳ هجری شمی، صفحه- ۳۵۲.

[۲] دکتر ذبیح الله صفا، *تاریخ ادبیات در ایران*، جلد اول از جلد سوم، چاپ خانه رامین، ۱۳٤۱ هجری شمسی، صفحه - ٤٦۹.

[۳] دکتر محمد استعلامی (مقدمه، تصحیح و تعلیقات)، *مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی*، تهران: انتشارات زوار، چاپ چهارم، ۱۳۷۲ هجری شمسی، جلد اول، صفحۀ مقدمه - ۳۵.

[٤] *همان کتاب*، جلد اول، صفحه - ۷.

[٥] B.G Sir Percy Sykes, *A History of Persia*, Vol-2, London: Macmilan and com. Limited. 4th edition, 1951, p. 147

[٦] القرآن ، سوره السجده ، آیت: ٥۳.

[۷] مولانا رومی، *مثنوی شریف* (ترجمه بنگالی و تشریح)، محمد عیسی شاهدی، جلد اول ، داکا بنگلا بازار خیرن پروکاشنی، ۲۰۰۸ ، صفحه - ٥٥٥.

[۸] مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ،*تاریخ دعوت و عظیمت*، جلد اول، لکهنو ، بارچهارم، ۱۹۹۲ میلادی، صفحه - ۳۸٥.

[۹] جلال الدین مولوی، رینولد الین نیکلسن(تصیح)، *مثنوی معنوی*، جلد چهارم (تهران: انتشارات بهزاد، چاپ هشتم ، ۱۳۷۰ هجری شمسی)، بیت - ۳۷۰۲ ، صفحه - ۷۰۸.

[۱۰] القرآن، سوره الهدید، آیت - ۴.

[۱۱] *مثنوی معنوی* ، همان ، جلد چهارم، بیت- ۱٥٤، صفحه -٥٥۷.

[۱۲] دکتر محمد استعلامی، *مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی*، دفتر ۳، بیت ۱۳۲۰ و دفتر -۲، بیت ۱۷٤٦

[۱۳] القرآن، سوره بنی اسرائیل، آیت : ۸٥.

[۱٤] ار ای نیکلسن (ادیتت)، مثنوی معنوی ، همان، دفتر ششم، بیت : ۷۸.

[۱٥] القرآن ، سوره الانعام، آیت : ۹۸.

[۱٦] جلال الدین رومی، *دیوان شمس تبریزی*، غزل - ۳۹۳.

[۱۷] دکتر محمد استعلامی ،همان، جلد اوّل، بیت : ۱۱۲-۱۱۳ صفحه-۱٤ .

[۱۸] همان، جلد اوّل، بیت : ۹-۱۰ صفحه-۹.

[۱۹] ار ای نیکلسن (ادیتت)، *مثنوی معنوی* ، جلد پنجم ، ۱۳۷۰ هجری شمی، بیت: ۲۷٤۰، صفحه - ۸٤۹.

[۲۰] *همان* ، جلد اول ، بیت: ۲٥، صفحه - ٦

[۲۱] القران ، سوره المائده، آیت : ۱٦٥.

[۲۲] ار ای نیکلسن (ادیتت)، *مثنوی معنوی* ، جلد اول ، تهران : انتشارات بهزاد، ۱۳۷۰ هجری شمی، بیت: ۱٥۳۰-۱٥۳۱، صفحه - ۲۳۹.

[۲۳] دکتر محمد حسین بیات، *مبانی عرفان و تصوّف*، تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ

اول، ۱۳۷۳ هجری شمسی، صفحه - ٦١ .

[٢٤] القرآن ، سوره البقره ، آیت : ۱۱٥.

[٢٥] القرآن ، سوره قاف، آیت : ۱۶.

[٢٦] دکتر محمد استعلامی (مقدمه، تصحیح و تعلیقات)، *مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی*، همان، جلد اوّل، بیت : ۳۰ .

[٢٧] مولانا عزیزالحق (ترجمۀ بنگالی) *مثنوی شریف*، دفتر اول، داکا: کتابخانه رشیدیه، چک بازار، بدون تاریخ، صفحه - ۳۳

[٢٨] همان ، صفحه - ۳٤

[٢٩] دکتر محمد استعلامی ، همان، جلد دوّم ، بیت : ۳۰۷ ، صفحه - ۲۲.

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

بررسی وِیژگی های غزلیات حافظ شیرازی
(Salient Features of Hafiz Shirazi's Ghazals)

Dr. Md. Kamal Uddin*

Abstract: Hafiz Shirazi (1925-1390) was the greatest Persian poet of the 14th century in Iran. His poems deal with the mystical themes as well as the social and cultural concepts of life. His approach to life in poetry is both spiritual and mundane. So, his poems can be interpreted and enjoyed on various levels of thought. The secret characteristic of the poetry is the interrelation of his verses. His idea involved the theme of love, beauty, distraction, madness, and miseries of separation between a lover and his beloved. Moreover, the beauties of nature and creation have flourished in his Ghazals. The philosophy of hope inspires people to become hopeful regarding the benevolence of God. The great characteristic feature of his lyrics is that they contain a harmonious balance between words and meanings. His selection and use of vocabulary in his writings are very rich and varied. The most useful literary term used in his poetry is 'rind' that relates the sense of love in thought and action. In addition, words such as heart, Hafiz, head, soul, love, jovial, eye, beloved, flower, sorrow, stress, face, affair, friend, saki and water have been brought together in his Ghazals. Hafiz is considered as one of the greatest poets of all time. He is a great Persian poet in thought and expression. The paper attempts to depict the salient features of Hafiz Shirazi's Ghazals.

مقدمه

حافظ شیرازی بزگترین غزلسرای عرفانی ایران و یکی از نوابغ بزگوار عالم انسانی است. غزلیات او دارای مضامین متنوع عبارتست از عشق، عرفان، انسانیت، اخلاقیت، فلسفه، پند و اندرز و تأثیر قرآن باصنایع لفظی و معنوی بیان شده است. عشق عرفانی او به خداوند متعال می رسد و اشعار او حاوی زندگی مردم است. هیچ شاعر ایرانی در دنیای شعر فارسی به اندازهٔ حافظ، با زنده و نازک اندیشه وتنوع تجربه و مضامین متنوع نرسیده است. نام بلند و آوازهٔ جهانگیر حافظ در زبان و ادبیات فارسی پایمانده است. دیوان حافظ از لحاظ دل نامه، روح نامه، آئینه های جان بینی و جهان بینی ایران معروف است.

ویژگی های غزلیات حافظ شیرازی

دیوان غزلیات حافظ دارای قصاید و مثنویات و رباعی است. حافظ اشعار عاشقانه را از غزل سعدی است و سطوح عارفانه را از عطار و مولانا و عراقی است سروده است. قهرمان شعر حافظ هم معبود و هم معشوق و هم ممدوح است. شعر حافظ مجموعهٔ فرهنگ ایرانی عصر او و قرون پیش از اوست. حافظ هم مضمون گرا و هم معنی گرا ست که در عین سخنوری و سختکوشی هنری و رعایت لفظ، اهمیت معنی را هرگز ترک نکرده است. صدای حافظ در واقع، صدای آسمانی و ملکوتی، صدای ایمان،

* Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Bangladesh.

صدای آتشی، صدای راستی و حقیقت جویی، صدای انسانیت و صدای عشق و شور است. زندگی و احوال زندگی مردم ایران در دیوان او به طرح این درجه مطرح شده که ایرانیان حافظ را حافظهٔ ما می گویند. مردم در اشعار او سخن درون دل را می جویند که هرگز آن را بدست فراموشی نمی دهند. چنانکه شاعر می گوید:

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که درین گنبد دوار بماند

بر جمالِ تو چنان صورتِ چین حیران شد که حدیثش همه جا در در و دیوار بمانْد

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۲۴۰

عشق در غزلیات

بیان عشق در اشعار حافظ به گونه های متنوع بیان شده است. یکی از حافظ پژوهان معاصر، دکتر علی اسلامی ندوشن، حافظ را برخوردار سه گونه عشق با سه معشوق می داند: « نوع اول موجودی که می توانسته است یکی از انسانهای زمان او باشد... نوع دوم معشوقی است که سیمای روشنی ندارد. درست نمی توان دریافت که زن است یا مرد، پیر است، یا جوان، زنده است یا مرده. نوع سوم معشوق عشق عرفانی است، که از سنایی با هاتف اصفهانی، شورانگیزترین کلمات را به خود اختصاص داده است. این معشوق، مفهوم بسیار وسیعی را در بر می گیرد و در مرکز آن پروردگار است، فرمانروای کائنات است، واجد همهٔ زیباییها...» (حافظ، ۱۳۷۸؛ ۱۹۵) عشق الهی از عمده ترین سرچشمه ها و ذخایر معنوی شعر حافظ است. موضوع عشق الهی، مهر ورزیدن به معشوق ازلی-ابدی است. توصیفات و تلمیحات عرفانی او در ادب فارسی کم نظیر است. عشق عرفانی او به قول عبد الرحمن جامی در نفحات الانس «... هیچ دیوان به از دیوان حافظ نیست اگر مرد صوفی باشد.» مهمترین پیامهای حافظ توسط عشق عرفانی بیان شده است. شعر او تأویل پذیر است. بنابراین بین عشق زمینی و انسانی، عشق آسمانی و عرفانی فرقی نیست. همه می توانند از سرودن اینقدر شعربا موفقیت به درجهٔ او برسد که از خواندن شعرای دیگران امکان پذیر نیست. چنانکه می گوید:

هر که ترسد ز ملال اندُهِ عشقش نه حلال سَرِ ما و قدمش یا لبِ ما و دهنش

شعرِ حافظ همه بیتُ الْغَزَلِ معرفت است آفرین بر نَفَسِ دلکَش و لطفِ سخنش

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۳۸۱

حدیث عشق زحافظ شنو نه از واعظ اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۱۷۸

تأثیر قرآن کریم

حافظ یکی از بزگترین علما و افاضل شعرای ایران است. خود شاعر حافظ قرآن است و قرآن را در سینه دارد. چنانکه در دیوانش، جابجا به آیات قرآنی اشاره کرده است و می گوید که قرآن را با چهارده روایت می خواند و نیز هرچه کرده همه از دولت قرآن کرده است. شاعر می گوید:

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ   هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم

دیوان حافظ شیرازی، ص. ٤٣١

ندیدم خوشتر از شعر تو، حافظ   بقرآنی که اندر سینه داری

دیوان حافظ شیرازی، ص. ٦٠٧

عشقت رسد بفریاد، ار خود بسان حافظ   قرآن زبر بخوانی در چارده روایت

دیوان حافظ شیرازی، ص. ١٣١

ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد   مسائل حکمی با نکات قرآنی

دیوان حافظ شیرازی، ص.(بیست و ششم)

پس از پژوهش و تحقیقات مطرح می شود که حافظ هم در لفظ و هم در مفهوم به آیات قرآنی اشاره دارد. به طور نمونه می شود گفت:

شب وصلست و طی شد نامهٔ هجر   سلام فیه حتی مطلع الفجر

دیوان حافظ شیرازی، ص. ٣٣٩

بیت فوق از اشاره به آیهٔ ٥ سورهٔ قدر سروده شده است.

فلسفهٔ زندگی

فلسفهٔ حافظ فلسفهٔ حیات است. اندیشه های فلسفی حافظ در اشعار او بدون اصطلاحات فنی فلسفی با زبان شاعرانه بیان شده است. حافظ نه فقط به مسائل ادبی بلکه به مسائل ابدی نیز اعتنا دارد. حافظ فقط مضمون پرداز نیست بلکه معنا اندیش و معنا آفرین هم هست. فلسفهٔ اخلاق حافظ نیز قوام دهندهٔ فلسفهٔ حیات اوست. وقتی که در جامهٔ شعر و غزل عرضه می گردد می شود دید که باعناصر زیباشناختی و عرفانی نیز آمیخته شده است. مقام حافظ در فکر و فرهنگ اسلامی–ایران محفوظ است. ایرانیان فلسفهٔ زندگی را از فکر و فلسفهٔ زنده حافظ می آموزند. چنانکه حافظ می گوید:

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشقثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

چندان بود کرشمه و نازِ سَهی قدان   کآید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۱۷

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۲۱۸

رند و رندی حافظ

بیان رند و رندی یکی از مهمترین اصطلاحات عرفانی که در دیوان حافظ به کار برده است. شاید هیچ کلمه ای در دیوان حافظ دشوارتر از رند نباشد. رند معانی گوناگون در لغات نامه های مختلف دارد. رند و رندی در اشعار سنائی و عطار و حافظ هم ملاحظه می شود. در قاموس حافظ رند کلمهٔ پربار شگرفی است. کلمهٔ رند و رندی در حدود هشتاد بار در دیوان حافظ به کار رفته است. گاهی مفهوم رند به روایت حافظ به انسان کامل یا آدم حقیقی یا اولیاء الله می باشد. شرح مقام رند و رندی حافظ به آن گونه شأن وشکوه درخشان در دیوان او مطرح شده که با تشریحات قبل از او بسیار دشوار است. چنانکه حافظ می گوید:

ماه کنعانی من! مسند مصر آنِ تو شد وقت آن است که بدرود کنی زندان را

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۱۴

رمز آفرینش جهان

رمز آفرینش جهان پنهان است که آنرا اظهار کردن خیلی پیچیده است. حافظ هم مانند فیلسوفان بزرگوار رمز آفرینش آسمان و جهان هستی چندان اظهار نظر نکرد. شاعر در مبحثی که علم و یقین ندارد، خاموشی می گزینند. حافظ در اشعار از خویشتن می پرسد که این آسمان بلند پرنقش و نگار چیست و خود جواب می دهد که هیچ دانایی در آفرینش خداوند متعال ندارد. او می گوید که گیتی و شغل و مقام همگی ناچیز و در حکم عدم است، من هزار مرتبه تحقیق کرده ام ولی در نتیجه این مسأله پیچیده یافته ام. چنانکه شاعر می گوید:

ه چشمِ عقل در این رهگذار پرآشوب جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل است

بگیر طُرّهٔ مه چهره‌ای و قصه مخوان که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است

دیوان حافظ شیرازی، ص. ٦٤-٦٥

ایهام پردازی در غزلیات

سخن حافظ غالبا همراه باایهام است و این ایهام پردازی بیانش راگیراتر و دلنشین تر می سازد. ایهام به دو گونه معنی می دهد که یک معنی نزدیک به ذهن و دیگر معنی دور از ذهن باشد. کاربرد ایهام در

اشعار او معانی دلنشین می دهد که مفهومش را نه فقط فارسی زبانان متوجه می شوند بلکه هردلی از آن معنایی و هر دردمندی از آن درمانی می جوید. چنانکه حافظ می گوید:

زگریه مردم چشمم نشسته در خونست ببین که در طلبت حال مردمان چونست

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۷۷

مردم در بیت فوق به دو معنی است، یکی معنی انسان و دیگری معنی **مردمک چشم است**. این نوع کاربرد صنعت معنوی در اشعار حافظ به کار رفته است.

اشاره های تاریخی

اگرچه اشعار او از لحاظ اشعار عارفانه و عاشقانه معروف است ولی پس از تحقیقات و پژوهش معلوم می شود که در شعر او اشاره های تاریخی به اوضاع و احوال عصر هم وجود دارد. او شاعری سیاسی و مبارز هم هست و با زبان ایهام و طنز به مسائل حاد اجتماعی دورهٔ خود پرداخته است و با نوع شاهان متظاهر نقد کرده است. حافظ در این زمینه مشخصات خاصی دارد که از شعرای دیگران می شود جدا کرد. در غزلیات حافظ اشاره های تاریخی و مذهبی ملاحظه می شود. چنانکه شاعر می گوید:

یوسفِ گُم گشته بازآید به کنعان، غم مَخُور کلبۀ احزان شَوَد روزی گلستان، غم مخور

ای دل غمدیده، حالت بِه شود، دل بَد مکن وین سرِ شوریده باز آید به سامان غم مخور

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۳۴۴

شعر مدحی

شعر حافظ در محور عمودی بیشتر دنیوی و عاشقانه یا مدحی است و مضامین مختلف از جمله عرفان در محورهای افقی است. گاهی از یک نگاه معلوم می شود که شعر عرفانی است ولی پس از دقت متوجه می شود که فکر اصلی مفهوم دیگری است. چنانکه می گوید:

می بیاور که ننازد به گُلِ باغِ جهان هر که غارتگریِ بادِ خزانی دانست

حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت ز اثرِ تربیتِ آصفِ ثانی دانست

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۶۴۶

همدردی در غزلیات

حافظ با درد درونی دل خود، دردهای افراد جامعه را احساس می کند. او پیش از آنکه شاعر باشد، انسان است و پیش از آنکه هنرمند باشد، درمند است. هر دردمندی که دیوانش را می خواند درمان خودرا از آن می جوید. گویی حافظ در هفت قرن گذشته درد و غم و رنج دردمندان را پیشگویی کرده و

قصه و غصهٔ آنان را شرح داده است. به نظر شاعر غم بی همزبانی دارد. مردم در رنجهای دیگران باید همراه باشد که به درد دیگران بخورند. شاعر می گوید:

بیا و حالِ اهلِ درد بشنو به لفظِ اندک و معنی بسیار

بُتِ چینی عدوِ دین و دل‌هاست خداوندا دل و دینم نگه دار

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۳۳۲

زاهدان ریاکاری

حافظ همیشه علیه کارهای بدی و ریاکاری سرزنش می کرد. او هرجا که می نشست و هرجا که می رفت عالمان بی عمل و زاهدان خودبین و خویشتن پرست و واعظان غیر متعظ و صوفیان ناصافی و شیخان دنیا را با صراحت سرزنش و مذمت می کرد. چنانکه حافظ می گوید:

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قران را

دیوان حافظ شیرازی، ص. ١٤

حافظ عارفی است که به حق رسیده و هرگز رفتارهای ریاکاری دوری مانده تا ریاکاری را کاری مسلمانی فکر نکرده است.

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالوس، مسلمان نشود

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۳۰۸

پند و نصیحت

ادبیات فارسی ادبیات اومانیسم و اخلاقی است که شعرای زبان فارسی به حکمت و موعظه، پند و اندرز بسیار دقت کرده اند. مردم با رفتار خوبی می توانند زندگی خوب می سازند. زندگی مردم از ظلم و حسد و بدکار آلوده می شود. حافظ برای زندگی خوب و نیکو کار به مردم پند و نصیحت داده است. این ویژگی ها برای رهایی از بدکار و ظلم و ستم به مردم کمک می کند. شاعر می گوید:

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

حدیث از مطرب و مِی گو و راز دَهر کمتر جو که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

دیوان حافظ شیرازی، ص. ٥

و جای دیگر می گوید:

گوش کن پند، ای پسر، و زبهر دنیا غم مخور گفتمت چون در حدیثی، گر توانی داشت هوش

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۳۸۷

اهمیت سعی و کوشش

مردم می تواند از سعی و کوشش نتیجهٔ خودش را به دست بیاورد. توفیق نتیجهٔ کار و کوشش آدمی است. نتیجهٔ خوبی و موفقیت بدون رنج بردن هرگز بدست مردم نمی رسد. چنانکه شاعر می سراید:

سعی نابرده در این راه، بجائی نرسی   مزد اگر می طلبی، طاعت استاد ببر

روزِ مرگم نفسی وعدهٔ دیدار بده   وان گَهَم تا به لَحَد فارغ و آزاد بِبَر

دیوان حافظ شیرازی،

ص. ۳۳۸

تأثیر حافظ در جهان

حافظ از برجسته ترین شاعران زبان فارسی است که شعر و آوازه اش در ایران محدود نمانده و در سرزمین های دیگر نیز شیفتگان و پیروانی یافته است. هندوستان از نخستین سرزمینهایی است که اشعار حافظ بدان رسید و بر ادبیات فارسی آن تأثیر گذاشت. گرچه شاعر در سراسر زندگی خود از ایران بیرون نرفت ولی آوازه اش حتی در همان روزگار خودش به مرزهای اذربایجان، عراقین و هندوستان رسیده بود. چنانکه خود شاعر در این زمینه می گوید:

ساقی حدیث سرو گل و لاله میرود   وین بحث با ثلاثهٔ غساله میرود

شکر شکن شوند همه طوطیان هند   زین قند پارسی که به بنگاله میرود

حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین غافل مشو که کار تو از ناله میرود

دیوان حافظ شیرازی، ص. ۳۰۵

وجای دیگر می گوید:

در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است   خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند   سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

دیوان حافظ شیرازی، ص.۵۹۹

نتیجه گیری

خواجه شمس الدین حافظ شیرازی یکی از اکابر علما و افاضل شعرای ایران است که با روح هر ایرانی آمیخته و سرشته شده است. دیوان حافظ دارای مضامین متنوع عبارت است از سطوح عاشقانه، سطوح عارفانه و مدحی است که به گونه های مختلف ملاحظه می شود. حافظ نمونهٔ زندگی یک مسلمان هوشمند ایرانی را به بهترین وجه در هنر خویش بیان کرده است. مردم ایران در لحظه لحظهٔ زندگی هم در

درد و هم در غم و هم در شادی دست به سوی دیوانش دراز می نمایند. تأثیر و نفوذ سخن حافظ در آثار شاعران بعد از او هم از نظر فکری و هم از نظر ادبی مهم است. سخن حافظ از بلندترین و ماندگارترین موجهای ادبیات فارسی است که اندیشه ها را با زیباییهای هنری نقش شده است. بنابراین می شود گفت که حافظ مردم جهان است که آرامگاه او زیارتگاه عاشقان امروز است.

منابع و مآخذ:

شمس الدیدن محمد حافظ: *دیوان غزلیات مولانا شمس الدین محمد خواجه حافظ شیرازی*، بکوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، تهران: انتشارات صفی علی شاه، ۱۳۷۷ هـ.ش.

حافظ نامه، جلد اول، بهاء الدین خرمشاهی، تهران: شرکت انتشارات سروش، ۱۳٦٦

سبک شناسی شعر، سیروس شمیسا، تهران: انتشارات فردوس، چاپ نهم، ۱۳۸۲ هـ.ش.

کیهان فرهنگی، سال پنجم شمارهٔ ۸، تهران: چاپ مؤسسهٔ کیهان، آبان ماه ۱۳٦۷

حافظ، بهاء الدین خرمشاهی، تهران: طرح نو، ۱۳۷۸

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

نقد و بررسی بر فلسفهٔ اخلاقی در بوستان سعدی
(Moral Philosophy of Sheikh Sadi`s Bustan: An Analysis)

Dr. Md. Osman Goni*

Abstract: Shaikh Sadi (1191-1291) was the most brilliant, distinguished, acknowledged and popular ethical poet in Persian literature. He is also called the 'Master of both prose and verse'. The epical works of Sadi such as the *Bustan* (1257) and the *Gulistan* (1258) deal with ethics, politics, state administration and sociology. His book *Bustan* is the ethical mirror of a political, social and family life. Sadi discussed the duty to Allah, duty of a ruler to his citizens, duty to parents, marriage and the responsibilities of married persons, good behaviour to orphans, neighbours and dependents. In addition, to cut one's coat according to the cloth, to leave up greed, choosing companions etc are the moral ideas in his *Bustan*. This article highlights these topics in the light of Sheik Sadi's *Bustan*.

مقدمه:

سعدی یکی از بزرگترین سخندانان ایران و مایه افتخار ادبیات فارسی است. در آغاز سدهٔ هفتم هجری زاد و نزدیک به صد سال زیست و یک جهان ادب و هنر به وجود آورد. سعدی آخرین مظهر کمال در سراسر ادبیات ایران است. به نظر می رسد که در اغلب موارد قصد سعدی بیان محاسن و معایب اجتماعی و اخلاقی بشری بوده و نهایتا به اصلاح جامعه توجّه داشته است. در کل حکایتها از جهت نظام اجتماعی و امور کشورداری یا سیاست مُدن یک سیستم فکری تعقیب شده است. هدف او راهنمایی و خدمت به انسانها خاصه کسانی بود که در اجتماع او زیستند و زبان او را می فهمیدند. آنچه در ضمیرش می گذشت با قلم توانای خویش سودمندترین مباحث سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را تصویر کرده است. در این گفتار سعی بر این است که سعدی و هویت شاعری او، آن دسته از سخنان شیخ شیراز از اشعار بوستان وی که فلسفهٔ اخلاقی دارد و در طول زمان در میان مردم به صورت مثل در آمده است، بر رسی گردد.

سعدی و هویت شاعری او:

شیخ سعدی یکی از بزرگترین شاعریست که بعد از فردوسی در آسمان ادب فارسی درخشیده است و هنوز می درخشد. او در شیراز دیده به جهان گشود. تاریخ تولد سعدی به درستی روشن نیست ولی قرینهٔ سخن او در گلستان می توان آنرا بتقریب در حدود سال ۶۰۶ هجری دانست. تخلص او به سعدی بسبب ظهور وی در روزگار اتابک سعد بن زنگی بن مودود سلغری (حکومت ۵۹۹-۶۲۳ ه.ق.) است.

---

* Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Bangladesh.

وبنا بر ابن الفوطی در کتاب تلخیص مجمع الاداب به علت انتساب سعدی به سعد بن ابی بکر بن سعد بن زنگی است. خاندان سعدی به گفتهٔ خود وی همه از عالمان دین بودند.[۱] پدر شیخ ملازم اتابک سعد بن زنگی بوده و آغاز تحصیلات شاعر با سرپرستی پدر بود.[۱] اما در همان سالهای کودکی پدر را از دست داد و درد بی پدری در جانش نشست.[۲]

سعدی مقدمات علوم و شرعی را چنان که مشهور است از پدر بزرگ مادری خود، مسعود بن مصلح فارسی، پدر قطب الدین شیرازی فراگفت و سپس برای اتمام تحصیلات به بغداد رفت.[۳] سعدی در نظامیه بغداد، مدرسه‌ای که دو قرن پیش خواجه نظام الملک طوسی آن را بنا کرده بود درس خواند و از آن مدرسه شهریت یافت. سعدی گفت:

مرا در نظامیه ادرار بود شب و روز تلقین و تکرار بود.[٤]

او در بغداد با بسیاری از بزرگان علم و ادب آشنایی یافت. از آن میان از محضر دو استاد بزرگ بهره‌ها بر گرفت. یکی جمال الدین عبد الرحمن ابو الفرج ابن جوزی (در گذشته بسال ۶۳۶ ه.ق.) و یکی دیگر عارف معروف شهاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سهروردی صاحب "عوارف المعارف" (در گذشته ۶۳۲ ه.) که از وی بنام "شیخ دانای مرشد" ذکر گردیده است.[٥] سعدی سالیانی دراز به گشت و گذار و جهانگردی پرداخته است. پس از پایان بردن تحصیلات در بغداد، سالیانی درازی در سر زمینهای اسلامی چون حجاز، شام، لبنان و روم (یعنی آسیای صغیر، ترکی فعلی) به سفر پرداخته و روزگارانی با مردمان گوناگون به سر برده و از هر گوشه‌ای بهره و از هر خرمنی خوشه‌ای برداشته:

در اقصای عالم بگشتم بسی به سر بردم ایام با هر کسی
تمتع به هر گوشه‌ای یافتم ز هر خرمنی خوشه‌ای یافتم.[٦]

سعدی در آثار خود به خصوص گلستان و بوستان اشاره‌هایی دارد به سفر خود به سرزمینهای مشرق چون کاشغر و هند و شکستن بت سومنات که خود یاد کرده، به درستی نمی توان گفت که آیا این سفرها صورت گرفته یا سعدی آنها را قالبی برای نقل حکایت قرار داده است.[۷] اما برخی از تذکره نویسان و پژوهندگان احوال شاعر، این اشاره‌ها را واقعیت پنداشته است. آنها سعدی را در اقصای عالم گردش داده، او را به مصر، حبشه، ارمنستان، چین و هند و حتی به فرنگ برده‌اند. تا آنجا که جز ابن بطوطه سیاح دیگری از مشرق زمین نیافته‌اند که به اندازه سعدی جهان را در نور دیده باشد.[۸] شاعر سفری را که در حدود سالهای ۶۲۰-۶۲۱ ه.ق. آغاز کرده بود، در حدود سال ۶۵۵ ه.ق. به پایان برد و به شیراز بازگشت. در این هنگام فرمانروای فارس اتابک ابو بکر بن سعد زنگی _حکومت ۶۲۳-۶۵۸ ه.ق.)

بود. سعدی در دربار این اتابک مقامی ارجمند یافت و در خانکاه به موعظه و راهنمایی مردم پرداخت. در این هنگام که شاعر فراغتی یافته بود، خود را به تصنیف و تألیف دست زد. در همان سال ۶۵۵ ه.ق. که شاعر به شیراز بازگشت "بوستان" را و در سال ۶۵۶ ه.ق "گلستان" را تصنیف کرد. دیگر از شیراز خارج شد و در سال ۶۶۲ ه.ق. به بغداد و حجاز رفت. پس از آن پیاده به زیارت حج رفت. و به احتمال زیاد در بازگشت از این سفر، از راه آسیای صغیر به آذربیجان رفت و مورد احترام شمس الدین محمد جوینی (وفات، ۶۸۳ ه.ق.) و برادرش عطا ملک جوینی (۶۸۱، ۶۲۳ ه.ق.) مؤلف تاریخ جهانگشای قرار گرفت.[۹] شیخ سعدی پس از این سفر به میهن گرامی خود شیراز باز آمد و به خلوت و ریاضت پرداخت، و با جهانی از دانش و آزمون به راهنمایی مردم همت گماشت.[۱۰] چندین سال بعد شاعر چشم از جهان فرو بست.

تاریخ درگذشت سعدی به درستی روشن نیست و آن را در مآخذ گوناگون بسالهای ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۴، ۶۹۵ ه.ق. نوشته‌اند. اما ذی الحجه سال ۶۹۰ ه.ق. در غالب مآخذ نزدیک به دوران حیات سعدی ذکر شده و اعتماد بدان سزاوارتر می نماید.[۱۱]

آثار سعدی به دو دسته منظوم و منثور تقسیم می شود. آثار منظوم سعدی: نخستین اثر مستقلی که سعدی تألیف کرد، سعدی نامه یا بوستان است. از مقدمه بوستان چنین بر می آید که سعدی بسیاری از بخشهای بوستان را پیش از بازگشت به شیراز سروده و در شیراز به سال ۶۵۵ ه.ق. یعنی در همان سال بازگشت، آن را به پایان رسانده است.[۱۲] بوستان مثنوی است که در بحر متقارب هم وزن شاهنامه فردوسی به نظم آورده شده است.[۱۳] این کتاب بنام ابو بکر بن سعد زنگی است که سعدی در دیباچه به او تقدیم کرده است. این منظومه در اخلاق و تربیت و وعظ و تحقیق است که دیباچه و ده باب دارد: (۱) عدل و تدبیر و رای، (۲) احسان، (۳) عشق و مستی و شور، (۴) تواضع، (۶) ذکر قناعت، (۷) عالم تربیت، (۸) شکر بر عافیت، (۹) توبه و راه صواب، (۱۰) مناجات و ختم کتاب.[۱۴]

شماره ابیات این منظومه در حدود چهار هزار است و تاکنون بارها جداگانه و همراه کلیات سعدی بطبع رسیده است.[۱۵] این منظومه نسبتا کوچک به راستی بوستانی است پر از گلهای رنگین و نمونه‌های دلپسند شیرین از انواع پند و نصیحت عالی و سیاست زندگانی و حکایات گوناگون آن از شاهکارهای بی نظیر زبان فارسی است و کمتر منظومه‌ای در فارسی در این بحر، و بدین طرز، به رشته نظم درآمده است. و تعدادی از ابیات آن در زبان فارسی و در افواه مردم وارد شده و حکم "امثال سایره" پیدا کرده است.[۱۶]

بوستان آمیزه‌ای است از اخلاق و سیاست مدن و حکمت عملی و دستورهای زندگانی، و اغلب مطالب در قالب حکایت و از زبان شخصیتهای داستانها و به صورت گفت و شنید بیان شده است.[۱۷]
غزلیات سعدی: شهرت سعدی بیشتر در غزل است. در غزل سرایی وی یگانه استاد است و غزل عاشقانه را با آن شور و حال لطیفتر ازو کس نسروده است. تعداد غزلهای سعدی در حدود هفتصد است. در نسخه‌های قدیم، غزلها به چند بخش تقسیم شده است: طیبات، بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم. در غزلیات وی موضوع‌هایی چون عشق، دوست داشتن، دوست پرستی، وصف یار زیبا، دوری از معشوق، شوق دیدار، تحمل دوری، شکیبایی در غیبت دوست، تحمل رنج و ناملایمات دوستی، وفادری، پایداری در عشق و دوستی و غیره در آنها نه یک بار بلکه بارها توصیف شده است.
قصاید سعدی: سعدی شاعر بزرگ ایران نه تنها استاد غزل و مثنوی بوده بلکه در اقسام سخن و فنون ادب دست داشته و در هر رشته استادی و مهارت شایانی به خرج داده است، از جمله قصاید خوب و دلپذیری در موضوعات مختلف مانند مدح و وصف و موعظه و تنبیه و رثاء و توحید به رشته نظم کشیده و از لحاظ تصرف و ابتکاری که در مضامین شعری و شیوهٔ مدح از خود نشان داده است، صورت تازه و شایسته‌ای به این رشته از سخن بخشیده است.[۱۸] علاوه بر آنچه ذکر گردید شد، در مجموعه آثار سعدی که به کلیات سعدی، معروف است، همانند: قصیده‌های عربی، مرثیه‌ها، خبیثات، چند غزل، قطعه، رباعی، ملمعات، مثلثات و مفردات که همه آنها رکیک نیست بلکه بعضی فقط متضمن مطایبه‌های مطبوع منظوم است.

فلسفهٔ اخلاقی در بوستان سعدی:

بوستان آمیزه‌ای است از اخلاق و سیاست مدن و حکمت عملی و دستورهای زندگانی، و اغلب مطالب در قالب حکایت و از زبان شخصیت های داستانها و به صورت گفت و شنید بیان شده است.[۱۹] به نظر می رسد که در اغلب موارد قصد سعدی بیان محاسن و معایب اجتماعی و اخلاقی بشری بوده و نهایتا به اصلاح جامعه توجّه داشته است. در کل حکایتها از جهت نظام اجتماعی و امور کشورداری و سیاست مُدن یک سیستم فکری تعقیب شده است.

تقوی و پرهیزگاری:

سعدی در اول بوستان اشاره کرده است که پادشاه باید تقوی دار و پرهیزگار باشد. زیرا که الله سبحانه تعالی مالک این جهان است. الله هر کسی را که خواهد ملکیت می دهد و از هرکسی می خواهد پس

می گیرد. همه ملکیت و عزّت و ذلّت بدست خداست. الله تعالی در قران می فرماید: "قل اللهم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. انک علی کل شیء قدیر." بدین علت سعدی می گوید:

اگر بنده‌ای سر برین در بنه   کلاه خداوندی از سر بنه
بدرگاه فرمانده ذو الجلال   چو درویش پیش توانگر بنال
چو طاعت کنی بس شاهی مپوش   چو درویش مخلص برآور خروش
که پروردگارا توانگر تویی   توانا و درویش پرور تویی
نه کشور خدایم نه فرماندهم   یکی از گدایان این در گهم.[۲۰]

نگهداری رعیّت:

به نظر سعدی پادشاه باید با رای رعیت انتخاب شود. پادشاهی که از سوی رعیت تآیید می شود از خطر دشمن امان است. پادشاه اگر چه صاحب بسیار مال و دولت و قوت است باین حال، پادشاه برای پاس و نگهداری رعیت است نه رعیت برای اطاعت پادشاه. بقول سعدی:

نیاساید اندر دیار تو کس   چو آسایش خویش جویی و بس
نیاید بنزدیک دانا پسند   شبان خفته و گرگ در گوسفند
برو پاس درویش محتاج دار   که شاه از رعیت بود تاجدار.[۲۱]

امنیت و عدالت :

وظیفهٔ پادشاه این است که امن و امنیت زیر دستان خود را تأیین کنند ولی در طول زمان همیشه رعیّتان از طرف حکومت کنندگان مظلوم واقع شده‌اند. بنابر این سعدی می گوید که رعیّت اساس ملک و حکومت است. پادشاه هیچ وقت نمی تواند با ظلم و ستم حکومت کند، بلکه خودش پایه حکومتش را سست می کند و می کَند.

نه کند جور پیشه سلطانی   که نیاید زگرگ چوپانی
پادشاهی که طرح ظلم فگند   پای دیوار ملک خویش را کند.[۲۲]

نویسنده به مخاطب خود یعنی شاهان می گوید که رعیتان به واسطه ظلم و ستم شاهان فاصله می گیرند و سنت دوستی بین آنان به دشمنی تبدیل می شود. اگر شاه پاسداری خوبی را انجام دهد، رعیتان وقت ضرورت همانند یک لشکر برای پادشاه می جنگند.

با رعیّت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین زان که شاهنشاه عادل را رعیّت لشکر است.
[۲۳]

......

همان به که لشکر به جان پروری که سلطان به لشکر کند سروری[۲۴]

ترک ظلم و ستم :

سعدی می گوید که پادشاهان نباید در رفتار خود با رعیّت و زیر دستان اساس بدی و ظلم بگذارد. اگر شاه آن کار را خرده‌ای کند لشکریانش زیادتر می کنند.

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ[۲۵]

......

نماند ستمگار بد روزگار بماند برو لعنت پایدار[۲۶]

فکرآسایش رعیّت :

پادشاه برای رعیّت انتخاب شود. اگر به فکر آسایش خویش باشد در ملکش امن و امنیت نماند. اگر چوپان در خواب ماند، باید گرگ بر گوسفندان حمله کند و ضرر می رسد. پادشاه باید وظیفه شناس رعیت ضعیف و باشد. این وظیفه ناشناسی عیب و خطاست. اگر کسی با خلق خدا مهربان باشد از ترس دشمن به راحتی زندگی می کند. زیرا که همه انسان اعضای یک پیکرند. اگر عضوی بدرد آید دیگر عضوها نمی تواند بر قرار ماند. کسی این احساس را ندارد نمی توان آن را آدمی خواند.

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی[۲۷]

نتیجه گیری :

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی بی تردید بزرگ ترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده خود روشن ساخت و آن روشنی با چنان نیرویی همراه بود که هنوز پس از

گذشت هفت قرن، از تاثیر آن کاسته نشده است. آثار سعدی تصویر زندگی است. زندگی چهره خود را در این شعرها و نوشته‌ها باز می نماید و به سوی یک زندگی بهتر راه می گشاید. نزد وی اخلاق وسیله‌ای است که انسان را به کمال آدمیت می رساند و وجود او با رشته محبت با سراسر کاینات پیوند می دهد. بدین سبب وی را در تمام دنیا معلم اخلاق بدانند و بنامند. بعضی سخنانش در نزد عوام به صورت امثال در آمده است.

منابع و مأخذ

۱- [۱] همه قبیلهٔ من عالمان دین بودند — مرا معلم عشق تو شاعری آموخت
بهاء الدین خرمشاهی، کلیات سعدی، تهران: انتشارات ناهید، چاپ گلشن، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۵، ص-۴۲۳؛ دکتر رضا زاده شفق، تاریخ ادبیات ایران، تهران: انتشارات آهنگ، چاپخانه آرمان، چاپ اول، ۱۳۶۷، ص-۲۵۰.

۲- ز عهد پدر یاد دارم همی — که باران رحمت برو هردمی
که در خردیم لوم و دفتر خرید — ز بهرم یکی خاتم زر خرید
همان، کلیات سعدی، ص-۳۳۷.

-۳ من آنگه سر تا جور داشتم — که سر در کنار پدر داشتم
مرا باشد از درد طفلان خبر — که در طفلی از سر برفتم پدر
همان، کلیات سعدی، ص-۲۳۰.

-۴ پرویز اتابکی، برگزیده و شرح آثار سعدی، تهران: نشر پژوهش فرزان، چاپ نوشتار، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص-شش.

-۵ کلیات سعدی، ص-۳۰۷.

۶- مقامات مردان بمردی شنو — نه از سعدی، از سهراوردی شنو
مرا شیخ دانای مرشد شهاب — دو اندر ز فرمود بر روی آب
یکی آنکه در جمع بد بین مباش — دویم آنکه در نفس خود بین مباش
دکتر خلیل خطیب رهبر، دیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازی، تهران: انتشارات مهتاب، چاپ مهارت، چاپ پنجم بهار ۱۳۷۱، ص-بیست و چهار.

-۷ کلیات سعدی، ص-۱۸۸.

-۸ پرویز اتابکی، برگزیده و شرح آثار سعدی، همان، ص-شش.

-۹ الطاف حسین حالی، حیات سعدی، لاهور: مجلس ترقی ادب، اپل پریس، ۱۹۶۱ ع-۳۶.

-۱۰ دکتر حسن انوری، شوریده و بی قرار (درباره سعدی و آثار او) تهران: نشر قطره، ۱۳۸۶، ص-۱۵ و ۱۶.

-۱۱ دکتر علی اصغر حلبی، تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۱، ص- ۱۷۹.

-۱۲ دکتر خلیل خطیب رهبر، دیوان غزلیات، همان، ص-بیست و هفت.

-۱۳ دکتر حسن انوری، شوریده و بی قرار (درباره سعدی و آثار او) ص-۱۸.

-۱۴ کلیات سعدی، ص-۱۸۹.

-۱۵ کلیات سعدی، ص-۱۸۹.

-۱۶ تاریخ ادبیات در ایران، جلد سوم بخش اول، ص-۶۰۵.

-۱۷ همان، ص-۶۰۶.

-۱۸ دکتر علی اصغر حلبی، تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی، ص-۱۸۰.

-۱۹ کلیات سعدی، ص-۴۹۹.

-۲۰ دکتر علی اصغر حلبی، تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی، ص-۱۸۰.

-۲۱ کلیات سعدی، ص-۲۰۹.

-۲۲ غلامحسین یوسفی، بوستان سعدی، **تهران:** انتشارات خوارزمی، چاپ اول، ۱۳۵۹، ص- ۴۲

-۲۳ کلیات سعدی، ص-۵۶.

[۲٤]- همان، ص-۳۷.

[۲٥]- همان، ص-۳۸.

[۲٦]- همان، ص-۳۷.

[۲۷]- همان، ص-۴۹.

[۲۸]- همان، ص-۵۰ .

[۲۹]- همان، ص- ۱٥۳

[۳۰]- همان، ص- ۱٦۲

[۳۱]- غلامحسین یوسفی، بوستان سعدی، ص- ۸۰

[۳۲]- منصور مهرنگ، بوستان سعدی، ص- ۳۱۱

[۳۳]- خزائلی، دکتر محمد، : *شرح بوستان سعدی*، تهران: چاپخانهٔ محمد حسن علمی، چاپ نهم،۱۳۷۲، ص-۲۱۶

[۳٤]- همان، ص-۲۱۷

[۳٥]- محمد علی فروغی، کلیات سعدی، همان، ص-٤۸.

[۳٦]- همان، ص-۱٤۸.

[۳۷]- همان، ص-۱۷۲

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

سهم شیخ سعدی در ساختن جامعه آرمانی
আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে শেখ সা'দীর অবদান
(Sheikh Sa'dis contribution in building an ideal society)

Abstract: Musharraf-ud-Din Sheikh Sadi is one the greatest poets and unquestionably the most popular Persian writer. He was born at Shiraz in 1184 A.D. His popular prose work *Gulistan*, a greatest literary work was written in 1258 A.D. It is the product of the poet's ripe experience and matured wisdom which he gathered during the thirty years travel in Asia and Africa. It deals with ethics, moral lessons. Politics, state administration and sociology. His treatment of the theme of Human kindness and humurs appropriate use of in Sadis *Gulistan*, made him, the most lovable writer in the world of Iranian Culture. Nobility of his thought and pure morals, made it easy for him to produce his master-piece, the *Gulistan*. The whole book is interspersed with a variety of charming little poems containing advice and humorous reflection on human life. As regards the literary style of the *Gulistan*, the work is singular and unique and a fine Model of simplicity Combined with elegance of Style and beauty of expression. In his *Gulistan* Sa'di states proper guidance in human life, matters incorporated to human welfare directly or indirectly and all related national and excellent discussion. The *Gulistan* especially is a rich store of clever tales and charming anecdotes, contains moral lessons and contains lessons of practical wisdom which are capable to develop of moral education. This article will discuss Sheikh Sa'dis contribution in building an ideal society.

چکیده : مشرف الدین مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی یکی از بزرگترین شاعر ایران است. وی در حدود سال ۶۰۵ و۶۰۶ هجری در شیراز متولد شده. سعدی بیشتر کتاب ننوشته؛ ولی کتابهای که نوشته درآن دو تا کتاب خیلی شهرت یافته. نام آن دو تا کتاب *گلستان* و *بوستان* است. سعدی کتاب *گلستان* را در سال ۶۵۶ هجری نوشته وکتاب *بوستان* را درسال ۶۵۵ هجری نوشته شده است . او با کتاب *گلستان* و *بوستان* کشورهای اسلامی و در تمام عالم علم و ادب شهرت یافته. کتاب *گلستان* و*بوستان* از همان عصر خودش تا کنون کتاب درسی است وتقریباً به تمام زبانها ی عالم نقل شده. سعدی بوسیلۀ این کتاب از آن نیکبختان است که در زمان خود حتی از اوان جوانی صیت شهرت خود را شنید. کتاب *گلستان* در حقیقت کتابی است که در تمام کتاب موضوعات اخلاقیت را روشن کرده آموزش اخلاقی را بوجود آورده. اشتیاق شیخ سعدی درساختن جامعه آرمانی در این مقاله آورده شده است. روشن کرده میشود که آدم آرگانیسم اجتماعی است.

انسان موجودی اجتماعی است. جامعه اولین نهادی است که انسان ایجاد کرده است. مردم برای پیشرفت زیبای زندگی از یکدیگر انتظارکمک دارند. انسان در آغاز خلقت در غارهای کوهستانی یا شاخه های درخت زندگی می کرد. مردم در جستجوی غذای خود بیرون می رفتند و بارها طعمه حیوانات وحشی می شدند. به هر حال خداوند متعال مردم را با شعور به دنیا فرستاده است. پس خودشان مشکلات را حل کردند. انسانها برای زنده ماندن در برابر حملات حیوانات وحشی، جوامعی را تشکیل داده و جوامی را ایجاد کرده اند. مردم با ساختن جامعه تسلط خود را بر همه موجودات زنده کردند و به تدریج بر همه جهان مسلط شدند. هیچ انسانی خود کفا نیست بلکه وابسته به یکدیگراست. بنا بر این، نیاز دیگری باید جلوگر شود.این چیز ساختن یک جامعۀ شاد در جهان کاملاً لازمی است. انسان بزرگوار کسی است

که بدون در نظر گرفتن منافع خود، جان خود را فدای خیردیگران کند. ازاین ویژگی شخصیت انسانی، روند خدمات اجتماعی ناشی می شود.
در زیر به موضوعات انگیزش ارائه شده در این دو کتاب در ساختن یک جامعه ایده آل پرداخته شده است.

کتاب گلستان : سعدی بوسیلۀ کتاب گلستان نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای اسلامی و در تمام عالم علم و ادب از همان عصر خودش تاکنون جزو سخنگویان نامدار بشمار آمده و آفکار و اشعار
او را از روی شوق و رغبت جستجو می کنند.[۱]
کتاب گلستان تقریباً به تمام زبانهای عالم نقل شده ونامش زبانزد آگاهان جهان است.[۲] در بارۀ کتاب گلستان پروین شکیبا گفته است : "گلستان در حقیقت کتابی است در آموزش و پرورش وهدف اغلب حکایات و امثال آن، ادب و تربیت و تهذیب نفس است."[۳]
کتاب گلستان مشتمل بر هشت باب است. هشت باب را در زیر به ترتیب ذکر نموده است: باب اول در سیرت پادشاهان، باب دوم در اخلاق درویشان، باب سوم در فضیلت قناعت، باب چهارم در فوائد خاموشی، باب پنجم درعشق و جوانی، باب ششم در ضعف پیری، باب هفتم در تأثیر تربیت، باب هشتم در آداب صحبت. از هر باب کتاب *گلستان* مورد آموزش اخلاقی را بطور نمونه ذکر گردیده است.

باب اول در سیرت پادشاهان : اوّلین حکایت این باب این است که: حکایت پادشاهی را شنیدم که بکشتن اسیری اشارت کرد بیچاره درآنحالت نومیدی بزبانی که داشت َملِک را دشنام دادن گرفت. آن وقت پادشاه از یکی از وزراء پرسید که این نفر چه می گوید یکی از وزراء نیک محضر گفت ای خداوند همی گوید: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پادشاه وقتی که این جواب را شنید دردلش رحمت آمد و از سر خون او دست برداشت.
وزیر دیگر که مخالف او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید به پیش پادشاهان جز براستی سخن گفتن، این پادشاه را دشنام داد و نا سزا گفت. آن وقت پادشاه روی از این سخن درهم کشید و گفت آن دروغ که وی گفت پسندیده تر آمد مرا از این راست که تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنائ این بر خبثی "و خردمندان گفته اند که دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز."[٤] دراین حکایت سه نوع شخصیت وجود دارد؛ یک شخصیت پادشاه، دو شخصیت وزیر، سه شخصیت اسیر. در این حکایت یک آموزش اخلاقی روشنتر شده است که وقتی بنی آدم کاری که انجام می دهد آن وقت برای مردم چیزی که خیرخواه، خیرآمیز، و مصلحت آمیز می شود آن کار و آن چیزی را انجام بدهد. اگر کاری که برای مردم با عث نقصان و فتنه آنگیز می شود آن کاری را ترک می کند. دراین حکایت گرچه وزیر اوّل برای نجات دادن یک اسیر دروغ گفته وزیر دوم برای کشتن اسیر راست گفته. در این حکایت به نزدیک خردمندان دروغ گفتن وزیر اوّل را پسندیده تر آمد از راستی گفتن وزیر دوم را، برای اینکه دراین پایان حکایت گفته شده است که دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز. این جمله اخلاقی موافق یک حدیث رسول(ص.) است. درحدیث رسول خدا(ص.) فرموده است: "الفتنة اشدّ من القتل"

باب دوم در اخلاق درویشان : باب دوم در اخلاق درویشان چنانکه نام ازباب معلوم می شود دراین باب چه چیز را تاکید داده؟ از نام این باب معلوم است که درسرا سر این باب دوم موضوعات اخلاقی را روشنتر کرده است

باب سوم در فضیلت قناعت : قناعت یکی از مهمترین زیور اخلاقی مردم است. در سر تا سر باب سوم دربارۂ فضیلت قناعت بیان شده است. دربارهٔ[۴] قناعت شیخ سعدی با قطعه ای نصیحت داده:

ای قناعت توانگرم گردان + که ورائ تو هیچ نعمت نیست
کنجِ صبر اختیار لقمان است + هرکرا صبر نیست حکمت نیست.[۵]

دراین قطعه فضیلت قناعت و صبر را بطور خوبی بیان کرده است. دراین قطعه گفته می شود که هیچ نعمت از نعمت قناعت صبر بزرگتر نیست. از این حکایت این اخلاقی را بیآموزیم که سوال کردن بدترین عیب است. این عیب را ما با ید با قناعت تبدیل بکنیم.

باب چهارم در فوائد خاموشی : در سراسر این باب سعدی اهمیت فوائد خاموشی را بطور خوبی بیان کرده است. خاموش ماندن عمده ترین اخلاق مردم است.

باب پنجم در عشق و جوانی : باب پنجم در بارۂ عشق و جوانی ذکر شده است. درحکایات این باب نیکی و بدی عشق وجوانی بیان شده و بعد از آن سخنان خردمندان آورده شده است. سپس به طرف خوبیِ عشق و جوانی با پند و نصیحت تشویق داده است.

باب ششم درحالت ضعفِ پیری : مفهوم اولین حکایت این باب، این است که آدم در حالت ضعف پیری هم نمی خواهد که بمیرد. دراین حالت آدمی را باید که سیرت بزرگان را بخواند و خودش را اماده بکند برای زندگی آخرت. آن وقت کارِ نکو را انجام بدهد و رضامندی خداوند تعالی جستجو بکند. در حالت ضعف پیری مردم پیر به دنیا بیشتر تعلّقات پیدا می کند ودر دل ایشان دنیا و در دنیا چیزی که جالب است به طرف آن چشم ببندد. آن وقت باید چشم را به طرف چیزهای جالب نبندد؛ بلکه چیزهای جالبی را که آفریده است، یعنی به طرف خداوند متعال دل را ببندد. در حا لت ضعف پیری، اکثر اوقات آدمی را باید در ذکر خداوند متعال و فکر آخرت را همیشه دردلش جای بدهد.

باب هفتم در تأثیر تربیت : در این باب دربارۂ تربیت آخلاقی بیشتر حکایت بیان شده است. تربیت یک نوع آموزش از انواع آموزش است. یک دفعه تربیت آموزش بهتر از هزار بار علم آموختن بر آن موضوع. مثلا گفته شده است که: "شنیده کی بود مانند دیده". برای اینکه تربیت بکاربردن مهمتر از علم آموختن بر هر چیزی است. اگر انسان بخواهد که خودش را انسان بزرگ بکند برای آن انسان لازم است که اوّل کار آموزش آخلاقی را بپذیرد. اگر آخلاقی را بطور خوبی بکار می برد انسان کامل می شود. همه را باید تربیت را در حالت کودکی بپذیرد. برای اینکه وقتی آدم بزرگ میشود آن وقت نمیتواند تربیتی را بطور خوبی بپذیرد. چنانکه شیخ سعدی در باب هفتم در تأثیر تربیت گفته است:

هر که در خُردیَش ادب نکنی + در بزرگی فلاح ازو بر خاست
چوبِ تر را چنانکه خواهی پیچ + نشود خشک جز بآتش راست.[۶]

باب هشتم در آداب صحبت : این باب از مهمترین ابواب گلستان است. دراین باب بیشتر پند ونصیحت وجود دارد. دراین پند و نصیحت چیزهای خیر خواه بنی آدم است. دراین باب فقط برای مسلم پند و نصیحت نداده، بلکه برای انسان یا بنی آدم پند ونصیحت داده شده است. این

باب پر از حکمت است. دراین باب حکایت گفته نشده است. دراین باب پر از سخن دانائی وجود دارد. هر رشتهٔ این باب خیلی اهمیت دارد. بیشتر سخن این باب در موضوعات گوناگون سخن دانائی گفته شده است .ازاین باب بطور نمونه دو، سه تا حکمت ذکر گردیده است که: "مال از بهرِ آسایش عمراست نه عمرازبهرِ گردِ کردن مال است عاقلی را پرسیدند که نیکبخت کیست و بد بخت چیست گفت نیکبخت آنکه خورد و کِشت و بد بخت آنکه مُرد و هِشت." [۷]

مال برای آسایش زندگی است مال برای جمع کردن نیست.یک شخصی از یک خردمند پرسید که نیک بخت کدام کس است وبد بخت کدام کس است؟ ایشان جواب داد که خردمند آن کس است که مال خود را بخورد، مردم را بدهد و در راهِ خدا بذل کند و بد بخت آن کس است که مال خود را نخورد، کسی راهم ندهد ودر راهِ خدا بذل نمی کند وعاقبت در این حالت از دنیا می رود. سعدی دربارهٔ این حکمت در یک قطعه گفته است:"دو کس رنج بیهوده بردند وسعی بیفائده کردند. یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد"[۸]

دو نوع کس بیهوده سعی و زحمت می کشند و بیهوده کوشش بکارمی برند. یکی آن کس است که مال را جمع کرد، نخورد ونداد. و دیگر آن کس است که علم را آموخت ومطابق عِلم عَمل نکرد.

در یک حکمت سعدی گفته است: "سه چیز پایدار نماند مال بی تجارت وعلم بی بحث و ملک بی سیاست." [۹] یعنی سه چیز بدون سه چیز پایدار نماند: مال بدون تجارت وعلم بدون بحث و ملک بدون سیاست .

در پایان این سخن می توان گفت که در این باب هزارها خیرخواه و مصلحت آمیز پند و نصیحت داده شده است. در این باب هشتم در هر حکمت موضوع آموزش اخلاقی وجود دا رد. این باب از لحاظ آموزش اخلاقی، مهمترین باب گلستان است. در این باب موضوعات گوناگونِ آموزش اخلاقی بیان شده است. دراین مقاله، همهٔ موضوعات اخلاقی را جای دادن ناممکن است. برای همین بطور نمونه از هر باب چند نکته موضوعات آخلاقی نوشته شده است. کتاب گلستان سعدی یکی از مهمترین کتابهای اخلاقی جهان است. اگر اخلاق مردوم خوب می شود جامعه هم خوب می شود.این کتاب در ساختن یک جامعه آرمانی خیلی اهمیت دارد. بدیع الزّمان فروزانفر اصلا گلستان سعدی را از لحاظ سلاست عبارت و سلاست الفاظ و حسن تعبیر و تناسب صدر گفته است که: "در آخرین درجهٔ فصاحت قرار گرفته و سعدی، درَی از سخن بر روی آیندگانِ گشوده، و با وجود این می توان گفت که درِ سخن را هم بسته است، زیرا تاکنون که از تألیف این نامه قریب هفت قرن می گذرد وفضلای بسیار و نویسندگان کا مل در ایران پیدا شده اند، هنوز کسی مانند گلستان ننوشته است." [۱۰]

مانند آنچه برای نمونه آورده شد دارای نکات نغز اجتماعی و اخلاقی و تربیتی است و این مزایاست که آن کتاب را سر حلقهٔ ادبیات جهان قرارمیدهد زیرا در هر باب قرار مطالبی عمیق و سودمند که سرمشق زندگی تواند بود مندرج است.

کتاب بوستان که نیز هدف تربیتی دارد می نمایند که استاد درمثنوی اجتماعی و اخلاقی نیز ماهر و زبردست بوده و کار سابقین را مانند شیخ عطار در این رشته بکمال رسانده و حقایقی بسی مهم و سودمند بسلک حکایت بیان نموده است. کتاب بوستان مشتمل در ده باب است که ابیاتی درهر باب برای اشاره بطرز سخن شاعر آورده میشود:

باب اول در عدل و تدبیر و رایست و این ابیاب آن بابست:

نیاساید اندر دیار تو کس + چو آسایش خویش خواهی باش
نیاید بنزدیک دانا پسند + شبان خفته و گرگ در گوسفند
بروپاس درویش و محتاج دار + که شاه از رعیت بود تاجدار
مکن تا توانی دل خلق ریش + که چون میکنی میکنی بیخ خویش. [۱۱]

باب دوم در در احسانت و در آن باب چنین گوید:

یکی را خری در گل افتاده بود ز سوداش خون در دل افتاده بود. [۱۲]

باب سوم در عشق و مستی و شور است و در آن بحکم ذوق وحدت عرفانی این ابیات آمده:

ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست + بر عارفان جز خدا هیچ نیست
همه هرچه هستند از آن کمترند + که با هستیش نام هستی برند[۱۳]

در این باب با مثال و حکایت دربارهٔ عشق و مستی و شور سخن مهم گفته شده است.

باب چهارم در تواضع است. یک نفر به خاطر همین ویژگی می تواند به راحتی جایگاهی در قلب شخصی دیگر به دست آورد. آن صفت تواضع است.تواضع از انسان شخصیت بزرگی می سازد. این ویژگی با رفع اختلاف و اختلاف بین افراد و با رفع تفاوت ها و نا برابری ها بین مردم، آرامش را در جامعه به ارمغان می آورد. و در آن از جمله چنین فرماید:

یکی قطره باران ز ابری چکید + خجل شد چو پهنای دریا بدید
که جائیکه دریاست من کیستم + گراو هست حقا که من نیستم
چو خود را بچشم حقارت بدید + صدف در کنارش بجان پرورید
سپهرش بجائی رسانید کار + که شد نامور لؤ لؤ شاهوار
تواظع کند هوشمند گزین + نهد شاخ پرمیوه سر برزمین. [۱٤]

دراین باب با مثال و حکایت گوناگون دربارهٔ تواضع سخن عمده گفته شده است.

باب پنجم در رضاست و در آنبات آمده:

عبادت با خلاص نیت نکوست + و گرنه چه آید زبی مغز پوست. [۱۵]

باب ششم درقناعت است و این ابیاب ازآنست:

مپنداری این قول معقول نیست + چو قانع شدی سیم و سنگت بکیست
گدارا کند یکدوم سیم سیر + فریدون بملک عجم نیم سیر. [۱٦]

باب هفتم در تربیت است و در تربیت و در آن با اشاره به بد اندیشان و بد گمانان گوید:

اگر بر پری چون ملک ز آسمان + بدامن در آویزت بد گمان
بکوشش توان دجله را پیش بست + نشاید زبان بد اندیش بست
تو روی از پرستیدن حق مپیچ + بهل تا نگیرند خلقت بهیچ. [۱۷]

باب هشتم در شکر برعافیت است. در آن چنین فرمود:

زبان آمد از بهر شکر و سپاس + به غیبت نگرداندش حقشناس. [۱۸]

باب نهم در توبه و صواب است. دراین باب با امثال و حکایات واشعارزیبا در بارهٔ فضیلت توبه و صواب سخن لازمی بکاربرده است.

باب دهم درمناجاتست و درآن گوید:

خدایا بعزت که خوارم مکن + بذل گنه شرمساری مکن
مرا شرمساری به روی تو بس + دگر شرمساری مکن پیش کس. [۱۹]

خلاصۀ آثار شیخ سعدی شیرازی از نظم و نثر مظهر عقاید و افکاریست که در نتیجه عمری آزمایش و اندیشه و مطالعه آفاق و انفس و سیر و سفر و آمیزش با اقسام ملل و مشاهده وقایع تاریخی بحصول پیوسته.شیخ سعدی خود فرماید:

در اقصای عالم بگشتم بسی + بسربردم آیام با هر کسی
تمتّع زهر گوشه ای یافتم + زهر خرمنی خوشه ای یافتم.[۲۰]

این سخنهای گرانبها در عبارتی موزون و شیوا با اشعار زیبا و امثال و حکایاتها بیان شده وبدین ترتیب مجموعه ای نفیس که حاوی بهترین دستورهای اخلاقی و اجتماعی و نمونه شیوای فارسی ادبی باشد بوجود آمده که مطالعه آن بدون تردید "متعلمانرا بکار آید و مترسلانرا بلاغت افزاید".[۲۱]

زمانی مردم در شوق بقا جامعه را ساختند و هنوزهم بدون جامعه نمی توانند زنده بمانند. بنابر این اهمیت جامعه درزندگی انسان بسیار زیاد است. و برای اینکه مردم در آرامش و شادی زندگی کنند، ساختن یک جامعه اید آل بسیار ضروری است. با شور و شوق و الهام ساختن جامعه ای شاد، سعادتمند و آرمانی، حدود هشتصد سال پیش، جشن فرخنده شاعر انسان دوست شیخ سعدی در کهن ایرانی شیراز برگزار شد.

درساختن یک جامعه ایدآل به افراد مستقل نیازاست. ساختن یک جامعه ایده آل بدون افراد مستقل امکان پذیر نیست. پس اول از همه مردم باید به یک فرد روشن فکر با شخصیت خود تبدیل شوند. سپس یک خانواده ای زیبا تشکیل شود، جامعه ای زیبا و ایدآل ساخته می شود. تنها در این صورت است که می توان کشوری شاد و مرفه ساخت. به همین منظور است که شاعربزرگ اومانیست ایران، شیخ سعدی، تشویق و الهام فراوانی برای ساختن جامعه ای آرمانی ارائه کرد. عمدتاً با نوشتن دو جواهر قیمتی به نام *گلستان* و *بوستان* ارائه کرده است.

منابع و مآخذ

[۱]. دکتر رضازده شفق، *تاریخ ادبیات ایران*، انتشارات آهنگ ایران، چاپخانۀ آرمان، چاپ اول، ۱۳۴۹هـ .ش. ص.۲۵۲.
[۲]. همان.
[۳]. *شعر فارسی از آغاز تا امروز*، ص. ۱۲٤-۱۲۳.
[٤]. *گلستان سعدی*، ناشر: اشرفیه بک هاؤس، داکا: بنغلا بازار. ص. ۱۸-۱۷.
[٥]. همان، ص. ۱۰٦.
[٦]. همان، ص. ۱۸٥.
[۷]. همان، ص. ۲۱۱-۲۱۰.
[۸]. همان، ص. ۲۱۲.
[۹]. همان، ص. ۲۱۳.
[۱۰]. بدیع الزمان فروزانفر، *تاریخ ادبیات ایران*، تهران: انتشارات و وزارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول ،۱۳۷۳ه.ش. ص. ۳۸۳.
[۱۱]. *بوستان سعدی*، تهران: چاپ چهارم ۱۳۶۸ هجری قمری، چاپ مروی، صحافی امیر کبیر، ص.۱۳۵.
[۱۲]. همان، ص.۲۳-۲۵.
[۱۳]. همان، ص.۱۴۸-۱۴۹.
[۱٤]. همان، ص.۱۸۱.
[۱٥]. همان، ص. ۲۴۰.
[۱٦]. همان، ص. ۲۵۶-۲۵۷.
[۱۷]. دکتر رضازده شفق، *تاریخ ادبیات ایران*، ص.۲۶۲.
[۱۸]. همان.
[۱۹]. همان.
[۲۰]. همان، ص.۲۶۳.
[۲۱]. همان، *ص*.۲٦۳ .

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

সোহরাব সেপেহরির কবিতায় মানুষ ও প্রকৃতি
(Man and Nature in Sohrab Sepehri's Poetry)

Dr. Tahmina Begum*

Abstract: Sohrab Sepehri (1928-1980) was a famous contemporary Iranian poet and painter. He was brought up in an art and poetry loving family. He graduated from the Faculty of Fine Arts of the University of Tehran. He was well-versed in Buddhism, mysticism, and Western traditions. He loved the beauty of nature and he was considered as one of the foremost modernist painters. He assembled the Eastern concepts and philosophy with the Western techniques. He focused on the people and their life oriented phenomena in his poetry. Human rights are reflected in his writings beautifully in various ways. He composed his poetry in short sentences to express his thoughts and feelings. His poetry contains a biography of two aspects both inner and outer. He beautifully explained God's recognition of the beauty of nature. He made an attractive combination of romanticism and symbolism. His poetry deals with humanity and the concern of human values. He looked at the nature and the creature from the viewpoint of a lover. His poetry takes people to a journey of an unknown world where ugly things become beautiful. In his thoughts, one should plant the flower of love in his heart for the entire universe. His poems have been translated into several famous languages. This paper will discuss the place of man and nature in Sohrab Sepehri's poetry.

ভূমিকা

সাংবিধানিক বিপ্লবের সময় থেকেই ফারসি সাহিত্যে নবজাগরণের সূচনা হয়। সমাজে মানুষের দৈনন্দিন ঘটনাই হয়ে ওঠে সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। সাহিত্য মানব জীবনের দর্পণ। আর কবিতা হলো এর প্রাণ। কাজার বংশের শাসকদের মধ্যে প্রথম ইউরোপ সফর করেন নাসির উদ্দিন শাহ। এ সফরের সূত্র ধরেই ইরানে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সাংবিধানিক বিপ্লবের প্রাক্কালে ইরানের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। অর্থনৈতিক দূরবস্থা এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে জনগণ ছিল আতঙ্কিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে একদল শিক্ষিত জনগোষ্ঠী পত্রপত্রিকা ও তাঁদের প্রকাশনার মাধ্যমে আধুনিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতিধারাকে তরান্বিত করে এবং নবনব ঘটনা আধুনিক বিশ্বসংস্কৃতির সাথে ইরানের সাধারণ মানুষের সংশ্লিষ্টতার গুরুত্বকে পূর্বের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মূলত এসময়ে বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও বর্ণনাধারার দিক থেকে ফারসি সাহিত্য ছিল বিবর্তন ও বিপ্লবমুখী। প্রাচীন ছন্দরীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি আবার নতুন ধারার ছন্দরীতিও পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেনি। আধুনিক সাহিত্যের প্রতিটি স্তরে এক একজন শক্তিশালী কবিসাহিত্যিক চিত্তাকর্ষক রচনাবলির মাধ্যমে ফারসি সাহিত্যের উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখেন। ফারসি সাহিত্যের আধুনিক ধারার অন্যতম প্রধান কবিপ্রতিভা সোহরাব সেপেহরি।

সোহরাব সেপেহরির ব্যক্তিজীবন ও কবিতাভুবন

সোহরাব সেপেহরি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর কাশানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আসাদুল্লাহ সেপেহরি; যিনি একজন পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসে কর্মরত ছিলেন। তাঁর শিল্প সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল দৃশ্যমান। তিনি শিল্পের অঙ্গনে বেশ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ সত্যিই সহজ নয়। সোহরাবের পিতা একজন দক্ষ চিত্রশিল্পীও ছিলেন। যিনি ছবির মাধ্যমে শিল্পচর্চার এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেন। তাঁর মা মাহযাবীন সেপেহরি একজন গৃহিণী ছিলেন। একটি সংসারকে ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে রেখে পথ চলেছেন। তাঁর ভাই ও বোনদের নাম যথাক্রমে মনুচেহর, হুমায়ুন দোখত, পারী দোখত ও

* Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Bangladesh.

পারভানে।[১] কবির শৈশবকাল কাশান শহরে অতিবাহিত হয়। ছোট্ট ছোট্ট পা যখন বড় হতে শুরু করে ঠিক তখনই তিনি বাবাকে হারান। শৈশব থেকেই তাঁর মা তাদেরকে মানুষ করে তোলেন। একটি সংগ্রামি জীবন এগিয়ে চলে বিভিন্ন প্রতিকূলতায়। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তিনি কাশান শহরে অবস্থিত 'দাবিস্তানে খৈয়্যাম হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি একই স্কুল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাও সমাপ্ত করেন।

কর্মজীবন প্রতিটি মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। সোহরাব শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি না টেনেই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কাশানের শিল্পকলার শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। এ সময়ে তাঁর উচ্চতর অধ্যায়ন অব্যাহত ছিল। কিন্তু বাবার গুণে গুণান্বিত ছেলের মনের আকাশেও ছবির প্রতি আলাদা একটি টান অনুভূত হতে দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে চিত্রকর্ম ও ক্যালিওগ্রাফির প্রতি তাঁর আগ্রহ বহগুণ বেড়ে যায়। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি তেহরানে অবস্থিত চারুকলা বিভাগে ভর্তি হন এবং পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু করার প্রতিও মনোযোগী হন। এ সময় চিত্রশিল্প ও কারুশিল্পের বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজনের মাধ্যমে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে উচ্চতর ডিগ্রিলাভের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে সোহরাব একজন উঁচু মানের চিত্রকর হিসেবে পরিচিতি পান। পরবর্তীতে তেহরানের একটি তেল কোম্পানিতেও তিনি যোগ দেন। এসব চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি তিনি কবিতা সন্ধ্যাগুলোতেও নিয়মিত উপস্থিত হতেন। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর *মারগে রাঙ্গ* নামক কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়।[২] ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে ২১ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ছবির ক্যানভাসে তুলির ছোঁয়ায় নিজের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে চিত্রিত করেন। একইভাবে তিনি কাগজের ক্যানভাসে ভাষা ও বাক্যবিন্যাসে সেই ভাবনাগুলোর শৈল্পিক প্রতিফলন ঘটান।

নিজেকে সমৃদ্ধ করতে অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই। সোহরাব সেপেহরি চিত্রশিল্পের কাজে অনেক দেশ পরিভ্রমণ করেন। ফ্রান্স, ভারত, আফগানিস্তান, মিশর, ইতালি, আমেরিকাসহ জাপান পরিভ্রমণের মাধ্যমে একদিকে যেমন চিত্রশিল্প বিষয়ক সম্যক জ্ঞানলাভ করেন। তেমনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে আত্মার যে বিশালত্ব তৈরি হয় তা একজন কবিসত্তাকে বেগবান করে তোলে। তিনি জাপান থেকে লৌহের উপর খোদাইয়ের কাজ শিক্ষা লাভ করেন।[৩] যে কারণে সোহরাবের কবিতা কখনো কখনো জাপানি '*হাইকো*'কবিতার রঙ ধারণ করেছে। সোহরাব যে প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং শহরের হৈচৈ থেকে মুক্ত হয়ে স্বীয় জন্মভূমি শহর কাশানের প্রকৃতির কাছে ছুটে যেতেন, এগুলো সবই তাঁর সফরেরই ফসল। তাঁর কবিতা এবং চিত্রকর্মে ঘুরে ফিরে প্রকৃতির উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়:

به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من.[٤]

'যদি কেউ আমার খোঁজে আস
কোমল-ধীর পায়ে এসো, যেন চিড় না ধরে
আমার চীনা মাটির একাকিত্বে।'

যিনি তুলির আচঁড়ে গড়ে তোলেন পৃথিবীর নানামুখ। যার ছোঁয়ায় দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশের গৌরবময় সম্ভার। সেই সোহরাব সেপেহরি একজন চিত্রশিল্পী হয়েও রচনা করেন আটটি কবিতাগুচ্ছ। যা তাঁকে একজন খ্যতিমান কবি হিসেবে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর কবিতাগুচ্ছসমূহ হচ্ছে *মারগে রাঙ্গ* (১৯৫১ খ্রি.), *যেন্দেগিয়ে খাবহা* (১৯৫৩ খ্রি.), *আভার উফতাদ ও শারকে আন্দুওয়াহ*(১৯৬১ খ্রি.), *সেদইয়ে পইয়ে অবমোসাফের*, *হজমেসাবয* (১৯৬৭ খ্রি.)। তাঁর এ সাতটি কাব্যগ্রন্থ পরবর্তীসময়ে *মা হিচমা নেগাাহ* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এসময়ের আরও পরে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে *হাশত কিতাব* শিরোনামে এটি একত্রে প্রকাশিত হয়।[৫]

সোহরাব সেপেহরির কবিতার গতি-প্রকৃতি

কবিতা জীবনের নানরকম সমস্যার উদঘাটন। সোহরাব সেপেহরির কবিতায় জীবনসমস্যা রূপায়িত হয়। আধুনিক কবিতার জনক কবি নিমায়ী কাব্যরীতি লক্ষ্য করা যায় সোহরাবের প্রথম দিকের কবিতাসমগ্রে। যদিও শেষের দিকের কবিতায় ফাররুখযাদের কবিতার সাথে কিছুটা মিলের চিহ্ন পাওয়া যায়। কবি তাঁর কাব্যচর্চায় নিজস্ব চিন্তাশৈলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আঙ্গিক ও নির্মাণগত দিক থেকে তাঁর কবিতা ছন্দের অন্তমিল ও পংক্তির সমতামুক্ত। পাশাপাশি একটা সুরের দ্যোতনাও বিদ্যমান। যে দ্যোতনা তিনি বিভিন্ন ধ্বনি, শব্দ এবং সুরের ব্যবহারে সৃষ্টি করেছেন। এ কোমল স্বপ্নময় দ্যোতনাই সোহরাবের কবিতাকে অন্য সব কবির কবিতা থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করে জনপ্রিয় করে তোলে। কবিতার এ বৈশিষ্ট্যই তাঁর নিজস্ব ধারার প্রধান পরিচায়ক। সোহরাব তাঁর কবিতায় পানিকে নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে পানি হচ্ছে শুদ্ধতার প্রতীক। আমরাও সবাই জানিপানির অপর নাম জীবন। আরেফ বা পূণ্য-পুরুষের সংস্পর্শে এসে যেমন সাধারণ মানুষের আত্মা শুদ্ধতা লাভ করে, পানিও তেমনি সব অপবিত্রতা, অশুদ্ধতাকে ধুয়ে শুদ্ধ করে তোলে। তাই সোহরাব তাঁর কবিতায় গেয়ে উঠেন-

آب را گل نکنیم:
در فرودست انگار، کفتری می خورد آب.
یا که در بیشه دور، سیره ای پر می شوید
یا در آبادی، کوزه ای پر می گردد.
آب را گل نکنیم:
شاید این آب روان، می رود پای سپیداری،
تا فرو شوید اندوه دلی
دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب.[٦]

'আমরা পানি ঘোলা করবো না:
হয়ত ভাটির কোথাও, কোন এক কবুতর পানি পান করছে।
অথবা অদূরে ঝুপের ধারে, কোন এক চড়ুই তার পাখনা ঝাড়ছে
অথবা কোনো জনপদে, ভরছে কোনো পেয়ালা।
আমরা পানি ঘোলা করবো না:
হয়তো এ প্রবাহমান পানি, শুভ্র কোনো গাছের গোড়ায় বয়ে যাচ্ছে
যেখানে কোনো বিষাদ হৃদয় বিগলিত হচ্ছে
হয়ত কোনো এক দরবেশের হাত, পানিতে ভেজাচ্ছে একটুকরো শুকনো রুটি।'

রহস্যময় জীবন

পৃথিবীর সৃষ্টি বরাবরই রহস্যেঘেরা। জীবন আবর্তিত এ রহস্যঘিরেই। একদিন শেষ হবে সবই। তবু আয়োজনের যেন শেষ নেই। জীবনের প্রয়োজনে নাকি প্রয়োজনের তাগিদে ছুটছি সবাই। প্রাণপণ ছুটছি। সমাপ্তির ঠিকানা যেন জানা নেই কারো। খোলা আকাশে পাখিদের উড়েবেড়ানো আমাদের মনকে চঞ্চল করে তোলে। যেন তাকেই সব কথা বলার আছে। আছে হৃদয় উপুড় করে দেয়ার আঁশ। সুখে হোক বা দুঃখে আমরা সৃষ্টিকর্তাকেই স্মরণ করি। মন ব্যাকুল হয়ে উঠে সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে। রহস্যময় পাখির অবয়বে মানুষের জীবনচিত্র এরূপেই অঙ্কিত হয় সেপেহরির কবিতায়। বিদায়ের মুহূর্তও একাকিত্বের পোশাকে ঢাকা। মাঝখানের জীবন তরীতে যুক্ত হয় অনেক অভিধা। তাইতো কবির কণ্ঠে ধ্বণিত হয়,

حرف ها دارم
با تو ای مرغی که می خوانی نهان از چشم
و زمان را با صدایت می گشایی!

چه تو را دردی ست
کز نهان خلوت خود می زنی آوا
و نشاط زندگی را از کف من می ربایی؟[۷]

‘অনেক কথা রয়েছে আমার মনের গহীনে
তোমার সঙ্গে হে পাখি! তুমি চোখের আড়াল থেকে ডাকো
আর তোমার কণ্ঠধ্বণি দ্বারা কালকে অতিক্রম কর!
তোমার কী ব্যথা রয়েছে
যে জন্য তুমি নির্জনে সঙ্গোপনে আওয়াজ তোলো
আর আমার জীবনের স্বাচ্ছন্দ কেড়ে নিচ্ছো?

কল্যাণ কামনা

মানুষ, পশুপাখি সবই আল্লাহর সৃষ্ট জীব। সবই আমাদের প্রয়োজনে আয়োজিত। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবেই মানুষের সৃষ্টি। এই যাপিতজীবনে কিসে আমাদের কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ এটা জানা অত্যন্ত জরুরী। কারণ সৃষ্টিকর্তা মানুষের কল্যানের তরেই আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ করে পাঠিয়েছেন। অপরের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারাতেই সফলতা। ইহজীবন ও পরজীবন উভয় জগতে কল্যাণ লাভের জন্যই পৃথিবীবাসীর প্রতি সদয় আচরণ আবশ্যক। তবেই আমরা আল্লাহর নৈকট্যলাভ করতে পারবো। একজন প্রকৃত মানুষের মানবিক গুণাবলির অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় অপরের কল্যাণ কামনা। সেক্ষেত্রে পশু-পাখির প্রতিও আমাদের আচরণ হবে সুন্দর। তাদের উপকারে এগিয়ে যাওয়া। কবি সেপেহরী অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের একজন মানুষ ছিলেন। পক্ষীকূলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় মেলে তাঁর লেখনীতে। তিনি বলেন,

آب را گل نکنیم:
روی زیبا دو برابر شده است.
چه گوارا این آب!
چه زلال است این رود!
مردم بالا دست، چه صفایی دارند!
چشمه هاشان جوشان، گاوهاشان همه شیر افشان باد!
من ندیدم دهشان،
بی گمان پای چیزهاشان جاپای خداست. [۸]

পানি ঘোলা করবো না আমরা:
সুন্দর মুখ হয়েছে দ্বিগুণ আকর্ষণীয়।
কী সুপেয় এই পানি!
কী নির্মল এই নদী!
উজানের মানুষগুলো কীযে পরিচ্ছন্ন!
তাদের ঝরণাগুলো উচ্ছ্বল, তাদের গাভীগুলো সব দুগ্ধভরা!
দেখিনি আমি তাদের গ্রাম,
নিঃসন্দেহে তাদের ঝুপড়ি ঘরের তলা খোদার পদচিহ্ন।

আশার আলো

বেঁচে থাকা আনন্দের। তাই মানুষকে আশাবাদী হতে হয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে আশার আলোই মানুষকে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নের সিঁড়িতে চড়তে চায় না এমন কাউকে পাওয়া যাবে না বোধহয়। কারণ সবাই স্বপ্নকে ছুঁতে চায়। চায় জীবনকে আনন্দের করে তুলতে। অন্ধকারের পরেই আসে আলো। সেই আলোর ভেলায় চড়ে সবাই সাফল্য চায়। চায় জীবনের কাঙ্খিত সুখ। কিন্তু এটাই সত্য ফুলেও কাঁটা থাকে। তাই জীবন যতক্ষণ কষ্ঠ থাকবে। কষ্টের মহা সমুদ্র পার করার নামই জীবন। সমস্যার সাথে মোকাবেলা

করেই জীবনের কাঙ্খিত লক্ষ্যর্জন সম্ভব। সেপেহরিও তাঁর জীবনে কখনও তুলির ছোঁয়ায় তাঁর কল্পনাকে রঙ দিয়েছেন। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলায় ছিলেন দৃঢ়। শৈল্পিক সৌন্দর্যে জীবনের ছবি এঁকেছেন। কবিতার শব্দমালায় গেঁথেছেন বুকের পাটে জড়ানো স্বপ্নজাল। দরিয়া ওয়া মারদ (সাগর ও লোকটি) কবিতায় সেপেহরির ভাষায়-

تنها و روی ساحل
مردی به راه می گذرد
نزدیک پای او
دریا، همه صدا.
شب، گیج در تلاطم امواج.
رو می کند به ساحل و در چشم های مرد
نقش خطر را پر رنگ می کند.
انگار
هی می زند که: مر! کجا می روی، کجا؟
و مرد می رود به ره خویش.[9]

একাকী নদীর কিনারায়
একটি লোক পথ অতিক্রম করছে
তার পায়ের কাছেই
সাগরের তরঙ্গমালা গর্জনময়
রাত তরঙ্গের বিক্ষুব্ধতায় আতঙ্কিত
তীরের দিকে ধেয়ে আসে লোকটির চোখের সামনে
ভয়ংকর রূপ ধারণ করে
হঠাৎ
লোকটিকে বলে ওঠে, কোথায় যাচ্ছ? কোথায়?
আপন পথেই চলতে থাকে লোকটি অবিরাম।

মানুষের জীবনচিত্র

শিল্পীর তুলিতে অঙ্কিত হয় জীবনের বর্ণিল রঙ। এ রঙের খেলায় মেতে উঠে তার সৃষ্টিকর্মের নানা আঙিক। সোহরাব সেপেহরি একজন দক্ষ শিল্পীর কারুকার্যে রহস্যময় নানা দিক চিত্রায়িত করেন। তুলির আঁচড়ে যেভাবে অঙ্কন করেন নানা শিল্পকর্ম একইভাবে তার কলমে রূপায়িত হয় মানুষের জীবনের নানা চিত্র। অন্ধকার রাতের বর্ণনায় তিনি বলেন-

رخنه ای نیست در این تاریکی:
در و دیوار به هم پیوسته.
سایه ای لغزد اگر روی زمین
نقش وهمی است زبندی رسته.
نفس آدم ها
سر به سر افسرده است.
روزگاری ست در این گوشهء پژمرده هوا
هرنشاطی مرده است.[১০]

এই অন্ধকারের মাঝে নেই এতটুকু ছিদ্র:
দরজা ও দেয়াল মিশে একাকার
ছায়া যদি পড়ে মাটির ওপরে

কল্পনার চিত্র বন্ধন ছিড়ে মুক্ত হয়ে গেছে।
মানুষের দীর্ঘশ্বাস
প্রতিটি হৃদয় বেদনা বয়ে বেড়ায়
হাহাকার এই বাতাসের মাঝে মানুষের জীবন
সব আনন্দ চিরবিদায় নিয়েছে।

প্রকৃতির নিসর্গ

শৈশবের স্মৃতি ভীষণভাবে আলোড়িত করে কবি হৃদয়। তিনি শহরের যান্ত্রিক জীবনের কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে ছুটে যেতেন প্রিয় শহর কাশানে। যেখানে মাটির গন্ধ তাঁকে আপ্লুত করত। রাস্তার পাশ ঘেসে বেড়ে উঠা গাছেরা তাকে সম্ভাষণ জানাতো। যেন একটি বন্ধুর দেখা মিলেছে বহুদিন পর। তাঁর চিন্তা ও ভালোবাসার ছোঁয়ায় প্রকৃতিও যেন হেসে উঠত সহসা। প্রকৃতির প্রতি তাঁর অন্তরঙ্গতা ও ভালোবাসা ছিল ভরপুর। নিসর্গতা স্পর্শ করে যেত কবিকে। তিনি যেন প্রকৃতির কাছে প্রকৃতিরই অংশ হয়ে উঠতেন। একজন কবির হৃদয় হতে হয় আকাশসম। যেখানে কোনো বাঁধাধরা নিয়মের ঘের থাকবে না। কোনো নিয়ম মেনে চলতে হবে না। মন যা প্রকাশ করতে ইচ্ছে প্রকাশ করবে মন তাই বলবে। এইতো প্রকৃতিপ্রেম। সেপিদে বা শুভ্রতা কবিতায় কবির কণ্ঠে ভেসে উঠে-

در دور دست
قویی پریده بی گاه از خواب
شوید غبار نیل ز بال و پر سپید
لب های جویبار
لبریز موج زمزمه در بستر سپید.
درهم دویده سایه و روشن.
لغزان میان خرمن دوده
شبتاب می فروزد در آذر سپید. [১১]

দূর দিগন্তে
রাতজাগা একটি রাজহাঁস উড়ে এসেছে
নীল নদের জলে যেন তার ডানা বিধৌত করছে
ঝরণার উৎস ধারায়
যেন সুভ্যতার তরঙ্গ উপচে পড়ছে
আলো আর ছায়া একযোগে দৌড়াচ্ছে
যেন কাজলের স্তুপের মাঝে প্রবাহমান
শরতের আকাশে চাঁদ উদিত হয়।

প্রকৃতির ঐশ্বর্য হৃদয়াকাশকে প্রসারিত করে। আকাশের বিচিত্র রূপ মনে শিহরণ জাগায়। মেঘগুলো ঘুরে বেড়ায় এক হতে অন্যত্রে। চনমন আনমনে মনের আকাঁ ছবি ভাসে আকাশের কোল ঘেঁষে। প্রেমের পৃথিবীর নতুন নকশা তৈরির কাজ করে শরতের আকাশ বাতাস গাছপালা। চোখের সামনে নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটে। নতুন স্বপ্নরা পেখম তুলে আবেশে। রঙ-বেরঙের প্রজাপতিরা পাখা মেলে উড়ে উড়ে রঙের ঢেউ তুলে দেয় মনে। পুলকিত মন প্রেমকে গভীরতায় কাছে টানে। সূযাস্তের প্রকৃতির মনের গভীরে ভিন্ন আবহ সৃষ্টি করে। মন চায় বলতে, কিন্তু কান চায় শুনতে, ঠোঁট চায় প্রকাশ করতে। এমনই সুখ-দুঃখের মিশেল অনুভূতির প্রকাশ ঘটে তার কবিতায়। কবি যেন এই সৌন্দর্যে ডুবে থাকতে চান। নিজেকে প্রকাশ করতে চান রাতের প্রকৃতির নিসর্গে। কবির অবেগঘন কণ্ঠে ধ্বণিত হয়-

ریخته سرخ غروب
جا به جا بر سر سنگ
کوه خاموش است.

می خروشد رود
مانده در دامن داشت
خرمنی رنگ کبود.
سایه آمیخته با سایه.
سنگ با سنگ گرفته پیوند.
روز فرسوده به ره می گذرد.
جلوه گر آمده در چشمانش.
نقش اندوه پی یک لبخند.[১২]

পশ্চিম দিগন্তে রক্তিম আভা ভেঙে পড়েছে
এক জায়গা থেকে অন্যত্র পাথরে উপরে
পাহাড় নিশ্চুপ
নদীর পানি জ্বলজ্বল করে
আকাশি রঙ ছেয়ে যায়
ছায়া ছায়ার সাথে মিশে একাকার
পাথর পাথরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে
দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে দিন আপন পথেই চলে
তার চোখের সামনে দ্যুতিময়
বিষাদের মাঝে একটু মুচকি হাসির রেখা।

উপসংহার

আধুনিক ফারসি কবিতার অন্যতম প্রধান দিকপাল সোহরাব সেপেহরি। প্রেম-ভালোবাসা, মূল্যবোধ, আশাবাদী চেতনা ও প্রকৃতির নিসর্গ তার কবিতার বিশেষ উপজীব্য বিষয়। জীবনের রঙ-বেরঙের চিত্র অঙ্কিত হয় তার কবিতায়। এ শিল্পীর তুলিতে চিত্রিত হয় মানুষের জীবন কথা। সৃষ্টিরহস্যের নানা রূপ ধরা পড়ে কবিতার পাতায় পাতায়। অপূর্ব সৃষ্টির বিচিত্র অবয়বের চিত্রায়ন ঘটে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের দ্যোতনায়। প্রকৃতির প্রতি ছিল কবির গভীর অনুরাগ। প্রকৃতির অপরূপ চেতনার প্রকাশ ঘটে কবিতায়। অন্তরের গহীনে লুপ্ত অনুভূতি প্রকৃতির নিসর্গে আরো প্রেমময় হয়ে ওঠে। মনের গভীরে কল্পলোকের ভাবনাগুলো ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। শৈল্পিক নান্দনিকতায় কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণময়। মানুষের জীবনের আয়না রূপে আবির্ভূত হয় তার কবিতা। জীবনঘনিষ্ঠ ভাবনা, কাব্যিক দ্যোতনা, কল্পনার সমবায়ে কবিতা হয়ে ওঠে বাঙ্ময়। অন্তরের জাগায় আশার আলো। জীবন এগিয়ে যায় সত্য-সুন্দরের মোহনায়। মানুষের হৃদয়ের গভীরে জায়গা তার অনাদিকালের তরে। সোহরাব সেপেহরি আধুনিক ফারসি সাহিত্যের উজ্জ্বল কবিপ্রতিভা। স্মরণীয় হয়ে আছেন মানুষের মনের মনিকোঠায়।

তথ্যনির্দেশ

১ শাহনায মোরাদি কুচি, *মোআররাফি ওয়া শেনাখতে সোহরাব সেপেহরি*(তেহরান: নাশরে গ্বাতরে, ২০০০) পৃ. ১১।
২ তদেব, পৃ.১২।
৩ তদেব, পৃ. ১৩।
৪ ড. মোহাম্মদ জাফর ইয়াহাকি, *চুন সাবুয়ে তেশনে* (তেহরান: জামি প্রেস, ১৯৯৫), পৃ. ১৩৬।
৫ তদেব, পৃ. ১৩৭।
৬ সোহরাব সেপেহরি, *মাজমুয়েয়ে সোরুদেহায়ে সোহরাব সেপেহরি* (তেহরান: এন্তেশারাতে শাদান, ২০১০), পৃ. ২৭০।
৭ তদেব, পৃ.৬২।
৮ তদেব, পৃ.২৭০।
৯ সোহরাব সেপেহরি, *শেরে যামানে মা ৩*, মোহাম্মদ হোকুকি (সম্পা.) (তেহরান: এন্তেশারাতে নেগাহ, ১৯৯২), পৃ. ৭১।
১০ সোহরাব সেপেহরি, *মাজমুয়েয়ে সোরুদেহায়ে সোহরাব সেপেহরি*,পৃ. ২১।
১১ সোহরাব সেপেহরি, *শেরে যামানে মা ৩*, পৃ. ৬১।
১২ তদেব, পৃ. ৬৩-৬৪।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

বাংলাদেশে ফারসি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
(Importance and Necessity of Persian Language in Bangladesh)

Dr. Rizwana Islam Shammi*

Abstract: Persian is an ancient and rich Language. This language is one of the oldest languages in the world. The Persian Language first appeared in a place called Persia in ancient Persia about a thousand years before the dearth of Christ. Its ancient relics can still be seen covered in various parts of Iran. Over time, The Persian language began to spread and improve. Although the centre of this language was Persia, its impact was far-reaching. Formerly, the Persian language was widely spoken in Russia, Afghanistan,Turkey, Iraq and Pakistan. Not only that, it spread to the Indian sub-continent in the early thirteenth century from distant Persia. It was the state language of Bengal from 1204 AD to 1837 AD. Later, towards the end of the British Period, the widespread use of this language in the sub-continent came to an end.

Due to the fact that the Persian language has been the state language of Bengal for a long time, the influence of the Persian language has been observed on the Bengali language. Many mediaeval Bengali litterateurs also wrote poems under the influence of the Persian poets. Moreover the basic ideas of Persian poetry: such as morality, spirituality and philosophical thoughts, are very necessary in Bengali life. The basic tenets of Persian poetry can be helpful in enriching the course of our lives. We believe that through this our individual life can radically change and beautify our family life and social and state systems. These are the topics I will present in my main article.

ভূমিকা

ফারসি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে এ ভাষার উদ্ভব হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গে ফারসি ভাষার নিগূঢ়তম সম্পর্ক রয়েছে। দীর্ঘ ছয় শত বছর ফারসি ভাষা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর রয়েছে ফারসি ভাষার সুদীর্ঘ প্রভাব। দীর্ঘ ৬৩৪ বছর রাজ ভাষা হিসেবে ফারসি ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ব্যপকভাবে প্রভাবিত করেছে। এ সময় প্রায় সকল ভারতীয় ভাষা ফারসি ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে বাংলায় মুসলমানদের আগমন ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য আর্শীবাদস্বরূপ। বাংলায় মুসলমানদের আগমনের ফলে আরবি-ফারসি সাহিত্যের অমূল্য রত্নভাণ্ডার দ্বারা বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই আমাদের কাছে ফারসি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশে ফারসি চর্চার প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশে ফারসি চর্চা কতটা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে চর্চা করেন এবং শেকড় সন্ধানী গবেষকমাত্রই অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার সাথে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক কতটা নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। এ ভাষার সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের শত শত বছরের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে ফারসি ভাষা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মূল ভাণ্ডার।[১] ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

প্রথমত:_বাংলা সাহিত্য চর্চায় ফারসির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

যুগে যুগে ফারসি ভাষার সাহিত্য জগতে বহু কবি সাহিত্যিক ও দার্শনিকের আর্বিভাব ঘটেছে। তাঁদের রচিত কাব্য সাহিত্য ও তাদের জীবন দর্শন, নৈতিকতা, কাব্যশৈলী প্রভৃতি বিষয় বাংলা সাহিত্যে বিভিন্নভাবে প্রভাব

* Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Bangladesh.

বিস্তার করেছে। এর ফলে বাংলায় বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এর প্রভাব ব্যাপকভাবে বিরাজমান। তাই আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য উদঘাটন করতে হলেও ফারসির প্রয়োজন।

প্রথমেই ইরানের বিখ্যাত কবি শেখ সা'দীর- (১১৮৪-১২৯২ খ্রি:) প্রভাবের কথাই বলা যেতে পারে যে, শেখ সা'দীর *গুলিস্তান* ও *বুস্তান* কাব্যের প্রভাব খুবই বেশি। বাংলা ভাষা-ভাষী কবি সাহিত্যিকসহ বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ সা'দীর নৈতিক গ্রন্থাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। আবার অনেক কবি সাহিত্যিকদেও গ্রন্থাবলিকে পদ্যরীতিতে, আবার অনেকে গদ্যরীতিতে অনুবাদ করেছেন। যা বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি দান করেছে। [২]

মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের পাশাপাশি হিন্দু বাংলা ভাষী কবিদের রচনায়ও ফারসি কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। । বিশেষ করে হিন্দু কবি বড়ু চণ্ডি দাশ রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের বড় নিদর্শন। তাঁর এ কাব্যে ফারসি শব্দের বহু ব্যবহার পাওয়া যায়। এ রচনায় রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রে মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীর (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) মাসনাবীর প্রভাব থাকা অমুলক নয়। এ সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য সমলোচকদরে একটি মন্তব্য হলো- "ইরানী সূফীতত্ত্বের প্রভাবেই ভারতে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ প্রসার লাভ করে।"[৩]

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ তার চৈতন্য দেবের (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রি:) মাহাত্ম্য প্রচার প্রসঙ্গে "জগাই মাধাই"[৪] উদ্ধার সংবাদে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে,-

মাসনবী আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দু'জনে।[৫]

রূমীর মাসনবী সতত আবৃত্তি করতেন বলে জগাই-মাধাই বৈষ্ণব ইতিহাসে মহাপাপী বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। এছাড়াও বড়ু চণ্ডি দাশের রচিত পদাবলীতে মাসনবীর ছাপ বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে বড়ু চণ্ডি দাশের পদাবলী উপস্থাপন করা হলো-

"কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে
কেনা বাঁশী বা এ বড়ায়ি গোঠ গোকুলে"
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শব্দে মোর আউলাইলো রান্ধন।।[৬]

মাওলানা রূমী বাঁশীর সাথে আত্মার সম্পর্ক করে যেভাবে মাসনাবী কাব্য রচনা করেছেন। মাসনাবীর প্রথম কয়টি শ্লোকের সাথে উল্লিখিত পদাবলীর হুবহু মিল থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে সূফী কবিদের একটি ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বলে আমাদের ধারণা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: মধ্যযুগে বাংলা কাব্য রচনায় ফারসি কাব্য চর্চার প্রভাব

মধ্যযুগে কয়েকজন বাঙ্গালী কবি ফারসি কাব্য ও কবিতায় প্রভাবিত হয়ে কয়েকটি রোমান্স ও ধর্ম বিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন। তবে এ কাব্যগুলো ফারসি কাব্যের সরাসরি অনুবাদ, না ভাবানুবাদ, নাকি ফারসি কাব্যানুকরণে রচিত? এ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এ কাব্যগুলো ফারসি কাব্য সাহিত্যে প্রভাবিত হয়ে বাঙ্গালী কবিগণ রচনা করেছিলেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মধ্যযুগে রচিত এরূপ কয়েকটি কাব্যের আলোচনায় ফারসি কাব্যে প্রভাবের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে এবং ফারসির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ পাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ইউসুফ জোলেখা

শাহ মুহাম্মদ সগীর সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৩-১৪০৯খ্রি:) *ইউসুফ জোলেখা* কাব্য রচনা করেন। ইরানের মহাকবি ফেরদৌসী (৯৩৫/৯৪১-১০২০/১০২৫ খ্রি:) এবং সূফী কবি জামী (১৪১৪-১৪৯২খ্রি:) মূল কাহিনী পল্লবিত করে *ইউসুফ জোলেখা* নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। ফেরদৌসীর কাব্যের রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শাহ মুহাম্মদ সগীরের কাব্যের সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

সতের শতকের শেষ এবং আঠার শতকের শুরুর দিকের অন্যতম বাঙ্গালী কবি আব্দুল হাকিম। তিনি ফারসি কবি আব্দুর রহমান জামীর *ইউসুফ ওয়া জুলাইখা* নামক কাব্যের অনুসরণে আনুমানিক ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে *ইউসুফ জলিখা* কাব্য বাংলা ভাষায় রচনা করেন।[৭] *ইউসুফ জলিখা* কাব্য সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন-

' মোল্লা জামীর কাব্য শিরেতে ধরিয়া,
আব্দুল হাকিমে কহে বাঙ্গালা রচিয়া।।
ইসুপ জলিখার কিস্‌সা হইল সমাপ্ত।
ফারসী কিতাব বাঙ্গালা পদন্ত।।'[৮]

লায়লী মজনু

কবি দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত *লায়লী মজনু* কাব্যটি ফারসি কবি জামীর (১৪১৪-১৪৯২খ্রিঃ) লায়লী ও মজনুন নামক কাব্যের ভাবানুবাদ। লায়লী ও মজনুর প্রেম কাহিনী সারা বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবী লোক গাঁথা।

সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল: বাংলা রেমান্টিক ভাব ধারার *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল* অন্যতম বিশিষ্ট কাব্য। দোনাগাজী চৌধুরী ও আলাওল, ইব্রাহীম ও মালে মুহম্মদ এই কাব্যের প্রেম কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন।

সপ্তপয়কর: সপ্তপয়কর কাব্যটি পারস্য কবি নিযামী গাঞ্জুবীর (১১৪০-১২০২খ্রিঃ) হাফত পেইকর কাব্যের অনুবাদ। তবে আলাওলের অন্যান্য কাব্যের মতোই ভাবানুবাদ। আরাকান রাজ্যের সময় মন্ত্রী সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে কবি নিযামী এ কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে কবি আলাওল লিখেছেন-

আরবী ফারসি ভাষা বয়েতের ছন্দ
বিশেষ নিজামী বাক্য সরল প্রবন্ধ।
এ গ্রন্থ মাঝে যত আছে ইতিহাস,
পয়ার প্রবন্ধে তার করহ প্রকাশ।[৯]

এই উক্তি থেকে দেখা যায় কবি ফারসি ভাষার প্রভাবে এ কাব্যের ভাবানুবাদ করেছেন।

সেকান্দার নামা: মধ্যযুগীয় বাঙ্গালী কবি আলাওলের *সেকান্দার নামা* কাব্যটি পারস্য কবি নিযামী গাঞ্জুবীর (মৃ.১২০২ খ্রিঃ) ফারসি কাব্য *এসকেন্দার নামা* (اسکندر نامه) কাব্যের অনুবাদ। একাব্যের মূল বিষয় সেকান্দার বা আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয় কাহিনী।

তোহফা: এটিও আলাওল রচনা করেন। সূফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলাভীর *তোহফাতুন নেসায়েহ* নামক ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ। আলাওল ফারসি মূল কাব্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে বলেছেন-

আরবী কিতাব হন্তে ফারসি ভাষাএ।
রচিলা বয়েত ছন্দে ইউসুফ গদাএ।।
ভক্তি ভাবে এক চিত্তে যে জনে পড়এ।
জ্ঞান বৃদ্ধি অতি হএ পাতক নাশএ।।[১০]

গুলে বকাওলী: বাংলা রোমান্টিক প্রণয় কাব্যের ধারায় *গুলে বকাওলী* কাব্যটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলা *গুলে বকাওলী* কাব্যের রচয়িতা হিসেবে নওয়াজিস খান খ্যাতিমান। শেখ ইজ্জতুল্লাহ নামক জনৈক বাঙ্গালী লেখক ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষায় গুলে বকাওলী গ্রন্থটি রচনা করেন।[১১]

বাংলার মরমী কবি ও সাধক লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯১খ্রিঃ) ও বিশ্ব কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) রচিত আধ্যাত্মিক কবিতাগুলোতে জালাল উদ্দিন রুমীর মাসনবীর প্রভাব সুস্পষ্ট। কবি গুরু **তার** পারস্যের যাত্রী গ্রন্থে ইরানীদের বিষয়ে উল্লেখ করেন-'এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। তারপরে এখানে একটা জনশ্রুতি রটেছে যে, পারসিক মরমী কবিদের রচনার সঙ্গে আমার লেখার আছে সাজাত্য।[১২]

তৃতীয়তঃ নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা অর্জনে ফারসির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

ফারসি ভাষায় এমন কিছু কবি-সাহিত্যিক কবিতা রচনা করেছেন, যা বর্তমান বিশ্বের মানুষের নৈতিক ও চরিত্র গঠনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। এ পৃথিবীতে ধনী-গরীব, রাজা-বাদশাহ, ফকীর-দরবেশ কেহই চিরস্থায়ী নয়। সকলকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাই পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, খোদার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার শিক্ষা ফারসি ভাষায় রয়েছে। শেখ সা'দীর ভাষায়:

জهان ای برادر، نماند به کس .... چه بر تخت مردن، چه بر روی خاک [১৩]

বঙ্গানুবাদ

হে ভাই ! এ পৃথিবী কারও জন্য চিরস্থায়ী নয়,
পৃথিবীর প্রতি মনোযোগী হইও না, স্রষ্টার প্রতি মনোযোগী হও, সেটাই যথেষ্ট।
দুনিয়ার রাজত্ব এবং এর উপর ভরসা করো না,
কেননা, তোমার মতো অনেকেই ছিল এবং মৃত্যুবরণ করেছে।
যখন দেহ হতে প্রাণ করিবে প্রস্থান,
বালাখানায় কিংবা মাটিতে মারাযাক উভয়ই সমান।

আমাদের সমাজে দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, নীতিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই সমাজকে সুন্দর ও কলুষমুক্ত রাখতে হলে নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খ্রি:)। তিনিও শেখ সা'দীর কাব্যে প্রভাবিত হয়ে বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। শেখ সা'দী ভদ্রলোকের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে তাঁর *বুস্তান* গ্রন্থে গল্প বর্ণনা করেছেন-

سگی پای صحرا نشینی گزید .... ولیکن نیاید ز مردم سگی[১৪]

কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত শেখ সা'দীর গল্পটিকে 'উত্তম ও অধম' নামকরণ করে বাংলা ভাষায় কাব্যরূপ দিয়েছেন। এ কবিতাটি আমাদের সকলেরই জানা। তবুও সতেন্দ্রনাথের ভাষায় তুলে ধরা হলো–

কুকুর আসিয়া এমন কামড়
দিল পথিকের পায়,
....
....
তা' বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়।[১৫]

ইরানের মহিলা কবি পারভীন এতেসামী তার কাব্য-চিন্তা ও দৃষ্টি ভঙ্গি বর্ণনা করতে গিয়ে বিধবা, দরিদ্র, ইয়াতীম, শ্রমিক প্রভৃতি চরিত্র ছাড়াও বস্তু জগতে ও জীব জগতের বিভিন্ন দৃশ্যেরও চিত্র অংকন করেছেন। পারভীন এতেসামী নেকড়ে ও কুকুরের সংলাপে যে দৃশ্যের চিত্রপট এঁকেছেন, 'তাতে নেকড়ে মেষপালের রক্ষক কুকুরের কাছে একটি মেষ দানের ফরমায়েশ দেয়। কুকুর সে আদেশ পালন করতে রাজি হয় না। কুকুরের ভাষ্য , আমি আমার মনিবের স্বার্থের হেফাজতকারী, রক্ষক ও জিম্মাদার। কুকুর কিছুতেই মনিবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।' পারভীনের ভাষায়-

پیام داد ساگ گله را، شب گرگی ..... که رهزنی تو و من نام پاسبان دارم [১৬]

এক রাতে এক নেকড়ে ফরমায়েশ পাঠালো, মেষ পালের কুকুরের কাছে;
প্রত্যুষেই একটি ছাগ পাঠিয়ে দিবে আমার ঘরে , মেহমান আছে।
আমার রাগ জাগাবে না, জান যে, নেকড়ে ভীষণ রাগী।
কলিজাটা নিরেট কালো, রক্ত চোষা দণ্ড নখরে দাগী

জবাব দিল (কুকুর) , তোমার সাথে আমার কোন পরিচয় নাই,
তুমিতো ডাকাত, আর আমার পরিচয় 'রক্ষক' তাই।

এমনি হাজারো নীতি কথা ফারসি ভাষায় রয়েছে যা থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি, তবেই আমরা পৃথিবীর বুকে সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে পারবো।

চর্তুথত: প্রেম -ভালোবাসার শিক্ষা অর্জনে ফারসি চর্চার অনিবার্যতা

প্রেম বা ইশ্ক হচ্ছে কারও সাথে অথবা কোনো জিনিসের প্রতি বন্ধুত্ব বা হৃদয়ের আবেগপূর্ণ সম্পর্ক; কোন জিনিস কামনার উৎসারিত আকর্ষণ।[১৭] ইবনুল আরাবীর মতে প্রেম তিন প্রকার: স্বাভাবিক প্রেম, আধ্যাত্মিক প্রেম ও ঐশী প্রেম। ঐশী প্রেম পরম সত্তার প্রেম বা আল্লাহর প্রেম। এই প্রেম হতেই অন্যান্য প্রকার প্রেমের উৎপত্তি হয়।[১৮] প্রেমের শক্তি সম্পর্কে কবি রুমি বলেছেন:

از محبت تلخ ها شیرین شود   از محبت مسّ ها زرّین شود
از محبت درد ها صافی شود   از محبت دردها شافی شود[১৯]

প্রেম-ভালোবাসার কারণে তিক্তও মধু হয়ে যায়
প্রেম-ভালোবাসায় পিতল স্বর্ণ হয়ে যায়,
প্রেম-ভালোবাসায় কুৎসিত বস্তু পরিষ্কার দেখায়
প্রেম-ভালোবাসায় বেদনাই সুখ মনে হয়।

কবি ইকবাল বলেন:

از محبت چون خودی محکم شود   قوتش فرمانده عالم شود [২০]

প্রেম মহব্বতের কারণে খুদী যখন অধিকতর শক্তিশালী হয়,
ইহার শক্তির বলে পৃথিবী আদেশদাতায় পরিণত হয়।

পঞ্চমত: ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে ফারসি চর্চার গুরুত্ব ও আবশ্যকীয়তা:

বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে ফারসি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এ পর্যন্ত বাংলাভাষী অঞ্চলে ফারসি ভাষায় মোট কতগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব না হলেও সংখ্যাটি যে হাজারের কাছাকাছি হবে তা সহজেই অনুমেয়। এ সব গ্রন্থের মধ্যে কিছু মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত, আবার কিছু হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।[২১] এছাড়াও বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে বেশ কিছু প্রাচীন ফারসি পাণ্ডুলিপি, শিলা লিপি, দলিল দস্তা, রাজাদের ফরমান, ফারসি চিঠি পত্র, প্রাচীন পত্রিকা ও মুদ্রা সংরক্ষিত রয়েছে।

ষষ্ঠত: মানবতা বোধের শিক্ষা অর্জনে ফারসি চর্চার বিকল্প নেই

শেখ সা'দীর একটি নৈতিক আদর্শ ছিল মানবতাবাদ। যেখানে মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকবে না। বিশ্বের যে কোনো স্থানেই মানুষের বসবাস থাকুক না কেন; তারা একে অপরের অংশ বিশেষ। কেননা মানুষ একই আদম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ মানুষের জন্য, একে অন্যের সুখ-দুঃখের সাথী হবে এটাই নৈতিক দায়িত্ব হওয়া উচিত। সা'দীর ভাষায়:

بنی آدم اعضای یک دیگرند   ....   نشاید که نامت نهند آدمی [২২]

বঙ্গানুবাদ

আদম সন্তান একে অপরের অংশ বিশেষ,
কেননা তারা একই মৌলিক পদার্থ থেকে সৃষ্টি।
দেহের এক অঙ্গে কখনো ব্যথা অনুভূত হলে,
অন্য অঙ্গও তাতে অস্থির হয়ে পড়ে।
অন্যের দুঃখে যে দুঃখিত না হয়,
সে কখনো মানুষ নামের যোগ্য নয়।

এছাড়াও নৈতিক কবি শেখ সা'দী গরীব ও দঃখীর দুখে সমব্যথী হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে রচনা করেছিলেন-

تندرستان را نباشد درد ریش   او نمک بر دست و من برعضو ریش [২৩]

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও শেখ সা'দীর উপরোক্ত কবিতার অনুকরণে 'সুখী দুঃখীর দুঃখ বুঝে না' শীর্ষক কবিতা রচনা করেছেন। যা মূলত সা'দীর কবিতার ভাবানুবাদ মাত্র। কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদারের ভাষায় -

চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে,
....
ঈষৎ হাসিবে শুনে না শুনিবে
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।[২৪]

ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি শেখ সা'দী ছিলেন একজন নৈতিক কবি। যিনি পরের দুঃখ কষ্ট দেখে নিজের দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি *গুলিস্তান* গ্রন্থে একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। শেখ সা'দীর ভাষায়-

حکایت : هرگز از دور زمان .... کفشی صبر کردم.[২৫]

বাংলা সাহিত্যের কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার সা'দীর এই হেকায়াত বা কাহিনীকে বাংলা ভাষায় কাব্যরূপ দিয়েছেন, এ ভাবে-

একদা ছিলনা জুতো চরণ যুগলে
দহিল হৃদয়মন সেই ক্ষোভানলে।
....
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন,
আপন অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ?[২৬]

উপসংহার

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যে প্রভাব রয়েছে, তা চিরন্তন ও বাস্তব। বর্তমানে বাংলাদেশের যুবসমাজের বড় অংশ নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত পন্থায় জীবন পরিচালিত করে অধঃপতনের শেষ সীমায় এসে উপনীত হয়েছে। ধ্বংস প্রায় এ জাতিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য প্রেম, ভালোবাসা ও নীতি-নৈতিকতায় পরিপূর্ণ ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুরুত্বের সাথে পাঠদান করা উচিত। আর তাই ইরানের কবি আব্বাস ইয়ামীনী শরীফের সঙ্গে মিল করে বলতে চাই-

دست در دست هم دهیم به مهر
باغ فارسی را کنیم آباد
یار و غمخوار یکدیگر باشیم
تا بمانیم در این جهان خرّم و شاد

আমরা যদি বন্ধুত্বের সাথে হাতে হাত রাখি,
আর যদি ফারসির এই বাগানকে (ফারসি সাহিত্যকে) আবাদ করি,
একে অপরের সুখ দুঃখের সাথী হই,
তবেই এই পৃথিবীতে শান্তিতে থাকতে পারবো।

তথ্যনির্দেশ

১ কে এম সাইফুল ইসলাম খান সম্পাদিত, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি বিভাগ ও বাংলাদেশে ফারসি চর্চা* (ঢাকা: ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০২২), পৃ. ২৮১

২ মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, *বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮), পৃ. ১৫০।

৩ মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ড.আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের বাঙ্গালী গীতি-কবিতা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮ খ্রি:),পৃ-ক।

৪ জগাই-মাধাই" *চৈতন্যদেব সমকালীন* (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রি:) নবদ্বীপের কুখ্যাত অধর্মাচারী দুই ব্রাহ্মণ সতন্তান, পরে চৈতন্য প্রভাবে পরম বৈষ্ণব হন। এই তথাকথিত মহা পাপী নামক দস্যু ভ্রাতৃদ্বয়কে চৈতন্যদেব হরিনাম দিয়ে যে, উদ্ধার করেন তা বৈষ্ণব ইতিহাসে একটি সুবিক্ষাত ঘটনা ও সর্বজন স্বীকৃত। মনে হয়, রুমীর মাসনবী সতত আবৃত্তি করতেন বলে জগাই-মাধাই বৈষ্ণব ইতিহাসে মহাপাপী বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য: মনির উদ্দন ইউসুফ (আনূদিত:),*রুমীর মসনবী*, পূর্বোক্ত,পৃ-০৩।

৫ মনির উদ্দন ইউসুফ (অনূদিত), *রুমীর মসনবী* (ঢাকা: ওসমানিয়া বুক ডিপু, বাবু বাজার, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৩ বাংলা), পৃ-০৩।

৬ মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ড. আহম্মদ শরীফ (সম্পাদিত)*, মধ্য যুগের বাঙ্গালী গীতিকবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ-৬৪।

৭ রাজিয়া সুলতানা, *আব্দুল হাকিম কবি ও কাব্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী), ১৯৮৭খ্রি:) পৃ-৪৮।

৮ ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি পরিচিতি* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ১৯।

৯ মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০০ খ্রি.), পৃ-২৩১।

১০ তদেব, পৃ. ২১৫।

১১ মাহাবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৩৪-২৩৫।

১২ মোহাম্মদ বাহা উদ্দীন, *বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্য ও রুমী চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক* (ঢাকা: ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯), পৃ-৮৬।

১৩ আব্দুল আযীম খান গারীব গুরগানী (সম্পাদিত), *গুলিস্তানে সা'দী* (তেহরান: এন্তেশারাতে ইরান, মেহের ১৩৮০ হি.শা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

১৪ গোলাম হোসেন ইউসুফী (সম্পাদিত)*, বুস্তানে সা'দী* (তেহরান: এন্তেশারাতে খাওয়ারেজমী, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৯ হি.শা.), পৃ-১২৩-১২৪।

১৫ ড. আলোক রায় (সম্পা), *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ* (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪), পৃ-৫৪৭।

১৬ দিওয়ানে পারভীন এ'তেসামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭।

১৭ গোলাম হোসেন সাদরী আফসার, *ফারহাঙ্গে ফারসিয়ে এমরুয* (তেহরান: মোয়াসসেসেয়ে নুশরে কালামাহ্, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৩ হি.শা.), পৃ. ৭৯০।

১৮ Dr. A E Affifi, *The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi* (Pakistan: Lahore, Sh. Muhammad Ashraf), p. 171.

১৯ মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি, *মাসনাভীয়ে মা'নাভী*, ১ম খণ্ড, বেইত নং ১৫৩০-১৫৩১, পৃ. ২৩৯।

২০ *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরী* (*আসরারে খুদী* অংশ) , পূর্বেক্তি, পৃ. ১৯।

২১ নূর হোসেন মজিদী, *বাংলাদেশে ফারসি চর্চা*, আঞ্জুমানে ফারসি বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন স্মারক (ঢাকা: আঞ্জুমানে ফারসি বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৩৫।

২২ আব্দুল আযীম খান গারীব গুরগানী (সম্পাদিত), *গুলিস্তানে সা'দী* , পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

২৩ মোহাম্মদ আলী ফরুগী (সম্পাদিত), *কুল্লিয়াতে সা'দী*,(তেহরান: এনতেশারাতে রামীন, ১৩৬৭ হি. শা.), পৃ. ২৪৪।

২৪ সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার, জীবনী গ্রন্থমালা*, ২১শ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৩।

২৫ মির্যা আব্দুল আযীম খান গারীব গুরগানী (সম্মা.), *গুলিস্তানে সা'দী* , পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৭।

২৬ সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার, জীবনী গ্রন্থমালা* ,২১শ খন্ড পূর্বোক্ত, পৃ-৭৩।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

The Psychological Struggle of Women in Iranian Film: A Theoretical Analysis

Dr. Md. Mumit Al Rashid*
Md. Kamal Hossain*

Abstract: Iranian women are contributing to the key issues of any social change and challenges in their country, despite the various restrictions imposed on them. Most outsiders assume that since Iran is a conservative country, Iranian women are naturally thousand times behind in filmmaking. As Iran is a developing country, women are still a minority, not just in art and culture; but also in politics and economics. Men, rather than women, make important decisions in their society. Though this is not entirely accurate, Iranian women do have some limitations. Nevertheless, history tells us that the women of Iran are more aware of the realities of their country. They look deeper into the future and they try to rediscover the course of history. But being conservative does not mean practising bigotry. As a result, with the rise of the new genre of filmmaking, a record number of graduates are coming out every year from the film schools located in present day Iran. On Average, more than 20 of these graduates make new films each year and many of them have women producers. They want to retain their culture and present it through art. This approach has been a great success for Iranian films. Most of the works have been done by women and they have been making honourable contributions. Iranian women today have a long way to go before they can achieve complete success. In this article, I will try to give a brief theoretical analysis on the general attitude towards women in Iranian film, barriers to entry in the film industry, psychological struggle, external engagement in society, religious perspective and the position of Iranian women in the global context.

সূচক শব্দ: ইরানি চলচ্চিত্র, ইসলামি বিপ্লব, নারী স্বাধীনতা, নারী নির্মাতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা।

ভূমিকা

ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় ইরানের সিনেমা মূলত দুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে- ইসলামি বিপ্লব পূর্ব যুগ ও বিপ্লব পরবর্তী যুগ। ইরানি সিনেমায় নারীর প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তনগুলো সন্ধান করা, নারীর আত্মোপলব্ধির সূচনা পরীক্ষা করার মতো। এই সূচনার যাত্রাটি ৪টি ধাপে বিভক্ত করা যেতে পারে-
এই চারটি পর্যায়ের বিকাশে মূলত গত ৬ দশকে নারীর অবস্থান এবং তাদের জীবনযাত্রার অবস্থার বিবর্তনকে বিশেষভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই দশকগুলোতে ধীরে ধীরে নির্বাচিত ইরানি চলচ্চিত্রগুলোতে নারীর নিত্য সংগ্রামের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। ইরানের চলচ্চিত্রগুলোতে প্রায়শই নারীদের জীবন নিয়ে প্রামাণ্যধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, ইরানের সিনেমায় নারীদের প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তনটি ফিচার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নারী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রবেশের সাথে মিল রেখে ১৯৮০-এর দশকের শেষদিকে শুরু হয়েছিল। ১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে, নারীরা "সচেতনতার" পর্যায়ে প্রবেশ করেছিলেন। বাস্তবচিত্র জীবনে নারীরা বিপ্লবে বড় একটি অবদান রেখেছিলেন এবং তা সত্ত্বেও তাদেরকে সামাজিক মর্যাদা ধরে রাখতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যেতে হয়েছে। সেই থেকে ১৯৮০-এর দশকের শেষের সেই প্রচেষ্টা ও পরিবেশটি শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল এবং নারী পরিচালকরা ধীরে ধীরে ফিচার ফিল্ম বানাতে শুরু করেছিলেন। তাদের লেন্সগুলো আরও সরাসরি নারী বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানকে নির্দেশ করে।

---

* Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Dhaka, Bangladesh
* Part-Time Teacher, Institute of Modern Languages, University of Dhaka, Bangladesh

পরবর্তী পর্যায়ে, নারীরা একটি কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার গতি অর্জন করেছিল। যেমন যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক কষ্টে নারীরা কেবল তাদের পুরুষদের নিষ্ক্রীয় সমর্থক হিসেবে বসে থাকেন নি; বরং তারা তাদের পুরুষদের অনুপস্থিতিতে নিজেরাই জীবন্ত আখ্যান হয়ে উঠেছিলেন। যেহেতু পুরুষরা যুদ্ধে ছিলেন বা কেবলমাত্র তারা নিজেরাই তাদের পরিবারকে চালিয়ে নিতে অক্ষম ছিলেন, তাই নারীর ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরিবারের ভবিষ্যত গঠনে ঠিক যেমন সহায়তা দরকার ছিল ঠিক সেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

অবশেষে, বাস্তবায়নের এই যাত্রা তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছেছে: নারীরা সমতায়নের জায়গায় আরও বেশি গুরুত্ব চেয়েছেন। যে নারীরা তাদের পরিবারে অভাবের সময় সবকিছু বাজী রেখেছিলেন, তারা দেখতে পেয়েছিলেন যে সমস্যাগুলো শেষ হওয়ার পর তাদের উপযুক্ত অবস্থানের বা সংগ্রামের বাস্তবসম্মত মর্যাদা পাননি এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনেকেই মূল্যবোধগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করেছিলেন। ফলাফল হিসাবে, নারীরা আত্মিক উপলব্ধি থেকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তাদের এতটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে দেখা গেছে যে, কেবল তাদের সংজ্ঞার মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট গতিতে বেঁধে রাখা সম্ভব হয়নি, দেখা গেছে তাদের অগ্রগতিতে আর কোনো পুরুষের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না; বরং তারা এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, তাদের মুক্ত ও স্বাধীন চিত্রনাট্য নির্মাণে, পরিচালনায়, প্রযোজনায় তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বা অতি রক্ষণশীলরা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইরানি চলচ্চিত্রের জন্য অনেক দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করার পথে এগিয়ে দিয়েছিল।

ইরানি চলচ্চিত্রের সূচনা ও বিকাশে নারীর অবস্থান

ইরানে সিনেমার প্রবেশ কাজার বংশের শাসনামলে। বাদশাহ মোজাফফর উদ্দিন শাহের আদেশে মির্জা ইবরাহিম আক্কাছবাশি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স থেকে প্রথম সিনেমাটোগ্রাফ কিনে নিয়ে আসেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সিনেমা হল স্থাপিত হলেও ঐ বছরই প্রথম জনসাধারণের জন্য সিনেমা হল উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রথম দিকে ইরানে পশ্চিমা সিনেমা আমদানি করে ফারসি সাবটাইটেল ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকদের সিনেমা দেখার তৃষ্ণা মেটানো হত। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ওভান্স ওগানিয়ান্সের হাত ধরে ইরানে প্রথম ফিচার ফিল্ম **'অবি ওয়া রবি'** নির্মিত হয়; যদিও চলচ্চিত্রটি ছিল নির্বাক। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে চিত্রশিল্পী ও উপন্যাসিক আব্দুল হুসাইন সাপান্তার হাত ধরে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র **দোখতারে লোর** (ভিন্ন নাম **জাফর ও গোলনার**) নির্মিত হয়। অসাধারণ জনপ্রিয় এই চলচ্চিত্রটি ভারতের মাটিতে শ্যুটিং হয়। এই সিনেমার বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় বানিজ্যিক রোমান্টিক কাহিনীর বিন্যাস!

এই চলচ্চিত্রটি ইরানের সিনেমা জগতকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু পরবর্তীতে বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি দর্শককে একঘেয়েমির বেড়াজালে বন্দি করে। সামগ্রিকভাবে ঐ সময় থেকে একেবারে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত নারীকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, নারী হচ্ছে কোথাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, দেহপসারিণী, ক্লাবের নর্তকী, রাস্তার ভবঘুরে, ছিঁচকে চোর, পকেটমার এবং গ্রামের প্রতারিত ইত্যাদি যাবতীয় নেতিবাচক বিশেষণের অধিকারী। অথচ তৎকালীন ইরানের বাস্তবচিত্র তার নিরিখে এর কোন ভিত্তি নেই। হয়তো শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে সিনেমাকে তুলে ধরার প্রাণান্তকর চেষ্টার বহিঃপ্রকাশ। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, **মারজান** চলচ্চিত্র দিয়ে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শাহলা রিয়াহি প্রথম নারী নির্মাতা হিসেবে ইরানের চলচ্চিত্র অঙ্গনে পা রাখেন। তাঁর নির্মিত **মারজান** চলচ্চিত্র সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন: **মারজান** ইরানি চলচ্চিত্র অঙ্গনের একটি প্রথম দিকের নমুনা, যেখানে ইরানের গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপট ও অনুভূতিপ্রবণ দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ঐ সময় পর্যন্ত প্রায় সবগুলো চলচ্চিত্র নাচ, গান, অ্যাকশন নির্ভর ছিল... কিন্তু মারজান দর্শকের চিন্তার খোরাককে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করার জায়গাটিকে নতুনভাবে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

ষাটের দশকের শেষ দিকে এসে ইরানের চলচ্চিত্র নতুন ঢেউয়ের মুখোমুখি হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত **কায়সার** চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে। এ সময়টিতে চলচ্চিত্র যে আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়, তা 'জাহেলি যুগ' (মূর্খতার যুগ) নামে পরিচিত। এ সিনেমায় নারীর ভূমিকা বাদ দেওয়া হয়। এ সময়ের চলচ্চিত্রগুলোতে নারীর

স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্রিকতাকে ন্যূনতম বাহানায় গলাটিপে হত্যা করা হয় এবং কাপুরুষোচিত চরিত্রে ব্যবহার করা হয়।

ইরানের ইসলামি বিপ্লব পরবর্তী সাময়িক অস্থিরতা ও ঐ সময়ের সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা, সিনেমা শিল্পকে পুরোপুরি স্থবির করে দেয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে 'বিষাদগ্রস্ততার যুগ' নামকরণ করা হয়।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'বুনিয়াদে সিনেমায়ে ফারাবি' ও 'হোওযে হোনারি সযেমানে তাবলিগাতে ইসলামি' যাত্রা শুরু করে। মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি মুল্যবোধ ও সংস্কৃতি বিকাশে নতুন ধারার প্রবর্তন। এর ফলে এই দশকে ইরানের সিনেমায় নারীর অভিনয়ের পথ সংকুচিত হয়ে গেল। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ফারসি অজার মাসে 'মিনিস্ট্রি অফ কালচার অ্যান্ড ইসলামিক গাইডেন্স' এর অধীনে চিত্রনাট্য কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশন চিত্রনাট্যে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করে দেয়, এতে রক্ষণশীল নারীর একটি চিত্রকল্প তুলে ধরা হল, যেখানে নারী চরিত্রটি গ্রামের সহজ-সরল ভূমিকায় থাকবে, যার কোন পেশা ও সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকবে না। এ যুগে আমরা কোন সিনেমায়-ই দেখিনা যে, একজন নারী আধুনিক, সুশিক্ষিত ও খ্যাতিমান পেশায় নিয়োজিত অথবা একজন শিক্ষিত মা অথবা এমন একজন নারী, যিনি কিনা নিজেকে পরিবার ও নিজের স্বামীর জন্য উৎসর্গ করেছেন! ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে শুধুমাত্র একটি সিনেমায় একজন নারীকে শিক্ষকের চরিত্রে এবং ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে একজন নারীকে চিকিৎসকের চরিত্রে অভিনয়ে দেখা যায়। তবে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৭৫ টি চলচ্চিত্রের কোনটিতেই পেশাজীবী কোন নারী চরিত্রের দেখা মেলে না। এ সময়ে ইসলামি বিপ্লবের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির রেষারেষিতে অসংখ্য পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী দেশান্তরিত হন। তবে ইরানের সিনেমা জগতে ইসলামি ও সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন চলচ্চিত্রের উন্মেষ ঘটে।

এ সময়ে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ফজর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সূচনা, পরবর্তীতে এটি মধ্যপ্রাচ্যের কান চলচ্চিত্র উৎসব নামে খ্যাতি লাভ করে! আশির দশকে ইরানি চলচ্চিত্রে নারীকে এমনভাবে আড়াল করে রাখা হলো যে, চতুর্থ ও পঞ্চম ফজর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা নারী অভিনেত্রীর পুরস্কার পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়।

তবে ১৯৮৮ পরবর্তী ইরাক-ইরান যুদ্ধের সামাজিক ও মানসিক বিজয়ের আত্মতৃপ্তি নিয়ে ইরানের সিনেমা নতুন আঙ্গিকে যাত্রা শুরু করে; যেখানে নারী পরিচালকগণ সামাজিক বিষয়াবলী নিয়ে নানা মাত্রিক কাজে যুক্ত হন। বিশেষতঃ রাখশান বানি এতেমাদ, পৌরান দেরাখশান্দেহ, তাহমিনে মিলানি, মারজিয়ে বোরুমান্দ, ফারিয়াল বেহযাদ-এর মত পরিচালকবৃন্দ এ সময়ে শিল্প নৈপুণ্যে ইরানি সিনেমাকে বৈশ্বিক মাত্রা দান করেন। অপরদিকে ফাতেমেহ মোতামেদ ওড়িয়া, গোওহার খেইর আন্দিশ, ফারিমাহ ফারজামির মত অভিনেত্রীবৃন্দ ইরানের চলচ্চিত্রে নতুনত্ব নিয়ে হাজির হন এবং নারীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন।

এ সময়ে ইরানের সিনেমা জগতকে প্রাণ দান করে মূলতঃ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেমা স্টাডিজ বিভাগ ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলো। যেখান থেকে অসংখ্য অভিজ্ঞ টেকনেশিয়ান, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও অভিনেতা-অভিনেত্রী উঠে আসেন। মোহসেন মখমলবাফ, রসুল সাদরে অমেলি ও রসুল মোল্লা কলিপুরের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আগমনে নারীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র বিশেষতঃ প্রেমঘটিত বিষয়াবলী নিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এ সময়ের অন্যতম একজন লেখক হচ্ছেন দারিয়ুশ মেহেরজুই, যিনি পরবর্তীতে নারী বিষয়ক চলচ্চিত্র **বানু** (১৯৯২ খ্রি), **সারা** (১৯৯৩ খ্রি), পরী (১৯৯৫ খ্রি) নির্মাণ করে বোদ্ধামহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেন। এছাড়া নারী পরিচালক রাখশান বানি এতেমাদ নির্মাণ করেন নারী ঘরানার অনবদ্য চলচ্চিত্র **নারগেস** (১৯৯২ খ্রি), রুসারি অবি (The Blue-Veiled, ১৯৯৫ খ্রি), **বানুয়ে ওরদিবেহেশত** (The May Lady, নির্মাণ ১৯৯৯ খ্রি), **যিরে পুছে্ত শাহ্র** (Under the Skin of the City, নির্মাণ ২০০১ খ্রি)। তিনি নব্বই দশক ও বিংশ শতকের অন্যতম একজন নারী নির্মাতা, যিনি উপরোক্ত চলচ্চিত্রগুলো দ্বারা ইরানের সিনেমাকে দেশ-বিদেশে নারীর প্রতিনিধিত্বের জায়গা নতুন করে লিখিয়েছেন। **বানুয়ে ওরদিবেহেশত**

চলচ্চিত্রে আমরা দেখি একজন বিধবা যুবতী নারীর প্রেম, যা প্রতিটি দর্শকের মধ্যে উপলব্ধির নতুন জায়গা তৈরি করেছে। কেননা ঐ সময় পর্যন্ত মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নারীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য দ্বিতীয় বিয়ের প্রথাগত ধারণা চালু ছিল। এই চলচ্চিত্রে নারী সুশিক্ষিত, একজন লেখক ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার ছোঁয়ায় আলোকিত।

মজার বিষয় হল- বিগত দুই দশকের হিসাব অনুসারে পশ্চিমা দেশগুলোর চেয়ে ইরানের নারী নির্দেশকের শতকরা হার বেশি। এক্ষেত্রে অগ্রপথিকের ভূমিকায় আছেন রাখসান বানি এতেমাদ। একাধারে তিনি যেমন লেখিকা, ঠিক তেমনি নির্দেশক এবং সমগ্র ইরানে তিনি সবচাইতে বেশি জনপ্রিয় নারী চলচ্চিত্রকার। তাকে বলা হয়, ইরানি চলচ্চিত্রের বিগ স্টেটস উইমেন।

ইরানের নারী মতবাদের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে যিনি সবচাইতে বেশি নারীবাদী চলচ্চিত্র নির্মাণ ও নারী অধিকার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাহমিনে মিলানি। এ সময়ে তাঁর আবির্ভাবে ইরানের নারীবাদী চলচ্চিত্র নতুন এক মাত্রা পায়। বিশেষতঃ তাঁর চিত্রনাট্যে অন্যান্য নারী নির্মাতাদের চাইতে বেশি দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরুষের আধিপত্য ও জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র **বাচ্চেহায়ে তালাক** (১৯৮৯ খ্রি.), যেখানে আমরা দেখি পরিবারের পুরুষ লোকটি একজন পিতা, যিনি খুব বেশি বদমেজাজি ও রাগী এবং বাচ্চাদের প্রতিনিয়ত প্রহার করেন। অন্যদিকে **'দিগে চে খাবার'** (১৯৯১ খ্রি.) একটি হাস্য-রসাত্মক পারিবারিক চলচ্চিত্র, এই চলচ্চিত্রের শক্তিমান ও মূল চরিত্র হচ্ছে একজন উদার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মেয়ে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্রী। সে কল্পনার রাজ্যে বসবাস করে; কিন্তু তাকে সকল মেয়েদের প্রতিনিধি বলা যায় না, কেননা সে চিরায়ত প্রথার বিরুদ্ধেলড়াই করে না, চলচ্চিত্রটির শেষাংশে আমরা দেখতে পাই, সচরাচর সব গল্পের মত দরিদ্র মেয়ের সঙ্গে বড়লোক পুত্রের প্রেমের চিরচেনা সেই গল্পের অবতারণা! মিলানির অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে **দু যান** (১৯৯৮ খ্রি), **নিমে পেনহান** (২০০০ খ্রি), **শাবহায়ে তেহরান** (২০০০ খ্রি), **ভা' কোনেশে পাঞ্জুম** (২০০২ খ্রি) নারীকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে, যেখানে নারীর এমন প্রতিচ্ছবি অংকন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি নারী শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে নেই, অত্যন্ত সম্মানিত পেশায় যুক্ত এবং চলনে-বলনে স্পষ্টতঃ আধুনিকতার প্রতিচ্ছবি।

এ সময়ের আরও একটি অনবদ্য চলচ্চিত্র **ক্বেরমেয** (১৯৯৮ খ্রি), নির্মাতা ফারিদুন জিরানির এই চলচ্চিত্রটি **১৯৯৯** খ্রিস্টাব্দে সবচাইতে বেশি ব্যবসা সফল হয়। নারীবাদী ধারায় পরিবর্তনের প্রথম শ্লোগান বলা যেতে পারে এই চলচ্চিত্রটি। এখানে মূল চরিত্র নারী, যার স্বামী সাইকোসিস রোগে আক্রান্ত, যাকে পরবর্তীতে হত্যা করতে বাধ্য হয়। আমরা জিরানির আরও একটি চলচ্চিত্র **অব ওয়া অতাশ** (২০০০ খ্রি)-এ দেখতে পাই নারীর সামাজিক বিধি-নিষেধের চিত্র, যা ইসলামি বিপ্লবের পর নির্মাণ ও সেন্সরবোর্ড থেকে ছাড়পত্র পাওয়া একটি বিরল ঘটনাই বলা যেতে পারে! এখানে অবশ্য নারীকে আমরা উদার দৃষ্টি সম্পন্ন এবং একজন কবির ভূমিকায় দেখতে পাই, তবে শেষ দৃশ্যে গল্পের মূল চরিত্র নারী পুরুষের হিংস্রতার বলী হয়ে মারা যান।

পরের বছরগুলোতে আমরা দারিয়ুশ মেহেরজুইয়ের **লায়লা** (১৯৯৬ খ্রি), পৌরান দেখাশান্দে-এর **হিস! দোখতার হা' ফারিয়াদ নেমি যানাদ** (২০১৩ খ্রি), তাহমিনে মিলানির **মেল্লি ওয়া রা'হ হায়ে নারাফতে আশ** (২০১৬ খ্রি), পৌরান দেখাশান্দে-এর **যিরে সাকৃফে দুদি** (২০১৬ খ্রি) চলচ্চিত্রগুলোতে নারীর ভেতরকার ব্যথা, বেদনা, অস্পর্শ হাহাকার, অনুভূতির তীব্র যাতনা, না পাওয়ার কান্না, নারীর প্রতি পুরুষের অহেতুক সন্দেহ, দ্বিধা-সংশয়, পুরুষের মন জয়, নিজের ভালোবাসা ও স্বপ্নের পুরুষটিকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার মত কাহিনী দর্শকের হৃদয়ে গভীর উপলব্ধির জায়গা তৈরি করে।

উল্লেখ্য যে, **১৯৭৯** সালে সংগঠিত ইসলামি বিপ্লবের পর, নারীরা সরকারের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন, বিশেষত নারী শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীগণ, তবে **১৯৯৫-২০০৩** সালের মধ্যে, বেশ কয়েকজন ইরানি অভিনেত্রী **অদাম বারফি, শোকারান**সহ আরও বেশকিছু শৈল্পিক চলচ্চিত্রে অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য দ্বারা বক্স অফিস সুপারহিটে দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন! এছাড়া আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের চলচ্চিত্র

উৎসবগুলোতেও দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছিল, যেমন- রসুল সাদরে অমেলি পরিচালিত **দ্যা গার্ল ইন দ্য স্নিকার্স** (১৯৯৯ খ্রি), আসগর ফরহাদি পরিচালিত **অ্যাবাউট এলি**। অবশ্য আব্বাস কিয়রোস্তামির চলচ্চিত্রগুলো এর পূর্বেই চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের মন জয় করে নিয়েছিল।

সুতরাং ধীরে ধীরে নারীরা ক্যামেরার সামনে এবং পেছনে চলচ্চিত্র শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ পেশাদার শিল্পী হিসাবে নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণ করলেন। তারা শুধু একজন অভিনেত্রী হিসেবেই নয়; বরং একজন দক্ষ পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবেও নিজেদের কর্মদক্ষতা দেখালেন।

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানের প্রথম নারী পরিচালক হিসেবে পৌরান দেরাখশানদেহ আবির্ভূত হন। অবশ্য বিপ্লবের পূর্বেও তিনি বেশ কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন, তাঁর প্রথম ফিকশনধর্মী চলচ্চিত্র **দ্যা রিলেশনশিপ** (সম্পর্ক) ১৯৮৬ সালে মুক্তি পায়। দেরখশানদেহ-এর প্রথম চলচ্চিত্রটিতে আমরা ইরানি চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় এক অজানা বিশ্বকে তুলে ধরার প্রয়াস দেখতে পাই। চলচ্চিত্রটিতে একজন পরিচালক পরিবার ও সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুর যোগাযোগ সমস্যা, প্রতিকার ও সমাধানের চেষ্টা করেন। ২০১৩ সালে তিনি পরিচালনা করেছিলেন **হুশ! গার্লস ডোন্ট স্ক্রিম** (হুশ! মেয়েরা চিৎকার করে না)। চলচ্চিত্রটি নারী প্রতিনিধিত্বের একটি স্পষ্ট উদাহরণ, যেখানে মেয়েদের ওপর যৌন নির্যাতন ও হয়রানির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

আবার সামিরা মখমলবাফ মাত্র ১৭ বছর বয়সে নির্মাণ করে ফেললেন চলচ্চিত্র **'দ্যা অ্যাপেল'** (১৯৯৮ খ্রি)। তাঁর দ্বিতীয় চলচ্চিত্র **'দ্যা ব্লাকবোর্ড'** (২০০০ খ্রি) নির্মাণ ছিল নিঃসন্দেহে একটি ইতিহাস। দ্বিতীয় চলচ্চিত্রটি সামিরা মখমলবাফকে পরিচালক হিসেবে পাইয়ে দেয় কান জুরি অ্যাওয়ার্ড। গত ৯০ বছরের ইরানের সিনেমা ইতিহাসে ৪০ জন নারী চলচ্চিত্রকারের দেখা মেলে। তবে বর্তমান সময়ের সাড়া জাগানো নারী চলচ্চিত্রকার হচ্ছেন নার্গিস অবইয়ার। তিনি ইতিমধ্যেই নারী-পুরুষ মিলিয়ে ইরানের সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিচালক হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন। কেননা, তার সর্বশেষ ছবি **"শাবি কে মা'হ কা'মেল শোদ (Night of the full Moon)"** এখনও পর্যন্ত ইরানের সবচাইতে বেশি ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইরানি চলচ্চিত্রে এখনও পর্যন্ত যেসব নারী পরিচালক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- সামিরা মখমলবাফ, রাখসান বানি এতেমাদ, পৌরান দেরাখশানদেহ, তাহমিনে মিলানি, ফররোগে ফররোখযাদ, নিকি কারিমি, মরিয়ম কেশাভার্জ, নার্গিস অবইয়ার। অন্যদিকে বড় পর্দা ও ছোট পর্দা মিলিয়ে অসাধারণ সব অভিনেত্রী ইরানের সিনেমা জগতকে বিশ্ব দরবারে দারুণভাবে রাঙিয়ে দিয়েছেন।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইরানি চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নারীরা তাদের দেশের বাস্তবচিত্র তুলে ধরতে চাইছেন, তাই তারা বিশদ আকারে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে আগ্রহী, তারা প্রতিটি সুক্ষ্ম ও সমস্যাযুক্ত বিষয়গুলোকে আরও গভীরভাবে দেখেন। তাদের জন্য সিনেমা হল জানালা, যা তাদের দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য উন্মুক্ত ও অবারিত দ্বার। তারা সমস্যাগুলো দৃশ্যমান করে সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন এবং তারা চাইছেন দর্শক সেই সমস্যার প্রতি গভীর দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সমাধানগুলো সন্ধান করবেন।

অবশ্যই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে প্রচুর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তবে তারা স্বেচ্ছায় কাজ করছেন, তারা দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, পুরুষ যা কিছু করতে পারে, নারীরাও তা করতে সক্ষম, কিছুটা কঠিন তবে অবশ্যই সম্ভব। ইদানিংকার সিনেমা শ্যুটিং স্পটে গেলে মেয়েদের সেক্টরে উপস্থিতি বেশ প্রাণবন্ত ও আশা জাগানিয়া মনে হবে।

সুতরাং নারী শিল্পীরা মা-বোন-স্ত্রী হিসেবে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রজন্মের এই প্রয়াস বিশেষত পরিবার, সমাজ এবং সরকারের সাথে যে মানসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেখানে তাদের প্রমাণের জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা দেখা যায়।

লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীর সমতায়নে ইরানি চলচ্চিত্র

ইরান সমাজ বিশ্বের বহু দেশের বহু সমাজের মতো এখনও জেন্ডার সাম্যের জন্য লড়াই করে চলেছে; তাই লিঙ্গ এবং যৌনতার দৃশ্যধারণ বা উপস্থাপন- যার মধ্যে সিনেমা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে- যাকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উপস্থিতি হিসেবে ধরে নেয়া যায়। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, অন্যান্য সংস্কৃতিজাত পণ্যের ন্যায় ইরানি সিনেমাও রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। আধুনিকতার সাথে ইরানি জনগণের মুখোমুখি হওয়ার চিত্র হিসেবে বিভিন্ন ধরণের নান্দনিক অভিব্যক্তি এবং বিভিন্ন উপস্থাপনা তাদের চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে। এই নতুন সিনেমা যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে নিঃসন্দেহে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। নারীরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যোগদান করছেন, উভয়ই চলচ্চিত্র পরিচালনা করছেন এবং বিভিন্ন মঞ্চের, বিশেষতঃ ক্যামেরার সামনে ও পেছনে সমান্তরাল ভূমিকা পালন করছেন। নতুন অভিনেত্রীরা কেবল স্বশরীরে হাজিরই নয়; বরং শিল্প ও দৈনিক সমালোচনামূলক বাস্তবচিত্র তার বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন পরিচালক, প্রযোজক, প্রযুক্তিবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা যে বিপ্লব-পরবর্তী জাতীয় মানসপটে কল্পিত ইরানের সিনেমায় নারীর সাথে যে সংঘর্ষ ঘটেছে, তা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছে।

উপসংহার

যে সকল নারী নির্মাতা পথচলার একেবারে শুরুতে প্রামাণ্যচিত্র বা ফিচার ফিল্ম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তারা স্পষ্টতই নিজেদের নিজস্ব একটি মাত্রা তুলে ধরতে চান সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির কাছে। কেননা সেখানে এই নবীন নারী নির্মাতারা একটা কিছু প্রমাণের তাগিদ তৈরি করেন। বর্তমানের ইরানি নারী নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা চলচ্চিত্রের ভবিষ্যতটি নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে নারীদের কার্যকর ভূমিকা থাকবে বলেও প্রচন্ড আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তাদের ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, ইরানি চলচ্চিত্রকে এই প্রজন্মের নারীরা সম্মিলিতভাবে আরও উন্নত স্থানে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. বাহার লু, আব্বাস (২০০০): *তারিখে তাহলিলি সাদ সা'লেগি সিনেমায়ে ইরান*, তেহরান: এনতেশারাতে পাজুহেশহায়ে ফারহাঙ্গি।

২. যান ওয়া সিনেমা (২০০০): *মাজমুয়ে মাক্বালাতে হামায়েশে যান ভা সিনেমা*, তেহরান: এনতেশারাতে সাফিরে সোবহ্।

৩. সাদ্র, হামিদ রেযা (২০০২ খ্রি): *দার অমাদি বার তারিখে সিয়াসি সিনেমায়ে ইরান* ১৯০১-২০০১ খ্রি. তেহরান: নাশরে নেই।

৪. মেহরা'বি, মাসুদ (১৩৭১ সৌরবর্ষ): *তা'রিখে সিনিমায়ে ইরান*, তেহরান: মাহনামে ফিল্ম।

৫. উমিদ, জামাল (১৩৭৪ সৌরবর্ষ): *তা'রিখে সিনিমায়ে ইরান*, তেহরান: রুযানে।

৬. কুণ্ডু, অপূর্ব কুমার (২০০৯): *ইরানী চলচ্চিত্র*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

৭. ইসলাম, উদিসা (২০১২): *ইরানী চলচ্চিত্র: ১০ নারী নির্মাতা*, ঢাকা: ভাষাচিত্র প্রকাশনী।

৮. হায়দারি, গোলাম (১৩৬৮ সৌরবর্ষ): *নাকদ নেভিসি দার সিনামায়ে ইরান*, তেহরান: অ'গাহ।

৯. শায়ায়ি, হামিদ (১৩৫৪ সৌরবর্ষ): *ফারহাঙ্গে সিনামায়ে ইরান*, তেহরান: হারমিনকো।

১০. নেযাদ, মুহাম্মদ তাহামি (১৩৬৫ সৌরবর্ষ): *সিনেমায়ে রুয়েপারদাযে ইরান*, তেহরান: পাযমান।

১১. নেযাদ, মুহাম্মদ তাহামি (১৩৮০ সৌরবর্ষ): *সিনেমায়ে ইরান*, তেহরান: দাফতারে পাযুহেশগাহে ফারহাঙ্গি।

১২. Bahar, M (2012): Religious identity and mass media, the situation of women in Iraniabn following the Islamic revolution.

১৩. https://www.youtube.com/watch?v=jomX8k1JiuI

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

فرهنگ عامه بنگلادش

(Popular Culture of Bangladesh)

Dr. Md. Noor e Alam*

Abstract: Popular culture embodies and embraces the social heritage of any human society. Popular culture is an important part of human life. The study of popular culture in European countries and, then, in the United States began in the eighteenth century. Popular culture or civilization combines a complex set of knowledge, beliefs, arts, ethics, laws, practices and any other power acquired by a person as a member of the society. The status of culture among different human societies is subject to some universal standards based on several general principles. Throughout their lives, people in human society have found appropriate ways to respond to their needs that have been exploited by their contemporaries and future generations. Human culture is a history of human struggle with nature and with indigenous and non-indigenous groups. Folk culture is a set of habits, customs and ways of life of people. Familiarity with Bangladeshi folk culture provides us with a sea of information and awareness. Bangladeshi folk culture is very valuable. To value human culture is to respect it because they are not different from their culture. It is their culture that builds and evaluates them. Bangladesh has a rich, diverse culture. Its architecture, dance, literature, music, painting and costume reflect its deeply rooted heritage. The culture and history of the three primary religions of Bangladesh (Hinduism, Buddhism and Islam) have greatly influenced the people. The popular culture of any nation has characteristics and themes that cause social distinction from other societies. At the same time, popular culture also considers human correlations. In this article, I will try to discuss the important aspects of Bengali folk culture.
Keywords: Bangladesh, popular culture, tradition, influence, consciousness.

مقدمه :

فرهنگ رفتار اكتسابي افراد است. فرهنگ عبارت است از مجموع انديشه‌ها، ارزش-ها، آداب و رسوم، هنرها، قوانين، اعمال و عادات انسان و همه آفريده‌هاي آن. (هاشمي، ۱۹۸۵ : ۵۵) فرهنگ بنگلادش به معناي ادبيات، رقص، موسيقي، آداب و رسوم غذا، لباس، جشنواره‌ها وغيره مردم است. بنگالي‌ها صدها سال تاريخ و سنت دارند. فرهنگ بنگالي به دليل ويژگي‌هاي فردي، در خود بزرگ‌نمايي مي‌درخشد. بنگلادش يكي از كشورهاي داراي فرهنگ غني در جهان است. فرهنگ بنگلادش عميقاً با فرهنگ منطقه بنگال در هم آميخته است. اساساً فرهنگ بنگالي به معناي فرهنگ بنگلادش است. اين در طول قرن‌ها تكامل يافته است و تنوع فرهنگي گروه-هاي اجتماعي مختلف در بنگلادش را در بر مي‌گيرد. اوايل قرن هجدهم نويسندگان مشهور، مقدسين، نويسندگان، دانشمندان، محققان، متفكران، آهنگسازان موسيقي، نقاشان، فيلمسازان، نقش مهمي در توسعه فرهنگ بنگالي ايفا كردند. حقوق بشر مهمترين بخش فرهنگ بنگالي است. نقش مهمي در توسعه فرهنگ بنگالي ايفا مي‌كند.

---

* Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Chittagong, Bangladesh.

فرهنگ تركيبي بنگلادش قرن‌ها متاثر از اسلام، هندو، بوديسم و مسيحيت بوده است. به اشكال مختلف از جمله موسيقي، رقص، نمايش خود را نشان داده است. در آغاز سال ۱۹۲٦م « انجمن ادبي مسلمانان» با ايدئولوژي رهايي عقل در منطقه رمنا شهر داكا تشكيل شد. اين نهاد نقش مهمي در توسعه فرهنگ مسلمانان بنگال دارد. نفوذ بشر دوستانه ليبرال بر مسلمانان «انجمن ادبي مسلمانان» حدود ۱۲ سال دوام آورد.(چودوري، ۲۰۱٤ : ٦-۷) كار خلاق انسان (ادبيات، هنر، فلسفه، رفتار اجتماعي و سياست) نيز فرهنگ محسوب مي‌شود. اما آفريده‌هاي مالي و فني انسان و محصولات او، ابزار توليد، كارخانه‌ها، منابع مادي ساخته شده و آثار تاريخي نيز بايد به عنوان فرهنگ در جامعه بشري مورد توجه قرار گيرد. (چودوري، ۲۰۰۹: ۱۱۷) اين مقاله راه‌هايي براي تقويت جنبه‌هاي مثبت فرهنگ عامه و محافظت در برابر جنبه‌هاي منفي و مخرب را بررسي مي‌كند. همچنين پيشينه فرهنگ بنگلادش؛ تأثير فرهنگ اسلامي در بنگلادش؛ تأثير فرهنگ خارجي بر فرهنگ بنگلادش؛ فرهنگ عامه؛ تأثير فرهنگ عامه در بنگلادش؛ رويدادهاي اجتماعي؛ نتيجه گيري و مراجع و غيره برجسته مي‌شوند.

پيشينه فرهنگي بنگلادش:

تكامل فرهنگي منجر به ظهور بنگلادش مستقل شد. به همان اندازه كه عناصر سياسي و اقتصادي ريشه استقلال بنگلادش بودند، آرزوي استقلال از آگاهي مذهبي، اجتماعي و فرديت قومي بيش از آن تجسم يافت. پس از شكست انگليسي‌ها در نبرد توطئه آميز پالاشي در سال ۱۷۵۷م، ميل به استقلال در بين مسلمانان بنگالي بيدار شد. جنگ آقاي مير قاسم، شورش فقير مجنو شاه، جنبش فرايزه حاجي شريعت الله، مبارزه آزادي حاجي تيتومير، شورش سپوي در سال ۱۸۵۷م، اختلال در سال ۱۹۰۵م، تأسيس اتحاديه مسلمانان «نيكيل بهارات» در داكا در سال ۱۹۰٦م و غيره. آگاهي فردي مذهبي-فرهنگي به عنوان انگيزه اصلي اين حركت طولاني عمل كرده است. دين فرهنگ مردم عادي است و فرهنگ دين تحصيلكردگان و فرهيختگان است. فرهنگ به معناي آگاهي از زندگي بهتر، شناخت زيبايي، شادي و عشق است. مردم عادي آن را از طريق دين دريافت مي‌كنند. پس محروميت از دين به معناي محروميت از فرهنگ است. دين يعني كنترل زندگي است. روشن فكران خود را از طريق فرهنگ كنترل مي‌كنند. نه دستورات بيروني، بلكه غرايز دروني آنها را هدايت مي‌كنند. تحميل سياست خارجي بر آنها مضر است. احساس رفاه آنها را از بين مي‌برد. نام ديگر آگاهي روح است.(چودوري، ۲۰۱٤ : ۱۷) دين انسان‌ها را از گناه و سقوط نجات مي‌دهد اما آنها را توسعه نمي‌دهد. هدف فرهنگ توسعه زندگي است. توسعه بشريت مهم است. نجات از لغزش و افتادن در راه چيز بزرگي نيست. (چودري، ۲۰۱٤: ۱۹)

تأثير فرهنگ اسلامي در بنگلادش:

پس از ورود قهرمان ترک، اختيار الدين محمد بن بختيار خيلجي به بنگال در سال ۱۲۰٤م، اسلام به طور گسترده در اين کشور گسترش يافت. (عبدالله، ۱۹۸۳، ۳۹) نه بختيار خيلجي و نه هيچ يک از حاکمان مسلمان مستقيماً اسلام را در اين کشور تبليغ نکردند. هدف اصلي آنها به دست آوردن دولت و حکومت بر ايالت بود. اما چون حاکم مسلمان است، فضاي مساعدي براي گسترش اسلام در اين کشور ايجاد مي‌شود. با گسترش اسلام، توسعه جامعه و فرهنگ اسلامي شتاب گرفت. پيش از اين، جايي که فرهنگ هندو غالب بود، مذهب و فرهنگ اسلامي يا مسلمان در دوران حکومت مسلمانان غالب شد. مردم اين کشور در گروه‌هايي با الهام از آرمان‌هاي بشردوستانه ليبرال برابري و برادري در اسلام شروع به مسلمان شدن کردند. فرهنگ پر جنب و جوش جديدي در بنگلادش بر اساس آرمان‌هاي بشردوستانه پيشرفته، اصول و ارزش-هاي اجتماعي اسلام و شيوه زندگي مسلمانان پديد آمد. فرهنگ اسلامي بسيار پرنشاط و حيات محور است. در نتيجه، در طول هزاران سال تکامل، شکل يک گروه قومي متمايز را به خود گرفت.

در پانصد سال اول حکومت مسلمانان در بنگال، اسلام به طور گسترده در ميان جمعيت تحت سلطه مسلمانان روستاهاي بنگال در شمال، شرق و جنوب شرق گسترش يافت. جمعيت هندو و بودايي منطقه به دلايل مختلف اجتماعي، مالي و سياسي، به دليل تبليغات و تشويق دراويش صوفي، که توسط سياست‌هاي آزاديخواهانه و حمايت حاکمان مسلمان جذب شده بودند، به تدريج به جمعيت مسلمان‌نشين تبديل شدند. اسلام از راه‌هاي مختلف از عربستان، ايران، ترکستان و شمال هند به بنگال آمد. مذهب مسلمانان روستايي براساس گذشته پيش از اسلام بنا شده است. بنابراين به آن «اسلام عاميانه»، «اسلام مردمي» مي‌گويند. طبيعي است که عناصر داخلي و خارجي با يکديگر ترکيب شده و با يکديگر تعامل دارند و فرهنگ اجتماعي و مذهبي هر منطقه را شکل مي‌دهند. در مورد اسلام در بنگال نيز همين اتفاق افتاد. اسلام در بنگلادش ويژگي‌هاي محلي بسياري را پذيرفته است که ريشه در جوامع پيش از اسلام دارد. در نتيجه اسلام موجوديت بسيار متفاوتي با شکل اوليه خود پيدا کرده است.(چودوري، ۲۰۰۹: ۱۳٦).

تأثير فرهنگ خارجي بر فرهنگ بنگلادش:

فرهنگ مايه حيات يک ملت است. فرهنگ بر اساس آرمان‌ها، ارزش‌ها و سنت‌هاي ملي سرچشمه مي‌گيرد و توسعه مي‌يابد. فرهنگ آينه يک ملت است، بيانگر آرزوهاي ملي، تاريخ-سنت، هنر-ادبيات، ذهن آگاهي، باورهاي حسي، ارزش‌هاي انساني و آداب زيبا است. وظيفه حفظ هويت و ويژگي‌هاي فرهنگي دست نخورده و تلاش براي رسيدن به تعالي آن براي نسل آينده است. در غير اين صورت هويت ملي براي مدتي از بين مي‌رود. وقتي هويت فردي يک ملت از بين مي‌رود، استقلال و کرامت آن ملت

زير سوال مي‌رود. از اين رو پرورش ميراث و فرهنگ ملي، حفظ و تعالي ميراث و فرهنگ ملي از وظايف ضروري ملي محسوب مي‌شود.
در عصر كنوني جهاني شدن، روند بيروني در همه چيز مشاهده مي‌شود. جوهره جهاني شدن دادن و گرفتن بر اساس برابري است. اين در مورد فرهنگ صادق است. با اين حال، فرهنگ بر اساس سنت‌ها، هنجارها و قوميت هر كشور و ملتي ساخته مي‌شود. هيچ ملتي كه به خود احترام مي‌گذارد نمي‌تواند با پذيرش فرهنگ بيگانه موافقت كند، وقتي كه مي‌كوشد پايه‌هاي سنت‌ها و هنجارها و قوميت يک ملت خاص را از بين ببرد. اما در واقعيت، ما آنقدر مردد نيستيم كه فرهنگ بيگانه را تمرين كنيم، بپذيريم، نگه داريم و حتي آن را گرامي بداريم بدون اينكه مثل يک نابينا خوب يا بد را قضاوت كنيم. اين يک گرايش خود ويرانگر و خودفريبي است. بايد از اين گرايش اجتناب كرد. اساس فرهنگ ملي بر اساس آرمان‌ها، تاريخ، سنت‌ها و ارزش‌هاي ملي شكل مي‌گيرد. همانطور كه ارزش‌هاي آرماني ملي قوميت را بر پايه‌اي استوار استوار مي‌كند، فرهنگ ملي كه بر اساس ايمان-تاريخ-سنت خود فرد بنا شده است نيز عزت نفس ملت را تقويت و غني مي‌سازد. از اين آگاهي، اين وظيفه ملي اساسي همه است كه تاريخ و ميراث خود را گرامي بداريم و فرهنگ باشكوهي را كه بر اساس آن بنا شده است، تمرين كنيم و توسعه دهيم. هميشه بايد توجه داشت كه فرهنگ بد و سايه آرمان‌هاي بيگانه هرگز نمي‌تواند بر فرهنگ ملي تأثير بگذارد. تنها ايمان قوي به آرمان‌ها - سنت و ارزش‌هاي خود مي‌تواند از گسترش اين سايه جلوگيري كند.(چودوري، ٢٠١٤ : ٢٧)

فرهنگ عامه:

فرهنگ در لغت به معناي ادب، آموزش و دانش است.(معين، ١٣٧١: ٢٥٣٨) فرهنگ در متن زندگي جريان دارد. سايه يا پرتو بالاترين دانش در فرهنگ عامه وجود دارد.(تميمداري، ١٣٩٠: ٢) فرهنگ عامه به مجموعه عناصر فرهنگي اطلاق مي‌شود كه بر رسانه‌هاي مختلف مردمي، زبان عامه پسند و سبک عاميانه در جامعه حاكم است. عناصر فرهنگي در يک دوره زماني نقش عمده اي را در افراد ساكن در جامعه ايفا مي‌كنند و ذهن را كنترل مي‌كنند. لحظات فرهنگي كه در نتيجه نيازهاي مختلف زندگي روزمره ايجاد مي‌شود، تجميع شده و ماهيت زندگي روزمره مردم را تعيين مي‌كند. فرهنگ عاميانه در آشپزي، لباس، رسانه، سرگرمي، ورزش، ادبيات و غيره منعكس مي‌شود. گاهي مرز فرهنگ عامه بين طبقات بالا و پايين مشخص نيست. باورها يا اعمال و سنت‌هاي فرهنگي مختلف كه توسط اعضاي جامعه به رسميت شناخته شده است، مكان‌هاي تاريخي، آيين‌هاي مختلف، هنرهاي مختلف؛ كه مردم از نسل‌هاي گذشته به ارث مي‌برند كه در يک زمان معين در آن جامعه همه جا حاضر و غالب است; به آن مي‌گويند فرهنگ عامه. فرهنگ عاميانه بر شكل گيري نگرش فرد نسبت به يک موضوع خاص تأثير مي‌گذارد. رايج‌ترين انواع فرهنگ

عبارتند از سرگرمي (فيلم، موسيقي، تلويزيون و بازي‌هاي ويدئويي)، ورزش، اخبار، سياست، مد، فناوري وغيره. (چودري، ٢٠١٤: ١٧) تمايل بي‌دليل به شوخي، ذهنيت گسترش نفرت در رسانه‌هاي اجتماعي بخشي از فرهنگ عامه است. همچنين بايد توجه داشت كه اين فرهنگ چقدر عقل و انديشه را كنترل مي‌كند. اينكه اين جنبه از فرهنگ عامه چه مدت ادامه خواهد داشت، نامشخص است. اما ملت بايد بهاي تشويق نگرش‌هاي منفي را بپردازد. بايد در نظر گرفت كه آيا خودسري، تندخويي و برخورد پرخاشگرانه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با شروع زندگي عادي، به بدتر شدن چهره كشور كمک مي‌كند؟ همچنين در صورت لزوم نياز به قانون گذاري وجود دارد.

تأثير فرهنگ عامه در بنگلادش:

اصطلاح «فرهنگ عامه» در قرن نوزدهم يا قبل از آن سرچشمه گرفت. به طور سنتي، فرهنگ عامه با آموزش با كيفيت پايين و طبقات پايين‌تر همراه بوده است. كه با «فرهنگ رسمي» طبقات بالا و آموزش با كيفيت بالا مخالف است. انقلاب صنعتي منجر به شهرنشيني در سراسر جهان و ظهور فرهنگ عمومي شد. فرهنگ عامه به عنوان ابزاري قدرت‌مند توسط جامعه بالا يا طبقه نخبگان جامعه و نخبگان براي كنترل زيردستان خود در جامعه استفاده مي‌شود. فرهنگ پاپ ذهن «مردم عادي» را تنگ مي‌كند و آنها را منفعل تر و به راحتي كنترل مي‌كند. هر چقدر هم در مورد تعريف واقعي فرهنگ عامه بحث و جدل وجود داشته باشد، نمي‌توان تأثير قدرت‌مند آن را در ميان جمعيت زيادي انكار كرد (تميمداري، ١٣٩٠: ١٠).

قبل از اينكه اينترنت در بنگلادش در دسترس باشد، «فرهنگ پاپ» مردم تلويزيون، نمايش، فيلم، نمايش‌هاي واقعيت، ورزش وغيره بود. مردم اين كشور قبل از اينكه با فرهنگ آكاش آشنا شوند به درام، سينما و موسيقي بنگلادشي علاقه زيادي داشتند. در نتيجه، از دوران پس از جنگ آزادي‌بخش تا دهه نود، دنياي سرگرمي بنگلادش هم با «هنر و هم هنرمندان» با كيفيت روبرو شد. و جايگاه بسيار مهمي در تاريخ فرهنگي اين كشور دارد. با توجه به ورود فرهنگ آكاش، مردم اين كشور به شدت به غلات كشورهاي خارجي به ويژه هند معتاد هستند. اگرچه ميزان اين تمايل به دليل رفاه اينترنت تا حدودي كاهش يافته است، اما نگاهي به «فرهنگ پاپ» كه مردم اين كشور جذب آن شده‌اند، ضروري است. اما متوليان امر در پيشگيري از فرهنگ بد بي‌امان هستند.(چودوري، ٢٠١٤ : ٢٨)

به دليل تأثير منفي فرهنگ عامه بنگلادش و تنزل همه جانبه ارزش‌ها، زندگي شخصي افسرده شده است، نزاع در زندگي خانوادگي، اختلاف و هرج و مرج در زندگي اجتماعي، بي‌ثباتي و هرج و مرج در زندگي دولتي، فساد در زندگي اقتصادي، رواج بي‌شرمي و حماقت در زندگي فرهنگي، امپرياليسم و جنگ در عرصه بين المللي و حتي زندگي در كل، بي‌ارزش بودن، ناراحت و بي‌قرار بود.

پس از ظهور اينترنت، گروهي از جوانان اين کشور با توليد محتواي متنوع در يوتيوب، دوران جديدي را در دنياي سرگرمي کشور آغاز کردند. در ميان آنها سلمان مقتدر، ايمن صادق و بسياري ديگر نقش‌هاي مهمي دارند. به خاطر فناوري؛ به دليل فرصت ارتباط با فرهنگ کشورهاي غربي؛ در ميان مردم تمايلي وجود داشت که به فرهنگ‌هاي ديگر گرايش پيدا کنند. آنچه خطرناکتر و غم انگيزتر است اين است که سازندگان يا تهيه کنندگان بيشتر به جنبه تجاري اهميت مي‌دهند تا کيفيت درام/فيلم.

محبوب‌ترين رسانه اجتماعي در بنگلادش فيس‌بوک است. هيچ محدوديت سني يا محدوديت خاصي براي استفاده از فيس‌بوک در اين کشور وجود ندارد، بنابراين مي-توان تصوير آزادي را مشاهده کرد. تمايل به ايجاد هرج و مرج از طريق جوک، شوخي، پست فيس بوک يا اظهار نظر در مورد همه چيز از مسائل جزئي گرفته تا اغتشاشات بزرگ در جامعه جوان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر يکي از نشانه هاي «فرهنگ پاپ» در نظر گرفته مي‌شود. فيس‌بوک در عرصه «لباس پوشيدن هر طور که مي خواهد» ايجاد شد.

در بنگلادش، اگر آهنگساز بدون اجازه از موسيقي شخص ديگري استفاده کند، آن شخص مي‌تواند طبق قانون کپي‌رايت پرونده تشکيل دهد. زماني پرونده‌اي عليه آهنگساز به دليل کپي کردن ملودي آهنگي از خواننده محبوب Baby Nazneen در يک آهنگ باليوود به نام Twistتشکيل شد. اما در عصر کنوني، تحريف شديد آهنگ اصلي به نام «کاور کردن» آهنگ به يک مد تبديل شده است. تبليغات منفي به يکي از ابزارهاي حفظ فرهنگ هنر تبديل شده است. فقط خواندن نظرات عمومي در فيس‌بوک نشان مي‌دهد که بخش بزرگي از مخاطبان چقدر بيمار هستند. ما کسي را فقط براي سرگرمي محبوب مي‌کنيم، اما هيچ سودي در آنجا به دست نمي‌آوريم. بلکه لطمه به آن استعدادهايي وارد مي‌شود که به خاطر اين شوخي‌هاي بيمارگونه نمي‌توانند در معرض ديد عموم قرار گيرند.

نتيجه :

با توجه به بحث فوق، مي‌توان گفت که بازتاب حس زندگي يک ملت، فرهنگ آن است. فرهنگ اين است که زيبا، رنگارنگ، باشکوه زندگي کنيم. با ادامه دادن ريشه-هاي احساسات متعدد بين طبيعت-جهان و انسان-جهان، با بيرون کشيدن آب ميوه‌هاي مختلف زنده بماندن؛ از طريق شعر خواني، در شکفتن گل‌ها، در تعقيب رودخانه، در آرزوي ماه براي فرار؛ در آبي آسمان، در سبز چمن زندگي کردن؛ از طريق داستان-ها، شادي‌ها و غم‌هاي عجيب مردان و زنان را زندگي کردن. از طريق داستان‌هاي سفر، همنشينان صميمي سرزمين‌هاي غريب و ملل غريب شدن؛ تکامل تمدن بشري را در طول تاريخ زندگي کردن. با عهد زندگي کردن تا رنج را از طريق داستان‌هاي زندگي کاهش دهند. در هماهنگي با دنيا زندگي کردن؛ فرهنگ بر اساس سنت‌هاي سوسياليستي، باورهاي ملي، سبک زندگي و آگاهي ملي توسعه مي‌يابد. مردم با

فرهنگ از بي‌عدالتي و ظلم متنفرند. آنها حتي جرات مجازات عادلانه مردم را ندارند. فرهنگ يک دين شخصي است. وظيفه آن زيبا ساختن «من» دروني فرد است. براي فرهنگ سازي به دانش و علم نياز است. عشق بيش از همه مورد نياز است. او بي فرهنگي است که در پي عشق، سبک زندگي عجيبي را در پيش نگرفته است.

منابع و مأخذ:

۱. بشار، قاضي حيرال. (۲۰۲۱). *زندگي اجتماعي–اقتصادي، آموزشي و فرهنگي در شهر رانگونيا*. چيتاگنگ : اس اي تريدارس.

۲. بهويا، دکتر غلام قبريا. (۲۰۰۲). *جامعه بنگلادش :سياست و فرهنگ*. داکا: انتشارات ايدارن.

۳. تيمداري، دکتر احمد. (۱۳۹۰). *فرهنگ عامه*. تهران: انتشار محکم.

٤. توهين، فضل الحق. (۲۰۰٦). *فرهنگ عامه در شعر بنگلادش*. داکا : انتشارات اتتادي

٥. چودوري، دکتر عبدالمومن. (۲۰۰۹). *تاريخ و فرهنگ بنگال باستان*. داکا: برادران مولا.

٦. چودوري، مطهر حسين. (۲۰۱٤). *بحث فرهنگي*. داکا: انتشارات نابازوگ.

۷. شاهنواز، اي کي. ام .(۲۰۰۷) *فرهنگ بنگال تمدن بنگال*. داکا: انتشارات ديبو پروکاش.

۸. شاهنواز، اي کي. ام .(۲۰۱۰) *ميراث فرهنگي بنگلادش*. داکا: انتشارات نوبهيل.

۹. عبدالجليل، دکتر محمد. (۱۹۹۹). *زندگي مردم و ادبيات مردمي بنگلادش شمالي*. داکا: انتشارات ساختمان ادبيات جهان.

۱۰. *عبدالله، دکتر محمد. (۱۹۸۳). ادبيات فارسي در بنگلادش. داکا: بنياد اسلامي بنگلادش.*

۱۱. معين، دکتر محمد. (۱۳۷۱). *فرهنگ معين*. (چاپ دوم، ويرايش هشتم). تهران: انتشار اميرکبير.

۱۲. هاشمي، تاج‌الاسلام. (۱۹۸٥). *فرهنگ بنگلادش در پرتو تاريخ*. (انتشار دوم). داکا: آکادمي سوکانتا.

۱۳. وکيل احمد. (۲۰۰۱). *فرهنگ عامه بنگال*. (ويرايش ۲). داکا: انتشارات گاتيدهارا.

14. اطلاعات اينترنتي :

15. فاتحه، بنت حق. (۲۰۲۱، ۹ سپتامبر) فرهنگ عامه در زمينه کنوني؛ https://shahojia.com/2021/09/09

16. مطيع الرحمان، محمد. (۲۰۲۰). فرهنگ بنگلادش؛ https://www.dailynayadiganta.com/special/540690

17. https://bn.wikipedia.org/wiki/

18. https://wikieducator.org/Bangladesh/

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

Amir Hasan Sijzi as a Ghazal Writer

Dr. Sagir Ahmad*

Abstract: Scores of Ghazal writers have contributed to the development of Persian Ghazal. The credit for introducing some unique styles to Persian lyrics goes to Hasan Sijzi as many prominent historians and tazkerah writers have also admired him for the exceptional quality of his Ghazals. Amir Hasan Ala Sijzi Dehlavi popularly known as Amir Hasan Sijzi, a contemporary poet and prose writer of Amir Khosrow Dehlavi, was born in Badayun, Uttar Pradesh in 652 A. H/ 1254 A. D. He was a close friend of Amir Khosrow and a favourite disciple of Hazrat Nizamuddin Aulia, the great Sufi saint of the Chishti Order. He got his early education from his hometown. After receiving his early education, he moved to Delhi where he came in contact with Prince Mohammad, son of Balban. Later he joined the service of the said prince in Multan under his governorship. In the latter part of his life, when Mohammad bin Tughlaq moved his capital from Delhi to Daulatabad, he migrated to the new capital where he died in 737 A. H./ 1337 A. D. Hasan Sijzi whose reputation primarily rests on his Ghazals, left a Divan comprising Ghazals, Qasidas, Mathnavis and Rubayis etc. He is also known for his book namely *Fawaidul Fuad* which is considered to be the best account of his spiritual guide, Hazrat Nizamuddin Aulia. In Ghazal writing, he was deeply impressed by the style of Sa'di Shirazi. He got the title of "Sa'di of India" for his emotional and melodious Ghazals. The paper primarily aims to evaluate his lyrical poetry.

چکیده:
عدّه ای از غزلسرایان فارسی در توسعه و گسترش غزل فارسی نقش مهمّی ایفاء نموده اند. امّا غزلسرایانی که صاحب سبک و شیوهٔ خاصی شده اند، امیر حسن علاء سجزی معروف به امیر حسن سجزی، یکی از آنها است که از دوستان صمیمی امیر خسرو و از مریدان خاص شیخ نظام الدین اولیاء بود. او تحصیلات مقدماتی را در شهر بدایون، در زادگاه خود فراگرفت و پس از آن به دهلی رفت و در آنجا با شاهزاده محمّد، پسر سلطان بلبن، ارتباط برقرار کرد. بعداً در مولتان به خدمت شاهزادهٔ مزبور درآمد. او در اواخر عمر خود وقتی محمّد بن تغلق پایتخت خود را از دهلی به دولت آباد (دیوگیر)منتقل کرد، به پایتخت جدید مهاجرت کرد و در سال ۷۳۷ هجری قمری در همانجا در گذشت. امیر حسن که شهرتش بیشتر به جهت غزل است در قالبهای شعر ی دیگر مانند قصیده، مثنوی و رباعی وغیره نیز طبع آزموده است. وی همچنین به خاطر کتاب «فوائدالفؤاد» نیز که به توسط او به احاطهٔ تحریر آمد و در واقع ملفوظاتی است از نظام الدین اولیاء، شهرت دارد. او در غزلسرایی اثر سعدی را به شدّت پذیرفت و به جهت توجّهی که به غزلهای او داشته،به لقب «سعدی هند» یاد شده . در این مقالهٔ مختصری تلاش نویسنده بر این است که غزلهای امیر حسن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد تا بعضی جنبه های خاص و توجّه برانگیز غزلهایش به اندازه ای روشن گردد.

کلید واژه ها: حسن سجزی، غزل فارسی، سبک خاص، سعدی هند.

مقدمه:

امیر حسن سجزی یکی ازشاعران و نویسندگان برجستهٔ زبان و ادبیات فارسی هند است که در اواسط قرن هفتم هجری قمری چشم به جهان گشود و درحدود تا چهار دههٔ اوّل قرن هشتم هجری

* Assistant Professor, Department of Arabic and Persian, University of Calcutta, Kolkata, India.

قمری زیست و در انواع مختلف شعر و نثر طبع آزمایی کرد امّا شهرت او بیشتر به علّت غزل است و از آنجا که در غزلسرایی نزدیکی او با سعدی شیرازی نسبت به غزلسرایان دیگر بیشتر است، او را به لقب "سعدی هند" یاد کرده اند. غزلهای او، گذشته از چاشنی شیخ سعدی ویژگیهایی را دربردارد که غزل فارسی قبلاً سابقه نداشت.

مختصری از زندگینامۀ امیر حسن:

امیر حسن سجزی از شاعران و نویسندگان ردیف اوّل زبان و ادبیات فارسی است که در غزلسرایی عدّه ای از سخنوران فارسی را تحت تأثیر خود قرار داد. او در سال ٦٥٢ هجری قمری در شهر بدایون، ایالت اترا پرادش هند به دنیا آمد و ایّام کودکی را در همانجا گذراند و تحصیلات مقدماتی را هم در همان شهر فرا گرفت و بعد از تکمیل تحصیلات مقدماتی بدایون را ترک گفت و در دهلی مقیم گشت. شهر بدایون در واقع مولد و دهلی منشای او بوده. او خود در این مورد در قصیده ای می گوید:

پرورده فضل ایزدش ارشاد غیبی مرشدش		بو ده بدایون مولدش دهلی است منشا داشته۱

مطالعات زندگانی امیر حسن بر ما آشکار می کندکه نیاکان او از بلاد عرب بودند که قبلاً در سیستان و بعداً در هند مقیم شدند. سیستان را قبلاً به عنوان سگستان یا سجستان شناخته اند و ساکنان آن دیار را سجزی می گفتند و به همین مناسبت امیر حسن را «سجزی» می گویند. بدون تردید او نه تنها از قبایل عرب بود بلکه از قبیلۀ قریش و هاشمی نسب بود و بدین امر در جایی چنین اشاره می‌کند:

خانۀ بو لهب چه جای قرار		چو در مصطفی است مستقرم
قرشی الاصل و هاشمی نسبم		کز هوایش بر آمد این شجرم ۲

امیر حسن در زندگانی خود هیچ وقت ازدواج نکرد. او همه عمر مجرّد ماند و در پنجاه و چهار سالگی به حلقۀ ارادت شیخ نظام الدین اولیا در آمد و در گروه مریدان خاص او شامل گردید و ملفوظات او را به نام "فواید الفؤاد"جمع آوری کرد.

سال ۷۲۵ هجری قمری برای امیر حسن عام الحزن ثابت شد. شیخ نظام الدین اولیاء، پیر و مرشدش و امیر خسرو، مصاحب و دوست صمیمی او دنیای فانی را برای همیشه وداع گفتند و داغ مفارقت بر دلش نهادند. این فاجعۀ پُر اندوه و ملال و انتقال دادنِ سلطان محمّد بن تغلق پایتخت خود را از دهلی به دولت آباد (دیوگیر) امیر حسن را نگذاشت در دهلی بماند. او وادار شد شهر دهلی را ترک کند و به دولت آباد برود و در آنجا در سال ۷۳۷ و یا ۷۳۸ هجری قمری چشم از جهان بربست ۳.

آثار امیر حسن:

آثار امیر حسن در هر دو دستۀ نظم و نثر به یادگار مانده است. از جمله آثار او یکی دیوان او است که غزلیات و قصاید و مثنویات و قطعات وغیره را در بر دارد و در سال ۱۳۵۲ هجری قمری به اهتمام مسعود علی محوی در حیدرآباد، به چاپ رسیده است.

آثار دیگر او کتابی است به نام "فواید الفواد" که در واقع ملفوظاتی است از شیخ نظام الدین اولیاء که او آن را در نثر ساده و روان به قلم آورده است. این کتاب مشتمل بر پنج جلد است و هر جلد دارای چند مجلس می باشد به این قرار است:

جلد اوّل متضمّن ٣٤ مجلس و جلد دوّم محدود به ۳۸ مجلس است و جلد سوّم ۱۷ مجلس دارد درحالی که در جلد چهارّم ۶۷ مجلس است و جلد پنجم دارای ۳۲ مجلس می باشد. بدین ترتیب تمام کتاب یک صد و هشتاد و هشت مجلس را در بر دارد و مطالبی که در آن به میان آمده است حاوی است بر احکام شریعت و دستور طریقت و در ضمن آن حکایاتی مربوط به اصحاب رسول و

صوفیان و ائمهٔ کرام و شرح حال بسیاری از مشایخ بزرگ طریقت بیان شده است. عبارت این کتاب ساده، صاف و روان و از هر گونه پیچیدگی و تعقید مبرّا و مشحون از زبان محاوره و تکلّم است.
اثر دیگری در نثر ، رسالهٔ مختصری است به نام"مخ المعانی" که مشتمل بر ۳۶صفحه و در بردارنهٔ موضوع عشق و عرفان است. علاوه بر این، در نثر ، مرثیه ای به یادگار مانده است که امیر حسن آن را به مناسبت شهادت شاهزاده سلطان محمّد نگاشته است. عبارت این نثر ، مسجّع و مقفّی و آ میخته به نظم است.

غزلسرایی امیر حسن:

امیر حسن سجزی یکی از خوش آهنگ ترین و خوشایند ترین غزلسرایان فارسی به شمار می رود که بنا به گفتهٔ بعضی دانشمندان فارسی "در سرودنِ غزلهای عاشقانه حتّی از امیر خسرو هم فرا رفت"۴. "او استاد غزل بود" و روش او "بعدها در سرایش شعر فارسی سخت مؤثّر واقع شد"۵. وی از نوابغ شعر بود و در غزلسرایی صاحب شیوه و سبک خاصی بود که هم در عهد خود و هم در ادوار بعد تأثیر ی فراوان درمیان شاعران فارسی داشت. طبق دکتر هرومل سدارنگانی:

> "... در اوایل قرن هشتم، دو نابغهٔ شعر ظهور کردند که سایر سخنوران فارسی زبان هند را تحت الشعاع قرار دادند و در ادوار بعد هم نفوذی دامنه دار درمیان شعرای ایران و هند داشتند، آن دو امیر حسرو و حسن دهلوی بودند." ٦.

عده ای از دانشمندان ادب، تاریخ نویسان و تذکره نگاران امیر حسن را در غزلسرایی ستوده اند و عده ای از غزل سرایان فارسی مانند کمال خجندی، حافظ شیرازی، مولانا جامی و هلالی وغیره در غزل تحت نفوذ
او بودند و غزلهای او را گاه گاهی در نظر داشتند و از سبک او پیروی نمودند و نزدیکی شیوهٔ کمال خجندی به شیوهٔ امیر حسن به اندازه ای است که او را "دزد حسن" خوانده اند. چنانکه سیروس شمیسا در این مورد می نویسد:

> "کمال در غزل تحت تأثیر حسن دهلوی بود و از این رو برخی از معاصرانش او را دزد حسن خوانده اند" ۷.

امّا او بنای غزلهای خود را بر غزلهای سعدی نهاده است و در غزل پیروِ سبک و روش او بوده است و از غزلهای او استقبالهایی کرده است و خود نیز به این امر اشاراتی دارد. چنانکه می گوید:

حسن گلی ز گلستان سعدی آورداست   که اهل معنی گلچین این گلستانند ۸

امیر حسن در دیوان خود در حدود هشت صد غزل دارد و در چندین غزل خود از اوزان و قوافی غزلهای سعدی شیرازی استقبال کرده است. او بنای غزلهای خود را مانند شیخ سعدی بر سادگی نهاده است و در غزلهای خود از زبان محاوره و تکلّم کار گرفته است و مطالب را به زبان شیرین و جاذب و دلنشین ادا کرده است. غزلهای او معمولاً ساده و بی تکلّف و از هر گونه تعقید و تصنّع خالی است. در غزلهای او تناسب واژه ها، صراحت و بی پیرایگی، پرهیز از تنافر واژه ها، اجتناب از حشو و زواید، اعتدال در تشبیهات و استعارات وغیره مزایایی است که غزلهایش را زبان زدِ خاص و عام کرده است. چند شعر به عنوان مثال در زیر نقل می شود:

آن دیده که بر حال منش هیچ نظر نیست   بی دیدن او چشم مرا نور بصر نیست
از شربت وصلت همه سیراب شدستند   من کشتهٔ آن چشم که بر ماش نظر نیست
بیچاره دلم شمع صفت در غم هجران   شب نیست که از روز دگر سوخته تر نیست
یک بوسه زدم بر قدمش جان ستد از من   گفتا دگری زن چه کنم جان دگر نیست ۹

از مزایای مهمّی غزلهای امیر حسن یکی روانی کلام اوست. بدون تردید غرلهای او از هر گونه پیچیدگی و ابهام منزّه و مبرّا است و بر اثر آن غزلهایش مثل دریای آب، جاری و روان است.حسن انتخاب واژه ها، حسنِ تراکیب، پیوستگی جملات، متانت و سنجیدگی و جزالت در بیان مطالب به غزلهایش لطافت و جذّابیّت بخشیده است و همچنین صفایی و پاکیزگی زبان و بیان و استفاده از واژه های منسجم و ملایم به غزلهایش عذوبت و شیرینی بخشیده است و غزلهایش را در سلاست و روانی به غایت کمال رسانیده است چنانکه ضیاء الدین برنی معاصر و مصاحب امیر حسن و نویسندهٔ "تاریخ فیروز شاهی" در این مورد می نویسد:

"... و به سلامتی ترکیب و روانی سخن آیت بوده است و از بسکه غزلهای وجدانی در غایت روانی بسیار گفته است او را سعدی هندوستان خطاب شده بود". ۱۰

از روی دلاویزت گر پرده بر اندازی — عشّاق ز سر گیرند آیین سر اندازی
طوبی که به هر شاخی از قدِ تو می لافد — گر تو برسی آنجا از بیخ بر اندازی
باز آ که در این میدان کس نیست حریف تو — شمشیرزدن از تو از ما سپر اندازی
جان را هدفی کرده نزدیک تو می آیم — تاناوک مژگان را نزدیکتر اندازی ۱۱

در غزل معمولاً مطالب درد و غم، سوز و گداز، احساسات و جذبات ، واردات و معاملات عشق، عجز و نیاز وغیره که جان غزل به حساب می آید، مطرح می شود چنانکه علّامه شبلی نعمانی در کتاب خود "شعر العجم" می گوید:

"جان غزل چیست؟ درد، سوز و گداز، جذبات، معاملات عشق و عجز و نیاز..."۱۲

امیر حسن در بیان مطالب مذکور در واقع دادِ سخن داده است. او موضوعات درد و اندوه، احساسات و عواطف درونی و خاطرات و معاملات عشق و عاشقی را در ابیات غزل به نحوی مطرح می کند انگار از آتش دود بر می آید. اشعار او که مملواز افکار لطیف و معانی باریک و مشحون از سوز و گداز و درد و نیاز است، حسب حال عاشقان و دردمندان می باشد. خود می گوید:

زین شعر حسن بشنو حال دل مسکینان — صد درد نهان دارد هر بیت که می خوانم ۱۳

علّامه شبلی نعمانی در مورد غزلهای او چنین می گوید:

"... او (یعنی امیر حسن) در قسمت غزل خدمتی بسزا نموده...آن سوز و گداز و جوش و خروش که در کلام او وجود دارد حتّی در کشتهٔ محبّت وی (امیر خسرو) هم یافت نمی شود"۱۴

محمّد مبارک علوی کرمانی معروف به امیر خورد، مؤلّف"سیر الاولیاء" مربوط به غرلهای امیر حسن این طور می گوید:

"...امیر حسن علاء سجزی که غرلیات جگر سوز او چقمق دلهای عاشقان آتش محبّت بیرون می آورد و اشعار دلپذیر او را حتّی به دلهای سخنوران می رساند و لطایف روح افزای او مایهٔ اهل ذوق است و سخن این بزرگ چاشنی سعدی دارد..."[15]

چند شعر ملاحظه کنید:

چهره نگار کرد گل چهرهٔ یار من کجا — باد بهار بوی شد بوی بهار من کجا
لوح زمین به هر زمان از قلم قضا کنون — جمله نگار نقش شد نقش نگار من کجا [16]

❖ ❖ ❖

دولت ما گل نکرد محنت خار از کجاست — راحت می ناپدید رنج خمار از کجاست
یار زمن رخ بتافت گفت نیازردمت — وه اگر آزار نیست نالهٔ زار از کجاست

ترک من آخر بدار غمزهٔ خونریز را گر تو نه ای تیغ زن سینه فگار از کجاست [17]

امیر حسن غرلهای خود را اکثراً در اوزان خوشاهنگ و خوشایند سروده است که برای غزل موزون می باشد. شاید به همین دلیل غزلهایش در مجالس وجد و سماع سراییده می شده است. بنا به گفتهٔ برخی از دانشمندان ادب، "شیخ نظام الدین اولیاء در حالت ذوق سماع از قوّالان می خواست تا غزلهای امیر حسن را بسرایند"[18].از ویژگیهای مهمّی که غزلهای امیر حسن را از غزلهای دیگران متمایز می کند، ردیفهای غریب است که او از آنها در غزلهای مختلف خود استفاده کرده است. به عنوان نمونه اشعار زیر را ملاحظه کنید:

بتم چون شاخ گل هر بار می آمد نمی آید نهال عیش کاندر یار می آمد نمی آید

صبایی کز در دلدار جنبیدی نمی جنبد نسیمی کز دیار یار می آمد نمی آید

نشاط می ز میخواره همی دیدم نمی بینم سلام گل که از گلزار می آمد نمی آید [19]

وی همچنین در بسیاری از غزلهای خود که تعداد آن نسبت به غزلسرایان دیگر زیاد است، بر قوافی اکتفا کرده است. قافیه های غزلهای او ، خواه در غزلهای مردّف خواه در غزلهای غیر مردّف به کار رفته باشند، به اصطلاح "تنگ" و "باریک" و به رشتهٔ ابیات کشیده شده اند. خود می گوید:

دُرِّ سخن به صرفه تری صرف کن حسن کین رشته از قوافی باریک رشته اند [20]

و اگرچه قافیه و ردیف باهم شعر را مترنّم تر می سازند معهذا در غزلهایی که امیر حسن در آن بر قوافی اکتفا کرده است، چون قافیه ها را با کمال قدرت و مهارت و چیره دستی و هنرمندی به کار برده است، نغمهٔ و ترنّم شعر به هیچ وجه کمتر نمی شود و لطافت و عذوبت آن به همان گونه باقی می ماند. مولانا عبد الرّحمن جامی به مزیّتهای مذکور غزلهای امیر حسن چنین اشاره می کند:

> "حسن دهلوی، وی را در غزل طریق خاص است. اکثر قافیه های تنگ و ردیفهای غریب و بحرهای خوشایندکه اصل در شعر خاصه در غزل ملاحظهٔ اینها است، اختیار کرده است لاجرم از اجتماع اینها شعر وی را حالتی حاصل آمده است که اگر چه به حسب بادی نظر آسان می نماید امّا در گفتن دشوار است و لهذا اشعار وی را سهل ممتنع گفته اند. " ۲۱

سخن کوتاه این که غزلهای امیر حسن از وقوع گویی، معامله بندی، جدّت اسلوب، شوخی، نزاکت، ملمع سازی و ویژگیهای دیگری مثل آن نیز برخوردار است که ممکن نیست همهٔ آنها در این مقالهٔ مختصری به احاطهٔ تحریر آید.

نتیجه گیری:

امیر حسن سجزی دهلوی یکی از عذب البیان ترین غزلسرایان فارسی است که بسیاری از غزلسرایان عهد خود و ادوار بعد را تحت تأثیر خود قرار داد و او خود زیر نفوذ سعدی شیرازی بوده. در غزل نزدیکی او با سعدی به اندازه ای است که دانشمندان ادب وادار شدند او را "سعدی هند" عنوان کنند معهذا در غزل موجد طرز خاصی شده و غزلهای خود را که مشحون از افکار لطیف و دلنشین و نمایندهٔ معانی باریک و توجّه بر انگیز است، در مطبوع ترین و خوشاهنگ ترین اوزان سروده است و آنها را با آرایه های ادبی آرایش داده است که توجّه خوانندگان را جلب می کند و سرمشق آیندگان بوده است .

منابع

١. دیباچهٔ دیوان حسن سجزی دهلوی، مسعود علی محوی، حیدرآباد دکن، ١٣٥٢، ص ١٨.

٢. همان، ص ٢٥.

٣. همان، ص١٠٦.

٤. تاریخ ادبیات ایران، یان ریپکا و دیگران، ترجمۀ کیخسرو کشاورزی، انتشارات گوتم برگ و جاویدان ، ایران، ۱۳۷۰،ص ۳۸٦.
٥. همان.
٦. پارسی گویان هند وسند، دکتر هرومل سدارنگانی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۴، ص ۱۸.
٧. سیر غزل در شعر فارسی، دکتر سیروس شمیسا، انتشارات فردوسی، تهران،۱۳۶۲، ص ۱۴۲.
٨. دیوان حسن سجزی دهلوی، ص ۹۳.
٩. همان، ص ۳۳.
١٠. دیباچۀ دیوان حسن سجزی دهلوی، ص ۲.
١١. دیوان حسن سجزی دهلوی، ص ۴۸-۲۴۷.
١٢. شعر العجم (جلد دوّم)، شبلی نعمانی، ترجمۀ محمّد تقی فخر داعی گیلانی، ص ۹۷-۹٦.
١٣. دیوان حسن سجزی دهلوی، ص ۲۵۷.
١٤. شعر العجم (جلد دوّم)، ص ۹۷-۹٦.
١٥. دیباچۀ دیوان حسن سجزی دهلوی، ص ۳.
١٦. دیوان حسن سجزی دهلوی، ص ۹.
١٧. همان، ص ۸۱.
١٨. امیر حسن سجزی دهلوی حیات و ادبی خدمات، محمّد شکیل احمد صدیقی، نامی پریس، لکهنو، ۱۹۷۹، ص ۱٤۳.
١٩. دیوان حسن سجزی دهلوی، ص ۱۸۰.
٢٠. همان، ص ۱۴۹.
٢١. بهارستان، عبد الرّحمن جامی، به تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۰۶.

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ: একটি পর্যালোচনা
(Origin and Development of Sanskrit Grammar: A Critical Study)

Dr. Bipul Kumar Biswas*

Abstract: The book that determines the etymology of the word and confirms the use of the word 'Suddha' and forbids 'Asuddha' in the sentence is called grammar. Sanskrit grammar has a well-known history of its origin and development. The *Vedas* contains the first source of the beginning of Sanskrit grammar. Literary works like *Vedanga*, *Upanishada* and *Vrahmana* also contain grammatical elements. Grammar was also well practised in the age of *Ramayana* and *Mahabharata.* Acharya Panini (Appro. in the 4th century BC) is considered a central figure in the history of Indian grammar. The division of the grammatical era is centred on him. His *Ashtadhyayi* is a famous grammar book written by aphorism. About eighty five grammarians could be found in various texts before the Panini age. After the Panini age, Katyayana (Appro. in the 3rd century BC) composed one kind of aphorism named *Vartika.*Then Maharshi Patanjali (Appro. in the 2nd century BC) wrote *Mahabhashya.* A detailed explanation of Panini's aphorism through arguments in simple language. Later grammarians wrote commentaries surrounding *Ashtadhyayi* or *Mahabhashya*. Jayaditya and Vamana (Appro. in the 7th century AD) jointly composed *Kashika-Vritti* on Panini's *Ashtadhyayi.* Again, Bhartrihari's *Mahabhashyadipika,* Keiyata's *Mahabhashyapradipa*, Nageshabhatta's *Mahabhashyapradipodyata* are famous as commentaries on *Mahabhashya*. In the seventeenth century, the grammarian Bhattoji-Dikshita wrote a book called *Siddhantakaumudi,* in which Panini's formulas were categorised in different classes. There Diksita's own notes named *'Diksita'* and examples are added to each of the aphorisms. Many commentaries were written on *Siddhantakaumudi,* including *Tattwavodhini* and *Valamanorama.* In this way, grammar progresses from simple to more simple. This evolution of Sanskrit grammar will be discussed chronologically in this article.

ব্যাকরণ হলো শব্দের অনুশাসন বিষয়ক গ্রন্থ। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের পাশাপাশি যে-শাস্ত্র ভাষায় সাধু শব্দের প্রয়োগ নিশ্চিত এবং অসাধু শব্দের প্রয়োগ নিরোধ করে তাই ব্যাকরণ। ব্যাকরণের জ্ঞানের দ্বারা ভাষার অনন্ত শব্দরাশি সম্পর্কে অল্পায়াসে নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব হয়। তাই *বেদ-বেদান্তাদি* শাস্ত্রের অসংখ্য শব্দ ও তার অর্থ সহজ ও নিখুঁতভাবে উপলব্ধির জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান আবশ্যক। আবার, শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত থাকে শাস্ত্রকারের জীবনদর্শন— অতীতের অভিজ্ঞতা, চলমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ-চিন্তা। তাই বিশ্বের মঙ্গলার্থে বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিকে শাস্ত্রপাঠ ও তার অর্থ উপলব্ধির প্রাথমিক সোপান হিসেবে অবশ্যই ব্যাকরণের নিয়মাদি সম্পর্কে জানতে হবে। *মহাভাষ্যে*ও সমাজহিতৈষী একজন ব্রাহ্মণকে ব্যাকরণ পাঠে উৎসাহিত করা হয়েছে— "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদো ঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি"[১]। কোন কারণ বা লাভালাভের বিষয় বিবেচনা না করে একজন ব্রাহ্মণ ষড়্-বেদাঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন। ষড়্-বেদাঙ্গের মধ্যে মুখ্যতমটি ব্যাকরণ। তাই ব্যাকরণের জ্ঞান লাভের জন্য অবশ্যই তাঁকে যত্নবান হতে হবে। শিক্ষার্থীদেরও ব্যাকরণ পাঠে উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে—

"যদ্যপি বহু নাধীপে তথাপি পঠ পুত্র! ব্যাকরণম্।
স্বজনঃ শ্বজনো মা ভূৎ সকলং শকলং সকৃৎ শকৃৎ ॥"[২]

---

* Professor, Department of Sanskrit, Rajshahi University, Bangladesh.

— হে পুত্র, অধিক অধ্যয়ন করতে না চাইলেও ব্যাকরণ বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন কর, যাতে স্বজন (আপনজন) স্থলে শ্বজন (কুকুর), সকল (সব) স্থলে শকল (খণ্ড/অর্ধেক) এবং সকৃৎ (একবার) স্থলে শকৃৎ (বিষ্ঠা) শব্দের প্রয়োগ না হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাকরণশাস্ত্রের পরিধি অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত। পণ্ডিতদের মতে, *বেদ*শাস্ত্রের মধ্যেই ব্যাকরণশাস্ত্র উদ্ভবের মূল বীজ নিহিত। বৈদিক মন্ত্রের রূপকার্থ বিশ্লেষণ করলে সেখানে ব্যাকরণশাস্ত্রের বিভাগ-উপবিভাগ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন— ব্যাকরণরূপী বৃষভের চারটি শৃঙ্গ, ব্যাকরণশাস্ত্রেরও চারটি বিভাগ— নাম, আখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ ও নিপাত। বৃষভের তিনটি পাদ, ব্যাকরণে বাক্যের তিনটি কাল— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বৃষভের দুটি মস্তক, ব্যাকরণশাস্ত্রেও শব্দ দুই প্রকার— নিত্য ও কার্য। উৎপত্তি-বিনাশরহিত শব্দই নিত্যশব্দ এবং উৎপত্তিবিনাশ-যুক্ত শব্দই কার্যশব্দ। বৃষভের সাতটি হস্ত, ব্যাকরণে সাতটি বিভক্তি— প্রথমা-দ্বিতীয়াদি। বৃষভকে তিন স্থানে বন্ধন করা যায়, ব্যাকরণে শব্দের উচ্চারণও তিন স্থানে বদ্ধ— বুক, কণ্ঠ ও মস্তকে[৩]।

মনুসংহিতা অনুসারে, বৈদিক যাগ্‌যজ্ঞ-কর্মানুষ্ঠান থেকে জগতের সার্বিক শব্দ-স্পর্শাদি উৎপন্ন। অতএব, শব্দশাস্ত্রের অন্তর্গত ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্ভবও *বেদ* থেকে, তা বলা যায়[৪]।

ব্যাকরণশাস্ত্রের ক্রমবিকাশে অতঃপর *বেদাঙ্গের* নাম উল্লেখ করা যায়। ছয়টি *বেদাঙ্গের* মধ্যে *শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও ছন্দ* হলো শব্দের অনুশাসন বিষয়ক গ্রন্থ। শিক্ষাকে *বেদ*শাস্ত্রের ধ্বনিবিজ্ঞান বলা হয়। বৈদিক শব্দের প্রয়োগভিত্তিক ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে *নিরুক্ত* গ্রন্থে। *ছন্দো* হলো মন্ত্রের অক্ষরভিত্তিক বিশেষ বিন্যাস রীতি। স্বর, মাত্রা, চরণ ইত্যাদি বিবেচনা করে ছন্দের বিন্যাস করা হয়— যা শব্দানুশাসনেরই অংশ।

বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণযুগ থেকে ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রকৃত বিকাশ শুরু হয়। *বেদের* অনেক *ব্রাহ্মণের* মধ্যে ব্যাকরণগত অনেক পরিভাষার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, *অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণের* একটি বর্ণনায় মধ্যে দিয়ে ব্যাকরণ-বিষয়ক মোট ৩৬টি পরিভাষা পাওয়া যায়। যথা— ধাতু, প্রাতিপদিক, নাম, আখ্যাত, লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি ইত্যাদি। ব্রাহ্মণোত্তর যুগের ব্যাকরণশাস্ত্রে এসকল পরিভাষা অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে।

অতঃপর প্রাতিশাখ্য। *প্রাতিশাখ্য* হলো একধরণের বৈদিক ব্যাকরণ। প্রত্যেক বেদের বিভিন্ন শাখার *প্রাতিশাখ্য* রয়েছে। ঋগ্বেদীয় *প্রাতিশাখ্যকে* সবচেয়ে প্রাচীন মনে করা হয়। *প্রাতিশাখ্যের* মধ্যে বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ, সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, স্বরবিধি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

রামায়ণের যুগে সুসমৃদ্ধ ব্যাকরণচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। *রামায়ণের* পবনপুত্র হনুমান একজন সুদক্ষ বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁর ব্যাকরণের জ্ঞান ও ভাষাপ্রয়োগের দক্ষতার প্রশংসা করে রামচন্দ্র বলেছেন—

"নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন কিঞ্চিদপশব্দিতম্ ॥"[৫]

(ইনি নিশ্চয়ই বহুবার সমগ্র ব্যাকরণ শুনেছেন। কারণ, বহু কথা বললেও তাঁর মধ্যে কোন অপশব্দের প্রয়োগ হয় নি।)

মহাভারতে একজন বৈয়াকরণকে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সর্বজ্ঞতাবশত পদার্থের সার্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানেন। ব্যাকরণজ্ঞ ব্যক্তিও শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞান-হেতু ভাষার দ্বারা সবকিছু প্রকাশ করতে পারেন।[৬]

শুক্লযজুর্বেদ অনুসারে ব্যাকরণশাস্ত্রের আদি প্রবক্তা হলেন পিতামহ ব্রহ্মা[৭]। অতঃপর, ব্রহ্মা বৃহস্পতিকে, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ ঋষিদেরকে এবং ঋষিরা ব্রাহ্মণদের ব্যাকরণ শিক্ষা দেন— "যথাচার্যা উচুর্ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ বৃহস্পতিরিন্দ্রায়েন্দ্রো ভরদ্বাজায় ভরদ্বাজ ঋষিভ্য ঋষয়ো ব্রাহ্মণেভ্যস্তং খল্বিমমক্ষরসমাম্নায়মিত্যাচক্ষতে।"[৮]

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের ক্রমবিকাশে আচার্য পাণিনির পূর্ববর্তী সময়ে প্রায় ৮৫ জন বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায়। *প্রাতিশাখ্য*, বৈদিক ও অন্যান্য ব্যাকরণে এই নাম পাওয়া যায়। আচার্য পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*তেও ১০ জন

পূর্ববর্তী বৈয়াকরণাচার্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে। যেমন— অবঙ্‌ স্ফোটায়নস্য (পা. ৬/১/১২৩), বা সুপ্যাপিশলেঃ (পা. ৬/১/৯২) ইত্যাদি। পুনরুক্তি বাদ দিলে পাণিনিপূর্ববর্তী সময়ে প্রায় ৮৫ জন বৈয়াকরণের নাম নির্ধারিত হয়।

আচার্য পাণিনি

সংস্কৃত ব্যাকরণের আকাশে আচার্য পাণিনি একটি সূর্যতুল্য উজ্জ্বল নক্ষত্র। নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে যেমন তার গ্রহাদির বিবর্তন, তেমনি আচার্য পাণিনিকে কেন্দ্র করে তাঁর অনুসারীদের অবস্থান ও খ্যাতি। তাঁকে কেন্দ্র করেই ব্যাকরণশাস্ত্রের যুগবিভাগ— পাণিনিপূর্ববর্তী যুগ, পাণিনি যুগ এবং পাণিনিপরবর্তী যুগ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন একজন বৈয়াকরণের ব্যক্তিগত জীবনপরিচিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। এবিষয়ে বিভিন্ন যুক্তি ও উদ্ধৃতির উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। পাণিনি নাম ছাড়াও তাঁকে পাণিন্‌, দাক্ষীপুত্র[৯], শালাতুরীয়[১০] ইত্যাদি বলা হয়। পণিন্‌-এর অপত্য পাণিন্‌, আবার পাণিন্‌-এর যুবাপত্য পাণিনি। অতএব পাণিনির পিতার নাম পাণিন্‌। পাণিনির মায়ের নাম দাক্ষী, তাই তাঁকে দাক্ষীপুত্র বলা হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা শালাতুর (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত) নামক গ্রামে বসবাস করতেন। তাই তাকে শালাতুরীয় বলা হয়। পণ্ডিতদের মতে, খ্রি. পূ. চতুর্থ শতকে তাঁর আবির্ভাব কাল। পঞ্চতন্ত্র অনুসারে সিংহের আক্রমণে পাণিনির মৃত্যু হয়।

অষ্টাধ্যায়ী

পাণিনি-রচিত ব্যাকরণশাস্ত্রের নাম *অষ্টাধ্যায়ী*। এতে ৮টি অধ্যায়, প্রতিটি অধ্যায়ে ৪টি করে পাদ রয়েছে— সর্বমোট পাদসংখ্যা ৩২টি। সার্বিক *অষ্টাধ্যায়ী* সূত্রাকারে রচিত। অল্পাক্ষরযুক্ত, সন্দেহমুক্ত, সারগর্ভমূলক এবং সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য নির্দোষ নিয়মকে সূত্র বলা হয়—

“অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্‌ বিশ্বতো মুখম্‌।
অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥”[১১]

*অষ্টাধ্যায়ী*র মোট সূত্রসংখ্যা ৩৯৮৩টি। তবে পাঠবিধিতে উদাত্ত-অনুদাত্তাদি স্বরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন গ্রন্থে সূত্রসংখ্যার তারতম্য দেখা যায়।

প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণরা সূত্রকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার সর্বাধিক চেষ্টা করেছেন। সূত্রের একটি মাত্র বর্ণ লাঘব করতে পারলে তাঁরা পুত্রজন্মতুল্য আনন্দ লাভ করতেন— “অর্দ্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ”[১২]। *অষ্টাধ্যায়ী*র সূত্রকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়, যথা— প্রত্যাহারসূত্রের প্রয়োগ, অধিকারসূত্রের প্রয়োগ ও গণপাঠ সংযোজন। প্রত্যাহারে দৃশ্যমান দুটি বর্ণের মাধ্যমে সূত্রে প্রয়োগকৃত অনেকগুলো বর্ণ বোঝানো সম্ভব। অধিকারসূত্র অন্য সূত্রের উপর অনুবৃত্তির মাধ্যমে কার্যকারী হয়, অধীকৃত সূত্রগুলিতে তার উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। আবার, গণপাঠের প্রত্যেকটি গণে একাধিক শব্দ থাকে। কিন্তু সূত্রে গণের প্রথম শব্দের সাথে ‘আদি’ যোগ করে উল্লেখ করা হয়, সার্বিক গণ উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। এভাবে সূত্র সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

আচার্য পাণিনি অতি সূক্ষ্মতার সাথে সূত্র রচনা করেছেন। হস্তে কুশনির্মিত অঙ্গুরীয়ক ধারণ করে, যত্নসহকারে, পূর্বমুখী হয়ে বসে, সূচিতা পালন করে তাঁর সার্বিক সূত্র রচনা। তাই সূক্ষ্মদৃষ্টিশীল, পবিত্রপরায়ণ, যত্নবান, নিষ্ঠাবান প্রমাণভূত আচার্য পাণিনি-রচিত সূত্রের একটি বর্ণও অনর্থক নয়, সার্বিক সূত্র আর কি? *মহাভাষ্যের* ভাষায় বলা যায়— “প্রমাণভূত আচার্যো দর্ভপবিত্রপাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙ্‌মুখ উপবিশ্য মহতা যত্নেন সূত্রং প্রণয়তি স্ম। তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুং কিং পুনরিয়তা সূত্রেণ।”[১৩]

কাত্যায়ন

পাণিনি-উত্তরকালে বৈয়াকরণদের মধ্যে বার্তিককার কাত্যায়নের স্থান সর্বাগ্রে। তাঁকে কাত্য, কাত্যায়ন, বররুচি — প্রভৃতি নাম দেওয়া হলেও কাত্যায়ন বা বররুচি নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। পণ্ডিতদের মতে, তাঁর আবির্ভাব কাল খ্রি. পূ. তৃতীয় শতক। পাণিনি-সূত্রের সমালোচনা করে তিনি *বার্তিক*-সূত্র রচনা করেন।

পাণিনির সূত্রে যা বলা হয়েছে (উক্ত), যা বলা হয়নি (অনুক্ত) এবং যা অসম্পূর্ণ বা দোষযুক্ত (দুরুক্ত)— কাত্যায়নের *বার্তিক*-সূত্রে তা তুলে ধরা হয়েছে—

"উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ততে।
তং গ্রন্থং বার্তিকং প্রাহুঃ বার্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ ॥"[১৪]

বার্তিকের সংখ্যা কত তা নির্ণয় করা কঠিন। বার্তিকসূত্র নামে কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না। তবে পতঞ্জলির *মহাভাষ্যে* পাণিনি-সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বমোট ১২৪৫টি বার্তিক সংযোজিত হয়েছে[১৫]।

মহর্ষি পতঞ্জলি

আচার্য পাণিনি ও কাত্যায়নের পর ব্যাকরণজগতে মহর্ষি পতঞ্জলির অবস্থান। তাঁকে গোনর্দীয়[১৬] ও গোণিকাপুত্র[১৭] বলা হয়। গোনর্দীয় অর্থাৎ গোনর্দ-দেশে তাঁর জন্ম। আবার, কৃষিকাজ বা কেশচ্ছেদনের সাথে যারা যুক্ত তাদের 'গোণ' বলা হয়। গোণের স্ত্রী গোণিকা। অর্থাৎ পাণিনির পূর্বপুরুষেরা কৃষিকাজ বা কেশচ্ছেদের সাথে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া, বিচিত্র প্রতিভার উপমা হিসেবে তাঁকে অনন্তনাগের অবতারের সাথে তুলনা করা হয়[১৮]। তিনি শুঙ্গবংশীয় রাজা পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন[১৯]। সেই হিসেবে তাঁর আবির্ভাব কাল খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতক মনে করা হয়।

মহাভাষ্য

মহর্ষি পতঞ্জলি রচিত ব্যাকরণগ্রন্থের নাম *মহাভাষ্য*। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*র উপর ভাষ্যমূলক গ্রন্থই *মহাভাষ্য*। *অষ্টাধ্যায়ীর* ৮টি অধ্যায়ের ৩২টি পাদকে সেখানে সর্বমোট ৮৪টি আহ্নিকে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে *অষ্টাধ্যায়ী*র সকল সূত্রের বর্ণনা সেখানে আসে নি, কিছু সূত্র বাদ পড়েছে। পাণিনিসূত্রের সরল ব্যাখ্যার পাশাপাশি ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলিরও ব্যাখ্যা *মহাভাষ্যে* দেওয়া হয়েছে। *মহাভাষ্যের* লক্ষণ প্রসঙ্গে *পরাশরোপপুরাণে* বলা হয়েছে—

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুকারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥"[২০]

মহাভাষ্যের বর্ণনা অনেকটা আক্ষেপ ও সমাধানমূলক। 'আক্ষেপ' অর্থ দোষ উদ্‌ঘাটন এবং 'সমাধান' অর্থ নিরাকরণ। এভাবে *মহাভাষ্য* একটি বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। পতঞ্জলির *মহাভাষ্যের* ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ পরিহার করে ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে তিনি বোধব্য বিষয়গুলি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যুক্তির সাথে উপস্থাপন করেছেন, ঠিক যেন কদম্বপুষ্পের বিন্যাস[২১]। তাছাড়া, ভাষ্যের মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইষ্টি রচনা করা হয়েছে। সাধুশব্দ নির্ধারণে যে স্বতন্ত্রবচন তাই ইষ্টি। এবিষয়ে বৈয়াকরণ নাগেশভট্ট বলেন— "ব্যাখ্যাতৃত্বে ঽপ্য-স্যেষ্ট্যাদিকথনে-না ঽস্বাখ্যাতৃত্বাদিতরভাষ্য-বৈলক্ষণ্যেন মহত্ত্বম্"[২২]। একারণে পতঞ্জলির ভাষ্যকে *মহাভাষ্য* বলা হয়।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি— এই তিনজন বৈয়াকরণকে একসাথে 'ত্রিমুনি ব্যাকরণম্' বলা হয়। "যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্"— অনুসারে পাণিনি ও কাত্যায়নের মধ্যে বিরোধ হলে কাত্যায়নের এবং পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির মধ্যে বিরোধ হলে পতঞ্জলির মতামতই গ্রহণযোগ্য।

জয়াদিত্য ও বামন

পতঞ্জলি-উত্তরকালে সংস্কৃত ব্যাকরণচর্চা দুটি ধারায় বিভক্ত— *অষ্টাধ্যায়ী*র ব্যাখ্যা-ভিত্তিক ও *মহাভাষ্যের* ব্যাখ্যাভিত্তিক। জয়াদিত্য ও বামন *অষ্টাধ্যায়ী*র উপর টীকা রচনা করেন। তাঁদের রচিত ব্যাকরণগ্রন্থের নাম *কাশিকাবৃত্তি*। "কাশয়তি প্রকাশয়তি সূত্রার্থমিতি ব্যুৎপত্ত্যা নিষ্পন্নঃ কাশিকাশব্দঃ"[২৩]। *কাশিকাতে অষ্টাধ্যায়ী*র সূত্রের ক্রমকে অক্ষুণ্ন রেখে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গ-এর মতে ৬৬০ খ্রি. বৈয়াকরণ জয়াদিত্যের মৃত্যু হয়[২৪]। পণ্ডিতদের তাই ধারণা, *কাশিকার* প্রথম পাঁচ অধ্যায় জয়াদিত্যের রচনা। শেষ তিন অধ্যায় জয়াদিত্যের মৃত্যুর পর আচার্য বামন-কর্তৃক রচিত হয়।

ভর্তৃহরি

সংস্কৃত ব্যাকরণজগতে ভর্তৃহরি একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। তিনি *মহাভাষ্যদীপিকা* ও *বাক্যপদীয়* গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গ-এর মতে ৬৫০[২৫] খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। অতএব, খ্রি. ৭ম শতকে তাঁর আবির্ভাব কাল মনে করা হয়।

মহাভাষ্যদীপিকা মহাভাষ্যের ওপর লিখিত ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ। এর একটি ফটোকপি চেন্নাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে[২৬]। সম্প্রতি ভাণ্ডারকার অরিয়েন্টল রিচার্স ইন্সিটিউট থেকে পণ্ডিত কাশীনাথ অভয়ঙ্করের সম্পাদনায় *মহাভাষ্যদীপিকার* প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যাকরণশাস্ত্রের দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ *বাক্যপদীয়* তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত— ব্রহ্ম, বাক্য ও পদকাণ্ড। ব্রহ্মকাণ্ডে অখণ্ড ব্রহ্মের সাথে শব্দব্রহ্মের তুলনা, বাক্যকাণ্ডে বাক্যের সংজ্ঞা ও বাক্যার্থের আলোচনা এবং পদকাণ্ডে পদ ও পদের অর্থবিষয়ক আলোচনা ধাপে ধাপে স্থান পেয়েছে। সার্বিক আলোচনা ছন্দোবদ্ধভাবে করা হয়েছে।

কৈয়ট

খ্রি. ১১'শ শতকের বৈয়াকরণ কৈয়ট *মহাভাষ্যের* উপর *মহাভাষ্যপ্রদীপ* নামক টীকা রচনা করেন। কৈয়টের পিতার নাম জৈয়ট। তিনি একজন উপাধ্যায় ছিলেন। "ইত্যুপাধ্যায়-জৈয়ট-পুত্র-কৈয়ট-কৃতে মহাভাষ্যপ্রদীপে----"[২৭]। গুণগতবিচারে প্রদীপ-টীকার মান অনেক উন্নত। পরবর্তীকালে বহু বৈয়াকরণ এর উপর নতুন টীকা রচনা করেন। চিন্তামণি, রামচন্দ্র সরস্বতী, ঈশ্বরানন্দ সরস্বতী, অন্নংভট্ট, নারায়ণ শাস্ত্রী, নাগেশভট্ট প্রমুখরা টীকাকার হিসেবে প্রসিদ্ধ।[২৮]

ভট্টোজিদীক্ষিত

আচার্য পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*র সূত্রগুলি বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত নয়। তাই *অষ্টাধ্যায়ীর* সার্বিক সূত্রের পাঠ ব্যতীত বালপ্রবেশীদের জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন দুরূহ হয়ে পড়ে। সেই ঘাটতি পূরণের লক্ষে বৈয়াকরণ ভট্টোজিদীক্ষিত (আনু. খ্রি. ১৭'শ শতক) *অষ্টাধ্যায়ী*র সার্বিক সূত্রকে গ্রহণ করে বিষয়ভিত্তিক ১৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* রচনা করেন। অধ্যায়গুলি হলো— সংজ্ঞাপ্রকরণ, পরিভাষাপ্রকরণ, সন্ধিপ্রকরণ, সুবন্তপ্রকরণ, অব্যয়প্রকরণ, স্ত্রীপ্রত্যয়প্রকরণ, কারকপ্রকরণ, সমাসপ্রকরণ, তদ্ধিতপ্রকরণ, তিঙন্তপ্রকরণ, প্রক্রিয়া-প্রকরণ, কৃদন্তপ্রকরণ, বৈদিকপ্রকরণ ও স্বরপ্রকরণ।

প্রতিটি সূত্রের সাথে গ্রন্থকারের স্বকৃত *দীক্ষিত*-টীকা ও উদাহরণ সংযোজন করা হয়। টীকা ও উদাহরণের ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল। এসকল সংযোজন গ্রন্থের মানকে ঋদ্ধ করেছে এবং ব্যাকরণপিপাসুদের কাছে আজ *সিদ্ধান্তকৌমুদী* গ্রন্থটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম লক্ষ্মীধর, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রঙ্গজিভট্ট। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শেষকৃষ্ণ তাঁর গুরু[২৯]। *দীক্ষিত*-টীকা ছাড়াও *সিদ্ধান্তকৌমুদীর* ওপর ভট্টোজিদীক্ষিত *প্রৌঢ়মনোরমা* নামক টীকা রচনা করেন। এছাড়া, পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ীর* ওপর তিনি *শব্দকৌস্তভ* নামক টীকা রচনা করেন। পরবর্তীকালে *সিদ্ধান্তকৌমুদীর* উপর বহু টীকা রচিত হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতীকৃত (১৮'শ শতক) *তত্ত্ববোধিনী* এবং বাসুদেবদীক্ষিতকৃত (১৮'শ শতক) *বালমনোরমা* টীকা দুটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

নাগেশভট্ট

ব্যাকরণজগতের বিস্তৃত বনভূমিতে বৈয়াকরণ নাগেশভট্ট একটি উর্বর ক্ষেত্র, যেখানে বহুবিধ ব্যাকরণবৃক্ষের জন্ম হয়েছে। পণ্ডিত বেলভলকর তাঁকে "Prolific writer"[৩০] (উৎপাদনশীল রচয়িতা) বিশেষণ দিয়েছেন। নাগেশভট্ট একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। আনুমানিক ১৭'শ-১৮'শ শতক তাঁর আবির্ভাব কাল মনে করা হয়। তাঁর পিতার নাম শিবভট্ট, মাতার নাম সতীদেবী— "শিবভট্টসুতো ধীমান্ সতীদেব্যাস্তু গর্ভজঃ"[৩১]। ব্যাকরণবিষয়ে তাঁর নয়টিরও অধিক গ্রন্থ রয়েছে, যথা— *মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত*, *পরিভাষেন্দুশেখর*, *বৃহৎমঞ্জূষা*, *লঘুমঞ্জূষা*, *পরমলঘুমঞ্জূষা*, *বৃহৎশব্দেন্দুশেখর*, *লঘুশব্দেন্দুশেখর*, *শব্দরত্ন* ও *বিষামী* ইত্যাদি।

বরদরাজ

ভট্টোজিদীক্ষিতের শিষ্য বরদরাজ (আনু. খ্রি. ১৭'শ শতক) *লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী* রচনা করেন, যা *সিদ্ধান্তকৌমুদীরই* সংক্ষিপ্ত রূপ। গ্রন্থটিতে নতুনত্ব বা স্বকীয়তা না থাকলেও এর ভাষা সহজ-সরল এবং বিষয়বিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য রয়েছে। পাণিনি-প্রবেশেচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থটি সহায়ক— "পাণিনিপ্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীম্"[৩২]। নিজ গুরুর সন্তুষ্টার্থে পরবর্তীতে তিনি বিস্তৃত আকারে *মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী* রচনা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, বৈদিক সাহিত্যের সংহিতাভাগের মধ্যেই ব্যাকরণশাস্ত্র রচনার মূল বীজের সৃষ্টি। *বেদাঙ্গের* যুগে শব্দের গঠন, উচ্চারণ, ব্যবহারিক প্রয়োগ ইত্যাদি শাখাসহ ব্যাকরণশাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। *প্রাতিশাখ্যের* যুগে বেদের প্রতি শাখাভিত্তিক ব্যাকরণশাস্ত্র বিস্তার লাভ করে। *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* যুগে ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রসারের পাশাপাশি বিজ্ঞ বৈয়াকরণেরা সমাজে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর, ভাষাশিল্পের মাধ্যমে শাস্ত্র তথা সাহিত্যচর্চাকে ব্যাকরণশাস্ত্রের একটি সংবিধিবদ্ধ নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই উদ্দেশ্যে আচার্য পাণিনি (আনু. খ্রি. পূ. ৪র্থ শতক) সম্পূর্ণ সূত্রাকারে রচনা করেন *অষ্টাধ্যায়ী*। আবার, সূত্রের সংক্ষিপ্ততা ভেঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলির মাধ্যমে ব্যাকরণশাস্ত্রের ভাষ্যমূলক গ্রন্থ *মহাভাষ্য* রচিত হয়। ব্যাকরণশাস্ত্রকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু হয়। অতঃপর, সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে বালপ্রবেশীদের সহজতর প্রবেশের তাগিদে বৈয়াকরণ ভট্টোজিদীক্ষিতের হাতে একে বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করে রচিত হয় *বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তকৌমুদী*। এভাবে উত্তরোত্তর সহজ থেকে সহজতর পথে সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র রচনার ধারা চলমান রয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম সম্পা., *ব্যাকরণ-মহাভাষ্য* (কলকাতা: দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণসজ্ঘ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ), পস্পশাহ্নিক, পৃ-৪৩।

২ ভট্টি, *ভট্টিকাব্যম্*, বাসুদেব শর্মা সম্পা. (বম্বে: নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৪), ভট্টিকাব্যসুধারণা, শ্লোক-১।

৩ রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পা., *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৭), ৪/৫৮/৩;
দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম সম্পা., *ব্যাকরণ-মহাভাষ্য, প্রাগুক্ত*, পস্পশাহ্নিক, পৃ-১০১।

৪ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *মনুসংহিতা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স, ২০০২), ১২/৯৮।

৫ বাল্মীকি, *রামায়ণম্*, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা. (কলকাতা: বেনীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ), ৪/৩/২৯।

৬ কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *মহাভারতম্*, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ সম্পা. (কলিকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), উদ্যোগপর্ব, ৪৩/৬২।

৭ বিজনবিহারী গোস্বামী সম্পা., *যজুর্বেদসংহিতা* (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), *শুক্লযজুর্বেদ* ১৯/৭৭।

৮ সূর্যকান্তশাস্ত্রী সম্পা., *ঋক্তন্ত্র*, (লাহোর: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৩৩), ১/৪।

৯ "সর্বে সর্বপদাদেশা দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেঃ"— গুরুপ্রসাদশাস্ত্রী সম্পা., *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্*, প্রথম খণ্ড (দিল্লী: প্রতিভা প্রকাশন, ১৯৯৯), "দাধা ঘ্বদাপ্" (পা. ১/১/২০) সূত্রের ব্যাখ্যায়।

১০ পুরুষোত্তমদেব, *ত্রিকাণ্ডশেষঃ*, শ্রীশীলস্কন্ধ মহানায়ক সম্পা. (বম্বে: শ্রীভেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৯১৬), ২য় কাণ্ড, ব্রহ্মবর্গ, শ্লোক নং ২৪।

১১ কপিলদেব ত্রিপাঠী সম্পা., *পরাশরোপপুরাণম্*, (বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০) ১৮/১৩-১৪।

১২ নাগেশভট্ট, *পরিভাষেন্দুশেখরঃ*, পণ্ডিত সদাশিব শাস্ত্রী সম্পা. (বেনারস: বিদ্যাবিলাস প্রেস, ১৯৩১), পরিভাষা নং-১৩৩।

১৩ গুরুপ্রসাদশাস্ত্রী সম্পা., *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্*, প্রথম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, "বৃদ্ধিরাদৈচ্" (পা. ১/১/১) সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

১৪ কপিলদেব ত্রিপাঠী সম্পা., *পরাশরোপপুরাণম্, প্রাগুক্ত*, ১৮/১৯-২০।

১৫ A. Berriedale Keith, *A history of Sanskrit literature* (London: Oxford University Press, 1956), p-426.

১৬ "গোনর্দীয় আহ"— গুরুপ্রসাদশাস্ত্রী সম্পা., *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্*, প্রথম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, "ন বহুব্রীহৌ" (পা. ১/১/২৯) সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

১৭ "গোণিকাপুত্র–– "— শিবদত্তশর্মা সম্পা., *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্*, দ্বিতীয় খণ্ড (দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, পুনর্মুদ্রণ: ১৯৮৮), "অকথিতঞ্চ" (পা. ১/৪/৫১) সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

১৮ কপিলদেব দ্বিবেদী, *সংস্কৃত-ব্যাকরণ এবং লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী* (বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০), ভূমিকা, পৃ-৩৬-৩৭।

১৯ "ইহাধীমহে", "ইহ বসামঃ", "ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ"— গুরুপ্রসাদশাস্ত্রী সম্পা., *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্*, তৃতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, "বর্তমানে লট্" (পা. ৩/২/১২৩) সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

২০ কপিলদেব ত্রিপাঠী সম্পা., *পরাশরোপপুরাণম্, প্রাগুক্ত*, ১৮/১৫-১৬।

২১ "অস্য ভাষা দীর্ঘপদসমাসরহিতা, লঘুলঘুতরবাক্যকদম্বকৈর্গুম্ফিতা, প্রশ্নোত্তরসনাথা, সরলা, সরসা, মঞ্জুলা চাহস্তি।"— অশোকচন্দ্র গৌড় শাস্ত্রী, *সংস্কৃতব্যাকরণশাস্ত্রেতিহাসবিমর্শঃ* (বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা সংস্থানম্, ১৯৯৭), দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ-৮২।

২২ গুরুপ্রসাদশাস্ত্রী সম্পা., *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্*, প্রথম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, মহাভাষ্যের শুরুতে কৈয়টকৃত নান্দীশ্লোকের (৫নং) ব্যাখ্যায় নাগেশভট্টকৃত 'প্রদীপোদ্যোত' টীকা।

২৩ অশোকচন্দ্র গৌড় শাস্ত্রী, *সংস্কৃতব্যাকরণশাস্ত্রেতিহাসবিমর্শঃ*, *প্রাগুক্ত*, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ-১৬১-১৬২।

২৪ Shripad Krishna Belvalkar, *Systems of Sanskrit Grammar* (Poona: Aryabhushan Press, 1915), p-35.

২৫ সন্তরাম সম্পা., *ইৎ-সিঙ্গ কী ভারত-যাত্রা* (এলাহবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড), চৌত্রিশ-অধ্যায়, পৃ-২৭৪-২৭৫।

২৬ অশোকচন্দ্র গৌড় শাস্ত্রী, *সংস্কৃতব্যাকরণশাস্ত্রেতিহাসবিমর্শঃ*, *প্রাগুক্ত*, দশম অধ্যায়, পৃ-২২৬।

২৭ মহাভাষ্যের ব্যাখ্যাকালে প্রতিটি আহ্নিকের সর্বশেষ বাক্যে কৈয়টের 'প্রদীপ' টীকায় এই তথ্য দেওয়া হয়েছে।

২৮ যুধিষ্ঠির মীমাংসক, *সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র কা ইতিহাস* (হরিয়ানা: রামলাল কাপুর ট্রাস্ট প্রেস, ১৯৮৪), প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, পৃ-৪২৪।

২৯ নাগেশভট্ট, *লঘুশব্দেন্দুশেখরঃ*, নরহরি শর্মা সম্পা. (বেনারস: বিদ্যাবিলাস প্রেস, ১৯২৭), প্রথম ভাগ, ভূমিকা, পৃ-৮-৯।

৩০ Shripad Krishna Belvalkar, *Systems of Sanskrit Grammar*, *op cit.*, p-49.

৩১ নাগেশভট্ট, *লঘুশব্দেন্দুশেখরঃ*, নারায়ণশাস্ত্রী সম্পা. (কাশী: মেডিকেল হল মুদ্রণযন্ত্র, ১৮৮৯), নান্দীশ্লোক।

৩২ কপিলদেব দ্বিবেদী সম্পা., *সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী*, *প্রাগুক্ত*, বরদরাজকৃত নান্দীশ্লোক।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

বিশ্বমৈত্রী অনুধ্যানে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন
(Reflection of Universal Amity in Studying Sanskrit Literature)

Dr. Chandana Rani Biswas*

Abstract: No one is different in this universe. Everyone is *one's own* : *relative of 'self'*. This realisation is the reflection of the universal amity. The Vedic sages, opening their eyes, saw the universe and realised that in trees, creepers, mountains, rivers, streams, every being and in all human beings exist the one and the same supreme soul. The creator is in the creation and He exists in all. These great thoughts of the sages are reflected in Sanskrit literature. The message of universal amity, reflected in Vedic and Sanskrit literature, is also very much relevant in the present time. The present world is very chaotic; the idea of amity is disappearing fast from the human being. In this situation, this article relevantly seeks to connect the views of universal amity to our ancient literature and the present time.

বিশ্বের সকলেই আপন, পরম আত্মীয় কেউ পর নয়– এমন অনুভব করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি মৈত্রীপূর্ণ আচরণই বিশ্বমৈত্রীবোধ। বৈদিক সাহিত্য তথা সংস্কৃত সাহিত্যের নানা গ্রন্থে রয়েছে বিশ্বমৈত্রীর কথা, বিশ্বের প্রতিটা বৃক্ষ-লতা, নদ-নদী, জীব-জগৎ ও মানুষকে ভালোবাসার কথা। ঋগ্বেদের ঋষিকবি এ বিশ্বের সবকিছুকে দেখেছেন প্রেমময় ও আনন্দময় দৃষ্টিতে। এ বিশ্বের প্রতি ধূলিকণা থেকে শুরু করে বৃক্ষরাজি, আলো-বাতাস, জীব-জগৎ, মানুষ সকলের মাঝে পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন তাঁরা। এ বিশ্বের সকলে পরম আত্মীয় এমন বিশ্বমৈত্রী অনুধ্যানে নিরত ঋষিকবি তাই আনন্দচিত্তে গেয়েছেন বিশ্বকে ভালোবাসার গান :

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥
মধু নক্তমুতোষসোমধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ৯০/৬-৮)

– মধু বহিছে সকল বাতাস। মধু ক্ষরিছে নদ ও নদী। মধু হোক আমাদের ওষধি সকল। মধু হোক রজনী ও ঊষা । মধুময় হোক পৃথিবীর ধূলিকণা। মধু হোক আমাদের পালয়িতা ঐ দ্যুলোক। মধুময় হোক আমাদের বনস্পতি। মধুময় হোক ঐ সূর্য। মধুময় হোক আমাদের ধেনুগণ।
সকলের প্রতি কী গভীর ভালোবাসা অনুভব করেছিলেন ঋষিকবি !মানুষ হতে আরম্ভ করে এই বিশ্বভুবনের বৃক্ষরাজি, পশুপাখিসকলের জন্য শুভকামনা এবং মৈত্রীবন্ধনের চেষ্টা ছিল বৈদিক ঋষির ধ্যানে ও সাধনায়। ঋগ্বেদের ঋষির এই অসাধারণ ভাবনার প্রতিফলন অথর্ববেদেও দেখা যায়। ঋষি অথর্বার দৃষ্টিতে এই পৃথিবী পরম মমতায় আমাদের সকলকে ধারণ করেছে। মায়ের মতো করছে লালন-পালন। তাই এই পৃথিবী আমাদের মা। আমরা পৃথিবীর সন্তান।ঋষি কবির ভাবনায়-চিন্তায়-দর্শনে পৃথিবী হয়েছে মা, মাতা বসুন্ধরা। "... মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।" (অথর্ব, ১২/১/১২) – পৃথিবী আমার মা, আমি তাঁর পুত্র।

ভেবে বিস্ময় লাগে সেই কয়েক হাজার বছর পূর্বে বৈদিক কবি পরম উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগতের সকল মানুষ মাতা বসুন্ধরার সন্তান। সকলকে মাতা বসুন্ধরা মাতৃস্নেহে লালন-পালন করছেন। তাহলে পৃথিবীর সকলেই আমরা পরস্পর পরম আত্মীয়। মাতা আমাদের এক, তাই আমরা অভিন্ন। সকলের সাথে আমাদের

---

* Associate Professor, Department of Sanskrit, University of Dhaka, Bangladesh.

রয়েছে আত্মিক বন্ধন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই পৃথিবীর সকল মানুষ আমাদের স্বজন। ঋষি কবির এই উপলব্ধি, এই উদার ভাবনাই আমাদেরকে বিশ্বমৈত্রীবোধে প্রাণিত করে।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে–"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা এই জগতের সকল বস্তু আচ্ছাদিত । ঈশ্বর সবার মধ্যে বিরাজিত। তিনিই এই বিশ্বের অন্তরে থেকে বিশ্বজগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। যিনি উপনিষদের এই মন্ত্রকে প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁর নিকট এ বিশ্বের সবই আপন। তিনি স্বার্থপরের মতো কখনও একা ভোগ করেন না। তিনি ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ভোগ করেন, কারও জিনিসের প্রতি লোভ করেন না, কারও কিছু অপহরণও করেন না।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন:

> "ইহার অর্থ এমন নহে যে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী' এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যন্ত বৃহৎ – সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' – ইহা কাজের কথা – ইহা কাল্পনিক কিছু নহে – ইহা কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণ দ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী, স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।" (ধর্মপ্রচার, রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-৪৭৮)

পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসার মূলমন্ত্র হলো সবার মাঝে নিজেকে দর্শন করা। এ সম্পর্কে ঈশোপনিষদের ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হয়েছে:

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ঈশ/৬

– যিনি আব্রহ্ম সকল কিছুর মধ্যে নিজের আত্মাকেই দর্শন করেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না। এখানে ভূমাদর্শী নিজের আত্মাকেই সর্বাত্মারূপে উপলব্ধি করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, বিশ্বের সবকিছু তাঁরই অন্তরে রয়েছে, হৃদয়ের বাইরের কেউ নয়।

প্রকৃত আত্মদর্শী তাই অন্যের দুঃখে দুঃখিত হন। আর অপরের সুখে আপন সুখ অনুভব করেন। কিন্তু আমরা যদি নিজেকে সংকুচিত করে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করে রাখি, তাহলে জীবনে দুঃখ নেমে আসে। কেননা সংকীর্ণতাই দুঃখ এবং বিস্তারেই সুখ। নিজেকে বিস্তার করলেই বিশ্বের সবার মধ্যে নিজেকে অনুভব করা যায়। বিশ্বের সবার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে দর্শন করা যায়। তখন এই বোধ জন্মে যে এ বিশ্বে কেউ পর নয়; সবাই আপন, পরম আত্মীয়। সকলের সাথে মৈত্রীভাবনায় যুক্ত হলে মনের দুঃখ-কালিমা দূরীভূত হয়। আলোকিত হয় মন, সকলেই হয় স্বজন। আনন্দময় হয় জীবন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরউক্তি:

> পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে, সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ। যিনি এই অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া। আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে। কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং, তাঁহাকেই দেখে। অন্যকে যখন আঘাত করিতে যাই, তখন সেই অদ্বৈতের উপলব্ধিকে হারাই, সেইজন্য তাহাতে দুঃখ দিই ও দুঃখ পাই; নিজের স্বার্থের দিকে যখন তাকাই, তখন সেই অদ্বৈতং প্রচ্ছন্ন হইয়া যান, সেইজন্যে স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত দুঃখ। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তং শিবমদ্বৈতম্, রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা- ৪৯৯)

কবি নজরুল তাঁর 'ঈশ্বর' কবিতায় সর্বভূতে আত্মাকে অনুভব করার কথা বলেছেন। সকলের মাঝে তিনি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন আপন অনুভবে, অখণ্ড দৃষ্টিতে :

সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি।

ঈশোপনিষদের সপ্তম মন্ত্রে বলা হয়েছে –

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

– যিনি সর্বভূতে নিজের আত্মাকেই অনুভব করেন, তখন তাঁর শোক বা মোহ হবে কোথা থেকে? অর্থাৎ আমাদের একত্বের অনুভূতি হলে শোক কিংবা মোহ আসতে পারে না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য অমৃতজিজ্ঞাসু মৈত্রেয়ী দেবীকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কে কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥ –বৃহদারণ্যক,২/৪/১৪

– যেখানে দুই আছে, সেখানে একে অপরকে আঘ্রাণ করে, দেখে, আস্বাদন করে, অভিবাদন করে, শ্রবণ, মনন বা স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু এর নিকট যখন সকলই আত্মা হলো, তখন কীরূপে কাকে দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, অভিবাদন, শ্রবণ, মনন বা স্পর্শ করবে? কীরূপে কাকে জানবে?

উপনিষদ ক্ষুদ্র স্বার্থের গুরুত্ব না দিয়ে বৃহৎ স্বার্থের গুরুত্ব দিয়েছে। কঠোপনিষদে মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'প্রেয়' ও 'শ্রেয়' সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রেয় সমগ্রের নয়, অংশের তৃপ্তি খোঁজে। প্রেয়বোধ মানুষের নিতান্তই ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার আনন্দ। ব্যক্তিগত স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিলেই সেটা প্রেয়। যিনি সমগ্র মানবের কল্যাণ না চেয়ে, কেবল দেহের সুখ চান তিনি প্রেয়কে বরণ করেন। আবার নিজের স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র সমাজের কল্যাণের বিরোধ বাধলে, নিজের স্বার্থকেই গুরুত্ব দেন, তিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন। কিন্তু আমিত্বের যখন বিস্তার ঘটে, তখন ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহৎ স্বার্থের দিকে মন ধাবিত হয়। এটাই শ্রেয়বোধ। অর্থাৎ শ্রেয়বোধ হলো সকলের মঙ্গলের জন্য নিবেদিত। শ্রেয় বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিরপ্রেরণা দেয়। শ্রেয়বোধই ব্যক্তির কল্যাণ এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে সমগ্র জগতের মঙ্গল আনতে পারে। কঠোপনিষদ জগতের সকলের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই শ্রেয়কে অবলম্বন করে জীবন যাপনের জন্য উপদেশ দিয়েছে।

অন্যৎ শ্রেয়ো ঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ কঠ. ১/২/১

– শ্রেয় এবং প্রেয় পরস্পর ভিন্ন। উভয়ের প্রয়োজনও ভিন্ন। শ্রেয়ের প্রয়োজন মুক্তিলাভে, প্রেয়ের প্রয়োজন ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগে। উভয়ই পুরুষকে আবদ্ধ করে। এই দুইটির মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁর কল্যাণ হয়, আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরমার্থ হতে বিচ্যুত হন।

উপনিষদের এই শ্রেয়বাদ মানুষের ব্যক্তিগত লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা দূর করার শিক্ষা দেয়। শ্রেয়বাদকে জীবনে লালন করার জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ সংযত জীবন যাপন। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গুলির রয়েছে আসক্তি। এ কারণে প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ। উপনিষদের নির্দেশনা হলো ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা। এতে শ্রেয় লাভ হয়। তাই ইন্দ্রিয় দমনের প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের। কঠোপনিষদে একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে এই ভাবনাটি উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্বের সাথে তুলনা করা হয়েছে।অশ্বকে ছেড়ে দিলে ইচ্ছে মতো উদ্দেশ্যহীন ভাবেবিচরণ করবে। সে তার গন্তব্যে পৌঁছাবে না। সেরূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ না করলে তারা আত্মসুখের প্রতি, ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শ্রেয়ের পথে অর্থাৎ বৃহত্তর কল্যাণের পথে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন ভালো সারথি।যিনি নীতিজ্ঞানসম্পন্ন, পরহিতের জন্য নিবেদিত তিনি দক্ষ সারথির মতো ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে বশে আনতে সমর্থ। কিন্তু যার নীতিজ্ঞান নেই, ইন্দ্রিয়গুলি তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না, যেমন দুষ্ট অশ্ব দুর্বল সারথির নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

প্রেয়ের পথ অনেকটা সহজ। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি।তাই ব্যক্তিস্বার্থকে ত্যাগ করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়। তবে তাকে সহজ করার জন্য উপনিষদ হৃদয়বৃত্তির চর্চার কথা বলেছে। হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি প্রীতিবোধে, মমত্ববোধে নিহিত। অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকলকে আপন জ্ঞান করলে ভালোবাসার জন্ম হয়, সকলের প্রতি প্রীতিবোধ অনুভূত হয়। অন্যের প্রতি প্রীতি জন্মালে তাদের

কল্যাণে স্বার্থত্যাগ সহজ হয়। ঈশোপনিষদে তাই বলা হয়েছে, বিশ্বের সকলেই একই ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপৃত। সকলেই স্বজন পরস্পর আত্মীয়। তাই অন্যকে বঞ্চিত করে ভোগ করতে নেই। সবাইকে নিয়ে ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করার নির্দেশ দিয়েছে উপনিষদ। এই বোধই শ্রেয়ের পথ। তাই শ্রেয়ের পথ বড় কঠিন হলেও পরিণামে তা সার্বজনীন কল্যাণ বয়ে আনে।

> মানুষ তার ইচ্ছামতো শ্রেয় ও প্রেয় যেটিকে খুশি বেছে নিতে পারে; উপনিষদ চিত্রময় ভাষায় এই ভাবটি প্রকাশ করার জন্য বলেছেন – এরা প্রত্যেকেই মানুষের কাছে এসে তার দৃষ্টি ও উৎসাহ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। দুটির মধ্যে প্রেয় তাড়াতাড়ি সুখ-সুবিধা এনে দেয় বলে বেশি আকর্ষণীয়; কিন্তু এর ভেতরটি ফাঁপা – যা কেবল কালে ধরা পড়ে। এদিকে শ্রেয় গোড়ায় কিছুটা কৃচ্ছ্রসাধন করিয়ে নিলেও মানুষের স্থায়ী কল্যাণ সাধনে সহায়ক হয়; এর আকর্ষণ ঘনীভূত রত্নে, যা গুপ্ত আছে গভীরে, ওপরে নয়। ঐ আকর্ষণীয় গভীর তলদেশে পৌঁছুতে হলে একটু ডুব দেওয়া দরকার। (স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, উপনিষদের সন্দেশ, পৃ. ২৬৩-২৬৪)

কোন কর্ম আমাদের শ্রেয়ের পথে প্রাণিত করে? এ সম্পর্কে তৈত্তিরীয় উপনিষদের উপদেশ স্মর্তব্য। সমাবর্তন উৎসবে আচার্য তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে সমগ্র জীবনচর্যাও সংসার জীবন পালনের জন্য উপদেশমূলক অভিভাষণ দিতেন।–

সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। ... সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ । ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্ ।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ । ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥
(তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১/১১/১)

– সত্য কথা বলবে। ধর্মানুষ্ঠান করবে। স্বাধ্যায় থেকে বিচ্যুত হবে না। ... সত্য হতে ভ্রষ্ট হবে না। ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে না। আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নবান হবে। উন্নতি লাভের জন্য মঙ্গলজনক কাজে যুক্ত থাকবে। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে অমনোযোগী হবে না।

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ । মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব।
অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং
সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি ॥ (তৈত্তিরীয় ১/১১/২)

– দেবতার কার্য (যজ্ঞাদি) এবং পিতৃকার্য (তর্পণাদি কর্ম) থেকেবিচ্যুত হবে না। মাতা,পিতা,আচার্য এবং অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করবে। লোকসমাজে যে সকল কর্ম নিন্দনীয় বলে বিবেচিত,কখনও তা করবে না। আমাদের যে-সকল কর্ম শোভন বলে গণ্য তারই অনুসরণ করবে, অন্য কিছু নয়।

অসাধারণ এই সমাবর্তন বক্তৃতা। শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুর এই উপদেশে নিহিত রয়েছে শ্রেয়বোধের আলোকবর্তিকা। যা বর্তমান যুগেও সকলের অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে নিজেকে বিশ্বলোকের সাথে, বৃহতের সাথে বিস্তারের আহ্বান জানানো হয়েছে। মহর্ষি সনক তাঁর শিষ্য নারদ মুনিকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন : নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্ – অর্থাৎ অল্পে সুখ নেই, ভূমাতেই সুখ। ভূমা হচ্ছে ব্রহ্ম, ভূমা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। নিজেকে বিস্তার করার জ্ঞান, বিশ্বলোকে নিজেকে সম্প্রসারিত করার জ্ঞান হচ্ছে ভূমা। ভূমার সাধনা তাই আমিত্বকে বিস্তার করে তোলা। ছোট আমির লালনে আসক্তি জন্মে। তাই ছোট আমিকে লালন করলে জীবনে দুঃখ অনিবার্য। ছোট আমি স্বার্থের আমি, সংকীর্ণ আমি। আর এই আমিত্ব যখন ব্যাপ্তিলাভ করে, তখন স্বার্থ পরার্থে পরিণত হয়। ভূমাবোধের দ্বারা আমিত্ব ব্যাপ্তি লাভ করে। এই ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন 'বৃহৎ আমি'র সাধক।

ভূমাবোধ হৃদয়ে জাগ্রত হলে মানুষ তার নিজের পরিবার, সমাজ, দেশ এবং সমগ্র বিশ্বকে আপন করে নেয়। তাই একই সঙ্গে তিনি যেমন নিজ পরিবার ও সমাজের সদস্য হয়ে ওঠেন, তেমনি আবার নিজ দেশের ও বিশ্বের নাগরিক হয়ে ওঠেন। তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয় বিশ্বৈক্যবোধ, বিশ্বপ্রেম। ভূমাদর্শী তাই উদারচরিত। বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

অয়ং নিজো পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥ – পঞ্চতন্ত্রম্ (অপরীক্ষিতকারকম্, কথা- ৩/৩৮)

– এ আমার আপন, ও পর– সংকীর্ণমনা লোকের মনেই এ ভাব স্থান পায়। কিন্তু উদারমনা লোকের কাছে সারা পৃথিবীর লোকই তাঁর আত্মীয়।

বিশ্বমৈত্রী ভাবনার উদ্বোধনে শঙ্করাচার্যকৃত 'অন্নপূর্ণাস্তোত্র' প্রণিধানযোগ্য। এখানে শিব ও পার্বতীকে সকলের পিতা-মাতারূপে ভাবা হয়েছে। আর শিবভক্ত বা তাঁর অনুসারীদের ভাবা হয়েছে পরম বন্ধুরূপে। এবং স্বদেশকে ভাবা হয়েছে ত্রিভুবনরূপে।

মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ (অন্নপূর্ণাস্তোত্র- ১২)

চমৎকার ভাবনা এটি। আমরা যদি একজনকে বিশ্বপিতা হিসেবে মনের মধ্যে স্থান দিই, তখন সকলেই হয়ে যাবে আমাদের বন্ধু বা ভাই কিংবা আত্মীয়। আর সকল দেশকেই ভাবতে পারব নিজের দেশরূপে। নিজের লোক পরের লোক বলে থাকবে না কেউ, থাকবে না নিজের দেশ পরের দেশ বলে কিছুও। সবাই হবে আপন, অতি আপন। এরূপ ভাবনায় ভাবিত হলে দূরীভূত হবে দ্রোহ বিদ্বেষ। স্থাপিত হবে অখণ্ড বিশ্বমৈত্রী।
মহত্ত্ব বিষয়ে মহাভারতে ধর্ম সম্পর্কে কিছু বক্তব্য স্মর্তব্য। ধর্ম মানুষেরমানবিকবৃত্তির উৎকর্ষসাধক। সর্বভূতের কল্যাণচিন্তা এবং সর্বভূতে অদ্রোহভাব ধর্মের সারবস্তু।প্রকৃত ধার্মিক জগতের সবকিছুর মধ্যে নিজেকে অভেদ মনে করে। সমস্ত জগতের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আপনার সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে অনুভব করাই মহাভারতের পরম ধর্ম। মহাভারতে সাধুব্যক্তির স্বভাব সম্পর্কে উল্লেখ আছে:

মানসং সর্ব্বভূতানং ধর্ম্মমাহুর্মনীষিণঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মনসা শিবমাচরেৎ ॥ শান্তিপর্ব, ১৯৩/৩১
অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যঃ স ধর্ম্মঃ সতাং মতঃ ॥
অদ্রোহঃ সত্যবচনং সংবিভাগো দয়া দমঃ ॥ শান্তিপর্ব, ২১/১১

পরের অপকার না করা, সত্য বাক্য বলা, বিভাগ করে যথাকালে ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করা, দয়া, ইন্দ্রিয়দমন, পরের হিংসা না করে যে ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাই মূলত সজ্জনদের ধর্ম।
এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন:

> ধর্ম্মের, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের মূল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এজন্য সর্ব্বভূতের হিতসাধন আমাদের ধর্ম্ম, কেন না বলিয়াছি যে – সকল বৃত্তিকেই ঈশ্বরমুখী করাই মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্যে। যদি সর্ব্বভূতের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে পরেরও হিতসাধন যেমন আমার ধর্ম্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্ম্ম। কারণ, আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্গত; ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরেরও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম।(ধর্ম্মতত্ত্ব: বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৬৫২)

অহিংসা ও সর্বভূতে মৈত্রীভাবনা পরমধর্ম। শান্তিপর্বে তুলাধার-জাজলি-সংবাদে তপস্বী তুলাধার জাজলিকে ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন:

বেদাহং জাজলে ধর্ম্মং সরহস্যং সনাতনম্ ।
সর্ব্বভূতহিতং মৈত্রং পুরাণং যং জনা বিদুঃ ॥
অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিঃ স পরো ধর্ম্মস্তেন জীবামি জাজলে ॥
সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্ব্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স ধর্ম্মং বেদ জাজলে ॥শান্তিপর্ব, ১৫৬/ ৫-৬,৯

– হে জাজলি, আমি সনাতন ধর্মের বিশেষ রূপ সম্পর্কে জানি। সর্বভূতের হিতচিন্তা ও কল্যাণ কামনাই ধর্ম। এমন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করা উচিত যেন নিজ কর্মদ্বারা কারো অমঙ্গল না হয়। প্রাণিগণের অপকার না করে, কিংবা অল্প অপকার করে যে জীবিকা নির্বাহ হয়, তাই পরম ধর্ম। যিনি সমগ্র বিশ্বের সুহৃৎ, বিশ্বকল্যাণে নিরত, যিনি কায়মনোবাক্যে নিজেকে বিশ্বহিতে উৎসর্গ করেছেন, তিনিই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ জানতে পেরেছেন।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। বনপর্ব, ২০৬/৭৪
স সর্বযজ্ঞৈরীজানঃ প্রাপ্নোত্যভয়দক্ষিণাম্ ।
ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন । শান্তিপর্ব, ২৫৬/২৯

– অহিংসাই ধর্মের মূলকথা। অহিংসা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বভূতে মৈত্রী ও সমগ্র বিশ্বের শুভকামনা অপেক্ষা বড় ধর্ম আর নেই। যিনি জগতের সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞ করেই যেন

অভয় লাভ করেন। প্রাণিগণের অহিংসা হতে প্রধান ধর্ম জগতে নেই। একমাত্র অহিংসা প্রতিষ্ঠাতেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা। পরহিত সাধনই ধর্ম। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন:

> পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহা হিন্দুধর্ম্মেও বলে, খ্রীষ্ট বৌদ্ধাদি অপর ধর্ম্মেরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শনিক বা নীতিবেত্তাদিগেরও মত। (ধর্ম্মতত্ত্ব: বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,পৃ.৬৫৩)

হিংসা-বিদ্বেষ, পারস্পরিক ভেদজ্ঞানে জর্জরিত বর্তমান পৃথিবী। সবাই যেন কেবল নিজেকেই নিয়ে ব্যস্ত, অপরের দিকে তাকানো কারো সময় নেই। কেবল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিজের ভোগ সর্বস্বতার দিকেই লক্ষ্য। খণ্ড খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুলতে বসেছে সকলেই যে অখণ্ড সত্তার অংশ। সংকীর্ণ ধর্ম সংস্কারের দ্বারা নষ্ট হচ্ছে একতা, অন্য ধর্মের অস্বীকৃতির দ্বারা তিরস্কৃত হচ্ছে বিশ্বমৈত্রী চেতনা। ভিন্ন ধর্মের লোককে মনে করা হয় দূরের কেউ। অন্য দেশের নাগরিক হওয়ায় তাকে আপন ভাবতে পারে না। অধিকাংশ মানুষের জীবনাদর্শ ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণতার আবর্তে হচ্ছে আবর্তিত। অহমিকা ও অহংবোধে আচ্ছন্ন হয়ে অজ্ঞতার অন্ধকূপে মগ্ন হয়েছে মানুষের মন। এখান থেকে মুক্তির উপায় হলো –'সর্বং খলিদ্বং ব্রহ্ম' এ বাণী উপলব্ধি করে জীবনে তা পালন করা। কেননা বিশ্বমৈত্রী চেতনার দ্বারা বিশ্বমানবকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে 'মুর্মূষুপ্রায় পৃথিবী' হবে ধ্বংস। বিনষ্ট হবে মৈত্রীভাবনার, মৃত্যু হবে মানবতার।

বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশ্বমৈত্রী ভাবনাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সকলকে এক স্রষ্টার সৃষ্টি জেনে, পরম আপনজন মনে করে, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন মতবাদ ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, বহুবাদের সঙ্গে সহাবস্থান করে, বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করে গড়ে ওঠে বিশ্বমৈত্রীবোধ। সতত বিশ্বমৈত্রীর অনুধ্যানে অনুরক্ত থাকার আকূতি প্রকাশ পেয়েছে বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যের নানা গ্রন্থে। ঋগ্বেদের ঋষিকবির মতো এই হোক আমাদের সৌভ্রাত্র, প্রীতি ও বিশ্বমৈত্রী বন্ধনের আহ্বান:

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ ।
সমানং মন্ত্রম্ অভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি ॥ (ঋগ্বেদ, ১০/১৯১/২-৪)

– তোমরা সকলে একসঙ্গে চল, একসঙ্গে আলোচনা করো। তোমাদের মানসিকতায় পারস্পারিক সম্মিলন হোক। পূর্বকালে জ্ঞানিগণ যেরূপ সম্মিলিত হয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেছেন, তোমরাও সেরূপ করো। তোমাদের সকলের মত এক হোক, মিলনভূমি এক হোক, মন এক হোক, চিত্ত একবিষয়ে সম্মিলিত হোক। তোমাদের শাশ্বত মঙ্গলের জন্য অন্তরের পরম কল্যাণকর বস্তু নিবেদন করছি। তোমাদের সকলের লক্ষ্য এক হোক, তোমাদের হৃদয় এক হোক, তোমাদের মন এক হোক, তোমাদের যেন হয় পরম ঐক্যসাধন।

তথ্যনির্দেশ

১. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত ও সম্পাদিত](১৯৮৬)। উপনিষদ, অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা
২. করুণাসিন্ধু দাস, সংস্কৃত সাহিত্য পরিক্রমা (২০০৩)। রত্নাবলী, ৩৯-এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা
৩. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী প্রথম খণ্ড(১৯৯৬)। মেসার্স যমুনা প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পালিশিং কোং, ৮/৩ নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা
৪. ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার বাউল (১৯৯৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ৪৮, হেড রোড, বালিগঞ্জ কলকাতা
৫. ক্ষিতিমোহন সেন, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন (২০১০)। পুনশ্চ, ৯-এ, নবীন কুণ্ড লেন, কলকাতা
৬. ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, উপনিষদ ভাবনা, তৃতীয় সংস্করণ: ১১ই জুলাই ১৯৮৭, তারা প্রিন্টার্স, ২৬ নং কে.জি. বোস সরণি, কলিকাতা
৭. শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপনিষদের ভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৮১, নবশক্তি প্রেস, ১২৩, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা-১৪

---

৮. শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, (১৯৪১)। আমাদের পরিচয়, বীণা লাইব্রেরী, প্রথম মুদ্রণ, কলিকাতা
৯. শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক, (১৩৮২ বঙ্গাব্দ)। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক ও লৌকিক),
১০. প্রকাশক: শ্যামাপদ ভট্টাচার্য,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
১১. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৮)। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, প্রকাশক: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আর্য ম্যানসন (নবম তলা), ৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তপোবন (শান্তিনিকেতন) – রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে
১৩. প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯৫, পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪১০
১৪. শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৪
১৫. স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, উপনিষদের সন্দেশ, চতুর্দশ সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৫, নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা
১৬. স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত (১৯৬১)। স্তবকুসুমাঞ্জলি, প্রকাশক: স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা
১৭. M.R.Kale (ed.), Panchatantra of Vishnusharman, Motilal Banarsidass, third edition, Delhi,1982

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

Resemblances of the Hindu Gods and Goddesses in the Japanese Buddhist Pantheon

Dr. Mayna Talukdar*

Abstract: Like the Hindus of India, the Buddhists of Japan worship many gods and goddesses for many purposes. During my post-doctoral research in Japan, I have visited many Japanese monasteries and seen that many Buddhist deities are quite similar to those of the Hindus. In this article, I will explain that some Japanese Buddhist deities, especially Taishaku-Ten, Bon-Ten, Sho-Ten, Benzai-Ten, Kichijō-Ten and Juntei-Kannon resemblances Hindu deities respectively Indra, Brahma, Ganeśa, Saraswatī, Lakxmī and Durga. I will further show that this is due to the fact that both Hinduism and Buddhism originated from the same place, ie. India.
Keywords: Japanese Buddhist pantheons that include Hindu deities. Agni, Ka-Ten. Viṣṇu, Naraen-Ten. Pṛthivī, Ji-Ten. Saraswati, Benzai-Ten. Lakṣmī, Kichijō-Ten.

Introduction

Japanese pantheon is home to a number of deities that are remarkably identical to well-known Hindu deities. This page will provide an overview of these related deities, which were initially adapted from Hindu tradition and are now venerated in the Buddhist Pantheon in a modified form. Additionally, I will discuss the perspectives that Japanese Buddhists share towards these deities. I shall contrast a few of the most significant deities in relation to the Indian and Japanese contexts because they have undergone several alterations on their journey to Japan.

Agni (In Japan Ka-Ten)

Agni is a well-known deity in the Vedic mythology for his power over fire. He has control over the fire in both the sun and the lightning. The fire which he possesses signifies sacrifice alongside with the symbol which is of purification and perfection. Therefore, he has the capabilities of leading one to Enlightenment. He is also the mouth of the gods and acts as a carrier for the offerings that are presented to the gods.

अग्निर्वैदेवानां मुखम् । तस्माद्देवा अग्निमुखा अन्नमदन्ति।
अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ।। (१/१२/१) (Ramesh Chandra Dutta (Ed.), 1976:92)

This is to say, Agni is the face of deities and deities feed themselves through Agni's mouth. He thus helps to convey all the divine orders between human and the gods. So I salute to Agni.

* Professor, Department of Sanskrit, University of Dhaka, Bangladesh.

Agni is generally depicted in scriptures as a ruddy-hued with two faces. The two faces have different characteristics with one expressing altruistic and the other malicious. He is said to have three and other places seven tongues. He has hair that stands on end like burning flames, three legs and seven arms. He is seen to be accompanied by a ram which is generally a sacrificial animal in the Hinduism. According to some Puranic text, Agni's mount is a goat. (Jitendra Nath Banerjee, 1956: 524)

The Japanese version, Agni or Ka-ten who is one of the twelve Guardian deities. He guards the south-east corner according to the Japanese Mandaras. He was variously portrayed in different temples in Japan. Although Agni is a fire god he was not so popular among the ordinary Japanese.

The depictions of Ka-ten have a lot of resemblances to the Agni in the Indian sculptures. He is generally shown sitting on a goat or a ram in the middle of blazing fire. He has a flaming deep red color body with white facial hair. "Gu-en-bon" chapter of Dai-nichi-kyo says that "Agni resides inside flames. He has three lines of ash marks. His body colour is deep red. He has a triangular sign on his heart. He is inside a circle of flames. He holds a string of beads and a water bottle for purification.''(Saroj kumar Choudhury, 2003: 141)

He is shown to have four arms each holding a different item. The upper right hand holds a triangular-shaped alter, the lower one holds a hanging garland of beads and the left grasps a stick. He is said to use it for purification and is depicted in the background of flaming fire. So Ka-ten has some significant similarity with the Vedic Agni.

Viṣṇu (In Japan Naraen-Ten)

Viṣṇu also known as Mādhava, Nārayaṇ and Hari, is one of the most prominent deities of Hinduism. His wife is also a goddess of wealth and fortune known as Lakṣmī. "Viṣṇu, who occupied a supreme position in the later Vedic literature, held a sub-ordinate position in the pantheon of the Gods in the Ṛgveda. He took three steps, one on earth, one in mid-heaven, and the third in the highest heaven which was invisible to men, but visible to the Gods, like an eye fixed in heaven.''(Abinas Chandra Das, 1925: 458)

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा निदधे पदं ।
समूलहमस्य पांसुरे ।। (१/२२/१७) (Ramesh Chandra Dutt (Ed.), ibid :81)

Viṣṇu is one of the celestial deities in the Ṛgveda, and such deities ultimately came to be known as the Adityas in Brahmanic literature. (R. C Majumdar, 2010: 366) The number of the Adityas were twelve and Viṣṇu, as one of the Adityas was the most prominent one. (Nalini kanta Bhattasali, 1929:75)

Viṣṇu is the second god in the Hindu Trimurti; the three in control for the creation, preservation and destruction of the universe. His role has been beautifully quoted in *Sri madbhagavadgīta :* "Whenever righteousness wanes and unrighteousness increases I send myself forth. For the protection of the good and for the destruction of evil, and for the establishment of righteousness, I come into being age after age." (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad, 1990: 193)

Viṣṇu is portrayed with a light blue skin and four arms each holding a unique object. The objects are a lotus, an imperishable mace (Koumodaki), a conch (Shankha) and the unstoppable discus (Sudarshana Chakra) signifying peacefulness, powerfulness, victory and spiritual energy respectively. His depictions of statues are usually in a standing position wearing yellow garments and have curled chest hair known as the Shrivatsa mark. Viṣṇu carried Garuda as his companion. He wears a knee long garland (Vanamala) with a sacred cord (upavita) around his body.

Kengo-Rikishi or Kongo-Rikishi is other names by which Naraen-ten is known in Japan. The Japanese Naraen-ten resembles to Viṣṇu as they are plainly identical. Bishinu-ten is the translated form of Viṣṇu in Japanese. According to Japanese conception, "Viṣṇu-Nārāyaṇa holds unusual strength of body. He generally rides on Karura, i.e. Garuḍa''. (Dwijendra Nath Bakshi, 1979: 89)

He is popularly shown to have one face with two arms or three faces with two arms. The three faced form is shown to have the face of an elephant or lion on the left side and the right side resembling to a boar. There are other uncommon forms of Narean-ten found which has four to eight arms. The body color is said to be blushish-black

and hair color of red with a jeweled crown on top. In his portrayal he fists his left and puts it on his waist and his right hand on his chest.

Both the illustrations share key features with each other including the half-bird Guraḍa which can too be seen in the Indian Viṣṇu's vehicle.

Pṛthivī (in Japan Ji-Ten)

Pṛithivī is one of the Vedic goddess characterizing Earth and a gentle mother goddess. The Sanskrit word for "Pṛthivī" translates to Earth in English. The goddess is known to have a nurturing, kind and a prolific nature to her character. She is often shown and addressed with the deity of sky, Dyaus, who are codependent of each other. He is responsible for the fertilization of earth through rain from the sky and Pṛthivī nourishes the whole nature afterwards. They are even considered as the parents of the world who created it and then formed men and gods. Pṛthivī and Dyaus are represented as a cow and a bull respectively.

Pṛthivī can also be addressed as Lakṣmī, the consort of Viṣṇu. Pṛthivī is also called by names as Bhumi, Bhudevi, Bhuma Devi, Dhrati and Dhrithri. These names indicate the powerfulness and her in control over everything. Goddess Pṛthivī is shown with two hands each holding something significant. She is usually sited on a platform kept stationary on the back of four elephants representing the four corners of the world, also called a votive statutory. Other portrayals of her have four arms each carrying a pomegranate, a water vessel, vegetables and herbs.

In the *Ṛgveda,* furthermore, "she is almost always coupled with Dyaus, the male deity associated with the sky. So interdependent are these two deities in the *Ṛgveda* that Pṛthivī is rarely addressed alone but almost always as part of the dual compound dyavaprthivi, sky-earth. Together they are said to kiss the center of the world.'' (Divid R. Kinsley, 1986 :8).

Pṛithivī in the Japanese Buddhist context is recognized as Ji-ten or Chi-ten. He is also known by other names such as "Hiru-chibi, kenro-chi-shin, Ji-shin (ten) etc. (Dwijendra Nath Bakshi, ibid :82) According to Alicia Matsunaga, "Pṛithivī is the Master of the gods in the ground". (Alicia Matsunaga, 1969: 22)

Ji-ten is shown in a male and female form. The skin tone of the male deity is of flesh where he is shown to hold a vase full of flowers in his left hand and the palm of his right hand is stretched and directed outwards. The female representation is of a white woman touching her heart with the right hand and her thigh with the left hand folded. "Another picture is the deity on the alter has raised hair and angry look. The eyes are red like fire. The fangs protrude outward. The lips are red. The face is black. The body is fat and heavy. Five snakes wrap around the shoulder and the arms. A tiger skin is wrapped round the waist. One hand holds an axe, and the other a bell." (Saroj Kumar Chaudhuri, 2003: 136)

One faces north in a clear land carrying ceremonial water, smearing perfume, flower, burning incense, food, drink, candles, unhusked rice, grains and flowers. Various depictions of Ji-ten are seen preserved in Japan. He is shown stood up on a pedestal holding a basket of flowers in the left hand and a mudra in the right hand.

Saraswatī (In Japan Benzai-Ten)

Saraswatī a Hindu Goddess who represents knowledge, music, wisdom, art and learning. Saraswatī is differently acknowledged as Mahāsveta, Viṇāpāni, Vāgdevi, Bhāratī, Vāgiśvarī. By the time of the Brāhmaṇa in the later mythology, "Saraswatī is identified with Vac, 'speech' and in post-Vedic mythology she became the goddess of eloquence and wisdom invoked as a muse and regarded as either the wife or daughter of Brahmā.''(Alicia Matsunaga, 1969:256) Later during the Puranic age, she was blessed as the 'Goddess of Learning'. She is also characterized as the goddess of eloquence and wisdom and the spouse of Brahmā or Viṣṇu. |Generally during the Maghi Sukla Panchami, Saraswati is worshipped. The special tithi is named as `Sripanchami'.

माघस्य शुक्लपञ्चम्यां विदयारम्भेषु सुन्दरि।

(Pandit Panchanan Tarkaratna (Ed), 2020: 4th chapters, Sloka No. 22)

The Buddhists was inspired by this Hindu goddess and altered her form in several ways. In Buddhism, she is recognized as Mahāsaraswatī, Vajravīnā and Vajra Sāradā according to *Sādhanmālā*. Saraswatī here is the associate of Mañjusri.

There are forms are seen to have four, eight or ten arms during the dancing poses. Other images show her with two arms and sitting erect in the virasana posture. Sculpture during the medieval period shows that “four-armed goddess seated in lalitākṣepa on a double-petalled lotus, playing on a Vīnā with her two front hands and holding a rosary and a manuscript in her back right and left hands respectively. A tiny swan (hamsa, the usual vehicle of the goddess in these medieval sculptures) is carved in the extreme left corner of the pedestal which is decorated with lotus coils usually found in these 11th or 12th century sculptures.” (Jitendra Nath Banerjea, 1956: 379) The goddess is also seen to ride on several vehicles such as peacock, lion and ram according to the Indian sculpture and paintings. (J.L.Shastri et. al. 1954: 133) However, a wide variety of her sculptures are seen throughout the years by the Hindu sculptors of India and are known by different descriptions of the forms of the goddess through the texts.[1]

In Japan, Benzai-ten is used to worship Saraswatī. She is renowned for the idea that she has power over all forms of flow, including the flow of offspring as well as the flow of love, music, riches, fortune, beauty, and happiness. On the other hand, little is known about her origins as the goddess of all flows. In Japan, Saraswatī is also known by other names. She is called there as “Benzai-ten, Ben-ten, Benten-Sama, Benzamini, Myōon-ten, Daiben, Dai-Benzaiten, Daibentenno, Bion-ten.’’ (Cf. Dwijendra Nath Bakshi, ibid :109)

She is also considered the goddess of rivers' flow, wealth, eloquence, fortune, and children. The Japanese also consider her as a goddess of love. A picture of her with a war-like expression is associated with the Enoshima Jinja in Kanagawa Prefecture of Japan.

Benzai-ten is respected in every family as an auspicious house-goddess. Her image is placed near the entrance door to bless wealth or fortune under its shelter. Her image is

also preserved in almost all the shops in Japan along with the image of ‘Daruma’.[2] Benzai-ten has long been revered as an amazingly powerful happiness-spreading deity. She is frequently portrayed as having eight hands, though occasionally she may have two, four, or even six hands. Eight weapons suited for a goddess of battle are held in Benzai-eight ten's hands: a bow, a sword, an axe, a string, an arrow, a halberd, and an iron wheel (cakra).

So it may be concluded that the Japanese goddess Benzai-ten and the Hindu goddess Saraswatī share striking iconographic and philosophical parallels.

Lakṣmī (in Japan Kichijo-Ten)

One of the most well-known and revered deities in the Hindu pantheon is Lakṣmī. She is said to be the goddess of wealth, love, prosperity, fortune and the embodiment of beauty. “When a man is growing rich, it is said that Lakṣmī has come to dwell with him; whilst those in adversity are spoken of as ‘forsaken of Lakṣmī.’ In pictures she is painted as a lady of a bright golden colour, seated on a lotus with two arms.’’ (W. J. Wilkins, 1900 :132) Buddhists and Jains both worship the goddess Lakṣmī. She has four hands, each of which represents one of the four aims of human existence; Dharma, artha, Kama and moksha. Although she is well-liked as a domestic goddess, she is also popularly worshipped as a cosmic force.

Lakṣmī, or more frequently Sri, is the companion of Viṣṇu (Nārāyaṇa), one of the central deities in Hinduism. She has appeared in this relationship under numerous identities during his various incarnations. Lakṣmī can be seen in her signature stances, sitting or standing on a lotus, usually holding a lotus in one or both hands. The lotus conveys the idea that good always manages to thrive despite an evil environment by being viewed as purity wherever it grows. In the pictures, she frequently has an elephant or an owl standing next to her.

Lakṣmī is referred to as Kichijō-ten in Japan. She is known as the goddess of riches. She also goes by the names Kichijō-ten, Kichishō-ten or Kishhō-ten. She is also known by the names Makashiri or Mahā-Śrī. It is said that ‘Kichijō-ten’s image was the first image of a female deity in Japan and was made in the Nara Period (645-794A.D).In fact, “it was in the Nara period that the images of female divinities, e.g. Kichijō-ten(Lakṣmī), Benzai-ten (Saraswatī) and Kishimojin (Hārītī) came into use.’’(Dwijendra Nath Bakshi, ibid : 129). In Japan, she is depicted as having two arms and holding a precious stone in her left hand while holding a lotus flower in her right. She wears a necklace and bracelet for decoration.

In the Yakushi-ji temple, which dates back to the Nara Period and is located in Nara Prefecture, there is a well-known portrayal of Kichijō-ten. Her movements are somewhat to the left, and her round face is well portrayed. She is adorned with a crown, a necklace, and lovely clothing as she sits on a pedestal. The Japanese goddess Kichijō-ten and the Hindu goddess Lakṣmī are similar in their iconographic and abstract forms. As a result, there are many temples in Japan that include further images of the deity.

Conclusion

It is very evident that various Hindu deities exists in Japanese pantheons but in a much altered versions. Each has their own unique individualities in the Japanese context and has been traditionally worshipped for a long time. On a closer speculation it can be deduced that the gods in Japan indulge themselves with worldly and materialistic problems rather than the spiritual aspect. Thus the beliefs include to the material benefits and various favors in the day to day of one's life. The folk belief and rituals of the Japanese Buddhist society was very inspired by the worshipping of the Hindu gods and goddesses. This enabled an open minded aspect towards other religions which brought in peace, tolerance and harmony in a multi-cultural society.

References

1. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad, *Bhagavad- Gita As It Is*, Bhaktivedanta Book Trust, 2nd Edition, 1990
2. Bakshi, Dwijendra Nath (1979). *Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon (A comparative Study)*, A Benten publication, First Edition, Calcutta.
3. Banerjee, Jitendra Nath (1956). *The Development of Hindu Iconography*, Second Edition, University of Calcutta.
4. Bhattasali, Nalini Kanta (1929). *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum,* Rai S.N. Bhadra Bahadur, Honorary Secretary, Dacca Museum Committee, Dacca.
5. Chaudhuri, Saroj Kumar (2003), *Hindu Gods and Goddesses in Japan*, Vedams eBooks(p) Ltd, New Delhi.
6. Das, Abinas Chandra (2925), *Rgvedic Culture*, R. Cambray and Co, Publishers and Booksellers, Calcutta.
7. Kinsley, David R. (1988). *Hindu Goddesses: Visions of the Divine Feminine in the Hindu religious Tradition,* University of California Press, London.
8. Majumdar, R.C. (2010). *The History and Culture of the Indian People*, *The Vedic Age*, Vol.1, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai.
9. Matsunaga, Alicia, (1969). *The Buddhist Philosophy of Assimilation: The Historical Development of the Honji- Suijaku Theory*, First Edition, Sophia University, Tokyo.

---

10. Pandit Panchanan Tarkaratna (Edited), (2020), *Brahmavaivarta Puranam*, Navabharat Publishers, Kolkata.
11. Shastri, J. L. et. al. (1954). *The Agni-Purana*, Part- 1, Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd, Delhi, First Edition.
12. Wilkins. W. J. (1900). *Hindu Mythology (Vedic and Puranic)*, Second Edition, Thacker, Spink and Co. Calcutta.
13. Some other texts describe Saraswatī is usually Visnudharmottar, Amsumadbhedagama,
14. Purvakaranagama, Rupamandana etc., as four-armed, white coloured, dressed in white garments and decked with many ornaments, holding in her four hands any four of the following objects : manuscript, white lotus, rosary, musical instrument, water-vessel etc.
15. Banerjee, Jitendra Nath, *The Development of Hindu Iconography*, University of Calcutta, 1956, p. 377
16. ‘Daruma’ is a word borrowed from the Sanskrit word ‘dharma’ meaning law or morality code and is often used with the word Bodaidaruma, ‘Bodhidharma’.

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

Humanity in Laghutrayi

Dr. Firoze*

Abstract: Among many different languages and literature produced in these languages, Sanskrit literature is the most prosperous one. It comprises four Vedas: eighteen *Puranas*, *Mahabharata*, *Geeta*, *Ramayana* etc. Apart from these, Kalidasa's *Kumarsambhawam*, *Raghuvansham* and *Meghdootam* are collectively known as *Laghutrayi*.
It is stated in *Kumarsambhawam* that even if an unprivileged person comes under the guidance of Mahatamas, he is accepted with love and affection.

"Kshudrepinunamsaranamprapannemamatvamuchchaihshirasam sativa."

In the epic *Raghuvansh* the mutual relationship between man and nature is depicted in a very captivating manner.

Nrityam Mayura: Kusumani Vriksha DarbhanupattanVijahurharinya:
***Tasya papanesamdukhbhavamattyantamasidruditamvanepi.* -(14/69)**

Similarly, *Meghdootam* is a very rare Khandkavya which depicts the relationship between nature and human beings with utmost beauty. It teaches that true humanity never fails and true love never dies.

Snehanahu: Kimapivirahedhvansinstetvabhoga-
***DishteVaastanyupachitrasa: Premarashi Bhavanti.* -(Poorvamegha-23)**

Thus *Laghutrayi* outlines humanity.

Kavikulaguru Mahākavi Kālidāsa is one of the greatest poet of Sanskrit literature. Kālidāsa composed works on the basis of ***Mahābhārata, Purāṇas***, ***Rāmāyaṇa***, ***Darśana*** etc. His compositions represent various forms and basic elements of Indian life and philosophy. Due to these characteristics, Kālidāsa is considered as a poet who gives a sense of vigilance towards overall well being of the nation. His famous works include plays like ***Mālavikāgnimitram***, ***Vikramorvaśiyam*** and ***Abhijñānaśākuntalam***. He also wrote two epics- ***Kumārasambhavam***, ***Raghuvaṃśam***. ***Meghadūtam*** and ***Ṛtusaṃhāram*** are included in the list of his work as Khaṇḍakāvya.
Out of these seven compositions, ***Kumārasambhavam***, ***Raghuvaṃśam*** and ***Meghadūtam*** are known as ***Laghutrayī***. The wonderful illustrations of these three works of Kālidāsa about humanity are presented to you through this research paper.
Kumārasambhava means the birth of Kumāra and Kumāra means Skanda or Kārtikeya. There are 17 cantos in this epic, but only up to eight cantos are considered to be composed by Kālidāsa. According to Nārāyaṇa Paṇḍita, the commentator, Kālidāsa's goal in this epic was to show the attraction of Śiva's heart through Pārvatī, which led to the birth of Kumāra Kārtikeya. Therefore, in the eighth canto, it is apt to assume the end of the epic with the description of their meeting after the marriage. The residual 9 cantos have been added by the later Mahākavis.
There are 19 cantos in the ***Raghuvaṃśam*** epic. In this, the lives of the kings of Raghukula are described starting from Dilīpa to Agnivarṇa. Here the character of king Raghu is very impressive. The dynasty was also named ***Raghuvaṃśa*** after

* Assistant Professor, Department of Sanskrit, Banaras Hindu University, Varanasi, India.

Raghu. The name ***Raghuvṃśam*** of the epic is also relevant, because in the second canto, king Dilīpa asks Nandinī for such a son, who can carry forward the lineage and take the dynasty to new heights.
The great poet Kālidāsa has established a new standard in each of his works. Through ***Meghadūtam,*** he placed such a unique work in front of the people, which has been appreciated till date and from which a very rich tradition of sandeshakavya or emissary has been born. ***Meghadūtam*** is a unique poem from the point of view that any detached person may babble by considering an unconscious as conscious and entertain himself by creating fantasies of sending messages by him. Such poetry did not existed before Kālidāsa. A small composition of about a hundred verse became the originator of a long poetic tradition that has rarely happened in the world literature.

Humanity in Raghuvaṃśam

As a human being, one should think for the welfare of the living beings. king Dilīpa was engaged in the welfare of all beings. For the kings of ***Raghuvaṃśam***, the poet says in the beginning-

"tyāgāya sambhṛtārthānāṃ satyāya mitbhāṣiṇāṃ
yaśase vijigīṣūṇāṃ prajāyai gṛhamedhinām.
śaiśave'bhyastavidyānāṃ yauvane viṣayaiṣiṇāṃ
vārdhake munivṛttināṃ yogenānte tanutyajām."[1]

That is, those kings used to collect money only for renunciation, used to speak less for truth only, wished to win for fame and used to marry for children. They used to practice knowledge in their infancy, in their youth they wished for worldly matters, in their old age they lived like sages, and in the end they gave up their bodies by yoga.

The poet describes the character of many kings like Dilīpa, Raghu, Rāma, Atithi etc. His statement for Dilīpa is impressive -

"prajānāmeva bhutyarthaṃ sa tābhyo balimagrahīt.
sahasraguṇamutsraṣṭumādatte hi rasaṃ raviḥ."[2]

It means, the king used to charge them only for the welfare of the people, just as the sun absorbs water from the earth to immerse in it a thousand times.

We can see the devotion of king Dilīpa to Nandinī in ***Raghuvaṃśam***. In the second canto, he is engaged in serving cows. King Dilīpa loves the cow named K**ā**mdhenu so much that he extends his foot forward only when the cow takes a step ahead-

"sthitaḥ sthitāmuccalitaḥ prayātāṃ, niṣeduṣīmāsanabandhadhīraḥ.
jalābhilāṣī jalamādadānāṃ chāyeva tāṃ bhūpatiranvagacchat.".[3]

it says, when the cow stood up, king Dilīpa would also stand up and as soon as she steps forward to walk, the king would also walk. He used to sit after her and when she wanted to drink water, then the king also used to drink water. Thus he was following her like a shadow.
Regarding the favour done by king Dilīpa, Kālidāsa writes-

"taṃ vedhā vidadhe nūnaṃ mahābhūtasamādhinā.
tathā hi sarve tasyāsanparārthaikaphalā guṇāḥ.."[4]

In this verse it is said that Brahmā ji certainly created Mahārajā Dilīpa out of these five elements - earth, water, light, air, sky, because these elements constantly serve

the whole creation with the qualities of smell, taste, form, touch and sound. Similarly, with all the qualities of king Dilīpa, only others were favoured.

Honesty is a priceless quality. It makes a person achieve new heights. Therefore, it is absolutely essential to have the moral value of honesty in us. That is why in *Raghuvaṃśa*, Kālidāsa presents the proof of the honesty of the king –

"dveṣyo'pi sammataḥ śiṣṭastasyārttasya yathauśadham.
tyājyo duṣṭaḥ priyo'pyāsidaṅgulīvoragakṣatā."[5]

Just as a patient takes medicine thinking that it will make me better. Similarly, king Dilīpa used to adopt those enemies who were good. Just as people cut off their fingers when they were bitten by a snake, in the same way king Dilīpa used to expel his evil relatives from the kingdom.

When king Dilīpa was staying in Maharṣi Vaśiṣṭha's Āśram, king Dilīpa did not drink even a drop of milk without asking. If he had wished, he could have drank the milk as the cow had given permission, but king Dilīpa, setting an example of complete honesty said that he would take milk only after getting the permission of Maharṣi Vaśiṣṭha -

"vatsasya homārthavidheśca śeṣa
mṛṣeranujñāmadhigamya mātaḥ!|
audhasyamicchāmi tavopabhoktuṃ
ṣaṣṭhānśamurvyā iva rakṣitāyāḥ||"[6]

King Dilīpa said to the cow –O! Mother, It is my wish that after the calf drinks and the havan is completed, I will take your milk as per the order of the sage, just as I take one-sixth for protecting the kingdom.

'paropakāraḥ puṇyāya pāpāya parapīḍanam' appears to be vindicated as king Dilīpa remain always ready to serve his people. To awaken the spirit of philanthropy in the people, Kālidāsa, in Raghuvaṃśam, depicted how king Dilīpa used to do favors to his people -

"prajānāṃ vinayādhānādrakṣaṇād bharaṇādapi.
sa pitā pitarastāsāṃ kevalaṃ janmahetavaḥ."[7]

It states, king Dilīpa forbade his subjects from going on the wrong path, like a father who prevents his sons from doing bad deeds, teaches them to do good deeds, protects them in every way and nurtures them and raises them, in the same way, he encouraged them to do good deeds, protected them from calamities and nurtured them by arranging food, clothing, money and education for them.

Selflessness-

King Dilīpa was always selfless for his people. That is why in the first canto of ***Raghuvaṃśam*** it is said that-

"tasya saṃvṛtmāntrasya guḍhakāreṅgitasya ca.
phalānumeyāḥ prārambhaḥ sanskārāḥ prāktanā iva."[8].

People give charity just to get name and fame but King Dilīpa had a different vision. Knowing everything, he kept quiet, even though he had the power to take revenge on the enemies, he forgave them. Even after giving donations he did not wish to get praised. Seeing his modest and humble behaviour, it seems that the qualities of being silent, forgiving and avoiding praise got imculcated in him along with wisdom, strength and sacrifice.

Humanity in Meghadūtam

Māhākavi Kālidāsa has elaborately discussed charity in ***Meghadūtam***. Despite being lifeless, the Megha is filled with the spirit of benevolence, which Kālidāsa has mentioned in ***Meghadūtam*** as follows -

"na kṣudro'pi prathamasukṛtāpekṣayā saṃśrayāya,
prapte mitre bhavati vimukhāḥ kiṃ punaryastathoccaiḥ."[9]

It says- If, even the petty people are treated with a sincere heart, then they do not delay in honoring the one who does their good. By doing charity we always get merit, when someone gives us respect and, then we should never disrespect him. Kālidāsa inspires us to give respect and hospitality in the ***Purvamegha***.

As quoted by Kālidāsa every passerby must be given due respect

"ārādhyainaṃ śaraṇavabhavaṃ devamullaṅghitādhwā,
siddhadvandvairjalakaṇabhayādvīṇibhirmuktamārgaḥ.
vyālambethāḥ surabhitanayālambhajāṃ mānayiṣyan,
srortomurtyā bhuvi pariṇatāṃ rantidevasya kīrtim."[10]

Selflessness -

Kālidāsa in Meghadūtam inspires us to imbibe human values of selflessness. A person should never be selfish, that is why Kālidāsa while leaving, inspired the Megha, to selflessly help everyone out there.

"hitvā tasmin bhujagavalyaṃ śambhunā dattahastā
krīḍāśaile yadi vicaret pādacāreṇ gauri.
bhangibhaktyā viracitavapuḥ stambhitāntarjalaughaḥ,
sopānatvaṃ kuru maṇitaṭārāohaṇāyāgrayāyī."[11]

That is,after giving up the snake like bracelet, Pārvatī having hand in hand with Śivā, is walking on mountain Kaildāśa. Yakṣa suggested Megha, to go ahead and make a staircase out of the flowing water by solidifying itself on the banks of gems so that they may use it as a ladder to climb.

Self responsibility

Dedication towards one's work is discpline. Kālidāsa expresses these feelings in Meghadūtam. According to the statement of the Yakṣa, the Megha is completely devoted to its work. For example-

"tāṃ kasyāñcidbhavanvallabhau suptapārāvatāyāṃ
nītvā rātriṃ ciravilasanātkhinnavidyutkalatraḥ.
dṛṣte surye punarapi bhavānvāhayedadhwaśeṣaṃ
mandāyante na khalu suhṛdāmabhyupetārthakṛtyāḥ."[12]

In the whole ***Meghadūtam***, the Megha is fully determined towards the work of his friend and performs his duty, because the custom of gentlemen is that when someone asks for something from them, they do it only after completing the work without any objection. That is why Kālidāsa has said in *Uttarmegha*-

"kaccitsaumya vyavasitamidaṃ bandhukṛtya tvayā me
Pratyādeśānna khalu bhavato dhīratāṃ kalpayāmi.
niśśabdo'pi pradiśasi jalaṃ yācitaścātakebhyaḥ:
prayuktaṃ hi praṇayiṣu satāmīpsitārthakriyaiva."[13]

That is, Oh gentleman! You have decided to do this work of my friend, haven't you? Surely you haven't accepted, by this I can see your patience. Because on asking, you give water to the devotee even when they remained silent.

Self-discipline

Self-discipline enriches the life of a person. If a person remains in his discipline, then he can never be a wrong-doer. Kālidāsa guides the self-discipline of the Megha in ***Meghadūtam***. As the Yakṣa told the Megha, so did the Megha. It is very exemplary. This verse of **Uttaramegha** is presented as follows-

"tasmādadrernigaditamatho śīghrametyālakāyāṃ,
yakṣāgāraṃ vigalitanibhaṃ dṛṣṭicihnairviditvā.
yatsandiṣṭaṃ praṇayamadhuraṃ guhyaken prayatnāt
tadgehinyāḥ sakalamavadat kāmarūpī payodaḥ."[14]

after this, the Megha took the desired form, soon walked from that Ramgiri mountain to convey the message, recognizing the Yakṣa's house with a dirty aura from the signs and lovingly told his wife all that the Yakṣa said with effort as a message.

Humanity in Kumārasambhavam

It has been told in Kumārasambhavam that there is darkness in the long caves of the Himālayas even during the day. Due to which it seems that even the darkness hides in its caves fearing the day and Himālaya gives shelter to it in its lap. Because great men keep the same affection for the wicked who come under their shelter, as they have for gentlemen. The form of Mamtā is shown very brightly in Kumārasambhavam. As the love of Himālayas towards Pārvatī has been shown-

"mahibhṛtaḥ putravato'pi dṛṣṭi-
stasminnapatye na jagāma tṛptim.
anantapuṣpasya madhorhi cūte
dvirephamālā saviśeṣasangā."[15]

That is, in the spring, like a bunch of bumblebees, leaving other flowers, keeps hovering over the mango tree. Similarly, the eyes of the Himālayas could not live without seeing Pārvatī.

Good Character-

"uvāca cainaṃ parmārthato haraṃ
vetsi nūnaṃ yata evamattha mām.
alokasāmānyamacintyahetukaṃ
dviṣanti mandāścaritaṃ mahātmanām."[16]

Pārvatī said that you said so because you don't even know Mahādevajī very well. Due to lack of recognition, those who are unaware, call the distinguished deeds of those Mahātmās as vain.

"yaducyate pārvati! pāpavṛttaye
na rūpamittyavyabhicāri tadvacaḥ.
tathāhite śīlmudāradarśane
tapasvināmapyupadeśatāṅgatam."[17]

Oh **Pārvatī**! People rightly say that beauty does not lead to sin because your modesty is so distinguished that even great ascetics can learn from it.

"tāmagauravabheden muniṃścāpaśyadīśwaraḥ.
strīpumānityanāsthaiṣāṃ vṛttaṃ himahitaṃ satām"[18]**.**

Lord Śankara saw Arundhatiji and the sages with equal attitude without discriminating between men and women, because while dealing with gentlemen, it must not be gender biased. Their character should be the deciding factor.

"tāmasmadarthe yuṣmabhiryā citavyo himālayaḥ.
vikriyāyai na kalpante sambandhāḥ sadanuṣṭhitāḥ."[19]

In the present verse sages are asked by shankar to go on his behalf and ask PārvatīJī from her father Himālayas. Because the relationship that good people mediate, goes without hindrance.

"raktabhāvamapahāya chadramā
jata eṣa pariśuddhamaṇḍalaḥ.
vikriyā na khalu kāladoṣajā
nirmalaprakṛtiṣu sthirodayā"[20]**.**

In this verse it is said that the moon has gradually turned white from pale. Because those who are of pure nature, even if any defect comes in them due to the change of time, it does not last for long.

Thus we see that humanity is present before us at many places in the Laghutrayī. If every human being imbibes these qualities in his life, then surely everyone in the world can make his life beautiful and happy.[21]

References

[1] Raghuvaṃśam-1.7,8
[2] Raghuvaṃśam-1.18
[3] Raghuvaṃśam -2.6
[4] Raghuvansham-1.29
[5] Raghuvaṃśam -1.28
[6] Raghuvaṃśam -2.66
[7] Raghuvaṃśam-1.24
[8] Raghuvaṃśam -1.20
[9] Pūrvameghaḥ-17, Meghadūtam
[10] Pūrvameghaḥ -48, Meghadūtam
[11] Pūrvameghaḥ-63, Meghadūtam
[12] Pūrvameghaḥ-14, Meghadūtam
[13] Uttarameghaḥ-54, Meghadūtam
[14] Meghadūtam- Prakṣipta Śloka
[15] Kumārasambhavam-1.27
[16] Kumārasambhavam--5.75
[17] Kumārasambhavam--5.36
[18] Kumārasambhavam--6.12
[19] Kumārasambhavam--6.29
[20] Kumārasambhavam-8.65

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

Persian Translation of Nītiśatakam: A Critical Study

Dr. Rajesh Sarkar[*]

Abstract: Human beings are inquisitive by nature. Therefore they remain continuously engaged in the process of artistic creation. Man's artistic creativity finds expression in language which is a very powerful medium of creative expression. In order to enrich the reserve of knowledge and to facilitate intercultural understanding, translation is used. Although no translation is absolutely fidel to the original text there is no other alternative available to translation if one is desirous of knowing a text of another language and culture.

It is worth mentioning here that we had a great tradition of translation from Sanskrit to Persian. After the establishment of the Islamic rule in India, Persian remained the official language of the country. Many Muslim rulers, who were fascinated by the rich cultural traditions of India and reared to political aspirations, got several Indian texts translated into Persian. Although people usually limit the translation from Sanskrit to Persian to the Mediaeval period, the tradition continues even in modern times.

In this series, the translation of Bhartṛhari's Nītiśatakam into Persian deserves special recognition. The book has been translated by Dr. Chandragupta, and published by Easter in 2014. It is the prose translation which beautifully transliterates the essence of the original text into Persian. The book includes the verses in original Sanskrit which is followed by its transcription in Persian and its translation. For example:-

sāhītyasaṁgītakalāvihīnaḥ
sākśātpaśupucchaviṣāṇahīnaḥ
tṛṇamnakhādannpijīvamānaḥ
tad-bhāgdheyamparmampaśūnām

Persian Translation- Aanke bi khirad, wa bi adab, wa bi hunarast. Misla haiwaniastkedumnadaradwaulfana mi khorad. Een barayehaiwanatkhusbakhtiast.

This is a modern Persian translation of the verse. In the proposed paper, I intend to examine the artistic aspects of the Persian translation of Bhartṛhari's Nītiśatakam.

The composite culture of India is a kaleidoscope of different languages, religions, beliefs, faiths, value systems and all that makes a society robust. Indian Society has the wonderful capacity to adapt and adopt, which is a two way process of give and take. History is witness to the number of people that came here from different parts of the world and went on to enrich their own lives while contributing to the healthy growth of Indian culture. During the middle ages, Muslim culture and Persian language had a major impact on what is known as Indian culture today. Persian was the medium of administration, literary creativity as well as communication amongst the elite. It was not a one way process because, whereas Persian was adopted in India by the rulers and the intellectuals, it also adapted to the Indian cultural nuances and linguistic scenario. Over a period of time, this gave the Persian language a distinct Indian flavour. This has been reiterated by according special status to Indian Persian amongst the varieties of Persian Language.

Indian history has yet to be written by Indians on the basis of original source material available in the form of manuscripts all over the country. The little original source material that has been used is mostly by foreign scholars who have their own

[*] Assistant Professor, Department of Sanskrit, Banaras Hindu University, India.

perspective on what has to be written and how it is to be presented. Very little work has been done on how interaction between Persian and Indian languages impacted the culture and thought process of the people of this country. Is appears form the texts available, a healthy give and take of knowledge systems between the scholars of the two major languages i.e. Persian and Sanskrit besides, regional languages. This led to translation of popular epics like 'rāmāyanṇa' and 'mahābhārata' into Persian. Philosophical works like Upanishads as also historical works like rājataraṅgiṇī, BīrSinghCaritra and others were translated into Persian. Is is a well-known fact that Pañcatantra the great fable collection in Sanskrit was translated into Persian by many scholars. Not only these, the Puranas, extracts from the Vedas and other Hindu scriptures regarding dharma, the way of living life in three stages- brahmacary, gṛhasta vānaprastha and sanyāsa are available in Persian recension. Darashukoh had got several important Sanskrit texts translated to Persian which included Yogavāṣisṭḥa. There are translations of works on scientific literature like medicine, astronomy and mathematics, works on music, arts and science, besides history and architecture. One can by no means call this list complete.

In this order, the world famous work of Sanskrit, i.e., 'nītiśatakam' was translated into Persian which is rarely known and less heard till date. Before discussing on this Persian-translation it is important to discuss on 'nītiśataka' and its author, 'Bhartṛhari'. This creation is authorised by 'Bhartṛihari' whose country period is much argumentative, and legends have made his Personality so much complicated that it's not easy to search out facts from that.

Three literal- creations are found in the name of Bhartṛhari-

(a) śṛṁgāraśataka (b) nītiśataka (c) vairāgyaśataka

In this; 'nītiśataka' and 'vairāgyaśataka' are visibly the scriptures subjected to morality. 'śhataka' comes under the independent-verse style of Sanskrit literature, in which there are hundred or something little more independent verses having independent meanings. Nītiśataka too is a popular creation set in this very genre. In nītiśataka there's an efficacious description of knowledge, valour, courage, friendship, Philanthropy, and benevolence, etc. Compendiously, the much interesting style and the exposition of thoughts subjected to morality, is the main specitality of this book.

There are other more books found in the name of 'Bhartṛhari. The doer of mahābhāṣays's 'tripadi-dīpikā' commentary, vākyapadīya and 'dhatusamīkśā', these three's 'Bhartṛhari' is same or a different from that of 'śataks' creator Bhartṛhari, this is very difficult to be determined.

Bhartṛhari is also believed to be the creator of 'Bhaṭṭikāvya' mīmāmsāsūtravṛtti, and vedāntsūtravṛtti etc. There's also a tradition which describes twelve 'śatakkāvyas' created by him. In the heresays somewhere he is believed contemporary to the Vikramaditya, while in folktale and folkdrama tradition, he is believed to be related with 'Guru Gorakhnātha'; Ācarya 'Dhanika' of 10th Century A.D extracted a part from his 'śataka' and 'vākyapadīya'. Hence, it is sure that Bhartrihari is from Pre-tenth century A.D. Chinese traveller It Jing pointed Bhartṛhari in the form of a grammarian (vaiyākaraṇa). If vākyapadīya's author and śataka's author Bhartṛhari is believed the same, then Bhartṛhari's period is proved to be before seventh-centuary A.D. Tradition too believes, both the same one

"mahāntaḥ kavayaḥ sāntu mahāntāḥ panditāstathā,
mahākavirmahāvidvāneko bhartṛharirmataḥ."

After Bhartṛhari's 'śataka-writing', in Sanskrit-literature 'śataka' poetries were written on wide-scale. The effect of Bhartṛhari was not only on Sanskrit or Indian

literature but also on Islamic world. In this order, Allama Muhammad Iqbal discusses about Bhartṛhari in his world-renowned creation viz. 'Jawednama'. He meets Bhartṛhari and conversates in his spiritual journey. Imprinting of this sight shows the effect of Bhartṛhari on Allama Iqbal. Allama Iqbal has transformed many of the shlokas (Verses) of Bhartrihari in Urdu shaier. In his eminent Urdu-Poetry-compilation named 'Qulliyaat-e-Iqbal', there uses to be an Urdu-translation of a moral verse of Bhartrihari; given with name on the very beginning page which is as-

"phūla kī pattī se kat saktā hai hīre kā zigar mard-e-nadāñ par kalām-e-narm ō-nāzuk be-asar"

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔
مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔

Allama Iqbal has translated many poems of Bhartṛhari in urdu-shaier style. Apart from this there have been many translations of Bhartṛhari's śatak in Urdu, whose descriptions are as follows-

1- Poetic translation of three 'śataka's of Bhartṛhari Raghuvinder Rao Jazb Aalampuri-Andhra Pradesh Sahitya Academy.
2- Poetic translation of three 'śataka' of Bhartṛhari by the name of 'Shaiyer-e-Aazam Bhartrihari' done by Imtiyazdduin khan- Uttar Pradesh Urdu Academy- 1983
3- Jaykrishna Chaudhary translated Bhartrihari's three 'śatakas' in Urdu, by the name, 'Bhartrihari; in year 1959 which was published by Idara-e-Anees Urdu, Allahabad. (U.P.)
4- The selected part of three 'śatakas' of Bhartrihari 'Bhartrihari Iqbal ka ek mumdahiyh Azeem Sanskrit shaȳir aur mufakkira Tahkiki mutala aur iske mustanad kalaam ka Urdu Tarjuma' Dairat-ul-Adab, Mumbai-2004

Thus, nītiśataka has been translated into various Indian and foreign languages. Dr. Chandragupta Bharatiya translated 'nītiśataka' into Persian viz. 'nītiśataka (Sad bait darbarah rafter e Neeki). Dr. Chandragupta Bhartiya is a young scholar of Sanskrit and Persian; from Delhi University. He is also a poet of Persian language as well as a manuscripalogist of Sanskrit and Persian.

This Persian translation is in the form of prose. This book has been published from 'Great Book contractor Lal Kuan, Delhi; in the year 2014.

The book begins with the prayer of almighty, formless God. In this order, Persian-translations of many moral-verses of this book are noticeable-

ajñayaḥ sukhamārādhyah sukhataramārādhyate viśeṣajñyaḥ.
jñānalavadurvidagdhaṁ taṁ naraṁ brahmāpi na rañjayati.

An ignorant Person is easy to please. It is still easier to please a man of learning, but even the god Brahma can not please a man stained with the possession of partial talents.

In this sequence, in forth coming many verses; Bhartrihari condemns the idiots, of which the translator has done very beautiful translation. In comparison to going heaven with a fool, Bhartṛhari tells it better to wander in mountain ranges with foresters.

varaṁ parvatadurgeṣu bhrāntaṁ vancarai saha. na murkhajanasamparkaḥ surendrabhavaneṣu api.

خرد را بہ بی خرد می توان اموخت ، و خرد را بہ خرد مند باز هم می توان اموخت ، ولی حتیٰ خداهم خرد را نمی تواند بہ نادان
بیا موذد ، چون نادان پر از غرور است

It is better to wander over hills in the company of wild person rather than to live in the society of ignorant men in the palaces of Indra (Paradise).

This very thing is said in Holy Bible somehow like this as-

با کسی که در جنگل زندگی می کند ، دوستی و گردش لذت بخش است و رفتن به کوه سخت و بلند هم خوب است ولی با شخص
نادان حتیٰ در جایگان فرشته ی اندهم گردش کردن لذت بخش نیست ـ

'It is better for a man to hear the rebuke of wise than to hear the song of fools'- 'Bible'.
At many places in Bhartṛhari's nītiśataka, there are verses describing the importance of 'knowledge'. He considers, 'knowledge' the supreme of all. In this context the following verse which gives importance to 'knowledge' is noticeable with its Persian translation.

vidyā nāma narasya rupamadhikaṁ prachhanna guptaṁ dhanaṁ,
vidyābhogakari yaśaḥ sukhakari vidyā gurūṇāṁ guruḥ.
vidyā bandhujano videśagamane vidyā parā devatā.
vidyā rajasu pujyate nahi dhanaṁ vidyāvihīnaḥ paśuḥ.

Knowledge is the greatest beauty of a man and his most hidden treasure. Is is the giver of all enjoyments, fame and happiness. It is the teacher of teachers and serves the function of a relative in the unfamiliar foreign country. It is the greatest God. It is knowledge that is honoured by the kings, not riches. A man without knowledge is like beast.

'Knowledge is appreciated not only in moral-books but also in our holy religious-scriptures. In 'srīmadbhagvadgītā', it is said that-

"nahi jnānena sadṛśåm pavitramiha vidyate" (gīta 4:38)

In this world there is no purifier as great as knowledge. As same in holy 'Hadith', we find words of Prophet Hazrat Muhammad (PBUH) related to the dignity of acquiring knowledge, in which it is said, "Acquire knowledge even though you have to go China for that.

Bhartṛhari's vision is primarily behaviour centred. As much he gives importance to 'knowledge', as same he gives to wealth, not a bit less than that. He knows that poverty is a curse. There is no respect of a poor person in materialistic world. Hence, pondering on the need of wealth and assets, Bhartṛhari writes-

خرد زیباترین و بهترین چیز ها است ، ثروت پنهان است،

و هر چیزی را به شما می دهد . خرد به شما شهرت می دهم و شما را مردم پسند می کند و این به شما شادی و ارا مش را هدیه می
دهد . خرد را هنمان همه چیز است .

او در دیار غربت همانند خویشا وندان است . خرد خداوندی بزرگ است ، پادشاهان نیز خرد را ستایش می کنند و نه ثروت را ،
انسان بی خرد همانند حیوان اسست .

" اطلبوا العلم و لو بالصّین "

"yasyāsti vittaṁ sa naraḥ kulīnaḥ
sa panḍitaḥ sa śrutvāngunajñayaḥ.
sa eva vaktā sa ca darśanīyaḥ
sarve gunāḥ kāñchanamāśryanti."

That man is nobly born and is wise as well as qualified and is to be considered a good speaker as well as personage fit to be seen, who has wealth. All the good qualities rest in the possession of gold.

ان کہ برایش ثروتی است ، همة لی بدی ها و ناتوانی هایش باثروت پوشاند می شود ۔ م

و همینظر طبقہ ی اجتماعی اش ، خردمند و داشنیدم است و سخنان خوب بر زبان می آورد و خوش بین است ، باثروت می توان بہ
اخلاق خوب و رفتار خوب رسید _

Bhartrihari was familiar with the terribleness of politics, he disdained 'Politics' in his book. The reason behind this is that being a king he understood and saw the politics from very near. On this subject his verse and its Persian-translation is noticeable:-

satyānṛtā paruṣā priyavādinī ca-
himsrā dayalurapi cārthaparāvadānyā
nityavyayā pracurnityadhanāgamā ca
vārā ṁganeva nṛpanīti-ranekarūpā.

The Policy of a king like that of a prostitute is manifold. It is truthful as well as false, heartless as sweet tongued, destructive as well as merciful, avaricious as well as charitable and ever prodigal as well as ever economical.

Bhartrihari gives respect to those noble poets, who take this society along the path of 'truth', He believes that such poets live after death with their glory-

از سیاست های شاهی این است کہ او گاهی را ستگو و گاهی در و غلو ، گاهی درشت گو و گاهی خوش سخن و مهر بان، گاهی
خسیس و گاهی بخشنده ، گاهی حریص می شود گاهی ثر و تش را صرف نیکو کاری می کند ، گاهی ثروت و مال بہ سہ دست می
اورد و گاهی آن را از دست می دهد ۔ سیاست های پادشاهی مثل فکر کسی کہ هر سو می رود ، قابل شخصیت نیست ...

jayanti te sukṛtino rasasiddhāḥ kavīśvarāḥ nāsti yesāṁ yaṡaḥkāye jarāmaraṇjaṁ bhayam.

Triumphant are the poets, the doers of glorious deeds and perfect in the expression of various natural emotions, whose fame is never in fear of decay or death.

Bhartṛhari trusts in courtesy and for this he gives parable from nature. In this context the following verse from 'nītiśatakam' is pointd along with its persian translation:-

ان کہ قلبش پاک و صاف است و بزرگ ، ان کہ مردلی پاک دل است و شاعر توانا ان کہ چنین بزرگ و سرفراز و بالنده است ، از
پیری و مرگ خواهد ترسید ...

bhāvanti namrāstaravaḥ phalodgamaiḥ navāmbubhirbhuri
vilambino ghanāḥ anuddhatāh satpuruṣāḥ samṛddhibhiḥ
svabhāva evaiṣa paropkāriṇām

The (branches of) trees hang-down when they are full of fruits, the clouds lower (themselves in the sky) when they are full of fresh water (vapour) and good men become gentle-hearted in prosperity. Such is the nature of those that do good to others.

Bhartṛhari gives importance to virtue, his saying is that if a person possesses virtue, then there is no need of corporal furnishings to him. We find many verses on this

subject in the book, 'nītiśataka'. The following verse with its Persian translation is noticeable:

srotraṁ śrutenaiva na kunḍalena
dānena pānirna tu kaṁkaneṇa,
vibhāti kāyaḥ karuṇāparāṇāṁ
paropkāraiḥ na tu candanena.

چون کہ درخت پربار گردد ، شاخہ هایش خمیده می شوند و سر بہ زیرمی کنند، چون کہ ابر پر اب می شود بہ زید می آید و آماده
بی بارش می گرد ، چون کہ انسان خوب غرق در ثروت می شود فر و تنی می گیرد ، این ذات و طبیعت انسان نیک خواه است ....

The ears look beautiful by listening to shastras and not by (wearing) ear-rings, the hands by doing charity and not by (wearing) bangles and body of gentle-hearted men by philanthropic actions and not by sandalwood plastering.

If there is a good and true friend in life then the journey of life becomes easy, but it is very difficult to distinguish a true-friend. Putting the solution of this problem, Bhartrihari expresses the sign of a true-friend: Subjected to the sign of a true friens, his verse with its beautiful Persian translation is noticeable:

گوش باحرف و سخن زیبا ارا‌ستہ می شود نہ با زیور و گوشواره ،دست نیکوکاران با نیکوکاری و بخشش مال و کمک بہ دگران
زیبا می شود و نہ بادست بند و جواهرات ، بدن انسان زیبا با نیک و کاری زیبا و ارا‌ستہ می شود و نہ با خمیره و مایہ ای ان...

pāpānnivārayati yojayate hitāya.
guhyaṁ ca gūhati guṇān prakaṭī karoti
āpadgataṁ ca na jahāti dadāti kāle
sanmitralakśanmidaṁ pravadanti santaḥ.

According to the holy men the following are said to be the qualities of a good friend. He prevents his friend from evil doing, makes him do use things, conceals his secrets, proclaims his good points, does not leave him in the time of distress and helps him with money when necessary.

Bhartṛhari gives importance to 'work or deed' , He believes that even god gives fruit according to 'work'. In this context there is an eminent verse of him; translated into poetic 'sheir' by Allama Muhammad Iqbal. Its Persian translation is elegant. This is a philosophical verse based on one of the well known six-orthodox philosophy under Hindu-Philosophy, and i.e. mīmamsā Philosophy, hence its translation was very difficult and arduous in it-self, however, the attempt of translator in this subject is praiseworthy.

انسان شریف و بزرگ منش   دوست خوب چنین می گوید دوست خوب را از گناه حذا می دارد و بہ انجام کار نیک را صبر می شود
، بدی ها و درستی ها را ظاہر می کند ، در سختی های روزگار دوتش را رهائی کند و دا زمان مصیبت و گرفتاری با او همدادی
می کند ....

namasyāmo devānnanu hatavidheste pivaśagā,
vidhirvandyaḥ so pi pratiniyatakarmika phaladaḥ
phalaṁ karmāyattaṁ yadi kimamarai kinča vidhina
namastatkarmabhyo vidhirapi na yebhyaḥ prabhavati.

We salute the gods but really they are under the authority of Brahma. We salute Brahma but he only awards the natural fruits of our various actions. Hence what have we to do is salute the actions; which even Brahma cannot go against.

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے
(علامہ اقبال)

This above verse effected widely to Allama Iqbal. He was of the belief that 'work' plays major role in human life, This meaning is expressed in following 'sheir' of Allama Iqbal.

amal se zindagī bantī hai jannta bhī jahannam bhīye khākī apanī fitarata men na nūrī hai na nāri hai

هر کہ چند مابہ خدا سلام می کنیم . ولی خواست او وا بستہ تقدیر است پس ماتقدیر لا سلامت می کنیم اماهمبین تقد پرهم است وابستہ
بر اعمال است و نتیجہ ی ان هم وابستہ بر کاز ماست پس با خدا چہ کار دا ایم

و تقدیر هم برای چیست ؟ بنا براین سلام و درود بر ان کار و اعمال باد کہ دا واقعی از خدا ابم بالا تر است ــ

In this way 'nītiśataka' is a store of moral speeches. There are many life useful moral speeches collected in this, better than one another. It has been translated nearly into every famous languages of the world. In this very order, its translation into Persian is the subject of pleasant wonder.

The tradition of Persian translation of Sanskrit books began from the Pahalvi (Middle age-Persian) translation of Pañcatantra which was done by Hakeem Borzoiya. This tradition of translation was at its pinnacle in Mughal-era, especially under the reign of Akbar, but this tradition of Sanskrit-Persian translation nearly halted with the downfall of Mughal dynasty.

This work of Chandragupta Bhartiya is an attempt of reviving, that very rich tradition. With the Persian translation; the rich verses of this book have become easy for the Persian-speaking peoples too. In fact translation of any artistic work makes it worldwide, a verse of Rajaśekhara is noticeable in this context:

nysyāvidagdhavadaneșu padāni śaśvat kasyāpi sañcarati viśvakutūhalīva.

References

1. Contribution of Muslims to Sanskrit Learning by Dr. J.B. Choudhury, Published from Pracyavani Calcutta, 1954.
2. Muslims Patronage to Sanskrit Learning, by J.B. Choudhury, Published from Pracyavani Calcutta, 1941.
3. Mughal Samrat Akbar aur Sanskrit Part Ist, IInd & IIIrd by Dr. Pratap Kumar Mishra, Published by Akhil Bhārtiya Muslim Sanskrit Sanrakshan Evam Prāchya Shodh Sansthan, Varanasi, 2012
4. A Short History of Sanskrit Literature, by T.K. Ramchandra Aiyar Published by R.S. Vadhyar San & Palghat South India, 2006
5. Sanskrit Sahitya ka Abhinav Itihas by Radhavallabh Tripathi Published by Vishvavidyalaya Prakashan Varanasi U.P. India, 2003 (4th Edition)
6. Sanskrit Sahitya ka Itihas by Pt. Baldeva Upadhyaya Published by Sharda Niketan Varanasi, U.P. India, 2010 (10th Edition)
7. Sanskrit Sahitya ka Itihas translated by Dr. Ramsagar Tripathi, Published by Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, Delhi India, 2013
8. Nitiśataka (Persian Translation) Translated by Dr. Chandragupta Bhartiya, Published by Great Book Contractor, Delhi India, 2014

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

Contribution of the Scholars of Bengal Province in the Oriental Studies

Dr. Shilpa Singh*

Abstract: No history of Sanskrit literature can be complete without a description of Sanskrit works composed in different regions of India, like Kerala, Kashmir and Bihar. Along with this, the Sanskrit literature of Bengal (including West Bengal and Bangladesh) can also be mentioned. If we study the Bengali Sanskrit literature, it has a sophisticated tradition. There have been many famous scholars in Bengal who composed many excellent texts based on oriental learning. The cultural heritage of this province, represented in Sanskrit works, is vast, varied and valuable. There is hardly any branch of Sanskrit literature to which Bengal has not contributed significantly. The remarkable thing is that the scholars of this field left the impact of their originality in many areas. The most prominent of these works are Navya-Nyay, Navya-Smriti and Tantra. In fact, these are three huge pillars on which the grand edifice of mediaeval Bengal culture rests. In the field of poetic literature also, Bengali literature developed a new literary style, which is known as Gaudi-Riti. To this day, Bengal appears to be a pioneer in the field of Sanskrit anthropological literature. In almost all regions, there are countless unpublished manuscripts of Sanskrit works written by Bengali scholars over the centuries. A historical study of Bengal's contribution to Sanskrit literature reveals the province's close cultural ties with Nepal and Tibet. In Tibetan translation, a considerable number of Buddhist philosophical and tantric works have been preserved, of which Sanskrit origins have been lost. With the advent of the British rule, Calcutta became the cultural centre of the country. Calcutta's Fort William College and the Asiatic Society added new dimensions to the study and research of various aspects of Sanskrit literature. A detailed research paper will be presented on the basis of this topic 'Contribution of the Scholars of Bengal Province in Oriental studies'.
Key Words- Bengal Sanskrit Literature, Veda, Smṛti, Nyāya, Vaiśeṣika, Mimānsā, Āgama,Tantra, Darśana, Vyākaraṇa, Sāhitya, Bengal Scholars and Contribution.

No systematic study of the history of Sanskrit literature is possible unless literary contributions from different regions of the Indian subcontinent are included. From this point of view, the details of the detailed study related works in the field of Sanskrit literature are available in different regions of India, such as Kaśmīra, Andhra, Keralā, Karṇātaka, Kāśī, Kāmarūp, Mithilā, Kānyakubja, Ujjain, Rajpūtānā Maharaṣtra, Gujarāt etc. In this sequence, the study sequence related to the contribution of Bangal has a comprehensive history of its own. By Bengal, I mean united Bengal, in which the contribution of scholars of today's sovereign nation Bangladesh is also noteworthy.
Bengal has been famous in India for its intellectual talent since ancient times. The first mention of Bangal is found in aitareya-āraṇyaka (2/1/1/5) by the name of the banga clan, which is historically considered to be a text of the later Vedic period. Similarly, in the nerve text called Śaktisangaṁatantra, śiva tells Pārvatī, describing this area as the most siddhiprada, that from the sea to the banks of the Brahmaputra, this region of Bengal is the most accomplished. Such is my word-

---

* Assistant professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India.

ratnākarṁ samārambhya brahmaputrān tadaṁ śive; bangadeśo mayā proktaḥ sarvasiddhipradāyakaḥ.

The contribution of Bengal in the field of oriental science, especially Sanskrit, can be mainly divided into three phases. Pre-British (Ancient and Medieval Bengal) British period (the period of establishment of Fort William College, Sanskrit College and Asiatic Society) Post-independence period. Similarly, there can be three categories of Bengali scholars who have contributed in the field of oriental science, first- whose birth-place and work-place both remained in Bengal, second-class of scholars, whose ancestors or they themselves were originally from Bengal, but they have gone elsewhere. The third category scholars are those whose ancestors were originally or outside, but they settled in Bengal and merged with this culture and became one. There were some areas in Bengal from where orientalists. Such a chain of scholars was formed which filled the scholarly class with wonder at the all India level. In these areas there is Navadvipa, Bhaṭṭapallīgrama (present-day Bhāgapāṛā, Howrah West Bengal). Kotalīpāṛā village (Farīdapūra district, modern Bangladesh) etc. are particularly noteworthy. This talent of Bangabhoomi and contribution in the field of oriental science has been accepted by the scholars outside Bengal with an unbiased and open mind. In this context, a few lines from the speech given at the annual function of 'Paschim Banga Rashtrabhasha Prachar Samiti', a friend of India's first Prime Minister Pandit Jawāharlāla Nehrū and famous scholar of Hindi literature, Rāmadhārī Singh Dinkara are worth mentioning in this context. His speech-

The compilation of his brothers under the title of 'Vandniya Bengal is also compiled in a treatise called 'Culture, Language and Nation'. This is the land where the art of India was born again. The poetry of vālmīki and Kalidasa has once again become new and where even in the spirit of doubt and uproar, religion has given a new proof of its eternal. What we are seeing in New India was born one day from the belly of this Bangabhoomi. Bengal is the first gateway to India and it is no wonder that the sun of our new age rose from the Bengali sky.

The contributions of the scholars of Bengal in the fields of oriental science, such as Vedas, poetry, grammar, lexicography, religion- philosophy, medicine, mathematics, astronomy, chemistry, Pali, Prakrit, Arabic-Persian have been of standard standard and world-renowned. Along with the original texts, a rich tradition of commentary and interpretation texts is also visible. In the present research paper, the contributions of Bengali scholars in the above mentioned areas will be discussed in a concise manner.

1. Veda and Smṛti (Theology)- In the course of Vedic studies, there has been more promotion of Sāmaveda in Bengal. Kauthuma recension has been more popular in sāmaveda also. This is being recited in the brahmins here under the branch of self-study. Vedic education in Bengal has been concentrated in tola (Gurukula) or chatuṣpāṭhī (Gurukula). sāmaveda saṁhitā, brāhmaṇa, āraṇyaka and upaniṣad have been studied in these centres of learning. Among the famous Vedic scholars of Bengal, the names of two scholars in the modern era are particularly noteworthy. The first is Nirvāna who made, Bengali translations of various Vedic texts. The second scholar is the eminent Vedic Āchārya Pandit Satyavrata Sāmaśramī. He has been an

all India level scholar of Samaveda. After getting education in Kāśī (Vārānasī) he was the teacher of Vedas in the Department of Sanskrit in Culcutta University for some years. A Sanskrit magazine named 'pratnakarmanandinī' was published by him in Kāśī (Vārānasī). The texts composed by him are as follows:

(A) sāmaveda (with sāmagana five volumes)
(B) Aitaṛeya-brāhmaṇa (in four volumes of the commentary)
(C) Śatapatha-brahmaṇa (in two volumes)
(D) Nirukta (in four volumes)
(E) Upalekhasutra
(F) Devatātattva (in Bengali language)
(G) Trayī Chatuṣṭaya (Introduction to Veda Chatuṣṭaya in Bengali Language).

In this sequence, theology has also been at its peak in Bengal. Dr. P.V. Kāṇe has also discussed in the first book of the book 'History of Dharmaśastra', many of the samṛtikārs of Bengal, some of which are as follows:

(I) Aniruddha Bhaṭṭa- was a Māhāmahopādhyāya and a religion president living in Champāhaṭṭī Bengal. King Ballālsen of Bengal has accepted him as his religious guide. Their date is 12th century. The memory texts composed by him are 'Hāralatā' and 'pitradayitā'. The additional name of 'Pitradayitā' is 'Karmopadeśinī method'.

(II) Pandit Bāṇeśwara Vidyālankāra- He was assisted in writing the book 'vivādārṇavasetu'.

(III) Bhavadeva Bhaṭṭa- The has been the Minister of War and Peace to King Harivarmana Deva of Bengal (late 11th
century). These are Brahmins of the Rādhiya class, living in Sddhala village. He called himself 'bālavallabhī bhujanga. The Smṛti texts composed by his are as follows:

(A) Karmānuṣthanapaddhati (Ten karmapaddhati or samskārapaddhati Chhandopaddhati)
(B) Prāyaśchittaprakaraṇa
(C) Sambhandhaviveka
(D) Śavasūtakāśouchaprakaraṇa

(IV) Bṛhaspati Rai Mukuta- Bengal he has been a court scholar of the time of Sultāna Jalāluddīna. Their time Raghunandan Bhaṭṭāchārya, the famous smṛtikāra of early 15th century Bengal, has mentioned them in many of his texts. You are also a Brahmin of the Rādhiya class. The 'smṛtiratnahāra' and 'Rai Mukut system' are particularly noteworthy in the memory texts composed by him. He wrote a commentary on amarakoṣa (Lingānuśāsana) named padacandrikā and commentary on Raghuvaṁsa, Śiśupāla slaughter.

(V) Pandit Chandrakānta Tarkālankāra (1810-1926 AD)- He was a resident of Śerpur Nagar, Maymaya Singh District (present day Bangladesh). He received education in grammar, poetry and Smṛtiśāstra at home. He has a special contribution in new Smṛties. Three Smṛti books were written by him which became very famour:

(A) udvāhacandrāloka
(B) śuddhi chandraloka

(C) Adhrva Devika Chandrāloka

He also worked on the volumes of Vaiśeṣikasūtrabhāṣya and Gobhila Gṛhyasūtra. This toll department remained at Government Sanskrit College from 1883 to 1897. For some time the service was in the University of Culcutta. In 1894 AD, he became a Honarary Fellow of the Asiatic Society and was also elected Vice-president of the Bangia Sahitya Pariṣad.

(VI) Govinda Nandan- has been a famous schala of Smṛti of Bengal. It is known from his biography that he was a resident of a place called Bāgdī of Medinīpura. His father's name was Gaṇapati Bhaṭṭa, by him the Smṛti texts named Dānakriyā-kaumudī, Śuddhi-kaumudī, Śrāddhakriyā- kaumudi, Varṣakriyā-kaumudī and Kriyākaumudī were written. Their time is from 1510 to 1550 AD.

(VII) Pandit Halāyudha- This is also very famous among the smṛtikāra of Bengal. He was a contemporary of King Lakshmṇa Sen of Bengal (1185 to 1205 AD). The famous Smṛti book composed by him is brāhmaṇasarvasva. Whose additional name is 'karmopadeśinī'. Vedmantra have also been commented by him.

Some Vedic Mantras has also been commented by him.

(VIII) Jagannātha Tarka Panchānana- The son of Pandit Rudra Tarka vāgiśa, he was a resident of a place called Trive\ṇī in Hooghly. During the time of Sir William Jones, he edited 'Vivādabhangarṇava'.

(IX) Jimūtavāhana- He was born in the Pāribhadra family of Rādha region of Bengal. The following works were done by him:

(a) Kālaviveka

(b) Vyavahāramātṛkā

(c) Dāyabhāga (commentary of Yajñavalkya Smṛti) His time is considered between 11th century to 14th century.

(X) Raghumuni-Vidyābhuṣaṇa- It is estimated that he composed 'Dattakacandrikā'. This wine was also the advisor of the royal family.

(XI) Raghunandana Bhaṭṭāchārya- He is the most famous smṛtikar of Bengal. He was born in Navadvīpa, the capital of Bengal at that time, his father's name was Pandit Harihara Bhaṭṭāchārya and Teacher Śrinātha Āchārya Chudāmaṇi. His chronology is 1500-1600 AD. 28 Smṛti scriptures have been written by him. He has done so much work in the field of smṛti that his name has become Smārta Bhaṭṭāchārya. At the end of each of his texts, the word 'Tattva' is mentioned. His early composition is 'Malmāsa'. His texts are:

(A) Tīrtha yātrā tattva.

(B) Dvādaśayātrātattva (vātrātattva)

(C) Gayāśrāddhapaddhati

(D) Rāsayātrāpaddhati

(E) Tripuṣkaraśāntitattva

(F) Grahayajñatattva

(G) Dāyabhāga commentary.

(**XIII) Śūlapāṇi-** He was a famous historian preceding Raghunandan. They have called themselves Sāhudiyāna, which is probably a sub-branch of the Radhiya class. Their time is between the 11th to the 15th century. The texts composed by him are as

follows:
Ekādaśiviveka Tithiviveka, Dattakavivek, Durgotsavavivek, Dolayātrāvivek, Prāyaścittaviveka, Vratakālaviveka, Rāsyātrāviveka, Śrāddhaviveka, Saṁkrāntiviveka, Sambandhaviveka. The Yājyavalkya Smṛti commentary was composed by him in the name of 'Dīpakalikā.

(XIV) Ballālsena- was a famous Hindu king of Bengal. His time was from 1158 to 1179 AD. His mentor was Aniruddha Bhaṭṭa. This is different from the Ballālsena. The texts composed by him are as follows: Dānasāgara Mānasāgara Adbhutsāgara. Eighty Smṛti texts have been written by him, in which various classical elements have been considered- Āhnikatattva, Chhāndogavṛṣotsarga, Dāya, Devapratiṣṭhā, Dīkśā, Durgotsava Ekādaśī, Janmāṣṭamī, Jyotiṣa, Kṛtya, Malimūlocha, Maṭhapratiṣthā, Puruṣottamakśetra, Prāyaśchitta, Ṛgvṛṣotsarga, Saṁskār, Sāmaśrādha, Śūdrakritya, Śuddhi, Tadāgabhāvanotsarga, Tithi, Udvāha, Vāstuyāga, Vrata, Vyavahāra, Yajurvṛṣotsarga, Yaju: Śrādha.

Some commentary texts have also been written by him. During the British period in Bengal, a treatise named 'Vivādabhangārṇava' was written by Jagannath Tarka Panchanan, the inspiration of Sir William Jones. The English translation of this book was done by Colebrook in 1796 AD. This book is popularly known as Colebrook Digest. This book was very useful for the British judges. In this sequecne, Pandit Bāṇeśwara Vidyālankāra, the inspiration of the Governor of Bengal, Warren Hastings, with the help of ten pundits, composed a book called 'Vivādarṇavasetu'. This book is divided into 21 chapters, in which there are 1632 verses. This book has also an important text of Indian Hindu jurisprudence.

(2) Nyāya Vaiśeṣika Mimāmsā- Bengal has been particularly famous for jurisprudence in the field of philosophy. Especially for Navya Nyāya, Banga place has been famous at all India level. Mithilā and Navadvīpa are considered to be two branches of Navyanyāya which started from Āchārya Gangeśopādhyāya. Out of which Navadvīpa branch is of Bengal. In the past, only some ancient Nyāya was studied in Bengal, but Pandit Vāsudeva Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya studied Navyanyāya in Mithilā from Pt. Mishra and propagated it in Mithilā. In this way Pandit Vāsudeva Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya was the original originator of Navyanyāya in Banga Place. There were other eminent teachers, whose descriptions are as follows:

(I) Pandit Bhavānanda 'Siddhāntavāgīśa'- the famous Naiyāyika of 16th century Bengal, by whom many texts were written, some are based on the texts of Raghunāth Śiromaṇi and some are the Alok texts of Pandit Pakśadhara Mishra. Explanation of- Pratyakśadīdhita-commentary, Anumānadīdhita-cpommentary, Ākhyātavāda-commentary, Nayavāda- commentary, Guṇadīdhita commenatry, Līlāvatī, Śiromaṇi-commentary, Pratykśā-lokasāramanjarī, Anumānālokasāramanjarī, Śabdāloksāramanjarī. Apart from this, more books on Navya-Nyāya were written by you.

(II) Gadādhara Bhaṭṭāchārya Chakravartī- The name of Gadādhara is notable among the later logicians of Raghunātha Śiromaṇi. Commentary is available on the word and guess section of the Tattvachintāmaṇi commentary is available on

the word and guess section of the Tattvachintāmaṇi book by them. Apart from this Pratykśāloka and Anumānāloka commentary were written on the Alok book of Pakśadhara Mishra. Apart from this, the texts of Raghunātha Śiromaṇi were interpreted by him. He has written 64 texts titled 'Vāda'. Of which Śaktism, Libertarianism. Etymology etc. are famous.

(III) Guṇānanda Vidyāvāgīśa- He has done remarkable work in the field of Navya Nyāya, who has a position in the 16th century. The first four of the following texts are commentaries on the texts of Raghunātha Śiromaṇi. Guṇavivṛtti-Viveka, Bauddhadhikkāra-Dīdhita Viveka, Anumāna Dīdhita Viveka, Līlāvatī Dīdhita-Vivek, Pratyamani- commentary, Nyāyapuṣpānjali-tātparya-Vivek, Śabdāloka Viveka.

Conclusion

No cultural history of Bengal before King Śaśānka is very much heard at all India level. But the stream of oriental science especially Sanskrit, which flowed in the medieval period also progressed in the Muslim rule of Bengal. In the modern period, Sanskrit Vidyā got a new position and direction in Bengal with the establishment of Sanskrit College, William Fort College and Asiatic Society during the British rule and the scholars of Bengal which includes both western and eastern Bengal. He achieved immense fame at the All India level with his contribution.

Reference

1. Chatterji, Rama: Religion in Bengal during the Pala and the Sena times, Calcutta, 1985.
2. Banerji, J. (ed.): The Music of Bengal, Baroda, 1988.
3. Chattopadhyay, Rita: Modern Sanskrit Dramas of Bengal (20th cent. A.D.), Calcutta, 1992.
4. Haridāsa Siddhāntavāgīśa, an appraisal, Calcutta, 1989.
5. A Study on Candravamsam, Calcutta, 1988.
6. Belvalkar, S.K.: Systems of Sanskrit Grammar, Poona.
7. Chattopadhyay, B. (ed.): Culture of Bengal through the Ages, Burdwan (West Bengal), 1988.
8. Banerji, S.C.: Tantra in Bengal, New Delhi, 1992 (2nd ed.).
9. Dattaray, R.B.: Vedicism in Ancient Bengal, Calcutta, 1974.
10. Chaudhuri, J.B.: History of Dutakavyas of Bengal.
11. Contribution of Muslims in Skt. Lit., Calcutta.
12. Muslim Patronage to Skt. Learning. Calcutta, 1942.
13. Contribution of Women to Skt. Lit., Calcutta.
14. Dutta, K.K.: Bengal's Contributions to Sanskrit Literature, Calcutta, 1974.
15. Diehl, K.S.: Primary printed and MS. sources for 16th-19th century studies available in Bengal, Orissa and Bihar Libraries, Calcutta, 1971

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

Deep-Ecology in The Vedic Literature

Dr. Thakur Shivlochan Shandilya*

Abstract: Human civilization has been passing through a very difficult period as the Earth is severely suffering from the problems of environmental pollution and global warming for a long time. In the blind rat-race of industrialization and urbanisation, we have exploited our environment so much that the essential environmental balance has been disturbed and the vital natural resources have been draining out ironically. Ecology evolved as a subject-field to fulfil the need of an honest revisit to our environmental policy. Ecology is the study of the relationship between the living organisms and their environment. Deep-ecology is one of the major branches of ecological studies. It is an environmental philosophy that asserts the intrinsic value of all living beings. It has been developed as a social movement that considers humankind as an integral part of its environment. It negates any boundary between self and others. Therefore, it establishes interrelation between all living beings and the physical environment and aims to challenge the idea of dominance of humans over the nonhuman nature. This paper is aimed to focus on the idea of Deep-ecological studies in the Vedic literature. The Vedas are believed to be the oldest existing texts of human wisdom in Sanskrit. Deep-ecological thoughts like coexistence, cooperation, sustainable development, nonviolence, global peace and unity are clearly evident in the Vedic and Upanisadic hymns. This paper will explore some of the most significant Deep-ecological references of the ancient Vedic literature to find out the solution to the present environmental crisis.

Environment is an intrinsic and vital part of this cosmos. All the creatures have an inevitable relation with the environment they live in. The environment consists of the earth, air, water, plants and animals that provide the necessary and sufficient conditions for sustaining life in this biosphere. Today, the environmental crisis is a tremendous problem for the whole world. Human civilization has been passing through a very difficult period as the Earth is severely suffering from the problems of environmental pollution, global warming and gradual crunch of natural resources from a long time. In the blind rat-race of industrialization and urbanization we have exploited our environment so much that the essential environmental balance has been disturbed and vital natural resources have been draining ironically.

We, the humans, have been exploiting our natural resources out of our selfishness and greed from a very long period of time. The earlier Newtonian model and the mediaeval Cartesian model of basic sciences have professed the Biblical view of dealing with the nature and its resources. The verse 1:26 of Genesis of the Holy Bible reads "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." This prophecy led the human beings to the exploitation of natural resources mercilessly which resulted in the ecological imbalance in the course of time. This anthropocentric view is actually the root cause of the exploitation of the natural resources.

A serious revisit towards our environmental policy was needed amidst of the drastic ecological imbalance and gradual draining of natural resources. Based on two main ideas, deep ecology was a movement initiated by Arne Naess, a Norwegian

* Assistant Professor, Department of Sanskrit, B.H.U., Varanasi, India.

philosopher in 1972 posits that there must be a shift from human centered anthropocentrism, where all living things have the same inherent value and Humans are equally part of nature rather than superior or apart from it. Arne Naess was inspired by the traditional Indian perspective towards the interrelation of the humans and the nature. He admits to be influenced by the thoughts of Spinoza and Gandhi, who believe in the holistic approach towards the environment that everything which is perceived by us is the form of the same non-dual consciousness. He believes in an intrinsic worth of every creature. Naess strongly criticized the Judeo-Christian approach towards the nature, stating that the "arrogance of stewardship consists in the idea of superiority which underlies the thought that we exist to watch over nature like a highly respected middleman between the Creator and Creation."[1]

Deep-ecology is one of the major branches of the ecological studies. It evolved as a subject-field to fulfill the need of an honest revisit to our environmental policy. It is an environmental philosophy that asserts the intrinsic value of all living beings. It has been developed as a social movement that considers humankind as an integral part of its environment. It negates any boundary between self and others; therefore, it establishes interrelation between all living beings and the physical environment and aims to challenge the idea of dominance of humans over the nonhuman nature.

The paper is aimed to focus on the idea of Deep-ecological studies in the Vedic literature. The *Veda*s are believed to be the oldest existing texts of human wisdom. Deep-ecological thoughts like coexistence, cooperation, sustainable development, nonviolence, global peace and unity are clearly evident in the *Vedic* and *Upaniṣadic* hymns. This study will explore some of the most significant Deep-ecological references of the ancient Vedic literature to find out the solution of the present environmental crisis.

Deep ecology emphasizes on biospheric egalitarianism and posits that humans shall make a conscious return to nature and all things on this earth have an equal right to live and thrive without disturbing other elements. The principal of biocentrism claims that everything is interrelated; if we harm nature, we inevitably harm ourselves. We must not only protect our environment for the sake of humans but also for the sake of our ecosystem.

The theory of deep ecology is not radical in itself. It focuses on nature instead of humans. It empathizes with other living things and believes in the principal of *"Live and let live."* One can find out the source of biospheric egalitarianism in the *Veda* and Upanishads. One can find ample evidence of the harmony between human and nature in the Vedic literature. The *Veda* states that everything is *Brahman*, indeed – *"Sarvaṁ khalu idaṁ Brahma."* Everything is originated from the same – *"Yato vā imāni bhūtāni jāyante."* In other words, the whole universe is the manifestation of the non-dual conscious being – *Brahman.*

The *saṁskṛti* (culture) of every country depends on its environment, climatic conditions and human behaviour. Literatures reflect in their own culture, geographical conditions, climatic influences and environmental aspects. Therefore, from this point of view the *Vedic* literature is of great utility to us and to the world society at large. Accordingly if we study the environmental conditions of our society and the world, we shall be greatly benefitted in our living and healthy life.

The traditional Vedic wisdom prescribes acts for avoiding environmental imbalance and ecological turmoil. But we neglected the instructions of the scriptures, sometimes out of total ignorance of the contents of these works and at other times out of incapability to follow the real intention of the seers of these scriptures. This study

would present a brief outline of the awareness for maintenance of balance in our environment and concern for the acts polluting nature, as we find it in the V*edic* literature.

The word *Veda* means knowledge. The *Veda* is believed to be the source of all types of knowledge – *"Vedo akhilo dharmamūlam. Sarva jñānamayo hi saḥ."*[2] It not only deals with the knowledge of the gross/subtle world but also with the Ultimate Truth *i.e.* the knowledge of both physical and spiritual aspects. The *Veda* is the first recorded statement of our heritage. Sir Norman J. Lockyer, the renowned astronomer has acknowledged "The *Veda*, in fact, is the oldest book in which we can study the first beginnings of our language and of everything which is embodied in all the languages under the sun."[3]

In the *Prithvī Sūkta* of the *Atharva Veda,* we find an idea of conservation of natural resources. Here, the *Prithvī* is worshipped as a deity, who is the mother of the whole cosmos and apart from humans, all plants, herbs and animals are said to be the children of the mother *Earth.* As a mother, the Earth loves and looks after all the creatures and elements equally and she is not biased towards any particular species :- *"Tvajjātāstvayi caranti martyāstvaṁ bibharṣi dvipadastvaṁ catuṣpadah." (Atharva 12.1.15).* In the *AtharvaVeda* people have been advised not to cause any harm to the Earth. The clear message of the *Veda* is to instill a deep harmonious bond between humans and other forms of life on the Earth so that it doesn't suffer from any ecological imbalance.

Many *Vedic* prayers invoke divine intervention to bliss and protect the environment. To protect environment the *Ṛg-Veda* says:

"Madhu vātāḥ ṛtāyate madhu kṣaranti sindhavaḥmādvirnaḥ santvoṣadhiḥ
madhu naktamutoṣaso madhumatpārthiva rajaḥmadhu dyaurastu naḥ pitā madhumānno
vanaspatirmadhumānnastu sūryaḥ mādhvirgāvo bhavantu naḥ'' (*Ṛgveda*,1/90/6,7,8)

(Environment provides bliss to people leading their life perfectly. Rivers bless us with sacred water and herbs provide us health, our days and nights are blissful, the Earth and the sky bless us. The plants and trees are blissful for us. The Sun blesses us with peaceful life. Our cows provide us milk).

The *Vedic* seers advocate for dealing with the nature in a very judicious way. Making full use of the *Hindu* psyche, they compared all the natural beings like trees, air, sun, moon, planets, rivers and mountains etc. with the human beings, Gods etc. For example in the *Ṛg*-veda,8/1/13 the *Vedic Ṛṣi* prays the deity *Indra* not to separate trees from the forests and the sons from their fathers.

Plants like *Tulsī, Pippala* and *Vaṭavṛkṣa etc.* have great importance in the Hindu culture. Many verses in the *Vedic* literature explain their importance. *"Aśwattho devasadanaḥ''* (*Atharvaveda,* 5/4/3). It was prohibited to cut a *Vatavṛkṣa* because *Devatās* live on the branches of this tree. Śri Kṛiṣna in the *Śrimadbhagavadgītā* says "*aśwattho sarvavṛkṣāṇām."*

The *Oṣadhi sūkta* of the *Ṛg-veda* addresses to plants and vegetables as mother, 'O mother of the mankind! A hundred are your applications and thousand fold is your growth. You fulfil hundred functions, make my people free from diseases. *"Śataṁ vo amb dhāmāni sahasramuta vo ruhaḥ''* (*Ṛg-veda*,10/97/2). The fire and Sun play the most significant role in the purification of environment. Animals and birds are part of nature and environment. The *Vedic* seers have mentioned about their characteristics and activities and have desired their welfare. *Ṛg-vedic* seers classify them in three groups sky animals like birds, forest animals and animals in human habitation—

"Tasmāt yajñāt sarvahutaḥ sambhṛtaṁ pṛṣadājyaṁ paśūntānścakre vāyavyānāraṇyāngrāmyāsca ye." (Ṛgveda,10/90/8)

All three types of living creatures found in the universe have different environments and every living creature has an environment of its own. But when we look from man's perspective all of them constitute this environment. There is a general feeling in the *Vedic* texts that animals should be safe, protected and healthy—

"Bhūrbhvaḥ svaḥ suprajāḥ prajābhiḥ syām suvīro vīraiḥ supoṣaḥ poṣaiḥnarya prajāṁ me pāhi śaṁsyaṁ paśūnmepāhyartharya pituṁ me pāhi." (*Yajurveda,* 3/37)

From the above detailed discussion, some light is thrown on the awareness of our ancient seers about the environment, and its constituents. It is clear that the *Vedic* vision to live in harmony with environment was not merely physical but was far wider and much comprehensive. The Vedic sages realized that the pure water, air etc. are the roots to good health and happiness and hence they considered all these as *Devatās*. They desired to live a good and healthy life of hundred years -

"Paśyema śaradaḥ śataṁ jivema śaradaḥ śataṁ śṛnuyāma śaradaḥ śataṁ prabravāma śaradaḥ śatamadīnā śyāma śaradaḥ śatam bhūyaśca śaradaḥ śatāt.'' (*Yajurveda*-36/24)

And this wish can be fulfilled only when environment will be clean and peaceful. Various types of environmental laws have now been enacted for the protection and preservation of environment. But many years ago, the sages recited the following verse -

"Dyauḥ śāntirantarīkṣa śantiḥ pṛithivī śāntirāpaḥ śāntiroṣadhayaḥ śantiḥ vanaspatayaḥ śāntirviswadevāḥ śāntirbrahma śāntiḥ sarva Ω śāntiḥ śāntireva śāntiḥ sā mā śntiredhi" (Śukla yajurveda 36-17)

"Let there be balance in the space! Let there be balance in the sky! Let there be peace on the Earth! Let there be calmness in water! Let there be richness in the herbs! Let there be growth in the trees! Let there be grace in the Deities! Let there be bliss in the Brahman! Let there be balance in everything! Let there be peace and peace! Let such peace be with every one of us!"

The knowledge of *Vedic* sciences is meant to save the human beings from failing into an utter darkness of ignorance. The unity in diversity is the message of the *Vedic* physical and metaphysical sciences. The essence of the environmental studies in the Vedas can be put here by quoting a partial mantra of the *Īśāvāśyopaniṣad* 'One should enjoy with renouncing or giving up others part' – *"Īśāvāśyamidaṁ sarvaṁ yatkiñca jagatyāṁ jagat tena tyaktena bhūñjithā mā gṛidhaḥ kasyaswid dhanam''*(*Ishopaniṣad*-1).

From this *Vedic* message it is clear that environment belongs to all living beings, so it needs protection by all, for the welfare of all. The Vedic *ṛṣi* has established an inherent relation of human beings with each and every element of the cosmos. By accepting the Sky as the father and the Earth as the mother of the mankind, the Vedic seer has enunciated an integral relationship between the nature and the humans - *"Dyaurme pitā janitā nābhiratra bandhurme mātā pṛthivī mahīyam." (Ṛgveda 1.164.33)* A mantra of the *Atharva Veda* states about the importance of the purity of the environment that all the humans, animals and birds live happily where there is a pure environment – *"Sarvo vai tatra jīvati gauraśvaḥ puruṣaḥ paśuḥ yatredaṃ brahma kriyate paridhirjīvanāya kam."(Atharva Veda 8.2.25)* Here the word *Brahma* has been used in the meaning of 'absolute purity' and the word *paridhi* is used for the environment. The Vedic seers have worshipped the nature and its components like trees, rivers, mountains, forests, animals, birds etc. as the *Devatās.* Etymologically the word *Devatā* means someone who gives us anything or enlighten us by any means or who lives in the heaven – *"Devo dānādvā dyotanādvā dyusthāne bhavatīti vā."* Our

nature gives us many things like food, water, air, light, energy etc. therefore it is the *Devatā* indeed.

The Gaia hypothesis is a well acclaimed notion in the modern deep ecology. It has been proposed by the famous chemist and ecologist James Lovelock in 1970. Lovelock named this idea after *Gaia*, the primordial goddess of the Greek mythology, who personified the Earth- "*Mythical images of the Earth Mother are among the oldest in human religious history. Gaia, the Earth Goddess was revered as the supreme deity in early, Pre-Hellenic Greece. "*[4] Lovelock states *"The idea of Mother Earth or, as the Greeks called her, Gaia, has been widely held throughout history and has been the basis of a belief that coexists with the great religions."*[5] He further says clearly *"Sustainable development, supported by the use of renewable energy, is the approach to living with the Earth ….. if we fail to take care of the Earth, it surely will take care of itself by making us no longer welcome."*[6]

This is the same notion preached by our great *Vedic* seers in numerous *Vedic* hymns.The *Veda* says that if we protect the Earth and the Sky than we would be protected by them reciprocally - *"Avatāṁ tvāṁ dyāvāpṛthivī, ava tvaṃ dyāvāpṛthivī."(Yajurveda 2.9) "Mā dyāvāpṛthivī abhiśocīḥ, mā antarikṣaṁ mā vanaspatīn."(Yajurveda 11.15)* An important *mantra* of the *Atharva Veda* preaches that if we dig any area of the Earth then we must refill that particular area after its use. We must not cause any hurt to the Earth in any condition, as it is our mother – *"Yatte bhūme vikhanāmi, kṣipraṃ tadapi rohatu; mā te marma vimṛgvari, mā te hridayamarpitam." (Atharva Veda 12.1.35).*

Thus it is very much clear that the holistic approach of the ancient Indian *Vedic* wisdom can contribute tremendously in the development of the deep ecological understanding and practices. A serious revisit of the concerned *Vedic* literature would be very helpful in the above context.[7]

References

1 Arne Naess (2002); *'Life's Philosophy – Reason & Feeling in a Deeper World'* p. 8.

2 Manusmriti 2.7

3 Lockyer, N. J. (1973): *The dawn of Astronomy*, M.I.T. Press, p. 432.

4 Spretnk, Charlene, Lost Goddesses of Early Greece, P.30, (The web of life p.22)

5 Lovelock, James; *Gaia: A New Look at Life on Earth*, P.11

6 ibid, P.3

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

সামাজিক কর্মকাণ্ডে সৎসঙ্গের অবদান
(The Role of Satsang as Social Activities)

Tapas Kumar Roy*

Abstract: Many great men were born in the whole of India. Those who have guided the worldly welfare of the people through their experience. Besides, they have found the right ways for people to attain worldly peace. Anukul Chandra is such a great man. Anukul Chandra was born at the village Himaitpur under Pabna District of the then East Bengal in undivided India. He established an organisation named 'Satsang'. The followers of this organisation are commonly known as 'Satsangi' (One who is the companion of everyone's life and growth). Anukul Chandra is regarded as an honest and reliable leader by his followers as he is the spiritual head and guide of the organisation Satsang and, thereby, Satsang is. By practising religious activities to enhance spirituality as well as making people expert and efficient in daily life, Satsang aimed to build up a self-reliant nation. For the materialisation of these goals Satsang started to execute many plans and programmes. Realistic endeavours were also chosen in the field of Agriculture, Industry, Education, Mechanical and Chemical technologies, Electrical technology etc. in small and large scale to make people efficient and self sufficient. Again, many social programmes were also initiated for making people scientific, reasonable and divinely graceful through Philanthropy and 'Ritwik Sangha'− an Organisation of 'Ritwik' (One who teaches religious matters and initiates to the divine philosophy of Anukulchandra). Various programmes for the welfare of people had been taken by Satsang under separate topics or captions. These topics will be discussed step by step in the following article.

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম নেওয়া অনেক আপ্তপুরুষ মানুষকে ইহজাগতিকসহ পারলৌকিক জীবনের উন্নতির সন্ধান দিয়েছেন। অনুকূলচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একবারে নবীনতম। ইংরেজ শাসন কবলিত ভারতবর্ষের এক ক্রান্তিকালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার অন্তর্গত 'হিমাইতপুর' গ্রামে তাঁর জন্ম। জীবনের নানা প্রতিকূলতা শেষে একপর্যায়ে তাঁরই নেতৃত্বে 'সৎসঙ্গ' গঠিত হয়। তিনিই উক্ত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-প্রাণপুরুষ। অনুকূলচন্দ্রের ভাষায়– "সৎ-এ সংযুক্তির সহিত তদ্‌গতিসম্পন্ন যারা তারাই সৎসঙ্গী এবং তাদের মিলনক্ষেত্রই সৎসঙ্গ।"[১] সৎসঙ্গের একটি স্বতন্ত্র সংযোজন হল সু-মানবের পাশাপাশি স্বনির্ভর সমাজ গঠন। সৎসঙ্গের পরিচালনায় নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড তথা সৎসঙ্গ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম-পরিধি তৎকালীন সময় হতে বর্তমানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তা তুলে ধরার পূর্বে অনুকূলচন্দ্রের জীবন-পরিচিতি ও সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত প্রয়োজন।

তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে বাংলা ১২৯৫ সালে (১৮৮৮ খ্রি.) অনুকূলচন্দ্রের জন্ম। তাঁর পিতার নাম শিবচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতা মনোমোহিনী দেবী। পাঁচ বৎসর বয়সে বালক অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষাজীবনের হাতে-খড়ি শুরু। অতঃপর পর্যায়ক্রমে পাবনা শহরের 'পাবনা ইন্সটিটিউশন', 'পাবনা জিলা স্কুল' এবং ঢাকার আমিরাবাদস্থ 'রাইপুরা স্কুল'-এ তাঁর পড়াশুনা।

সেসময়ে মাসতুতো ভগ্নিপতি শশীভূষণ চক্রবর্তী তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং নদীয়া জেলার অন্তর্গত 'নৈহাটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়'-এ তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। কিন্তু, চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় নিজের টাকা দিয়ে সহপাঠীর ফরম-ফিলাপের ব্যবস্থা করে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। পরে পারিবারিক চাপে অর্থকরী বিদ্যা ডাক্তারি পড়ার জন্য কলকাতায় বাবু শরৎ মল্লিক-প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ'-এ অনুকূলচন্দ্র ভর্তি হন। সেখানেও চূড়ান্ত পরীক্ষা না দিয়ে পরহিতব্রতী

* Ph.D Research fellow, Department of Sanskrit, Rajshahi University, Bangladesh.

অনুকূলচন্দ্র হিমাইতপুরে পুনরায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে অর্জিত হোমিও এবং ভেষজবিদ্যার সমন্বয়ে তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা পেশা শুরু করেন। প্রতিবেশী বসন্তকুমার সাহাচৌধুরীর সহযোগিতায় তাঁরই গৃহে একটি ডিসপেনসারি স্থাপন করেন এবং চিকিৎসাবিদ্যায় অসামান্য সাফল্য আসে। এসময়ে তাঁর উপলব্ধি হয়– শুধু দেহরোগ নয়, রোগের মূল উৎস মনে। তাই দেহরোগের চিকিৎসার উর্দ্ধে উঠে মানুষের মনের ব্যাধির নিরাময়ের কর্মপন্থা হিসেবে তিনি সঙ্গীসাথীদের নিয়ে ১৩২০ সালে প্রাথমিকভাবে গড়ে তুললেন একটি নামসঙ্কীর্তনের দল৬। দৈহিক ও মানসিক সমস্যাযুক্ত নানা মানুষ প্রতিদিন তাঁর কাছে সমাগত হতে লাগলো। সার্বিক প্রয়োজনে হিমায়িতপুরে তৈরী হলো আবাস, ধ্যানক্ষেত্র, কর্মশালা– ধীরে ধীরে যা সাধুজনদের মিলনক্ষেত্র পরিণত হলো – গড়ে উঠল "সৎসঙ্গ"। সৎসঙ্গ যেন কর্ম, জ্ঞান আর ভক্তির সমন্বয়ে একটি অভিনব ত্রিবেণী সঙ্গম। সার্বিকভাবে সেই প্রতিষ্ঠানের লৌকিক নাম দেওয়া হলো– 'সৎসঙ্গ আশ্রম'।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখদের সহযোগিতায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) "সৎসঙ্গ" সরকারিভাবে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে । সৎসঙ্গের মাধ্যমেই জীবন-বৃদ্ধির মর্মকথা তিনি বলেতে থাকেন– 'মরো না, মেরো না, পারতো মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর'। তাঁর ভাষায়– "Do never die, nor cause death, but resist death to death."৭ নেতাজী সুভাষ বোস, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বিদগ্ধ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের প্রমুখ ভাষাশিল্পিরা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

অনুকূলচন্দ্রের প্রেরণা এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় ১৯২০ খ্রি. থেকে ১৯৪৫ খ্রি. পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রমে আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি গড়ে ওঠে বিভিন্ন কর্মপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলির শিরোনাম ও কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হিমাইতপুরের নিভৃত পল্লীতে সমসাময়িক কলকাতা নগরীর মতো এক নীরব কর্ম-বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। নিম্নে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কর্ম-আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো–

১) আদর্শ শিক্ষানিকেতন 'তপোবন বিদ্যালয়'

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে গুরুসান্নিধ্যে হাতেকলমে, কষ্টসহিষ্ণুভাবে, বাস্তবভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। বর্তমান সনদসর্বস্ব শিক্ষা থেকে তা একেবারেই স্বতন্ত্র। অনুকূলচন্দ্রের মতে– "শিক্ষা যেথা শ্রমের সাথে/আদত্ শিক্ষা জানিস তাতে"৮। এই উদ্দেশ্যে তিনি হিমাইতপুরে ঋষিযুগের কাঠামোতে 'তপোবন বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোকে 'প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা'৯ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মন্মথনাথ মুখার্জি মহোদয় 'তপোবন বিদ্যালয়' সম্পর্কে বলেন–

> "সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষার অনুষ্ঠান হইয়াছে, -----এইরূপ প্রতিষ্ঠান বাংলার ঘরে-ঘরে করণীয়। যতদিন না বাংলার জেলায় জেলায় পল্লীতে পল্লীতে এরূপ অনুষ্ঠান সৃজিত হইবে, ঘরে ঘরে লোক বুঝিবে এরূপ শিক্ষা না দিলে যথার্থ শিক্ষা হইবে না, ততদিন আমাদের দেশের শুভদিন উপস্থিত হইবার বিন্দুমাত্র আশা ভরসা নাই।"১০

২) সৎসঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রঃ

ধর্মচর্চা, ঈশ্বরলাভ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তিলাভ ইত্যাদির পাশাপাশি অনুকূলচন্দ্র মানুষকে বিজ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত করার জন্য প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁর সংজ্ঞা– "Dharma is the scince of being and becoming."১১–এটিই তার উদাহরণ। বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনচর্চার প্রাথমিক আয়োজন 'বিশ্ব-বিজ্ঞান কেন্দ্র' –প্রতিষ্ঠা করেন।

৩) সৎসঙ্গ মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কসপ

স্বদেশী পণ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে না পারলে অথবা সেগুলো বিদেশে রপ্তানী করে অর্থাগমের ব্যবস্থা না করতে পারলে জাতির উন্নতি সম্ভব হবে না– এরকমই অনুকূলচন্দ্রের ভাবনা। এভাবনা থেকেই একখানা ছোট টিনের চালার নীচে একটি হাপর১২ ও কয়েকটি কামারশালার যন্ত্রপাতি নিয়ে ১৯২৪ সালে প্রথম মেকানিক্যাল ওয়ার্কসপের কাজ শুরু হয়। সেই সাথে হিমাইতপুরের মত অজ পাড়াগাঁয়ে পাওয়ার হাউজ থেকে

দিনরাত ৪৫ অশ্বশক্তি জেনারেটরের মাধ্যমে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা তখনকার সময়ে শুরু হয়েছিল।

৪) সৎসঙ্গ ক্যামিক্যাল ওয়ার্কস

অনুকূলচন্দ্রের চিকিৎসা পদ্ধতির একটি শাখা দেশজ লতাপাতার ব্যবহার। তিনি সবসময় চিন্তা করতেন দেশীয় লতাপাতা থেকে প্রয়োজনীয় নির্যাস আহরণ করে কিভাবে রোগীর চিকিৎসা ও সাধারণ মানুষের কল্যাণ করা যায়। সে ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ থেকেই **১৯২৫** সালে স্থাপন করা হয় 'কেমিক্যাল ওয়ার্কস্'। এখান থেকে পর্যায়ক্রমে নবরঞ্জিনী তৈল, প্রিভেন্টিনা মলম, পেরো-ডাইরিন, এব্রোমিন, উশীর কম্পাউণ্ড, নবরঞ্জিনী কেশ তেল ইত্যাদি ঔষধ তৈরী হয়।
এ বিষয়ে অনুকূলচন্দ্রের বক্তব্য–

> "বাংলার পল্লীগ্রামের বন-জঙ্গলে কত অদ্ভুত গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ রয়েছে--- এই সকল উদ্ভিদ হতে কত আশ্চর্য ফলদায়ক ঔষধ যে তৈয়ারী হতে পারে তারও ইয়ত্তা নাই। এদেশের জলবায়ুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ওষধি-সমূহই আমাদের ধাতুর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। তাই এদিকে মনোযোগ দেওয়া দেশবাসীর পক্ষে একটি বিশেষ কর্তব্য বলেই আমার মনে হয়।"[৯]

৫) সৎসঙ্গ প্রেস ও পাবলিশিং হাউস

অনুকূলচন্দ্রের বাণী তথা উপদেশ নির্দেশনাকে সাধারণ মানুষের কাছে লিখিত আকারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পাবনার-হিমাইতপুরে 'সৎসঙ্গ ক্ষীরোদাস্মৃতি প্রেস' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাণীসমূহের পাশাপাশি সেখানে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, আরবী, পারসি, সংস্কৃত ভাষায় ছাপার কাজ শুরু হয়। দুঃখের বিষয়, দেশভাগের পর পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার বিনামূল্যে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে আত্মীকৃত করে। উল্লেখ্য, সৎসঙ্গ প্রেসের প্রশংসা করে তৎকালীন 'আনন্দবাজার' পত্রিকার মন্তব্য করা হয়েছিল–

> "-----নিষ্ফল সমালোচনা ও কর্কশ বাদানুবাদের পরিবর্তে জাতির চিন্তা ও চরিত্রে যে গঠনমূলক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি প্রয়োজন 'সৎসঙ্গী' প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও আলোচনার ভিতর দিয়া তাহারই আভাস দিতেছে।"[১০]

৬) সৎসঙ্গ কুটিরশিল্প বিভাগ

"পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন-পূরণের অনুসন্ধিৎসা ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত হলেই বেকার সমস্যা জাতির বুক হতে ধীরে-ধীরে অন্তর্হিত হয়ে যাবে।"[৯] এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আটা, ময়দা, চিনি, চাউল, বোতাম, ইত্যাদি দ্রব্যাদি তৈরীর জন্য প্রযুক্তিযুক্ত ছোট ছোট যন্ত্রপাতি কিনে তার মাধ্যমে উৎপাদন শুরু হয়। সেসময়ে এই উদ্যোগ জাতীয় বেকার সমস্যা দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

৭) সৎসঙ্গ ব্যাংক

অনুকূলচন্দ্র পল্লীগ্রামের মানুষ ছিলেন। স্বভাবতই পল্লীর মানুষের জন্য তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য–

> "বাংলার কৃষক ও শিল্পীদের কি দুরবস্থা! দেশে কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, মালাকর প্রভৃতির ব্যবসায় আজ লোপ পেতে বসেছে। কৃষককূল নিরন্ন এবং ঋণভারে জর্জ্জরিত। কৃষি ও শিল্পকার্যের পরিচালন-উপযোগী যৎসামান্য মূলধন যাহা যখন দরকার হয়, তজ্জন্য তারা ধনী মহাজনের শরণাপন্ন হয়------ যেরূপেই হউক ইহাদিগকে বাঁচাতেই হবে। "[১১]

সেই লক্ষ্যে তৎকালীন সময়ে হিমাইতপুরের মত গণ্ডগ্রামে একটি ব্যাংক স্থাপিত হয়। সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষেরা কুশীদ্‌জীবী মহাজনের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এখান থেকেই যথাসময়ে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারত। স্বল্প আয়ের মানুষেরা যাতে সঞ্চয় করতে পারে সেজন্য 'সৎসঙ্গ রিনোভেশন' ফান্ডের ব্যবস্থাও ছিল সৎসঙ্গ ব্যাংকে।

৮) সৎসঙ্গ পূর্তকার্য বিভাগ (ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ)

প্রকৌশল-প্রযুক্তির প্রয়োগে স্থায়ী-অস্থায়ী নির্মাণ কাজের জন্য নির্ধারিত বিভাগের নাম পূর্তকার্য বিভাগ। প্রথমে নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এই কাজের সূচনা। সুপেয় পানির ব্যবস্থাপনার জন্য অনুকূলচন্দ্রের ইচ্ছায় এই উদ্যোগ গ্রহণ। পরবর্তীতে ভবন, লৌহ স্ট্রাকচার, জলাধার, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়। উল্লেখ্য, পাকশীর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (সাড়া ব্রিজ) ও গড়াই সেতুর River boring -এর নির্মাণ কাজেও সৎসঙ্গ প্রকৌশলীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৯) সৎসঙ্গ মাতৃসঙ্ঘ

পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের জীবন মানের উন্নতি সাধনে অনুকূলচন্দ্রের প্রেরণায় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সাধনা দেবী (বি. এ)-এর পরিচালনায় 'সৎসঙ্গ মাতৃসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদ্যেগে বহু নারী লেখাপড়ায় সনদ অর্জনের পাশাপাশি সঙ্গীত, বাদ্য, চিত্রকর্ম, সূচিকর্ম, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি কাজে পারদর্শী হয়ে উঠেন। এসকল নারীকল্যাণকর উদ্যোগের প্রশংসা করে সুলেখিকা শ্রীযুক্তা সরলাদেবী (বি. এ) বলেন–

> "যোগশাস্ত্রে যে বলে সাধনার দ্বারা মুদিত হৃদপদ্ম বিকশিত হয়, এই আশ্রমের নারীদের মধ্যে সেই তত্ত্ব সত্যে পরিণত দেখিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। ------দেখিলাম পাবনার এই সৎসঙ্গ আশ্রমটী বাঙ্গলার নারীর মনের চিকিৎসালয়, আত্মার নার্সারি ও কর্ম্মের কারখানা। নারী এখানে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও আনন্দের সমগ্রতায় পূর্ণ বিকশিত হইতেছে।"[১৩]

১০) সৎসঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগ

প্রাচীন সংস্কৃত উপদেশ বাক্যে বলা হয়েছে– 'শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্'[১৪]। অনুকূলচন্দ্রের মতে–

> "মানুষকে বাঁচতে হলে, পারিপার্শ্বিকের সেবায় উন্নতিলাভ করতে হলে যেমন শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন তেমনি পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যেরও প্রয়োজন, বরং স্বাস্থের প্রয়োজনীয়তাই প্রথম ও প্রধান, কারণ স্বাস্থ্যেই ঐশ্বর্য, স্বাস্থ্যেই সামর্থ।"[১৫]

সেজন্য অনুকূলচন্দ্র রোগ-প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে হিমাইতপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার জন্য এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

১১) সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্র

শিল্পগুণযুক্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনের লক্ষে অনুকূলচন্দ্রের নির্দেশনায় এই সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোকচিত্র ও মৃৎশিল্প নির্মাণ, 'সস্ পেন্টিং, 'ওয়াটার কালার', 'এনলার্জমেন্ট', 'অয়েলপেন্টিং', কমার্শিয়াল ডিজাইন, পুতুননির্মাণ ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত। এথেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেশ তথা দেশের বাইয়েও সেসময়ে গ্রহণযোগ্য পায়।

১২) সৎসঙ্গ আনন্দবাজার

সৎসঙ্গের সাধারণ ভোজনালয়ের নাম 'আনন্দবাজার'। মোটা ভাত এবং জলবৎ তরল ডাল খেয়ে দিবারাত্র সুকঠিন পরিশ্রমের পরও মানুষ যে সবলসুস্থ থাকতে পারে 'আনন্দবাজার' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আনন্দবাজারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনুকূলচন্দ্র বলেছেন–

> "বাঁচা-বাড়ায় সাহায্য করে
> দুটো খাওয়া দিয়ে
> আনন্দবাজার নাম হল তাই
> চর্যাপোষণ নিয়ে।"[১৬]

মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন বর্জিত সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারের মাধ্যমে মানুষকে সুস্থ রাখার কৌশল হিসেবে আজও এর কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য ১৩৫০ এর মন্বন্তরে এই আনন্দবাজারের উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় পার্শবর্তী ১০ মাইল এলাকাজুড়ে সেসময়ে কোন লোক খেতে না পেয়ে মারা যায়নি[১৭]।

১৩) সৎসঙ্গ গৃহনির্মাণ বিভাগ

প্রথমত স্বগৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে সৎসঙ্গ গৃহনির্মাণ বিভাগ চালু হয়। অনুকূলচন্দ্রের প্রেরণায় আশ্রমের তপোবন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র মিলে রাজমিস্ত্রীদের 'যোগান শ্রমিক' হিসেবে কাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে নিজেরাই রাজমিস্ত্রীর কাজের কলাকৌশল আয়ত্ব করে নেন। আবার, আশ্রমের ভিতরেই কাঁচামাটি পুড়িয়ে ইট তৈরীর

উদ্যোগ নেওয়া হয়। এভাবে আশ্রমের ইটভাটায় স্বনির্মিত তৈরী ইটে আশ্রমেরই বিভিন্ন ভবন, শৌচালয়সহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ এগিয়ে চলে। নির্মিত সেসকল স্থাপনার মধ্যে কিছু ভবন এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

১৪) সৎসঙ্গ ফিলানথ্রপি

ফিলানথ্রপি (Philanthropy) একটি ইংরেজি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ– 'Concern for the welfare of mankind' 'মানবকল্যাণ চেতনা'। অনুকূলচন্দ্র এর বাংলা প্রতিশব্দ দেন– 'বিশ্বকল্যাণ কেন্দ্র'। সৎসঙ্গের যে কেন্দ্রের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিতভাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় সেটাই 'সৎসঙ্গ ফিলানথ্রপি'।

১৫) সৎসঙ্গ দারুশিল্পালয়

আশ্রমের নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্রাদি এখান থেকে তৈরী শুরু হয়। পরে পাবনা শহরেও তার সরবরাহ শুরু হয়। সেসময় দারুশিল্প প্রভূত সুনাম কুড়িয়েছিল।

১৬) বায়ুচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

সৎসঙ্গ আশ্রমে প্রথমেই প্রথমে বায়ুচালিত যন্ত্রের মাধ্যমে বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদন সফল হয়। উল্লেখ্য, মেঘের মধ্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে সংরক্ষণ করে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সে প্রচেষ্টাও সৎসঙ্গ আশ্রমে শুরু হয়েছিল।

১৭) সৎসঙ্গ ঋত্বিক্ সংঘ

অনুকূল আদর্শের চেতনা প্রচারে আত্মনিবেদিত ও সাধনতৎপর কর্মীবৃন্দের সংগঠন হলো ঋত্বিক সংঘ। মানুষ ইষ্ট থেকে বিচ্যুত, ব্যক্তিস্বার্থে ব্যস্ত । অথচ, সমস্যা সমাধানে মূল উদ্যোক্তা তথা ভাল মানুষের জন্ম হচ্ছে না। অনুকূলচন্দ্রের মতে– সুবিবাহযুক্ত দম্পতির সুসন্তান জন্মদান সমস্যা সমাধানের একটি পথ। তাই ব্যক্তি-গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব নিরসন এবং অনুকূল আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সমাজকে সুন্দর করার প্রচার শুরু হয়। ভারতবর্ষসহ বহির্ভারতেও অনুকূলচন্দ্রের বাণী পোঁছে যায়। সংঘের এই কাজ বর্তমানেও চলমান রয়েছে।

১৮) মনোমোহিনী কলেজ অব সাইন্স এণ্ড টেকনোলজী

প্রকৌশল-বিদ্যা নির্ভর উচ্চতর একাডেমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য অনুকূলচন্দ্র তাঁর মায়ের নামে প্রতিষ্ঠা করেন 'মনোমোহিনী কলেজ অব সাইন্স এণ্ড টেকনোলজী'। পল্লীগ্রাম হিমাইতপুরে সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর এই স্থাপনা আশ্চর্যের বিষয়। পরবর্তীতে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হলেও দেশবিভাগের পরবর্তী পরিস্থিতে তা হয় নি। কলেজের জন্য অধিকৃত জমি এখন অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে বেদখল হয়ে আছে।

২০) কৃষি বিভাগ ও সেচ ব্যবস্থা

কৃষিকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট পশু, রাসায়নিক, জল, মাটি, হাওয়া ইত্যাদির সাথে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের জন্য অনুকূলচন্দ্রের উদ্যেগে কৃষি বিভাগ ও সেচ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।তাঁর চিন্তা ছিল প্রতিটি পরিবারে একটি পাকা বাড়ি, কৃষি ক্ষেত ও দক্ষ হাতে কৃষি-কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকবে[১৮]।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সৎসঙ্গের এই কর্মপরিধির ব্যাপকতা লক্ষ্য করে ১ অক্টোবর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য করেছিলেন–

> সৎসঙ্গে আসিয়া আমি সেই কর্তব্যেরই উদ্বোধনের প্রচেষ্টা দেখিতে পাইতেছি। মনে হইতেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে আমরা প্রাণে প্রাণে যাহার অনুসন্ধান করিয়াছি তাহা হাতে কলমে আরম্ভ করা হইয়াছে এই সৎসঙ্গে। ”[১৯]

প্রবাদ পুরুষ মহাত্মা গান্ধী বলেছে–

> “......... Of the surrounding of the Asram I carried a very good impression-29.05.1925.”[20]

অনুকূলচন্দ্রের হাতে গড়া সার্বিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্বমানবসভ্যতা উপকৃত হচ্ছিল। সেসময়ে অনুকূলচন্দ্র ডাক্তারের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর তিনি ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) স্বাস্থ্যকর স্থান দেওঘরে সাময়িকভাবে গমন করতে হয়। কিন্তু ভারতবিভাগ পরবর্তী প্রতিকূল

পরিবেশে তাঁর জন্মভূমিতে আর ফিরে আসা সম্ভব হয় নি। তখন উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে। ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট জন্ম নিল পাকিস্তান ও ভারত। হিমাইতপুর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো, দেওঘর পড়লো ভারতে। অনেকটা বাধ্য হয়েই তাঁকে দেওঘরে থেকে যেতে হলো। মাতৃভূমিতে ফেরার আকুতি নিয়েই ১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারি সূর্যোদয়ের পূর্বে দেওঘরে অনুকূলচন্দ্রের তিরোধান ঘটে। পরিশেষে বলা যায়, অনুকূলচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গ শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় সংগঠন নয়। মানবজীবনে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পাশাপাশি একটি শিক্ষিত, প্রযুক্তি-দক্ষ, স্বনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়ী জাতিগঠনে সৎসঙ্গ একটি কার্যকরী সংঘ। শিক্ষা, প্রযুক্তি, কেমিক্যাল ও মেকানিক্যাল বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, তড়িৎবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সৎসঙ্গের স্বতন্ত্র উদ্যোগগুলি তার প্রমাণ। আবার ঋত্বিক্ সংঘ, ফিলানথ্রপি প্রভৃতি শাখার মাধ্যমে সু-মানব গড়ে তোলাও এর এক অনন্য উদ্যোগ। তাই সৎসঙ্গের আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমে অন্ধবিশ্বাস ও মোহের উর্দ্ধে উঠে যুক্তি-নির্ভর, বিজ্ঞান-মনস্ক, ব্যবহারিক জ্ঞানে দক্ষ, সর্বোপরি ইষ্টমার্গী একটি সুন্দর মানবসমাজ গঠিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যনির্দেশ

১ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, ***সংজ্ঞা সমীক্ষা*** (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা–১১।

২ সুশীলচন্দ্র বসু, ***মানসতীর্থ পরিক্রমা*** (কলিকাতা, শ্রীমধুসূদন বন্দোপাধ্যায়, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা– ১৪।

৩ SriSri Thakur Anukulchandra, ***Magna dicta*** (Deoghar-Bihar, Satsang publishing house, 1985), p-187.

৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, ***অনুশ্রুতি, ১ম খণ্ড*** (দেওঘর বিহার, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৩), পৃষ্ঠা– ৩১।

৫ অতুল চন্দ্র সেন সম্পা., ***শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*** (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৩৬), পৃষ্ঠা–২০৬।

৬ ব্রজগোপাল দত্তরায়, ***শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র*** (কলিকাতা: ইম্পিরিয়েল লজ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা–৯৩-৯৪।

৭ রবীন্দ্রনাথ সরকার, ***অনুকূল ভাবনায় জন্মভূমি-তীর্থভূমি*** (পাবনা: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮), পৃষ্ঠা–৩।

৮ **'হাপর'**– কামারশালায় লোহা গলানোর জন্য আগুনে বাতাস দেওয়ার যন্ত্রবিশেষ।

৯ ব্রজগোপাল দত্তরায়, ***শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র***, ***প্রাগুক্ত***, পৃষ্ঠা–৯৬-৯৭।

১০ ***তদেব***, পৃষ্ঠা–৯৯।

১১ ***তদেব***, পৃষ্ঠা–১০০।

১২ ***তদেব***, পৃষ্ঠা–১০১।

১৩ ***তদেব***, পৃষ্ঠা–১০৬।

১৪ শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পা., ***কুমারসম্ভবম্*** (কলিকাতা: জানকীনাথ কাব্যতীর্থমহাচার্য, ১৩৩৫), পৃষ্ঠা–১৫৩।

১৫ ব্রজগোপাল দত্তরায়, ***শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র***, ***প্রাগুক্ত***, পৃষ্ঠা–১০৬।

১৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, ***অনুশ্রুতি, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত***, পৃষ্ঠা–৬৫।

১৭ ফণিভূষণ রায় এবং শিখা রায়, ***ভক্তবলয়*** (কলকাতা: শ্রীসুরজিৎ ভক্ত, ২০১৮) পৃষ্ঠা–১১।

১৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, ***অনুশ্রুতি, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত***, পৃষ্ঠা–১২২।

১৯ ব্রজগোপাল দত্তরায়, ***শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, প্রাগুক্ত***, পৃষ্ঠা–৪৭৮।

২০ ***তদেব***, পৃষ্ঠা–৪৭১।

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

قطب شاہی عہد میں اردو ادب: ایک مختصر جائزہ

(Urdu Literature in Qutub Shahi Reign: A Brief Analysis)

Dr. Md. Nasir Uddin*

Abstract: In the history of Urdu literature, the Urdu of Deccan that is called Dakhini Urdu has got much importance, specially the output of the Urdu literature of Qutub Shahi period is eminent. After the downfall of Bahmani kingdom the region of Deccan was divided into five sovereign estates namely Bejapur, Golcunda, Ahmednagar, Bedar and Gujrat. Qutub Shahi Dynasty ruled over Golcanda and Urdu benefited remarkably from it. This dynasty valued poets and scholars notably and that is why the storage of Urdu literature was enriched greatly. This dynasty ruled over this region Golcunda and Hyderabad from 1508 to 1687, which is nearly one hundred eighty years. Urdu thrived in this area in the favour of the rulers. During the reign of Qutub Shahi the men who played the pivotal role in the development of the Urdu Language in this region, were mainly Ibrahim Quli Qutub Shah, Mohammad Quli Qutub Shah, Mulla Wajhi, Sultan Mohammad Qutub Shah, Abdullah Qutub Shah, Ghawwasi, Ibne Nishati etc. This paper will try to showcase their life and work and highlight the contribution they rendered to the Urdu language and literature.

اردو ادب کی تاریخ میں دکنی اردو کو بڑی اہمیت حاصل ہے- اگرچہ شمالی ہند کے مقابلہ میں دکن میں اردو کا چرچا بعد میں ہوا مگر شمالی ہند سے دکن میں اس کا چرچا سب سے زیادہ ہوا- اس لئے کہ نظم اور نثر دونوں ہی کی ابتداء دکن سے ہوئی- یعنی اردو نے ادبی صورت دکن میں ہی اختیار کی- دکن میں تصنیف وتالیف کا سلسلہ اس زبان میں بہمنی دور (۱۳۴۷ء- ۱۴۹۵ء) سے ملنے لگا- اس دور میں بہمنی خاندان کے کل اٹھارہ بادشاہ گزرے- اس دور کے تمام بادشاہ اردو ادب سے دلچسپی رکھتے تھے- بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن کا علاقہ پانچ خود مختار سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا (جیسے بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، بیدر اور گجرت)- مگر اس زبان کی ترقی برابر جاری رہی اور بہت نامی گرامی شعراء اور نثر نگار پیدا ہوئے- بیجاپور میں عادل شاہی، گولکنڈہ میں قطب شاہی، احمد نگر میں نظام شاہی، بیدر میں برید شاہی اور گجرات میں عماد شاہی سلطنت قائم ہوئی- ان میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کو دکنی زبان وادب کی نشو د نما کے سلسلے میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے- ۱

قطب شاہی سلطنت کا بانی سلطان قلی قطب شاہ ہے- جس نے ۱۵۱۸ء میں خود مختار حکومت قائم کی اور گولکنڈہ کو اپنا پایۂ تخت قرار دیا- اس کے بعد اس خاندان کے سات شخص یکے بعد دیگرے حکمراں ہوئے- ۱۶۸۷ء میں اورنگ زیب عالمگیر نے یہ سلطنت فتح کر کے مغلیہ قلمرو میں شامل کرلی-۲

مندرجہ ذیل قطب شاہی عہد میں اردو ادب کی اشاعت میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے ان کا ایک مختصبر جائزہ پیش کیا جارہا ہے-

* Professor, Department of Urdu, University of Rajshahi, Bangladesh.

سلطان محمد قلی قطب شاہ

قطب شاہی خاندان کا پانچواں فرماں روا محمد قلی قطب شاہ سب سے زیادہ مقبول اور بلند پایہ بادشاہ گزرا ہے -اس کا دور حکومت ۳۱ سال یعنی ۱۵۸۰ء سے ۱۶۱۱ء تک تھا- اس کے دور حکومت میں سلطنت کو ہر طرح کا فروغ ہوا-وہ شہنشاہ اکبر کا ہم عصر تھا-شعر و شاعری سے قلی قطب شاہ کو بہت دلچسپی تھی -اس کے علاوہ وہ دیگر فنون لطیفہ کا بھی بہت بڑا قدر دان تھا- یہی وجہ ہے کہ اس کے دربار میں ہر فن کے باکمال لوگ اور بڑے بڑے شاعر جمع رہتے تھے-اس کے عہد میں اردو کو بڑی ترقی ہوئی- ۳

موجودہ معلومات کے لحاظ سے سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے- ۴ اس کے کلام کا مجموعہ جو اردو ادب میں " کلیات محمد قلی قطب شاہ" کے نام سے مشہور ہے پہلی مرتبہ اس کے بھتیجے اور جانشین سلطان محمد قطب شاہ نے اس کے مرنے کے بعد ۱۶۱۶ء میں مرتب کیا-اور پھر ۱۹۱۴ء میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے جدید ترتیب کے ساتھ حیدر آباد سے شائع کیا- ۵

"کلیات قلی قطب شاہ" میں غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی، مرثیے، ترجیع بند غرض سب ہی اصناف سخن کے وافر نمونے ملتے ہیں- جس کے مطالعہ سے اس کی قادر الکلامی اور شاعرانہ صلاحیتوں کا قائل ہونا پڑتا ہے-چند اشعار بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے:

پلا ساقی سے ہور خوشی سیتی تاج
ہوا سبز و خرم ہوا جیسا پاچ
تمن شوق کا نین تھے مینہ چوے
اے باتاں نہیں جھوٹ تم دیکھو ساچ- ۶

سلطان محمد قلی قطب شاہ کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں:

"سلطان کے کلام پر نظر ڈالی جائے تو واضح ہوگا کہ اس نے جملہ اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے-مثنوی، قصیدے، غزل، مرثیہ وغیرہ اس کے تخیل کے بہترین نمونہ ہیں-خیالات میں بلندی ہے، تشبیہ اور استعارے نادر اور وصف نگاری کا اچھا نمونہ پیش کیا ہے-مناظر قدرت کی جو عکاسی ہے وہ لاجواب ہے- ۷

ملا وجہی

ملا اسد اللہ وجہی قطب شاہی دور کا سب سے بڑا شاعر و نثر نگار گزرا ہے-وہ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے- محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں ملک الشعراء کے اعزاز سے نوازا گیا-اس نے طویل عمر پائی اور قطب شاہی خاندان کے چار بادشاہوں کا زمانہ دیکھا-اسے

نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی۔"سب رس" اس کا نثری کارنامہ ہے جسے اردو نثر کی تاریخ میں قابل رشک مقام حاصل ہے۔ شاعری کے میدان میں اس کی مثنوی "قطب مشتری" نے بہت شہرت پائی۔کلاسیکی ادب میں اس مثنوی کا شمار ہوتا ہے۔ ۸

قطب مشتری: قطب مشتری اردو کی پہلی طبع زاد دکنی مثنوی ہے جسے ملا وجہی نے ۱۶۰۹ء میں تصنیف کیا۔اس مثنوی میں وجہی نے سلطان محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کا قصہ رمزیہ انداز میں پیش کیا ہے۔اسی مناسبت سے اس کا نام قطب مشتری رکھا گیا۔مشتری بعد میں بھاگ متی کے نام سے مشہور ہوئی۔بھاگ متی ایک رقاصہ تھی۔جس پر قلی قطب شاہ عاشق تھے۔اس لئے وجہی نے اس داستان پر ایک مثنوی لکھ دی۔اس مثنوی میں وجہی کی جدت طراز طبیعت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔
مثنوی قطب مشتری میں اس عہد کے رسم و رواج اور معاشرے کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔یہ فنی اعتبار سے بہت بلند پایہ مثنوی ہے۔جذبات نگاری، منظر کشی، معاشرت کی عکاسی اس مثنوی کی اہم خصوصیات ہیں۔تشبیہات و استعارات کے بر محل استعمال نے اسے اعلیٰ درجے کا ادبی کارنامہ بنا دیا ہے۔یہ کتاب اپنے دلکش اسلوب اور اعلیٰ تخیل کی وجہ سے قدیم اردو کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔اس کے دیباچہ میں وجہی نے اس طرح اپنے کلام کی بڑائی ظاہر کی ہے:

نہ پہنچے نہ پہنچا ہے گن گیان میں
سو طوطی منج ایسا ہندوستان میں۔۹

سب رس: قطب شاہی دور کی زبردست کتاب "سب رس" ہے جس کو ملا وجہی نے عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں ۱۶۳۵ء میں تصنیف کیا ہے۔یہ تصوف کی ایک بہترین کتاب ہے۔حسن و دل کے عنوان سے اس کتاب میں تصوف کے مسائل نہایت خوبی سے ایک قصے کے پیرایہ میں قلم بند کئے گئے ہیں۔انسانی جذبات کی کشمکش اس کتاب میں نہایت خوبی سے پیش کی گئی ہے۔اس میں اخلاقیت کی تلقین بڑی کامیابی سے کی ہے۔اردو میں غالباً رمزیہ انداز بیان کی پہلی تصنیف ہے۔۱۰
"سب رس" کی چند سطریں بطور نمونہ پیش ہیں:

"عقل نور ہے عقل کی دوڑ بہوت دور ہے۔عقل ہے تو آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کوں پاتے۔عقل اچھے تو تمیز کرے، برا اور بھلا جانے، عقل اچھے تو اپس کوں ہور دسرے کوں پچھانے۔عقل تے میر، عقل تے پیر۔عقل تے بادشاہ عقل تے وزیر۔عقل تے دنیا، عقل تے دولت۔عقل تے چلتی سلطاناں کی سلطنت۔"۱۱

سلطان محمد قطب شاہ

سلطان محمد قطب شاہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور داماد تھا۔اپنے چچا کی وفات پر تخت نشین ہوا اور تقریباً پندرہ برس (۱۶۱۱ء سے ۱۶۲۵ء تک) حکومت کی۔خود شاعر تھا اور شاعروں کی سرپرستی کرتا تھا۔محمد قلی قطب شاہ کا کلیات بھی اسی نے جمع اور مرتب کیا تھا اور اس پر اردو میں ایک طویل منظوم دیباچہ لکھا تھا جس میں محمد قلی قطب شاہ کی طبیعت اور سخن طرازی کی خصوصیات تفصیل سے بیان کی تھیں۔سلطان محمد

قطب شاہ نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کر کے قادر الکلامی کا ثبوت دیا ہے- فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں اس کے دیوان موجود ہیں-اس کے شعروں میں سادگی کے ساتھ لطافت پائی جاتی ہے-نمونئہ کلام یہ ہے:

پیا سانولا من ہمار ابھایا

نزاکت عجب سبز رنگ میں دکھایا۔ ۱۲

عبداللہ قطب شاہ

سلطان محمد قطب شاہ کے بعد اس کا فرزند عبداللہ قطب شاہ تخت نشین ہوا اور تقریباً پچاس سال تک حکومت کرتا رہا- وہ اردو اور فارسی کا ایک اچھا شاعر اور ماہر موسیقی تھا- عبداللہ اس کا تخلص تھا-اس کے نانا محمد قلی قطب شاہ کے کلیات کی طرح اس کا اردو دیوان بھی موجود ہے-اس نے بھی محمد قلی کی طرح مختلف موضوعات پر لکھا ہے- لیکن اس کے کلام میں اتنی گہرائی اور وسعت نہیں ہے-البتہ زبان زیادہ صاف ہو گئی ہے-کلام کا نمونہ حسب ذیل ہے:

تو پیاری عشق بھی تیرا ہے پیارا

لگیا ہے بھوت تج سوں دل ہمارا

سکھی آمل کہ تل تل ذوق کر لیں

دنیا میں کوئی نہیں آیا دوبارا- ۱۳

غواصی

قطب شاہی عہد کا دوسرا مشہور شاعر غواصی ہے-وہ عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر اور ملا وجہی کا ہم عصر تھا- غواصی نے غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی وغیرہ مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے لیکن اسے سب سے زیادہ شہرت مثنوی نگاری میں حاصل ہوئی-اس نے تین مثنویاں لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں- جیسے میناستونتی، طوطی نامہ اور سیف الملوک وبدیع الجمال-

میناستونتی قدیم مثنوی میناست کا دکنی اردو میں ترجمہ ہے-یہ ترجمہ بہت مقبول ہوا- طوطی نامہ ضیاءالدین بخشی کے فارسی طوطی نامہ کا ترجمہ ہے - غواصی کی مشہور مثنوی "سیف الملوک وبدیع الجمال" سلطان محمد قطب شاہ ہی کے آخر عہد میں لکھی گئی تھی مگر اس کا انتقال ہو جانے پر اس کے کمسن جانشین سلطان عبداللہ قطب شاہ کے نام غواصی نے معنون کر دی- یہ مثنوی الف لیلہ کی نثری داستان سے ماخوذ ہے جسے غواصی نے اپنے انداز میں پیش کیا ہے—مثنوی "سیف الملوک وبدیع الجمال" سے چند اشعار بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے:

بندا اس کے گھر کا سو اقبال تھا

لبا سو اسے کوٹھڑیاں مال تھا

اوٹھیا غل جدھر کا ادھر مار مار

قیامت زمیں پر ہو آشکار- ۱۴

ابن نشاطی

قطب شاہی عہد کا ایک بڑا اور مشہور شاعر ابن نشاطی ہے۔ وہ بنیادی طور پر انشا پرداز تھا۔ اپنے زمانے میں شعر و شاعری کی قدر و منزلت دیکھ کر اس نے بھی شاعری کو اپنے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اس نے ایک فارسی قصے کو اردو میں نظم کر کے مثنوی کی شکل دی اور اس کا " پھول بن " نام رکھا۔ یہ ایک مذہبی تصنیف ہے اور اس میں پند و نصائح سے کام لیا گیا ہے۔ اس دور کی مثنویوں میں اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اس میں اس زمانے کے رسم و رواج بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ ۱۵

ابن نشاطی کی مثنوی پر تبصرہ کرتے ہوئے نصیر الدین ہاشمی لکھتے ہیں:

" ابن نشاطی کی مثنوی پر نظر ڈالی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ صوری اور معنوی دونوں اعتبار سے یہ بلند پایہ ہے اور اس زمانہ کی بہترین نظموں میں اس کا شمار کرنا چاہئے۔ ابن نشاطی نے اپنی مثنوی میں جو کردار کا نمونہ پیش کیا ہے قابل قدر ہے۔ زبان کے لحاظ سے یہ بہت صاف ہے۔ اس کے اسلوب بیان میں ندرت اور جدت پائی جاتی ہے اور کلام میں درد اور اثر موجود ہے " ۱٦

نمونے کے طور پر ابن نشاطی کی مثنوی پھول بن سے چند اشعار پیش کیا جاتا ہے:

اول میں حمد رب العالمین کا

دل و جاں سوں کہوں جاں آفریں کا

شہنشاں کا شاہ عبد اللہ خازی

اچھو جم حق سوں اس کے پیش بازی۔ ۱۷

مذکورہ بالا شاعروں اور نثر نگاروں کے علاوہ قطب شاہی عہد میں اور بہت سے اردو شاعر اور نثار گزرے ہیں۔ جن میں فیروز، محمود، خیالی، احمد، جنیدی، کبیر، لطیف، افضل، شوقی، فائز وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان بزرگوں کے حالات زندگی اور انکی ادبی کارناموں کو زیادہ سے زیادہ منظر عام پر لانے اور انکی تلاش و جستجو کی ضرورت ہے۔ ان کے حالات، ادبی کارناموں اور نمونہ کلام کو اس مختصر مضمون میں پیش کرنا ممکن نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اردو ادب کی ترقی میں دکنی ہند کا بہت بڑا حصہ ہے۔ خاص کر کے قطب شاہی عہد کے ادبی کارناموں کو اردو ادب میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔

حوالہ جات

۱۔ اے بشیر، *صحیفۂ ادب*، علی گڑھ: انوار بک ڈپو، ۱۹۹۷ء، ص۔ ۲۰۴
۲۔ نصیر الدین ہاشمی، دکن میں اردو، نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ۲۰۰۲ء، ص۔ ۴۷
۳۔ مہ لقا اعجاز، نقوش ادب، لکھنؤ: خورشید بک ڈپو، ۱۹۹۸ء، ص۔ ۲۵
۴۔ مسعود حسین، محمد قلی قطب شاہ، نئی دہلی: ساہتیہ اکادمی، ۱۹۸۹ء، ص۔ ۲۷
۵۔ ڈاکٹر سید اعجاز حسین، مختصر تاریخ ادب اردو، دہلی: اردو کتاب گھر، ۱۹٦۴ء، ص۔ ۲۵
٦۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور، دکنی ادب کی تاریخ، علی گڑھ: ایجوکیشنل بک ہاؤس، ۲۰۱۳ء، ص۔ ۵۸
۷۔ دکن میں اردو، ص۔ ۹۹، ۱۰۰

۸-پروفیسر نورالحسن نقوی،تاریخ ادب اردو، علی گڑھ: ایجوکیشنل بک ہاؤس،۲۰۱۱ء، ص- ۲۷،۳۷

۹-تاریخ ادب اردو، ص- ۴۷

۱۰- مختصر تاریخ ادب اردو، ص- ۲٦

۱۱-ملاوجہی،سب رس، مرتب ڈاکٹر قمرالہدی فریدیِ، علی گڑھ: ایجوکیشنل بک ہاؤس،۲۰۱۱ء، ص-٦٦

۱۲-تاریخ ادب اردو، ص-۲۷

۱۳-دکن میں اردو، ص- ۱۰۳

۱۴-دکن میں اردو، ص- ۱۰۸

۱۵-ڈاکٹر شیعب انصاری اور خالد انصاری، روح ادب، علی گڑھ: نیو بک سینٹر،۲۰۰۱ء، ص- ۱۷۴

۱٦-دکن میں اردو، ص-۱۳۷

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

راجندر سنگھ بیدی ایک کامیاب افسانہ نگار

(Rajendra Singh Bedi: A Successful Short Story Teller)

Dr. Muhammad Shahidul Islam*

Abstract: Rajendra Singh Bedi (1915-1984) acquired a special encampment in Urdu story telling. He along with Krishna Chandra and a world acclaimedshort story teller Saadat Hasan Monto played a remarkable role in setting a new trend and paved a way to short story telling in Urdu. Bedi has written numerous stories in which 'APNE DUKH MUJHE DE DO',' HATH HAMARE QALAM HUE', 'KOKH JALI', 'GRAHAN' are worth mentioning. He collects the materials for stories from his surroundings and personal experiences of life, complication of the society, intricacies of conjugal life, the simple homely and unpretentious life of the poor, injustice and oppression, and confrontations of the society are the features of his stories. Bedi narrates the usual trifling things very interestingly and impressively. So long Urdu short story narrative exists, Rajendera Singh Bedi's name would be memorised, too.This paper will try to analyse the main features of Rajendera Singh Bedi's style of short story writing.

اردو ادب میں راجندر سنگھ بیدی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ خاص طور پر اردو افسانہ نگاری میں بیدی کو ایک نامور اور زبردست افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ بغیر راجندر سنگھ بیدی اردو افسانہ نگاری کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اردو افسانے کے چار بڑے بڑے ستونوں میں ان کو ایک مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی فنی مہارت اور انفرادیت کے ذریعے اردو افسانہ نگاری میں غیر معمولی خدمات انجام دے کر اردو افسانہ نگاری کو عروج کمال تک پہنچایا۔ انہوں نے بے شمار قیمتی افسانے لکھ کر اردو افسانے کے خزانے کو صرف مالامال ہی نہیں کیا بلکہ افسانے کے فن کو اس قدر معیاری اور قابل بنایا کہ مغربی ترقی یافتہ زبانوں کے افسانوں کی صفِ اول میں اردو افسانے کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بیدی نے اپنے ہم عصروں کی بہ نسبت کم لکھا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی لکھا ہے بہت عمدہ اور بے مثال لکھا ہے۔ اردو افسانہ کی تاریخ لکھنے والے کوئی بھی مؤرخ اور محقق ان کے کارناموں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اردو ادب میں غیر معمولی خدمات کی وجہ سے حکومتِ ہند کی طرف سے انہیں "پدم شری" کے اعزاز سے نوازا گیا۔[1]

راجندر سنگھ بیدی یکم ستمبر ۱۹۱۵ء کو پاکستان کے لاہور میں پیدا ہوئے۔[2] بیدی کی ابتدائی تعلیم لاہور سے شروع ہوئی۔ انہوں لاہور کے ایس.جی.پی اے خالصہ اسکول سے فرسٹ ڈویزن میں دسویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ پھر لاہور کے ڈی اے کالج سے ۱۹۳۳ء میں انٹر میڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ بیدی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ۱۹۳۳ء میں اٹھارہ سال کی عمر میں کیا۔[3] پہلے پوسٹ آفس میں کلرک بعد میں ریڈیو لاہور میں آرٹسٹ، اسکرپٹ رائٹر اور آخر میں سری نگر ریڈیو اسٹیشن کے ڈائرکٹر کی حیثیت سے ملازمت کی۔ زندگی کے آخری وقت میں ملازمت چھوڑ کر ممبئی میں دائمی طور پر سکونت اختیار کی۔ وہیں گیارہ نومبر ۱۹۸۴ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔[4]

اردو ادب میں راجندر سنگھ بیدی ایک معروف اور بلند پایہ کے افسانہ نگار ہیں۔ فلم انڈسٹری میں بھی ان کو ایک ہر دلعزیز مکالمہ نگار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اردو ادب میں انہوں نے افسانے کے علاوہ ناول اور ڈرامے بھی لکھے ہیں لیکن ناول اور ڈراما نگار کی حیثیت سے بیدی کو وہ شہرت اور

* Professor, Department of Urdu, University of Rajshahi, Bangladesh.

مقبولیت حاصل نہ ہوئی جو ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے ہوئی۔ اردو افسانے کے ذخیرے کو مالا مال کرنے کے لئے بیدی نے تقریباً ۷۰ افسانے لکھے ہیں۔ جن میں لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، صرف ایک سگریٹ، آئینے کے سامنے، لمس، جوگیا، لمبی لڑکی، باری کا بخار، گرم کوٹ، جنازہ کہاں ہے، دس منٹ بارش میں، غلامی، وہ بڈھا، گرہن، تعطل، مٹھن، یوکلپٹس، کلیانی، چھوکری کی لوٹ، دیوالہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ بیدی کے ان افسانے لاہور، دہلی، لکھنؤ، ممبئی وغیرہ سے مجموعوں کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں "دانہ و دان ۱۹۴۳ء"، "گرہن ۱۹۴۲ء"، "کوکھ جلی ۱۹۵۹ء"، "اپنے دکھ مجھے دے دو ۱۹۶۵ء"، "ہاتھ ہمارے قلم ہوئے ۱۸۷۴ء"، "مکتی بودھ ۱۹۸۲ء" سب سے مشہور ہیں۔

اردو ادب میں راجندر سنکھ بیدی کو ایک اہم اور قابل قدر افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی خداداد تخلیقی قوتوں سے اردو ادب کی غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ ان کا شمار اردو افسانوں کے صفِ اول میں ہوتا ہے۔ اردو ادب میں ان کی خدمات کو کوئی بھی سنجیدہ مؤرخ، محقق یا قاری نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بیدی کے افسانوں کی تعداد اردو افسانہ نگاری کے صفِ اول کے افسانہ نگاروں کی بہ نسبت کم ہے۔ لیکن ان کے افسانوں کا معیار دوسرے افسانہ نگاروں سے کسی طرح کم نہیں۔ بیدی کے فسانے ہندوستانی تہذیب تمدن خاص طور پر پنجاب کی سیاسی سماجی معاشرتی اور معاشی صورت حال کا آئینہ دار ہے۔ ہندوستانی عورتوں کے مختلف پہلوان کے دکھ و درد، انسانوں کی مصیبت، حسن و عشق، طوائف کی زندگی، مزدوروں کا غم اور غریبوں کے مسائل کو انہوں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ خاص طور پر عام انسان کے چھوٹے چھوٹے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنا کر جیتی جاگتی صورت میں اس طرح پیش کیا کہ اس میں ایک خاص حسن، معنویت، اور انفرادیت پیدا ہو گئی۔ آل احمد سرور کے حوالے سے ابن کنول لکھتے ہیں "عام زندگی، عام لوگ، عام رشتے ان کے افسانوں کا موضوع ہیں مگر ان میں وہ ایسی طاقت اور توانائی، زندگی اور تابندی، معنویت اور انفرادیت بھر دیتے ہیں کہ ذہن میں روشنی ہو جاتی ہے۔"[5]
افسانے کے لوازمات سے بیدی بخوبی واقف تھے۔ ان کے افسانوں میں فن اور انسانی زندگی کا ایک حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان کے کچھ ایسے افسانے ہیں جن میں صرف سماج کی سچی تصویر کی عکاسی ملتی ہے اور کچھ ایسے افسانے ہیں جن میں انہوں نے انسانی زندگی کے مختلف مسائل کی نشاندہی کی۔ ان کے افسانوں میں فنی اور معنوی دونوں خوبیاں ملتی ہیں۔ جذبات نگاری، کردار نگاری، حقیقت نگاری، منظر نگاری ان کے افسانوں کی اہم خوبیاں ہیں۔

منظر کشی میں بیدی کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ جب ہی بیدی کسی بھی واقعہ یا کہانی کی تصویر پیش کرتے تھے تو وہ بے حد مصورانہ انداز میں پیش کرتے ہیں-ان کے اکثر افسانوں میں تصویر کشی کا کمال دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر "دس منٹ بارش میں" انہوں نے تصویر کشی کا جو جوہر دکھایا ہے وہ لاجواب ہے۔
بیدی ہندوستانی تمدن سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ اس لئے ان کے افسانوں میں ہندوستانی تہذیب کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں۔ خاص طور پر پنجاب کے دیہات کی معاشرت اور مسائل نظر آتے ہیں۔ ان کے افسانوں کی کہانیوں میں سیتہ، رشیدالدین، سندر لال، لکھی سنکھ، سنت، رام بابو، رحمان، منی وغیرہ اپنی اپنی سطح پر مختلف تہذیبی اور سماجی معاشروں کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کہانیوں میں جا بجا اپنی فنکارانہ

مہارت سے تہذیب کے ان پہلوؤں کو پیش کیا جس کی وجہ سے لاجونتی، کوکھ جلی، دس منٹ بارش میں، گرم کوٹ جیسے افسانوں نے بیدی کو افسانہ نگاری کی تاریخ کا ایک اہم ترین افسانہ نگار بنادیا۔

بیدی ایک حقیقت پسند افسانہ نگار ہیں۔ حقیقت نگاری کا معنی زندگی اور اس کے حقائق کو ہو بہو اور سچائی کے ساتھ بیان کرنا ہے۔[6] بیدی کا تجربہ، مشاہدہ اور مطالعہ بہت وسیع اور گہرا تھا۔ وہ انسانی زندگی کے تلخ حقیقتوں سے بخوبی واقف تھے۔ لہذا بیدی اپنے افسانوں میں انتہائی فنکارانہ انداز سے زندگی کی مختلف حقیقتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قاری جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں "وہ بڑھا" بیدی کی حقیقت نگاری کی ایسی ایک بے مثال نمونہ ہے جسے دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ زبان کے افسانوں کے صفِ اول میں رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کا مواد اور موضوعات اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنی اطراف و جوانب کی روز مرہ زندگی سے اخذ کئے ہیں۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے حالات و واقیات سے متاثر ہو کر وہ افسانہ لکھتے تھے۔ وہ پہلے ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ بعد میں ترقی پسند تحریک سے انہوں نے خود کو الگ کر لیا تھا۔ لیکن اس تحریک کی وابستگی نے ان کو زندگی کی مختلف صورتوں اور حقیقتوں سے قریب کر دیا تھا۔ اسلم جمشید پوری کہتے ہیں کہ "کہانی میں زندگی کے ایسے رنگ بھر دیتے ہیں کہ کہانی بالکل حقیقی لگتی ہے۔"[7]

بیدی ایک باشعور افسانہ نگار تھے۔ ان کو اردو ادب کا سب سے بہترین جذباتی افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مزاج میں انسان دوستی کی وجہ سے ان کے ہم عصر افسانہ نگاروں میں بیدی کو سب سے زیادہ جذباتی افسانہ نگار قرار دیا گیا ہے۔ بقول وقار عظیم "بیدی اردو کے سب سے زیادہ جذباتی افسانہ نگار ہیں اور ان کی افسانہ نگاری کا ہر پہلو اسی گہری جذباتیت کا پیدا کیا ہوا ہے۔"[8]

بیدی اپنے افسانوں میں انسانی نفسیات کے بڑے نباض نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی افسانہ نگاری میں کبھی کبھی اس طرح جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ قاری بے خود ہو جاتا ہے اور قاری کے دل و دماغ میں ایک شدید احساس پیدا کر دیتا ہے۔ ان کی جذباتیت کتابوں سے سیکھی ہوئی کوئی معمولی جذباتیت نہیں بلکہ اپنی زندگی سے جوڑی ہوئی اچھی اور بری بہت سی چیزوں پر گہری نظر دالنے والی جذباتیت ہے۔ جس میں خطیبانہ جوش کے بدلے ایک ہمدرد انسان کی طرح نرمی، دردمندی اور سکون ہوتا ہے۔ بقول وقار عظیم "بیدی کی جذباتیت میں گہرائی اور سکون ہے اور اسی گہرائی نے ان کے افسانے کو اس کا موضوع بھی دیا اور فن بھی۔"[9]

انہوں نے اپنے افسانوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کے جذبات، دلی کیفیت اور نفسیاتی حالت کا بھی بخوبی بیان کیا ہے۔ بیدی کے نسوانی جذبات پر تبصرہ کرتے ہوئے زاہدہ بی لکھتی ہیں کہ "بیدی نے عورت کے جذبات، دلی کیفیت و نفسیات کی عکاسی ہر زاویہ اور نقطۂ نظر سے کی اور عورت کی معنویت سمجھنے کے لئے مرد کی نفسیت کو بھی پہلو بہ پہلو بیان کیا۔"[10]

بیدی کو کردار نگاری کا فن خوب آتا ہے۔ ان کا سارا زور کردار کو ابھارنے پر صرف ہوتا ہے۔ وہ افسانے میں چھوٹے چھوٹے واقعات کو زنجیر کی کڑیوں طرح جوڑ کر ان سے بے حد اثر آفرینی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہانی کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ کہانی ختم ہونے کے بعد صرف کردار کا گہرا تاثر قاری کے ذہن پر نقش جاتا ہے۔ کوئی بھی افسانہ نگار کی گرفت اگر اپنے فن پر مکمل نہ ہو تو وہ افسانہ نگار کرداروں کو کامیابی کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا۔ بیدی کی گرفت فن اور کردار دونوں پر یکساں تھی۔ اس لئے بیدی نے اپنے افسانوں میں کردار کی روح میں جھانک کر اور اسے زندہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے افسانہ "لاجونتی" میں سندر لال کی سخت ترین روپ اور مہربانی برتاؤ، لاجو کی مظلومی و

مجبوری نیز سندر لال اور لاجو کے ذہنی اور روحانی رشتے کو اس کہانی میں جس طرح پیش کیا وہ لاجواب ہے۔ بیدی کی کردار نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے اسلم جمشید پوری کہتے ہیں "وہ کردار میں ڈوب جاتے ہیں اور کردار کو اپنی مرضی سے پھلنے پھولنے کا موقع عطا کرتے ہیں۔ ان کے ہر افسانے کے اختتام پر مرکزی کردار کا گہرا نقش قاری کے ذہن پر ثبت ہو جاتا ہے"[11]

بیدی کی کردار نگاری دوسروں کی کردار نگاری سے ذرا مختلف معلوم ہوتا ہے۔ وہ انسان کے کردار کو جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی ہو بہو بیان کرتے ہیں۔ ان کی کردار نگاری کے متعلق وقار عظیم کی رائے ہے کہ "بیدی کی کردار نگاری کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ وسیع اور عمیق مشاہدہ، مطالعہ کا پیدا کیا ہوا نفسیاتی نقطۂ نظر اور گہری جذباتیت سے متاثر فکر و تخیل کا انداز"[12] بیدی نے اپنے افسانوں میں مختلف قسم کے نسوانی کرداروں کا بھی بخوبی استعمال کیا ہے۔ افسانوں کی کہانیوں میں انہوں نے عورت کو ایک پاک دامن اور وفادار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

مکالمہ نگاری میں بھی بیدی نے بڑے احتیاط سے کام لیا۔ ان کے مکالمے نہ صرف کردار کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ معنی خیز اور فکر انگیز بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں اکثر لمبے اور طویل جملوں سے افسانے کو قارئین کے لئے بعید از فہم بنانا نہیں چاہتے بلکہ چھوٹے چھوٹے مکالموں اور فقروں سے اپنی کہانی کو آگے بڑھا کر دلچسپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر "لیکن تم نے کہا نہیں۔ اندو بولی---یاد ہے شادی کی رات میں نے تم سے کچھ مانگا تھا؟ ہاں مدن بولا------اپنے دکھ مجھے دے دو"[13] لیکن اس کے باوجود ان کے کچھ افسانوں کے مکالمے مشکل اور پیچیدگی معلوم ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے بعد قارئین نے بیدی کے مکالموں پر اعتراض کیا اور ان کی زبان کو کمزور قرار دیا۔ اس سلسلے میں وقار عظیم کا کہنا ہے "جن باتوں کو آسان اور سیدھی باتوں میں کہہ کر موثر بنایا جا سکتا ہے انہیں بیدی نے دقیق اور مشکل زبان میں کہا ہے اور اس سے ہر جگہ افسانے کی فضا میں ایک بوجھل پن پیدا ہو گیا ہے۔ اس میں تصنع آگیا اور بات میں شائد وہ تاثیر باقی نہیں رہی جو افسانہ کی مجموعی فضا کے لحاظ سے ضروری تھی۔[14]

مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی اردو افسانہ نگاری کے ایک بلند پایہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے گرد و پیش میں پیدا ہونے والے تمام چھوٹے چھوٹے واقعات کو کہانیوں کے ذریعہ ہندوستانی تہذیب و معاشرے خاص طور پر پنجابی کلچر کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ وہ اردو کے ایسے ایک مستند افسانہ نگار تھے جنہیں حقیقت نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری، کردار نگاری مطلب افسانہ نگاری کے تمام لوازمات اور فن پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ بیدی کی افسانہ نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے اور ان کی افسانہ نگاری کی ان تمام خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یقینی طور پر بیدی کو اردو ادب کے ایک کامیاب افسانہ نگار قرار دے سکتے ہیں۔

حواشی

1 اردو افسانہ از پروفیسر ابن کنول، کتابی دنیا، دہلی، ۲۰۱۱ء، ص-۳۷

2 راجندر سنگھ بیدی از وارث علوی، ساہتیہ اکادمی، نئی دہلی، ۱۹۸۹ء، ص-۷

3 راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری از پروفیسر وہاب اشرفی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۱ء، ص-۲۹

4 راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری از پروفیسر وہاب اشرفی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۱ء، ص-۲۹

5 اردوافسانہ ازپروفیسر ابن کنول، ص-۳۸

6 ترقی پسند تحریک اور اردوافسانہ از ڈاکٹر صادق، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۲۰۰۳ء ص- ۱۳۶

7 اردوافسانہ تعبیر و تنقید از ڈاکٹر اسلم جمشید پوری، موڈرن پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی، ۲۰۰۶ء، ص-۱۲۸

8 نیاافسانہ از وقار عظیم، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ ۱۹۸۲ء، ص- ۹۳

9 نیاافسانہ از وقار عظیم، ص- ۹۴

10 راجندر سنکھ بیدی کی تخلیقات میں نسوانی کرداروں کا تجزیاتی مطالعہ از زاہدہ بی، وانگیہ بکس، علی گڑھ، ۲۰۱۴ء، ص- ۱۵۳

11 ترقی پسند اردوافسانہ اور چند اہم افسانہ نگار از ڈاکٹر اسلم جمشید پوری، بزمِ اہم قلم، نئی دہلی ۲۰۰۲ء ص- ۸۴

12 نیاافسانہ از وقار عظیم، ص- ۹۷

13 اپنے دکھ مجھے دے دو از راجندر سنکھ بیدی، مکتبہ جامعہ لمیٹیڈ، نئی دہلی نومبر ۱۰۹۷ء، ص-۱۴۶

14 نیاافسانہ از وقار عظیم، ص- ۱۰۳

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

میر حسن اور ان کی مثنوی سحر البیان: ایک جائزہ

(Mir Hasan and his Masnavi *Sihar-ul-Bayan*: An Analysis)

Dr. Most. Umme Kulsum Akter Banu*

Abstract: Masnavi is one of the significant branches of Urdu literature. In literature, Masnavi is a poetry where any historical event or love story is described successively. Mir Hasan (1727-1786 AD) is one of those who have become famous for writing Masnavi poetry since the beginning of Urdu literature. He wrote many Masnavi in his life but *Sihar-ul-Bayan* is his best achievement. He wrote this Masnavi poetry in 1784. This is basically a love story where he presented the love story of the princess Badr-r Munir with the hero Benazir in a very touching manner. The language of *Sihar-ul-Bayan* is very elegant, accomplished and rhetorical. Ha has occupied a prominent place in Urdu poetry through his rhyme scheme, figures of speech, as well as illustration of love in the poetry. *Sihar-ul-Bayan* is not just a Masnavi poetry but it is adorned with the beauty of actual and natural view of that time. All the qualities that a successful Masnavi needs to have, are there in the *Sihar-ul-Bayan*. Through this Masnavi Mir Hasan has become immortal in the history of Urdu literature. This article will discuss Mir Hasan's short biography and his famous Masnavi *Sihar-ul-Bayan*.

اصناف شاعری میں مثنوی کو خاص درجہ حاصل ہے- مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئ تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہو—اردو میں مثنوی لکھنے کا آغاز اسی وقت سے ہو چکا تھا جب اردو شاعری کی ابتداء ہوئ تھی— لیکن اٹھارویں صدی عیسوی میں میر حسن نے جو مثنوی لکھی ہے وہ لاجواب تھی- میر حسن نے دوسری اصناف سخن میں طبع آزمائ کی ہے مگر انہیں سب سے زیادہ شہرت مثنوی نگاری میں حاصل ہوئ- مثنوی سحر البیان میر حسن کا شاہکار کارنامہ ہے—یہ اردو زبان کی ایک بہترین عشقیہ مثنوی ہے جس میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان نہایت دلکش انداز میں بیان کی گئی ہے—اس مثنوی کے ذریعہ میر حسن نے اپنے عہد کی تصویر کشی اور معاشرت کی بھرپور عکاسی کی ہے—صنف مثنوی کی تمام خوبیاں اس میں پائ جاتی ہیں- میر حسن کو شاعری کی دنیا میں اسی مثنوی کی وجہ سے شہرت حاصل تھی—اس مقالے میں میر حسن کی مختصر سوانح حیات اور انکی مشہور مثنوی "سحر البیان" پر روشنی ڈالی گئی ہے-

اردو زبان میں مثنوی ایک اہم صنف سخن ہے—اس میں مافوق الفطرت باتیں عام طور پر پائی جاتی ہیں- عشقیہ مثنوی میں صرف عشق و محبت کی داستان تک ہی محدود نہیں بلکہ جنگ کا بیان، اخلاقی نصیحتیں، تصوف کی باتیں مثنوی میں پوری طرح پائی جاتی ہیں— مثنوی میں واقعہ نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری، کردار نگاری کی بڑی اہمیت ہے- اس میں روانی کے ساتھ ساتھ ایسی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں جو دوسری اصناف میں یک جا نہیں پائی جاتیں- مولانا الطاف حسین حالی "مقدمہ شعر و شاعری" میں لکھتے ہیں:

* Professor, Department of Urdu, University of Rajshahi, Bangladesh.

"مثنوی اردو شاعری کی تمام اصناف میں سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف ہے—کیونکہ غزل یا قصیدہ میں اس وجہ سے کہ اول سے آخر تک ایک ایک قافئے کی پابندی ہوتی ہے-ہر قسم کے مسلسل مضامین کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے-مثنوی میں ظاہری اور معنوی اعتبار سے بلند پایہ شاعری کے تمام لوازم موجود ہیں"-۱

اردو شاعری کی آغاز سے لے کر موجودہ زمانے تک اردو مثنوی نگاری میں جنہوں نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی ان میں میر حسن کا نام سرفہرست ہے—ان کا اصل نام میر غلام حسن اور حسن تخلص تھا—ان کے والد میر غلام حسین ضاحک اپنے زمانہ کے مشہور شاعر تھے—میر حسن کے آباءواجداد شاہجہان کے زمانے میں افغانستان کے ہرات سے ہندوستان آئے اور دہلی میں بود باش اختیار کرلی تھی-میر حسن ۱۷۳۶ء میں دہلی میں پیدا ہوئے - یہیں تعلیم وتربیت ہوئی-۲

میر حسن کو شاعری کا شوق ابتداء ہی سے تھا-کیونکہ ماحول ہی شاعرانہ پایا تھا-وہ پہلے اپنے والد کے پھر خواجہ میر درد کے شاگرد ہوئے—جب دہلی اجڑ گئی تو میر حسن اپنے والد کے ساتھ اودھ کے دارالسلطنت فیض آباد گئے اور وہاں نواب سالار جنگ بہادر کی ملازمت اختیار کرلی- ۱۷۷۵ء میں آصف الدولہ تخت نشین ہوئے اور ۱۷۷۰ء میں فیض آباد کی جگہ لکھنؤ دارالسلطنت مقرر ہوا- ۳

نواب آصف الدولہ چونکہ خود بھی شاعر تھے اس لئے وہ دل کھول کر شاعروں کی قدر کرتے تھے—جب نواب صاحب کی قدردانی کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی تو بہت سے شعراء اپنے وطن چھور کر لکھنؤ چلے گئے—میر حسن بھی فیض آباد سے لکھنؤ چلے آئے—اور یہیں میر ضیاءالدین ضیاء کے شاگرد ہوئے—مگر ان کا رنگ کچھ زیادہ پسند نہ آیا—لہذا میر اور سودا کی تتبع میں شعر کہنا شروع کیا—

میر حسن کا رنگ گورا تھا اور قد درمیانہ-سر پر بانکی ٹوپی پہنتے تھے اور کمر سے دوپٹہ باندھتے تھے—داڑھی منڈاتے تھے-لکھنؤ کی تہذیب وشائستگی کا بے مثل نمونہ تھے-بڑے شگفتہ مزاج اور ظریف الطبع تھے—ان کا انتقال ۱۷۸۶ء میں لکھنؤ میں ہوا اور وہیں مفتی گنج میں نواب قاسم علی خاں کے باغ کے عقب میں دفن ہوئے- ۴

میر حسن کی تصانیف میں ایک دیوان، ایک تذکرہ شعرائے اردو اور چھوٹی بڑی بارہ مثنویاں ہیں—انکے دیوان میں غزلوں کے علاوہ قصیدہ، مرثیہ، مخمس، ترکیب ہند، واسوخت، مثلث وغیرہ شامل ہے—انکی غزلوں میں صفائی، برجستگی اور لطف محاورہ کے جوہر موجود ہیں—میر حسن کو عربی سے کم واقفیت تھی مگر فارسی میں اعلیٰ صلاحیت رکھتے تھے- جس کا ثبوت ان کا فارسی کا تذکرہ شعرائے اردو ہے—اس کتاب کی زبان نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے اور اس میں انہوں نے جامعیت اور وقعت نظر سے کام لیا ہے—میر حسن کی مثنویوں میں مثنوی شادی آصف الدولہ، مثنوی رموز العارفین، مثنوی گلزار ارم، مثنوی خوان نعمت اور مثنوی سحر البیان نہایت قابل ذکر ہیں-

مثنوی سحر البیان میر حسن کی آخری اور سب سے بہترین تصنیف ہے۔ یہ مثنوی اردو ادب میں ایک کلاسیکی حیثیت کی حامل ہے۔ میر حسن نے اپنے انتقال کے تین سال پہلے ۱۷۸۴ء میں یہ مثنوی لکھی۔ مصنف کا دعواہے کہ مثنوی کی کہانی ان کی طبع زاد ہے۔ یعنی یہ قصہ ان کا اپنا وضع کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں۔ اس کے مختلف اجزا الف لیلی ،قدیم فارسی مثنویاں ، قصوں ، کہانیوں اور داستانوں میں مل جاتے ہیں ۔ مصنف نے انہیں جوڑ کر ایک نئ داستان تیار کی ۔ بادشاہ کا بے اولاد ہونا اور پھر بڑھاپے میں اولاد ہونا

ایک عام سا خیال ہے جو اکثر داستانوں میں پایا جاتا - تکنیک کے اعتبار سے اس پر نظامی کے سکندر نامہ کا اثر نمایاں ہوتا ہے ۔

اس مثنوی میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان ہوئی ہے - داستان میں بادشاہ کے کافی عرصے کے بعد ایک اولاد ہوئی ہے ۔ اس کا نام بے نظیر رکھا گیا ۔ نجومیوں کے مطابق اسے بارہ سال تک کھلی چھت پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے ۔ شہزادہ بے نظیر ایک روز ماہ رخ نام کی پری پر عاشق ہو جاتا ہے اور شہزداہ کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی بدر منیر کے باغ میں جاتا ہے اور پھر شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر ایک دوسرے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی خبر دیو کے ذریعہ پری کو لگ جاتی ہے اور وہ اسے کنویں میں قید کر دیتی ہے ۔ پھر وزیر زادی نجم النسا اسے قید سے آزاد کراتی ہے اور بے نظیر اور بدر منیر کی شادی ہو جاتی ہے۔

مثنوی سحر البیان پڑھنے سے ہر بار یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا ایک بہت بڑا فنکارہےجوان جذبات کو بھی پیش کر دیتا ہے جس پر عام آدمی کی نگاہ نہیں پہنچتی ۔ ذیل میں سحر البیان کے قابل ذکر پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتاہے۔

مثنوی کی ایک اہم خصوصیت ہے منظر نگاری - منظر نگاری میں میر حسن کو مہارت حاصل ہے ۔ سحرالبیان میں اشعار سے عمدہ قسم کی منظر کشی کی گئی ہے۔ میر حسن نے بے نظیر کےلئے ایرانی انداز کا باغ لگایا ہے جس میں ایرانی پھولوں کے ساتھ ساتھ چمپا، موتیا، موگرا، مدن ،بان، گیندا وغیرہ سے اسے سجا دیا ہے۔ لکھتے ہیں :

گلوں کا لب نہر پر جھومنا
اسی اپنے عالم میں منہ چومنا
وہ جھک جھک کے گرنا خیابان پر
نشے کا سا عالم گلستان پر
چمن آتش گل سے دیکھا ہوا
ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا۔۵

کردار نگاری مثنوی کی ایک اہم پہلو ہے۔ میر حسن نےکردار نگاری میں بھی مہارت کا ثبوت دیا ہے ۔ مثنوی سحر البیان میں بہت سے کردار ہیں۔ مگر ان میں بے نظیر، بدر منیر، ماہ رخ اور نجم النسا کا کردار بہت اہم ہیں ۔ بے نظیر اس کہانی کا ہیرو ہے ۔ لیکن یہ کمزور کر دار کہا جا سکتا ہے۔ بدرمیر اس کا دوسرا کردار ہے۔ مگر وہ بھی اعلیٰ صفات سے محروم ہے ۔ تیسرا کردار وزیر زادی نجم النسا کا ہے۔ یہ ایک ذہین عورت ہے وہ ہر مشکل میں تد ابیر پیش کرتی ہے ۔

اور ایک کردار ہے ماہ رخ پری کا ۔ وہ بے نظیر کے عشق میں گرفتار ہے۔ اس کے اندر بھی عام عورتوں کی سی صفت ملتی ہے۔ ایک جگہ میر حسن لکھتے ہیں:-

کہاں یہ جوانی کہاں یہ بہار
یہ جوبن کا عالم ہے یادگار
سدا عیش دوران دکھاتا نہیں
گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں
سبھی یوں تو دنیا کی ہیں کاروبار
دے حاصل عمر ہے وصل یار۔٦

مثنوی کی ایک اہم جز ہے تہذیب کی مرقع کشی۔ مثنوی سحرالبیان میں اس عہد کی تصویر کشی اور معاشرت کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ اس وقت کا جو رسم ورواج، لباس، رہن سہن تھا اس مثنوی میں سب کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ میر حسن نے اپنے عہد کی تصویر کشی میں کمال کا اظہار کیا ہے ۔ لکھتے ہیں:

کناری کے جوڑے چمکتے ہوئے
وہ پاؤں کے گھنگرو چھنکتے ہوئے
وہ گھٹنا وہ بڑھنا اداؤں کے ساتھ
دکھا نا وہ رکھ رکھ کے چھاتی پر ہاتھ- ۷

مثنوی کی اور یک بڑی خصوصیت ہے جذبات نگاری - میر حسن کو جذبات نگاری میں بھی کمال حاصل ہے۔ انھوں نے جذبات نگاری میں ہر جگہ حقیقت کو پیش نظر رکھا ہے۔ مثنوی سحر البیان میں جذبات نگاری کے بھی بعض عمدہ نمونے ملتے ہیں ۔ کسی طویل عشقیہ مثنوی میں رنج و ،غم ہجر وصال رشک و حسد، محبت و الفت کے متعدد مواقع پیش آسکتے ہیں ۔ بلکہ بعض موقعوں جذبوں کا کش مکش شاعر کی قوت بیان کا امتحان بن جاتی ہے ۔ اب یہ فنکار پر منحصر ہے کہ وہ ایسی کسی سچو یشن کوضائع کر دیتا ہے یا اس میں رنگ بھر کر اسے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیتا ہے۔ مثلاً سحرالبیان کا ایک منظر ہے : شہزا دہ بے نظیر بدرر منیر کے باغ میں اتفاقا جا پہنچتا ہے ۔ بدر منیر اس جوان رعنا کو دیکھتے ہی ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ چاہتی ہے کہ شہزادے سے مل بیٹھے مگرحیا دامن گیر ہے ۔ جذبوں کی یہ کش مکش عملی

صورت میں یوں سامنے آتی ہے :

ادائیں سب اپنی دکھاتی چلی
چھپا منہ کو اور مسکراتی چلی
غضب منہ پہ ظاہر وے دل میں چاہ
نہاں آہ آہ اور عیاں واہ واہ
یہ کہتی ہوئی آن کی آن میں
چھپی جاکے اپنے وہ دالان میں۔۸

مثنوی سحر البیان کی سب سے بڑی اور نمایا خصوصیت اس کا انداز بیان اور اس کی زبان ہے۔ جو قاری کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے ۔ زبان نہایت صاف ، آسان اور عام فہم ہے ۔ جو ہر طرح کی قاری کے لئے دلچسپی اور رغبت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مثنوی کے بہت سے اشعار ضرب المثل بن گئے ہیں اور زبان زد ہیں۔ میر حسن کو اپنی مثنوں کی اس خوبیوں کا خود بھی احساس تھا ۔ جس کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں:

نہیں مثنوی ہے یہ ایک پھلجھڑی
مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی
نئی طرز ہے اور نئی ہے زبان
نہیں مثنوی ہے یہ سحرالبیان۔۹

محمد حسین آزاد سحرالبیان کی زبان کے بارے میں لکھے ہیں :

"کیا اسے سو برس آگے والوں کی باتیں سنائی دیتی تھیں کہ جو کچھ اس وقت کہا صاف وہی محاورہ اور وہی گفتگو ہے۔ جو آج ہم تو بول رہے ہیں۔ اس عہد کے شعراء کا کلام دیکھو ہر صفحے میں بہت الفاظ اور ترکیبیں ایسی ہیں کہ آج متروک سمجھی جاتی ہیں ۔ اس کا کلام (سوا چند الفاظ کے) جیسا جب تھا ویسا ہی آج دلپزیر اور دلکش ہے"۔۱۰

کلیم الدین احمد جیسا سخت نقاد بھی میر حسن کے اسلوب اور طرز بیان کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے -وہ میر حسن کے طرز تحریر پر تبصرے کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"اہم ترین چیز سحرالبیان میں طرز ادا ہے ۔ عبارت پاکیزہ اور با محاورہ ہے۔ بیان سراسر شوخ اور دل پذیر ہے ۔ شیرینی اور ترنم کی کمی نہیں ۔ عموماالفاظ نرم اور نہایت ملائم استعمال ہوئے ہیں ۔ میر حسن نے فصیح روزمرہ کا نچوڑ اس مثنوی میں رکھ دیا ہے۔ گفتگو اور مکالمے کے لطیف‌ترین پھول یہاں کھلتے ہیں ،جملہ خو بیوں کے ساتھ کہیں ضرورت سے زائد تصنع کا پتہ نہیں روانی دلکش ہے"۔۱۱

ڈاکٹر گیان چند میر حسن اور انکی سحر البیان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"مثنوی سحر البیان کو جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے ہر بار یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا غیر معمولی فنکار تھا - اس کا مشاہدہ ان جزئیات کو دیکھتا تھا جہاں عام نظریں نہیں پہنچتی- الفاظ اس کے محکوم ومطیع تھے جن سے وہ حسب خواہش کام لیتا ہے" ۔ ۱۲

مختصر یہ کہ مثنوی سحر البیان منظر نگاری، کردار نگاری، جذبات نگاری ،مکالمہ نگاری، واقعہ نگاری ہر اعتبار سے ایک کامیاب‌اور مکمل مثنوی ہے ۔ یہ اردو ادب کی بے مثل مثنوی ہے۔ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تخیل کے اعتبار سے بھی "سحر البیان"کافی ممتازہے - درد اور سوز و گداز گویا کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے ۔ اس کے اشعار اس قدر تاثیر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ بجلی کی طرح دل پر اثر کرتے ہیں ۔ میر حسن نے یہ مثنوی لکھ کر اردو زبان پر زبردست احسان کیا ہے ۔ اور جب تک اس زبان کے بولنے اور سمجھنے والے دنیا میں زندہ رہیں گے مثنوی سحر البیان کی وجہ سے میر حسن کا نام دلوں پر نقش رہے گا۔ میر حسن خود کہتے ہیں:

رہے گا جہاں میں مرا اس سے نام
کہ ہے یاد گار جہاں یہ کلام۔۱۳

حوالے

۱-الطاف حسین حالی ،مقدمہ شعر و شاعری ،مرتبہ ڈاکٹر وحید قریشی، علی گڑھ : ایجو کیشنل بک ہاوس ، ۲۰۱۲ء،ص- ۲۳۹

۲-مہ لقا اعجاز، نقوش ادب، لکھنؤ:خورشید بک ڈیپو،۱۹۹۸ء،ص-۱۸۲

۳-میر حسن، مثنوی سحرالبیان، مرتبہ ڈاکٹر قمرالہدی فریدی، علی گڑھ:ایجو کیشنل بک ہاوس، ۲۰۱۳ ء،ص-۱۱

۴- ڈاکٹر شعیب انصاری اور خالد انصاری، روح ادب ، علی گڑھ : نیو بک سینٹر،۲۰۰۱ء،ص - ۱۳

۵-مثنوی سحرالبیان،ص- ۷۹

۶-مثنوی سحرالبیان،ص- ۱۱۳

۷- مثنوی سحر ال بیان، ص- ۷۳

۸- مثنوی سحر البیان، ص- ۱۲۱

۹- مثنوی سحر البیان، ص- ۷

۱۰- مولانا محمد حسین آزاد، آب حیات، دہلی: کتابی دینا، ۲۰۱۴ء، ص- ۲۳۳

۱۱- کلیم الدین احمد، اردو شاعری پر ایک نظر، پٹنہ: ایوان اردو، ۱۹۶۶ء، ص- ۳۲۱

۱۲- ڈاکٹر گیان چند، اردو مثنوی شمالی ہند میں، جلد اول، دہلی: انجمن ترقی اردو ہند، ۱۹۶۴ء، ص- ۳۱۹

۱۳- مثنوی سحر البیان، ص- ۷۴

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

بنگال میں اردو صحافت کی نشو نما: ابتدا سے تقسیم ہند تک

(The Evolution of Urdu Journalism in Bangel: From Beginning to the Partition of Hind)

Dr. Zafar Ahmed Bhuiyan*

Abstract: The journey of Urdu Journalism started with the commencement of *Jame Jahan Numa* in 1822. After that till the partition of India (1947), different renowned Daily Urdu Newspapers like *Tahjibul Akhbar, Akhbar-e-Aam, Lisanul Haque, Al-Helal, Safir, Tarjuman, Zamhur, Asre Zadid, Nayi Dunya, Taswir* etc and weekly as well as monthly magazines including *Hind, Rehnuma, Angara, Oriental Observer, Khadim, Aftab, Ayena, Zadid Urdu, Paigam* were published one after another and the history of Urdu journalism advanced day after day. In Dhaka, the first Urdu newspaper *Al Mashrique* was published in 1906. Its editor was Hakim Habibur Rahman. From then till 1947, different newspapers and magazines including *Jadu, Akhbar, Al Ulama,* were published and the advancement of Urdu Journalism happened. Here, in this article, I am going to grasp your attention to this fact and inform you when, how and where these newspapers and magazines originated and flourished.

اردو صحافت کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ مشرقی بنگال میں اردو صحافت کا آغاز 27 مارچ 1822 کو ہوا۔ ہری ہر دت نے کلکتے سے منشی سدا سو کھ کی ادارت میں "جام جہاں نما" نامی اردو کا پہلا اخبار جاری کیا تھا۔[1] اس کے بعد سے تقسیم ہند تک مشرقی بنگال میں بے شمار اخبارات، رسالے اور جرائد نکالے گئے لیکن ایک مقدرہ عرصے کے بعد وہ سب بند ہو گیے۔ ان اخباروں میں روزمرہ، ہفتہ وار، چودہ روزہ، ماہوار، سہ ماہی اخبارات شامل تھے۔

اس بارے میں ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے اپنی کتاب 'صحافت پاکستان و ہند میں' کہاہے کہ 1853 میں ہندوستان کے جنوبی صوبوں میں اردو اخباروں کی تعداد تھی 35 جبکہ 1858 میں اس کی تعداد تھی صرف 12.[2] انگریز حکمران کے ظلم و ستم اور غیر تعاون اور مالی امداد کی فراہمی میں کمی کی وجہ اس وقت اردو صحافت میں لوگوں کی دلچسپی کم ہو رہی تھی۔

پھر 1870 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ سے 'تہذیب الاخلاق' نامی ایک اردو اخبار نکالا جو اس خطے کے عوام کو بیدار کرنے اور ان کے دماغی کشمکش کو ٹھیک کرنے میں انتہائی اہم خدمات انجام دیں۔[3]

انیسویں صدی میں اردو کے روزنامہ اخباروں کی تعداد بہت کم تھی۔ تاہم اس صدی کے نصف آخر کے اردو روزنامہ 'اخبار عام' اور 'پیسہ' قابل ذکر ہیں۔ 'اخبار عام' فرقہ بندی اور جانبداری سے دور رہ کر لوگوں کو لیے کام کیا۔ اس میں ہندو اور مسلمان دونوں مذہب کے لوگوں کے لئے

* Professor, Department of Urdu, University of Dhaka, Bangladesh.

مضامین شائع ہوتے تھے۔ دوسری طرف 'پیسہ' نامی اردو اخبار صرف مسلم قوم کے لئے کام کرتے تھے۔ مسلم مذہب کے لوگوں کے روزمرہ واقعات پر تبصرہ کرنا اور مسلم تحریکوں کو کامیابی تک پہنچانا ہی اس کا ایک اہم مقصد تھا۔[4]

بیسویں صدی کے اوائل میں برصغیر پاک و ہند کی سیاست اور عوام کی نظریات میں کافی تبدیلیاں ہوئی تھیں۔ اس وقت ایک طرف حالیہ خبروں سے باخبر ہونے کے لئے لوگوں کا شوق بڑھتا گیا تو دوسری طرف صحافت کی طرف بھی لوگوں کی دلچسپی و رغبت پیدا ہوتی گئی۔

اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا اکرام علی خان، ڈاکٹر مالک منظور، مولانا ابوالقاسم، قاضی عبدالغفور وغیرہ کی کوششوں کی وجہ سے مشرقی بنگال میں بہت سارے اخبارات و رسائل جاری ہوئے تھے۔ مشرقی بنگال میں اردو صحافت کا ابتدا سے تقسیم ہند تک کم بیش 50 روزنامہ اخبارات جاری تھے۔[5]

۔ ان اخباروں میں سے روزنامہ احسن الاخبار (1901)، لسان الصدق (1903)، الہلال (1912)، رسالہ (1914)، سفیر (1924)، روزنامہ ترجمان (1915)، جمہور (1917)، عصر جدید (1918)، روزنامہ زمانہ (1920)، نئی دنیا (1924)، الکمال (1922)، تصویر (1934)، استقلال (1939)، رہبر (1941) قابل ذکر ہیں۔[6]

ڈاکٹر مالک منظور احمد کی رائے کے مطابق 1901 میں 'احسن الاخبار' نامی اخبار مولانا آزاد کی سرپرستی میں جاری ہوا تھا۔ لیکن شنتی رنجن بھٹاچاریہ نے کہا ہے کہ یہ اخبار 1902 میں جاری ہوا تھا۔[7] 'الہلال' اس زمانے کا ایک کامیاب اخبار تھا جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ادارت میں 13 جولائی 1912 کو کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم جوہر لال نہرو نے اپنی کتاب ' Discovery of India ' میں مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال کی تعریف کی۔[8]

'رسالہ' نامی اخبار 28 اگست 1914 میں کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ یہ اخبار 1919 تک جاری رہا۔ مولوی غلام حسین کی ادارت میں ماہنامہ اخبار کی حیثیت سے یہ اخبار جاری تھا۔ روزنامہ 'ترجمان' ایک اور اہم اخبار ہے۔ شنتی رنجن بھٹاچاریہ کی رائے کے مطابق یہ اخبار 20 ستمبر 1915 میں شائع ہوا تھا۔ 1916 اس کا نام بدل کر صداقت رکھا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور شمس العلماء مفتی عبداللہ اس اخبار میں لکھتے تھے۔ یہ اخبار 31 مارچ 1918 میں بند ہو گیا تھا۔[9]

شیخ احمد عثمانی نے 1918 میں کلکتہ سے 'عصر جدید' جاری کیا تھا۔ یہ اخبار 1988 تک جاری رہا۔ تقسیم ہند سے پہلے یہ بنگال کا سب سے کثیر الاشاعت اخبار تھا۔ پہلے یہ اخبار کانگریس کا حامی تھا۔ بعد میں یہ مسلم لیگ کے لیے کام کرنے لگا۔ 1920 میں مولانا محمد اکرم خان نے روزنامہ 'زمانہ' جاری کیا۔ اس کے مضمون نگاروں میں مولانا آزاد، مولانا تمنا اتمادی اور سید سلیمان ندوی شامل تھے۔

اس کے علاوہ 1914 میں فاطمی کی ادارت میں 'الحق' جاری ہوا تھا۔ 1922 میں مولانا اکرام خان کی ادارت میں روزنامہ 'العصر' شائع ہوا۔ مولانا طاہر امام خان اس کے اڈیٹر تھے۔ صدیق انصاری کی ادارت میں 1924 میں 'نئی دنیا' جاری ہوا تھا جو 1930 میں بند ہو گیا تھا۔[10]
صرف روزنامہ اخبارات ہی نہیں بلکہ اس دور میں اردو صحافت کے دامن کو مزین کرنے میں ہفتہوار اخبارات نے بھی قدم بہ قدم چلے۔ بیسویں صدی میں تقسیم ہند سے پہلے مشرقی بنگال میں کم و بیش تقریباً 80 ہفتہوار اخبارات جاری تھے۔[11]

ان ہفتہوار اخباروں میں نور احمد کے شمشیر ہند (1924)، نجیب الرحمٰن کے الغالب (1926)، ابوالقاسم کے رہنما (1928)، محمد خیر الہدی کے صحافت (1931)، نور محمد کے الاسلام (1939)، عبدالواحد کے انگارہ (1939) اور اصلاح (1940)، جناب رحمت اللہ کے اوریئنٹل وبجر بر، سید محمد زفری کے خادم (1933)، حمید مقصود کے مخدوم (1934)، محمد اسماعیل کے رفیق الجدید (1935)، واہی کے طارق کے مزدور گزٹ (1934)، رفیق عبید جاہدی کے نقاش (1941)، نظیر الحسینی کے نئی منزل (1946) قابل تعریف ہیں۔[12]

نور محمد کی ادارت می' الاسلام 'نامہ اخبار 1939 میں انڈین ہسپتال روڈ سے شائع ہونے بعد صرف ایک سال تک جاری رہا۔ پھر 1940 میں دوبارہ کلکتہ کے زکریا اسٹریٹ سے عبدالرحمن خان کی ادارت میں یہ اخبار جاری ہوا تھا۔ 'بیان' ایک ادبی رسالہ تھا جو 1939 میں کلکتہ کے فیئیارس لین (Fairs Lane) سے جاری ہوا اور 1943 میں بند ہو گیا تھا۔[13]

وفا راشدی کی رائے کے مطابق سید محمد جعفری 'خادم' نامی اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ اس اخبار کے مضمون نگاروں میں محمد سلیمان، واصفی بنارسی اور علامہ جمیل مظہری شامل تھے۔ 1938 میں یہ اخبار بند ہو گیا۔ 'رہنما' نامی اخبار پہلے روزنامہ کی حیثیت سے شائع کیا گیا تھا لیکن 1928 سے یہ اخبار ہفتہ وار اخبار میں منتقل ہو گیا۔ 'شمشیر ہند' نامی اخبار 1924 میں جاری ہو کر 1926 میں بند ہو گیا ہے۔ کلکتہ کے زکریا روڈ سے یہ اخبار شائع ہوتا تھا۔[14]

یہاں قابل ذکر ہے کہ روزمرہ اور حالیہ خبروں سے روشناس ہونے کے لیے ایک طرف روزنامہ اور ہفتہوار اخبارات نکالے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف انسانی شعور کے مختلف پہلوؤں اور ادب کے دوسرے شعبوں پر تفصیلی سے تبصرہ پیش کرنے تحقیقاتی صحافت مثلاً ماہوار، سہ ماہی، سالانہ رسالوں کا آغاز ہوتا ہے۔

برصغیر کے مشرقی خطے میں اردو صحافت کا ابتدا سے تقسیم ہند تک بہت سارے ماہوار اخبارات جاری تھے۔ ان اخباروں میں حسن حسرت کے آفتاب، علامہ کیفی کے الرفیق، جناب اسحاق کے آئینہ، ڈاکٹر چندر ا بازو کے تندرستی، پرویز شہیدی کے جدید اردو، مالک صدیق کے ہور، مولوی بدیع الزمان شمس محمد سجاد حسین کے نگراے بزم، ابوالکلام آزاد کے الہلال، عبدالرزاق کے پیکم، ملاجان محمد کے روزنامہ پیام وغیرہ مشہور تھے
۔

'الرفیق' نامی اخبار 1914 میں جاری ہوا تھا۔ علامہ کیفی چریا کوٹی اس کے اڈیٹر تھے۔ تاریخ، مذھب اور بت پرستی سے متعلق مضامین اخبار میں شائع ہوتے تھے۔ 23 ستمبر 1921 میں عبدالرزاق مالہ آبادی کی ادارت میں 'پیغام' جاری ہوا تھا جو صرف دو سال تک جاری رہنے کے بعد 1923 میں بند ہو گیا تھا۔ 1923 میں کلکتہ سے 'المومن' نامی اخبار جاری ہوا تھا۔ یہ اختار کبھی کبھی ہفتہ وار اور کبھی کبھی ماہوار کی حیثیت سے شائع ہوتا تھا۔ 1935 میں اس کی اشاعت بند ہو گئی۔
'ہور' 1923 میں شائع ہوا۔ مالک صدیق انصاری کی بیوی اس کے اڈیٹر تھے۔ یہ اخبار 1941 میں بند ہو گیا۔ مولوی بدیع الزمان کی ادارت اور حبیبر نبی کی ملکیت میں کلکتہ کے رضوانہ پریس سے 1907 میں 'شمس بنگلہ' نامی اخبار جاری ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد بھی یہ اخبار جاری تھا۔ چراغ حسن حسرت کی ادارت میں 1926 میں 'آفتاب' نامی اخبار جاری ہوا تھا۔ دراصل یہ ایک ادبی میگزین تھا۔ وحشت کلکتوی، اختر شیرانی، سید نصیر حسین خیال وغیرہ اس میگزین کے ساتھ منسلک تھے۔

1932 میں کلکتہ سے 'آئینہ' نامی اخبار جاری ہوا جو 1935 تک شائع ہوتا رہا۔ جناب اسحاق اس اخبار کے ایڈیٹر رہے۔ 'جدید اردو' 1938 میں نکالا گیا۔ جناب پر بھیج شہیدی اس کے اڈیٹر اور جناب عبدالجلیل اس کے طابع و ناشر تھا۔ یہ اخبار 1950 میں بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رسائل اور اخبارات موجود ہیں جس کے بارے میں کسی اور جگہ تفصیلی کے ساتھ معلومات پیش کیے جائینگے۔ [15]

مشرقی پاکستان (1947-1971) یعنی آزاد بنگلہ دیش (1971 سے) میں اردو صحافت کا آغاز کب اور کیسے ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈھاکہ میں 1906 سے پہلے کسی بھی زبان کے اخبار یا سالے کے اجراء کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن وحید کیسر ندوی نے اپنی کتاب "مشرقی پاکستان کی اردو صحافت" میں بتایا ہے "البتہ کھلنا اور سریرام پور سے 1860 کے لگ بھگ ایک دو ہفتہ روزہ اخبار جاری ہوئے"۔ [16]

لیکن پروفیسر لطیف احمد نے اپنی پی ایچ ڈی تھیسس بعنوان " Urdu Journalism in Bengal (1901-1970); A Historical Study " میں وحید کیسر ندوی کی اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انیسویں صدی میں بنگلہ دیش میں ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے اخبارات و رسائل موجود تھے۔ ان میں فرید پور میں الاہی داد خان کے فرید پور درپن (1861)، مانیک گنج میں مولوی انیس الدین کے پاریلو بارتا باہو (Parilo Barra Baho،1874)، ٹانگائل میں محمد نعیم الدین کے اخبار الاسلامیہ (1884)، ٹانگائل میں عبد الحمید خان یوسف جائی کے احمدی (1886)، جاشور میں منشی غلام قادر کے ہندو مسلمان شمیلونی (1887)، کوسٹیا میں میر مشرف حسین کے ہیتکوری (1890)، ٹانگائل میں مصلح الدین کے ٹانگائل ہیتکوری (1892)، کوسٹیا میں ایس کے ایم روشن علی کے کوہینور (1898)، جاشور میں مہتب الدین کے مسلمان پتریکا (1901)، سراج گنج میں ایم نظیر الدین احمد کے سلطان (1901) قابل ذکر ہیں۔ [17]

1906 میں ڈھاکہ کو دوبارہ دارالحکومت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت حکیم حبیب الرحمن نے المشرق نامی اردو اخبار جاری کیا۔ اس بارے میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو اور فارسی کے پروفیسر ڈاکٹر کلثوم ابوالبشر نے اپنے مقالہ "مشرقی بنگال کی صحافت کا سنگ میل" میں کہا کہ اس وقت ڈھاکہ کے ایک مشہور طبیب، ادیب، مورخ، سیاسی رہنما اور ماہر لسانیات حکیم حبیب الرحمن نے اکتوبر 1906 میں المشرق نامی اخبار جاری کر کے ڈھاکے کی سرزمین میں اردو صحافت کا سنگ میل لکھا۔ یہ پہلے ایک ماہنامہ اخبار تھا لیکن بعد میں اسے ہر ہفتے جاری کیا جاتا تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کی لائبریری میں اس کے کچھ نسخے ابھی بھی موجود ہیں۔ کلکتہ کے رجوانہ پریس سے چھپوانے کے بعد ڈھاکے سے اس کی تقسیم کی جاتی تھی۔

حکیم حبیب الرحمن اس اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ علاوہ ازیں اس اخبار کے دوسرے سرپرستوں میں عبدالفیض، عبدالعلی، سید شرف الدین جہانگیر، محمد اکبر، مولوی نظام الدین، خواجہ ممتاز وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اخبار صرف دو سال تک جاری تھا۔ 1908 میں یہ اخبار بند ہو گیا۔

اس کے بعد اردو صحافت کے شوق کے حامل حکیم حبیب الرحمن نے مالی امداد میں کمی اور مشکل حالات کی وجہ سے دوسرے اخبار جاری نہیں کر سکا۔ لیکن اس وقت بھی اردو صحافت کی طرف ان کے شوق برقرار تھا۔ آخر جنوری 1923 میں انہوں نے جادو نامی ایک اور ماہنامہ اردو اخبار جاری کیا 3 جو 1930 تک جاری رہا۔ اس بارے میں پروفیسر سلمہ نے کہا ہے کہ "انہوں نے دوبارہ ہمت باندہ کر 1923 میں ماہنامہ "جادو" شائع کیا جو ڈھائی سال تک نہایت کامیابی کے ساتھ چلتا رہا"

30-35 صفحات کے اس اخبار کے سرپرستوں میں اظہر حسین اظہر، شرف الدین شرف، مولانا سید وھاب بادر علی شامل تھے۔ اس اخبار میں زیادہ تر سیاسی، تاریخی اور ادبی رسالے شائع ہوتے تھے۔ البتہ لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کیلئے اس میں نظم یا غزل بھی شائع ہوتے تھے۔

اختر "ایک اور مشہور اردو اخبار جو 1924 میں محمود الرحمن صدیق عرف خالد بنگالی کی نگرانی میں جاری ہوا تھا۔ کلکتہ کے وحید اللہ سڑک کے وحید پریس سے چھپانے کے بعد یہ اخبار کشور گنج سے تقسیم کی جاتی تھی۔ خالد بنگالی ان کے والد محترم مولانا عبدالحہ کی یاد میں یہ اخبار جاری کیا تھا۔ اس اخبار کا پہلا نسخہ 1924 میں شائع ہوا تھا جس میں 64 صفحات موجود تھے۔

اس اخبار کے مقاصد اور اس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ "اختر کی اشاعت کیلئے مجھے مجبور کیا وہ خود میر اذاتی 'شوق و شوق' پاس ہے۔ بنگال میں پاکیزہ اور سلیس اردو کی ترویج و اشاعت اختر کا واحد مقصد ہے"۔ اس اخبار کے اوپر لکھا رہتا ہے 'خدا حسن ہے یا حسن خدا ہے'۔ صرف ایک ہی نسخہ شائع ہونے کے بعد یہ اخبار بند ہو گیا۔ دراصل یہ ایک ادبی میگزین تھا۔ اس اخبار کے مضمون نگاروں میں نیاز فتح پوری، مرزا سلطان احمد، ناطق لکھنوی، عزیز لکھنوی، واقف بہاری قابل ذکر ہیں۔

1939 میں بنگلہ دیش کے نواخالی ضلع سے 'العلماء' نامی ایک اور اردو اخبار شائع ہوا تھا۔ یہ اخبار بنگلہ اور اردو دونوں زبانوں میں شائع کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ماہنامہ میگزین تھا جس کو چھاپنے کی ذمہ داری محمد مصطفیٰ ہوسی نعمانی کے سر پے تھا۔ اس کے ایڈیٹرز کا نام تھا رشید احمد اور محمد مصطفیٰ حسینا۔ مذہب کی تعلق مضامین اس میں سب سے زیادہ شائع ہوتے تھے۔ تاہم اس میں کبھی کبھی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف معلومات موجود رہتے تھے۔

ماخذ

1. A F Salahuddin Ahmed, Social Ideas and Social Changes in Bengal, E.J. Brill, Leiden, 1965, P. 89
2. ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، صحافت پاکستان وہند میں، شفیق پریس، پاکستان لاہور، صفحہ 178
3. ڈاکٹر جعفر احمد بھوئیاں، سر سید احمد کی تصنیفات: تعارف اور جائزہ، جھینگے پھول، دھاکہ، سال اشاعت: 2009، صفحہ 74
4. ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، صحافت پاکستان وہند میں، شفیق پریس، پاکستان (لاہور)، صفحہ 321
5. شانتی رنجن بھٹاچاریہ، بنگال میں اردو صحافت کی تاریخ، مشرقی بنگال، اردو اکادمی، کلکتہ، 2003، صفحہ 108
6. Dr. Latif Ahmed, Urdu Journalism in Bengal (1901-1970): A Historical Study, (PHD Thesis) Rajshahi, Bangladesh,July 2005, P.77-87
7. Dr. Latif Ahmed, Urdu Journalism in Bengal (1901-1970: p: 79
8. JawaharLal Nehru, The Discovery of India, Oxford University Press, Seventh Edition, New Delhi, 1988, p. 347
9. شانتی رنجن بھٹاچاریہ، بنگال میں اردو صحافت کی تاریخ، مشرقی بنگال، اردو اکادمی، کلکتہ، 2003، صفحہ: 123
10. شانتی رنجن بھٹاچاریہ، بنگال میں اردو صحافت کی تاریخ؛ صفحہ: 144
۱۱. شانتی رنجن بھٹاچاریہ، بنگال میں اردو صحافت کی تاریخ؛ صفحہ: 146
12. Dr. Latif Ahmed, Urdu Journalism in Bengal (1901-1970): A Historical Study, (PHD Thesis) Rajshahi, Bangladesh,July 2005, P.77-87
13. شانتی رنجن بھٹاچاریہ، بنگال میں اردو صحافت کی تاریخ، مشرقی بنگال، اردو اکادمی، کلکتہ، 2003، صفحہ: 146-147
14. شانتی رنجن بھٹاچاریہ، بنگال میں اردو صحافت کی تاریخ، مشرقی بنگال، اردو اکادمی، کلکتہ، 2003، صفحہ: 176-240
15. Shanti Ranjan Bhattacharya, Bengal mien Urdu SahafatkiTarikh, west Bengal Urdu Academy, Calcutta, 2003, p. 177 -250
16. WahedQaisarNadvi, Mashriqui Pakistan ki Urdu Sahafat, Naqoosh, March, Karachi, 1963, p.275
17. Mostafa Abul Bashar, Bangla ShomoshamaikPattrerJibon O jonomat, 1901-1930, Bangla Academy, Dhaka, 1977, p. 427-440

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

افکار اقبال اور دور جدید
(Thoughts of Iqbal and Modern times)

Dr. Md. Mahmudul Islam*

Abstract: This paper contains the thoughts of Iqbal (1877-1938) and their impacts to the Muslim community. Iqbal, who was a philosophical Urdu poet, has the message of self, nationality, politics, education, woman, civilization, intellect, love, beauty, destiny etc. In his speech, Self is the essence of all his ideas. Iqbal the spokesman of reality, is a person who influences the generations to come. His songs are sung by people, either special or common, of every class. The message of Islam is not for any single individual but for the world of man. Its effect is still alive today. In modern times, the Islamic nation is suffering from various problems. Some Muslim countries are victims of terrorism and oppression while some Islamic countries are living their luxurious lives without any realization of it. In these circumstances, anti-Islamic forces are slowly spreading their wings to dominate Islam. In different parts of the Muslim world, many anti-Islamic forces are showing their evil intentions and creating divisions in the Muslim community. The dream of the Islamic Nation is being taken away from reality.

In the present age, through the words of Iqbal, the Muslim community should learn a lesson and leave the old way of life and live a purposeful life with a new zeal and passion. The words of Iqbal are enough to create excitement in our hearts and make it a beacon for us to achieve the goal of our life.

Bengali is a language which became rich by using Persian and even today many words are still in Bengali language. The deep connection between Persian and Bengali language was established from 13th century. The exact number of Persian words in Bengali language is not available. Approximately 10000 Persian words are being used in Bengali language. Some words are used in everyday language and most people do not even know that these words are foreign words. Usage, translation of works of Persian poets and writers into Bengali began. Muslim writers and even some Hindu writers have translated Persian literature into Bengali. Many Bengali poets have translated LailaMajnoon, YousufZulaikha into Bengali. The works of Hafiz, Omar Khayyam, Jalaluddin Rumi and Ferdowsi have also been translated into Bengali.

Many poets of Bengali literature have been greatly influenced by Persian literature, philosophy and religion. The influence of Persian literature is evident in the writings of two great personalities of Bengali literature, Rabindranath Tagore and Qazi Nazrul Islam. Tagore was influenced by Hafiz's Sufism. Tagore's father was an ardent admirer of Hafiz's poems. The poetry of both Tagore and Hafiz reflects love, beauty and mysticism. QaziNazrul Islam knew Persian well. Perhaps he was more familiar with Persian literature than any other writer of Bengali literature in the twentieth century. Nazrul Islam has used Persian words very skillfully and has left behind every poet before or after him in this matter.

* Professor, Department of Urdu, University of Dhaka, Bangladesh.

The influence of Persian in Bengali literature has greatly strengthened Bengali literature. It has added a new flavor to Bengali literature and has greatly contributed to its development. I hope that this article will be equally popular among the ordinary people and the special people and will be accepted in the society.

عرصہ دراز سے ایرانی تاجر بنگال، خاص طور پر چٹاگانگ اور باریشال میں آتے تھے۔ نویں صدی کی ایک دستاویز کے مطابق باریشال اور کھلنا کا مغربی حصہ بنگال کے نام سے جانا جاتا ہے۔[۱] کیونکہ یہ ایک فارسی لفظ ہے لہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایرانی تاجروں نے اس خطے کا نام بنگال رکھا ہے۔

اسلام کی آمد کے بعد پہلے ہی عرب تاجر اور مبلغ بنگال آئے اور اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر صدیوں سے فارسی بولنے والے مبلغین اسلام کی تبلیغ کے لئے بنگال آئے۔ بعد میں فارسی بولنے والے مسلمان فاتح آئے۔ بنگال میں آنے والے تمام مبلغین، فاتحین، فوجیں اور کاروباری اور دیگر فارسی بولنے والے لوگ یہاں آباد ہوئے۔ اس لئے ہمیشہ بنگال میں ایک بڑی تعداد فارسی بولنے والی آبادی تھی۔ چینی مسافی ماہوان ۱۴۳۲ میں بنگال آیا اور اس نے دو زبانیں فارسی اور بنگالوگوں کے درمیان بولنے دیکھیں۔[۲]

اسلام سے پہلے کے بنگال میں بڑے پیمانے پر لوگ ناخواندہ تھے۔ مسلمان نے بنگال میں عام تعلیم فارسی میں متعارف کروائی۔۔ کیونکہ فارسی ریاستی زبان تھی اور اسلام کی تعلیم بھی فارسی کے ذریعہ آسان تھی۔ جو لوگ سرکاری ملازمت کے خواہشمند تھے وہ اچھی فارسی سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر مسلمان گھرانے میں فارسی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندوؤں کی زندگی میں بھی فارسی سیکھنا شروع کیا گیا تھا۔[3] ہندوستان کے دوسرے حصوں کی طرح بنگال کے باشندوں کے لئے بھی عربی کے ساتھ فارسی ملایا جانا ثقافتی زبان تھی۔[۴] مسلم حکمرانی کے دوران بنگال میں شاید ہی کوئی ناخواندہ شخص مل سکے۔ فارسی زبان کی تعلیم میں توسیع کی وجہ سے تمام لوگ تعلیم یافتہ تھے۔ یہ صورت حال روایتی طور پر انیسویں صدی کے وسط تک بھی طویل عرصے تک جاری رہی۔ ولیم ایڈم نے اپنی رپورٹ میں (۱۸۳۵ سے ۱۸۳۸) ذکر کیا ہے کہ انہیں مساجد اور امام باروں میں عربی اور فارسی زبان کی تعلیم ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بنگال اور بہار کی 40 ملین آبادی کے لیے ایک لاکھ پرائمری اسکول تھے یعنی ہر 400 افراد کے لیے ایک اسکول۔[۵]

بنگال میں فارسی زبان کی توسیع اس حد تک ہوئی کہ ادبی مشق بھی بہت حد تک پھیل گیا۔ بنگال میں لکھی جانے والی پہلی کتاب فارسی زبان میں تھی۔ یہ سنسکرت کی کتاب "امرتا کنڈا" کا ترجمہ تھا۔ تیرہویں صدی کے دوسرے عشرے کے آغاز میں قاضی رکن الدین نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اس کا عنوان بحر الحیات تھا۔[۶] اس کے بعد سیکڑوں فارسی کتابیں بنگال میں 150 سے زیادہ مصنفین نے لکھی تھیں اور ان میں اعلی درجے کے شاعر بھی تھے۔ نیز بنگال میں شائع ہونے والی پہلے اخبارات اور جرائد فارسی میں تھے۔ بنگال میں فارسی زبان کی گہری جڑیں اس حد تک تھیں کہ جب استعمار کے حکمرانوں نے ریاستی زبان کے طور پر فارسی زبان کو انگریزی کے ذریعے متبادل کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت دانشوروں کی ایک جماعت مسلمان اور ہندوؤں نے احتجاج کیا اور اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی اپیل کی۔[۷]

فارسی زبان 600 سال تک بنگال میں دفتری زبان تھی۔[8] فارسی زبان کے میٹھے میٹھے مترادف الفاظ نے بنگلا ادب کو متاثر کیا۔ ایران کے مسلمان ہجرت کر کے بنگال میں سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے بھی فارسی الفاظ بنگلا ادب میں داخل ہو گئے اور بہت مسلم شعراء ترقی یافتہ فارسی شاعری سے متاثر ہو کر بنگلہ زبان و ادب میں فارسی کے الفاظ استعمال کرنے لگے۔

فارسی بنیادی طور ایران، افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان کے کچھ حصوں میں بولی جاتی ہے اور انگریزوں کے اٹھارہویں میں پابندی عائد ہونے تک بہت سے ہندوستانی بادشاہوں کے دربار کی زبان بولی جاتی تھی۔

شمالی ہندوستان پر مسلمان حملہ کی آغاز ہی سے فارسی غزنوی عدالت کی زبان بن گئی۔ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک بڑے خطے کی سب سے ممتاز زبان کا درجہ حاصل کیا۔ فارس اور وسط ایشیا کے بہت سارے شاعروں اور سکالروں نے ۱۲۰۶ میں دلی سلطنت کے حکمرانوں کی طرف راغب کیا تھا۔ اور فارسی کے ادبی رجحانات نے ہندوستان کے پیچیدہ پیچیدہ ثقافتی نظریات کو اپنی آغوش میں رکھنا شروع کر دیا۔[9] صوفیانہ اخوت اور ہم آہنگی کے عقائد کے ایک مرکز نے فارسی پر سخت اثر ڈالا اور فارسی ثقافت جنوبی خطے میں مزید پھیل گئی۔ چنانچہ سلطنت کا دور علاقائی زبانوں کی ترقی کا دور تھا اور اس عمل میں بنگال کو سلطنت کی سرپرستی سے ترقی حاصل کرنے کا محرک ملا۔

بنگال کے باشندوں کی اصل زبان آسٹرک تھی اور آریوں کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کا انتقال ہو گیا۔ آریوں کی زبان کا نام قدیم ویدک زبان تھا جو بعد میں ادب کی زبان میں تبدیل ہوا۔ اصلاح شدہ نئی زبان کو'' سنسکرت ''زبان کا نام دیا گیا۔ یہ فرض کیا گیا تھا کہ بنگالی زبان کی ابتدا سنسکرت زبان سے ہوئی ہے۔ وقت گزرتے ہی زبان میں میں تبدیلیاں شروع ہوتی گئیں۔ آخر پراکرت زبان پیدا ہوئی جو عام لوگوں کی زبان بن گئی اور یہ نئی زبان مشرقی ہندوستان میں مستعمل تھی۔

ہندوراج کے دوران بنال کے لوگوں کی کوئی خاص زبان نہیں تھی۔ وہ مقامی بولیوں میں بات چیت کرتے تھے۔ کیونکہ حکمران طبقے سے مقامی لوگوں کی دشمنی اور نفرت تھی۔ لہذا حکمرانوں نے نہ تو کسی زبان میں اپنی بولی تیار کرنے یا سنسکرت میں ان کو خواندہ کرنے کے لئے کوئی قدم اٹھایا۔ بلکہ سنسکرت سیکھنے کو اعلی ذات کے درمیان محدود رکھا گیا تھا تب مسلمان آئے اور انہوں نے اس سرزمین کے لوگوں کو پہلی بار مذہبی فریضہ کے طور پر تعلیم یافتہ بنانے کے لئے اقدامات کئے۔ پال اور سین خاندانوں کے دور میں بنگالی زبان میں زیادہ ترقی نہیں ہوئی۔ قرون وسطیٰ میں بنگلہ زبان کی ترقی میں اضافہ ہوا۔ اس زبان نے ۱۳۵۰ سے ۱۸۰۰ کے عہد میں بہت ترقی کی۔ بنگلا شاعری ہندو اور مسلم شعراء پر مشتمل تھی۔ بنگلا زبان نے آہستہ آہستہ اس دور کے مسلمان سلطانوں کے فراخدلی سے اپنی ایک نشست حاصل کی۔

اختیار الدین محمد بختیار خلجی کی فتح بنگال (۱۲۰۴) نے بنگال کی ثقافت اور زبان میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں کیں۔ اختیار الدین محمد بختیار خلجی کی فتح بنگال (۱۲۰۴) اور مسلم حکمرانی (۱۲۰۴ سے ۱۷۵۷) کے دوران بنگال کی بدھو ہندو و مسلم ثقافتیں مجموعہ ہو گیں۔ جب بنال کے لوگوں کو پہلی بار ادب سے تعارف کرایا گیا تو ان کا تعارف فارس ادب سے ہوا۔ کیونکہ جب بھی بنگالی زبان تشکیل عمل میں تھی تو وہ فارس میں واقف ہو گئے۔ جب مخلوط بالی ایک آزاد زبان کی حیثیت سے اختیار کر گئی اور اس زبان میں کتابیں لکھی گئیں تو ان کتابوں میں مذہبی اور ادبی دونوں مشہور فارس کتابوں کے ترجمے تھے۔

مسلم دور حکومت میں بنگلا زبان کی سرپرستی کی گئی۔ شمس الدین یوسف شاہ، سلطان بنگال نے بنگلہ زبان میں'' بھگابت ''ہندو مذہبی کتاب کا ترجمہ کیا۔ اس طرح فارسی، عربی، ترکی، پرتگالی اور ڈچ الفاظ بنگلا میں جذب ہو گئے۔ بنگلہ زبان میں پہلا فارسی لفظ بنگلہ شاعر چاروچنڈیداس نے چودھویں صدی میں استعمال کیا اور بعد میں صدی کے آخر میں فارسی کے کچھ الفاظ بنگلہ زبان میں مستعار لے گئے تھے جس میں بنگلا الفاظ متبادل نہیں تھے۔ متوسطہ بنگلہ رومانی شاعری اور ادب میں فارسی شاعری کا سب سے زیادہ اثر ملا۔ بنگال میں فارسی ادب بہت مشہور ہوا۔ بنگال کے

مختلف لائبریری اور کتب خانوں میں فارسی شاعری اور ادب کے نسخے جیسے لیلی مجنوں، یوسف زلیخا محفوظ کیے گئے۔ دوسری طرف شیخ سعدی کی گلستان اور مولانا رومی کی مثنوی جیسی مشہور کتابیں تعلیم یافتہ لوگوں نے خاص طور پر بنال کے علما، یہاں تاکہ دور دراز دیہاتوں میں حفظ کی تھیں اور دونوں کا بنگالی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ فردوسی کی شاہنامہ کو بھی ترجمہ کیا گیا۔ رباعیات عمر خیام اور دیوان حافظ کا ایک سے زیادہ مرتبہ ترجمہ ہوا اور بنگلا ادب پر وسیع اثر پیدا ہوا۔ نیز دیوان امیر خسرو کا ترجمہ کیا گیا اور اثر ور سوخ پیدا کیا۔[10]

سلطان غیاث الدین اعظم شاہ (چودھویں صدی میں) نے حافظ کو بنگال کے دار الحکومت سونار گاؤں کے دورے کی دعوت دی۔ حافظ بنگال نہیں آ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک خوبصورت فارسی جوڑے "ہندی کے پرندے سب میٹھا ہو جائیں گے جب فارس کے مٹھائیاں بنگال آئیں گی "سلطان کو تحفہ کے طور پر بھیجے۔ اس کے ذریعے فارس اور بنگال کے مابین قریبی روابط اور بھی مستحکم بن گئے۔ پندرہویں صدی میں فارسی کی کہانی لیلا مجنو بنگال میں میں بہت مشہور ہوئی تھی۔ مسلم حکمرانی کے دوران فارسی زبان و ثقافت نے ترک اور افغانوں کو ایک طرف کیا اور بعد میں اس اصول کے تحت برصغیر پاک و ہند میں فارسی کو سرکاری زبان کے طور پر اپنایا گیا۔

فارسی ادب نے بنگلا ادب کو متاثر کیا۔ بہت سارے فارسی الفاظ بنگلا زبان وادب میں داخل ہوئے۔ بہت سارے ایرانی جو حکمرانوں کی خدمت میں پیش پیش تھے ان کے بنگال جانے کے سبب سے ممکن ہوا۔ ایرانیوں نے علما، اساتذہ اور شاعروں کی خدمات سمیت بہت سے کاموں میں خود کو مشغول کیا۔

اٹھارہویں صدی کے دوران بہت سے شیعہ مسلمان ایران سے آئے اور بنگال کے شہروں جیسے مرشد آباد، ڈھاکا، ہگلی وغیرہ میں آباد ہوئے۔ ایرانی نژاد افراد نے اضافہ ہوا۔ بعض نے اس ملک کو اپنا گھر بنالیا اور آباد ہو گئے۔ ان میں سے کچھ شمالی ہندوستان میں پھیل گئے۔ فردوسی، جامی اور نظامی جیسے فارسی عظیم مصنفین اور معمولی قسم کے شعرا کے لکھی ہوئی فارسی رومانوی کہانیاں بھی بنگال میں مشہور ہوئیں۔ سیف الملوک و بدیع الجمال کے بنگلا زبان میں دو نسخے موجود ہیں ان میں سے ایک آلاول اور دوسوا دولت غازی نے ترجمہ کیا۔

غالباً ۰۰۰۰ا فارسی الفاظ بنگلا زبان میں استعمال ہو رہے ہیں۔" ان میں سے کچھ ایسے ہیں جیسے

(1) محصولات، انتظامیہ اور قانون سے متعلق الفاظ مثال کے طور پر آئین -আইন، داروغہ-দারোগা، فیصلہ-ফয়সালা، فریاد-ফরিয়াদ،رای-রায়،وغیرہ۔

(2) بادشاہی، ریاست سے متعلق الفاظ، جنگ، تعاقب جیسے زمیندار-জমিদার، تحصیلدار-তাহশিলদার،نواب-নবাব، بادشاہ-বাদশা ،بیگم-বেগম، بہادر-বাহাদুর،-کمان-কামান، تیر-তীর،فوج-ফৌজ، شہر -শহরوغیرہ۔

(3) مذہب سے متعلق الفاظ جیسے خدا-খোদা، پیغمبر-পয়গম্বর، فرشتہ-ফেরেস্তা، بہشت-বেহেশত، دوزخ-দোযখ، مسجد-মসজিদ، عیدگاہ-ঈদগাহ، خانقاہ-খানকা، درگاہ-দরগাহ، نماز-নামায، روزہ-রোযা، مرثیہ-মরসিয়া،ماتم-মাতম، جائے نماز-জায়েনামায، وضو-ওজু، گناہ -গুনাহوغیرہ۔

(4) تعلیم سے متعلق الفاظ جیسے کاغذ-কাগজ، پیر-পীর، بزرگ -বুজুর্গوغیرہ۔

(5) عیش و آرام ، تجارت، فنون لطیفہ اور دستکاری سے متعلق الفاظ جیسے عطر-আতর، آئنہ -আয়না، گلاب-গোলাপ، چشمہ -চশমা، دالان-দালান، مخمل-মখমল، فراش -ফরাশوغیرہ۔

(6) جسم اور اس کے اعضا سے متعلق الفاظ جیسے بدن-বদন، پا-পা، سر-সার، گردان-গরদান، پنجہ-পাঞ্জা، دل-দিল وغیرہ۔

(7) لباس سے متعلق الفاظ جیسے چادر-চাদর، پردہ-পর্দা، سلور-সেলোয়ার، پیرہن-পিরাহান، بازو بند-বাজুবন্দ، قمر بند-কোমরবন্দ، پوشاک-পোশাক وغیرہ۔

(8) غذا سے متعلق الفاظ جیسے کالیہ-কালিয়া، کوپتہ-কোপ্তা، قرمہ-কোরমা، پلاؤ-পোলাও، بیریانی-বিরিয়ানি، گوشت-গোশত، پنیر-পনির، چا-চা، حلوہ-হালুয়া، کباب-কাবাব، قیمہ-কিমা، خوراک-খোরাক، کشمش-কিশমিশ، پستہ-পেস্তা، بادام-বাদাম وغیرہ۔

(9) قوم سے متعلق الفاظ جیسے ہندو-হিন্দু، فرنگی-ফিরিঙ্গী وغیرہ۔

(10) کاروبار سے متعلق الفاظ جیسے کاری گر-কারিগর، خدمت-খিদমত، خدمت گار-খিদমতগার، چاکر-চাকর، دکان دار-দোকানদার، بازی گر-বাজিকর، جادو گر-জাদুকর وغیرہ۔

(11) خاندان اور رشتہ دار سے متعلق الفاظ جیسے بابا-বাবা، ماں-মা، برادر-বেরাদার، دادا-দাদা، خالہ-খালা، داماد-দামাদ، شوہر-শওহার، کنیز-কানিয، دوست-দোস্ত، یار-ইয়ার وغیرہ۔

(12) مرد و عورت کے ناموں سے متعلق الفاظ جیسے دل افروز-দিলআফরোজ، دل ربا-দিলরুবা، نور جہان-নুরজাহান، جمشید-জামশিদ، رستم-রুস্তম، سہراب-সোহরাব وغیرہ۔

(13) مقامات سے متعلق الفاظ حمام خانہ-হাম্মামখানা، غسل خانہ-গোসলখানা، مسافر خانہ-মুসাফিরখানা، یتیم خانہ-ইয়াতিমখানা، کارخانہ-কারখানা، آسمان-আসমান، زمین-জমিন، بازار-বাজার وغیرہ۔

(14) پرندے اور حیوانات سے متعلق الفاظ جیسے بلبل-বুলবুল، کبوتر-কবুতর، باز-বায، طوطی-তোতা، گائے-গাই، خرگوش-খরগোশ، حیوان-হাইওয়ান، جانور-জানোয়ার وغیرہ۔

(15) زندگی کی عام چیزوں اور نظریات سے متعلق الفاظ جیسے آواز-আওয়াজ، آب ہوا-আবহাওয়া، افسوس-আফসোস، کم-কম، گرم-গরম، تازہ-তাজা، نرم-নরম، پیشہ-পেশা، لال-লাল، سبز-সবুজ، ہوشیار-হুশিয়ার، ہردم-হরদম وغیرہ۔

(16) شہر اور صوبے سے متعلق الفاظ جیسے نواب پور-নবাবপুর، گلستان-গুলিস্তান، راجشاہی-রাজশাহী، رنگ پور-রংপুর وغیرہ۔[12]

بنگلا ادب کے بہت سے شعرا فارسی ادب، فلسفہ، اور مذہب سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ بنگلا ادب کے دو عظیم ترین شخصیات رابندر ناتھ ٹیگور اور قاضی نذر الاسلام سمیت بہت سارے بنگلا شاعر فارسی ادب سے متاثر ہوئے، خاص طور رومی، حافظ اور عمر خیام سے۔ ٹیگور حافظ کے تصوف سے متاثر تھے۔ ٹیگور کے والد حافظ کے نظموں کے پر جوش مداح تھے اور ٹیگور کی شاعری میں حافظ کی شاعری کی طرح محبت، خوبصورتی اور تصوف کے موضوعات ملتے ہیں۔ دوسری طرف، قاضی نذر الاسلام فارسی کو بخوبی جانتے تھے۔ اور فارسی ادب سے اتنا زیادہ متاثر ہوا جو ان کی تخلیقات میں جھلکتا تھا اور اپنے کاموں کے ذریعہ اس نے اپنی عمر کے لوگوں اور آنے والی نسل کو متاثر کیا۔

نذرالاسلام نے اپنے گانوں میں زیادہ تر فارسی ادب کے اثر ورسوخ کی عکاسی کی۔ شاید اس نے دنیا کے ادب کی تاریخ میں کسی بھی دوسرے مصنف سے زیادہ گانے لکھے ہوں۔انہوں نے پانچ ہزار سے زیادہ گیت لکھے۔ان میں سے بہت سے گانوں میں افکار، روح، طرز، دھن، روایات، الفاظ اور یہاں تک کہ فارس ادب اور ایران کے ورثے کی عکاسی ہوتی ہے۔[13]

نذر الاسلام نے اپنی تخلیقات میں سیکڑوں فارس الفاظ استعمال کئے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر فارس اصطلاحات استعمال کئے ہیں۔ جیسے (شارب)(شراب)، ساقی (شراب پلانے والا)وغیرہ۔ بعد میں دوسروں نے بھی اس کی پیروی کی۔ بلبل (ایک چڑیا)، لالہ (ٹیولپ)، نرگھس (ایک پھول)، نوروز(نئے سال کادن)وغیرہ کااستعمال قارئین اور سامعین کوایرانی ماحول کی طرف لے جاتاہے۔اس معاملے میں اس سے پہلے یابعد میں ہر شاعر کو پیچھے چھوڑ دیاہے۔

نذرالاسلام کے زیر اثر شاعر حلقہ بھی بنیادی طور پر ان کی تخلیقات کے ذریعے فارسی ادب سے بنگلاادب کو متاثر کیا۔بنگلاادب میں فارسی کے اثر نے بنگلاادب کو بہت تقویت بخشی ہے۔اس نے بنگلاادب میں ایک نیاذائقہ شامل کیاہےاوراس کی ترقی میں بہت تعاون کیاہے۔

حوالہ جات

۱۔چاندانہ سلطانہ، بنگو بھومی وبنگو بھاشا(بنگال اور بنگلازبان)، روزنامہ جونو کونٹھو، ڈھاکا، ۱۲۔۲۔۲۰۰۰

۲۔ براتیندر ناتھ مکھرجی، بنگلابھاشارنام کوتودینیر(بنگلازبان کانام کتنے دن کا)، روزنامہ اتفاق، ڈھاکا، ۲۷۔۲۔۱۹۹۳

۳۔سید علی احسن، بنگلادیشیر سنسکریتی(بنگلادیش کی ثقافت)، روزنامہ اتفاق، ڈھاکا، ۴۔۱۰۔۲۰۰۲

۴۔سید مصطفی علی بریلوی، انگریزوں کی لسانی پالیسی، کراچی، ۱۹۷۰، صفحہ ۱۴۲

۵۔ڈاکٹر محمد عبدالرحیم، بنگلار مسلماندیرا تیہاش ۱۷۵۷۔۱۹۴۷(بنگال کے مسلمانوں کی تاریخ)۳۔۲، بلاک۔اے، لال ماٹیہ ہوجِنگ اسٹیٹ، ڈھاکا، ۱۹۷۶

۶۔ڈاکٹر محمد عبداللہ، بنگلادیشے فارسی ساہتیہ (بنگلادیش میں فارسی ادب)، اسلامک فاونڈیشن بنگلادیش، ڈھاکا، ۱۹۸۳، صفحہ ۳۰

۷۔ایضا، صفحہ ۶۵۔۶۶

۸۔بنگلاپیڈیا، فارسی

Sarah Anjum Bari, The Daily Star, Friday April 12, 2019۔۹

NurHosainMajidi, Daily New Nation, Dhaka, 31.07.2007۔۱۰

Sarah Anjum Bari, The Daily Star, Friday April 12, 2019۔۱۱

۱۲۔بنگلاپیڈیا، فارسی

Nur Hosain Majidi, Daily New Nation, Dhaka, 31.07.2007۔13

গবেষণা পত্রিকা (A Research Journal), Faculty of Arts, University of Rajshahi
Special Volume-4 on Issues and Discourses around Liberal Arts and Humanities
2nd International Conference, 13-14 November 2022, ISSN 1813-0402

اردو شاعری میں انسان دوستی
(Humanism in Urdu Poetry)

Dr. Md. Israfil*

Abstract: Humanism is a progressive philosophy of life that emphasises the importance of human values and dignity. It focuses on helping people to live well, achieve personal growth, and make the world a better place. The poetry works of the poets of a society are the mirror of that society. Poets highlight the positive and negative aspects of a society. Urdu poets were always engaged in establishing humanism in the society and in the pursuit of universal welfare of the people. Mir Taqi Mir, Mirza Ghalib, Hali, Allama Iqbal, Mozaffar Hanafi and others have sung the praises of humanity all their lives through their poems. This article will highlight the nature of humanity in Urdu poetry through study of the poems of these famous poets.

ادب میں انسانی دوستی کا مطلب انسانی محبت، حقوق انسانی کی حمایت، انسانی فلاح و بہبود کو مقصد حیات سمجھنااور انسانیت پرستی کو فروغ دینا ہے۔ دنیا کے تمام ادب میں جس چیز کو مرکزی اہمیت دی ہے وہ انسان ہے۔ انسان کی عظمت انسان کا احترام انسان سے محبت انسان کے حقوق اور انسان کے مقام و مرتبہ پر دنیا کے تمام ادب میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی شاعر ایسا نہیں جو انسان دوست نہ ہو۔ سب ہی نے انسان کے درمیان مضبوط رشتہ استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہاں انسان دوستی کے سلسلے میں چند اردو شعرا کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

اردو شاعری میں جب انسانیت نوازی یا انسان دوستی کی بات آئے گی تو نظیر اکبر آبادی (1735-1830ء) کلام کو سب سے پہلے یاد کیا جائے گا کیونکہ نظیر اکبر آبادی کے کلام کے جائزہ لینے کے بعد یہ بات کلیتہ واضح ہو جاتی ہے کہ اردو شاعری کی دنیا میں انسانوں سے محبت اور لگاؤ رکھنے والا یہ واحد شاعر تھا جس نے اپنی شاعری کی ابتدا ہی ایسے ماحول سے کی جہاں عوام سے دلچسپی اور لگاؤ اور محبت کا پیدا ہونا فطری بات تھی۔ نظیر کی شاعری کا موضوع عام انسان ہے اس لئے انہوں نے اپنے کلام میں انسانی زندگی کے گوناگوں مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے عوام کے ہر طبقہ کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اور ہر چھوٹے بڑے خاص و عام سب کو یکساں جگہ دی۔ اپنی نظموں میں ہر طبقہ کے لوگوں کا ذکر کر کے نظیر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے لئے تمام انسان برابر ہیں۔ خواہ امیر ہوں خواہ غریب ہوں اور ہر انسان اپنے پیشہ و مقام و منصب کے لحاظ سے برابر کی توجہ کا مستحق ہے۔ نظم "آدمی نامہ" میں انہوں نے تمام انسانوں کی برابری کو ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں :

دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی
اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی
زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی
نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی

نظیر اپنے نظموں کے ذریعے انسان کی عظمت، محبت اور مساوات کا درس دیتا ہے۔

---

* Professor, Department of Urdu, University of Dhaka, Bangladesh.

میرزاغالب (1869-1797ء)اردوزبانکے سبسے بڑے شاعروںمیںا یکسمجھے جاتے ہیں۔یہتسلیمشدہباتہے کہ 19
ویں صدیغالبکیصدیہے۔انکے فکروخیالکا محورانسانہے۔ان کے کلامیںانساندوستیقدمقدمپر جھلکتیہے
۔غالبمیلادآدمیتپر بہتتفصیلکے ساتھاظہارخیالنہیں کرتے لیکنانسانیعظمتوانفرادیتپر باربار روشنیڈالتے ہیں۔

انسانکیعظمتاورسربلندیکاانکواسقدراحساسہے کہوہاسکائناتکیکسیشئے کوانسانکے بالمقابلدرخوراعتنانہیں سمجھتے۔
وہحضرتآدمکے سامنے فرشتوں کےسجدہریزیاورانساناولکے جنتمیں قیامکیسے مہتمبالشانواقعاتکو بھولنے کے لئے تیار نہیں۔غالبلکھتے ہیں :

ہیںآجکیوںذلیلکہکلتکنتھیپسند
گستاخیفرشتہماریجنابمیں

غالبانسانیتکیمنزلتکرسائیآساننہیں سمجھتے ہیں۔وہزمانہکیاسستمظریفیپر حیرانہیں کہبنیادمکوابانسانبننے میں بھیہزاروںدشواریوں کاسامناہے۔
وہکہتے ہیں :

بسکہدشوارہے ہرکامکاآساںہونا
آدمیکو بھیمیسرنہیںانساںہونا

غالبانساندوستیکے لئے اولینشرطیہقراردیتے ہیں کہآدمیاپنے پندارکابتکھناچورکردے۔
غالبصوفیاکے اسطبقہسے اپنے کو معلققراردیتے ہیں فخرمحسوسکرتے تھے جو
"ملامتیہ، کہلاتاتھایعنیوہلوگخلقخداکیلعنتوملامتپرصبروتحملکوکسرنفسکاایکبہترینوسیلہسمجھتے تھے اورروحکیبلندیاورانسانکیداخلیاصلاحکاایکاچھاطریقہ تصورکرتے تھے۔غالبلکھتے ہیں :

دلپھرطوافکوئے ملامتکوجائے ہے
پندارکاصنمکدہویرانکیے ہوئے

روشناسخلقہونااورعوامسے خودکوجوڑے رہناغالبکے نزدیکعینتقاضائے انسانیتہے۔
انیسویں صدی کے شعراء میں مولاناالطاف حسین حالی (1914ء- 1837ء) سب سے بڑے انسان دوست شاعر نظر آتے ہیں۔ہمیں ان کی شاعری میں قدم قدم پرانسان دوستی کی قدریں جلوہ گر نظر آتی ہیں۔حالی کی ایک مشہور نظم "حب وطن' ہے جس میں انہوں نے وطن اور اہل وطن کو خراج عقیدت پیش کیاہے،ساتھ ہی ساتھ ان کی انسانیت نوازی کے احساسات کے آئینہ دار بھی ہے۔اس نظم میں وہ وطن سے محبت کو

ایک فطری جذبہ قرار دیتے ہیں جو انسان کو انسان سے جوڑ دیتا ہے اور ربط و تعلق کے مضبوط رشتے کو اور بھی استوار کرتا ہے۔ وہ ملک کی عیش پرستوں اور اہل دولت کو غریبوں کی حالت زار کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو انسان دوستی کا ایک اہم پہلو ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں۔

اہل دولت کو ہے یہ استغنا کہ نہیں بھائیوں کی کچھ پرواہ
قوم مرتی ہے بھوک سے تو مرے کام انہیں اپنے حلوے مانڈے سے
گر رہا چاہتے ہو عزت سے بھائیوں کو نکالو غربت سے

ایک اور مثنوی "کلمۃ الحق" میں حالی انسان دوستی کی ایک اہم اساس یعنی حق گوئی کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے لئے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت بیان کرتے ہیں۔ حالی کے نزدیک حق گوئی کا امر اگرچہ بہت دشوار ہے لیکن جب سماج کے ہر افراد سچائی اور راست بازی کی راہ پر چلے تو پھر کسی انسان کو کسی سے کوئی آزار نہ پہنچے اور باہمی انسانی مروت قائم ہو جائے۔

ہوتا نہ ہرگز جگت میں اجالا حق کا نہ ہوتا گر بول بالا
اے راست گوئی اے ابر رحمت ہے اس چمن میں سب تیری برکت

حالی نے اپنی شاعری میں عورتوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ سرسید کی تحریک سے متاثر ہو کر حالی نے کئی ایسی نظمیں لکھیں، جن میں انسانیت اور انسان دوستی کی عکاسی ملتی ہے۔ "مناجات بیوہ"، "چپ کی داد"، "رحم و انصاف" وغیرہ موضوعاتی نظموں کا سلسلہ کافی مشہور ہے۔ مثنوی "مناجات بیوہ" کے ہر شعر سے حالی بنی نوع انسان کی کمزور صنف عورت اور وہ بھی بیوہ کے ساتھ زبردست ہمدردی اور دردمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سماج میں بیوہ کو جو مقام حاصل ہے اس کے خلاف زبردست صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ حالی کی زبان میں بیوہ کی فریاد ملاحظہ ہوں:

اے مرے زور اور قدرت والے حکمت اور حکومت والے
میں لونڈی تیری دکھیاری دروازے کی تیری بھکاری
بات سے نفرت کام سے وحشت ٹوٹی آس اور بجھی طبیعت
دن بھیانک رات ڈراؤنی یوں گزری ساری یہ جوانی

حالی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عالمی انسان دوستی کے داعی ہیں۔ وہ انسان کو خواہ زمین کے کسی حصہ میں ہو محترم قرار دیتے ہیں اور زمین کے ہر حصہ میں محبت و اخوت کے چراغ روشن کرنے کے آرزومند ہیں۔ انکی پوری شاعری قومی ہمدردی اور انسان دوستی کا نوحہ ہے۔

علامہ اقبال(۱۹۳۸ء- 1877ء)شاعر بھی تھے اور مفکر بھی۔وہ احترام آدمیت کے لئے تڑپے ہی نہیں بلکہ تڑپنے کا طریقہ سکھایا۔انہوں نے حصول انسانیت کے لئے فلسفہ خودی کو روشن مینارے کی طرح پیش کیا جس میں انسان کی ہستی خدا کی وحدہ لاشریک ہستی سے علیحدہ رہتی ہے مگر اسکے کارنامے جلوہ خدا کا مظہر ہوتے ہیں۔

اقبال اپنے اشعار کے ذریعہ جس خودی کی تعلیم دیتے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں، تمام انسانوں کیلئے ہے،ان کے نزدیک انسان کی خودی کی تکمیل مذہب کی اعلیٰ قدروں میں مضمر ہے،اسی لئے اقبال نے اپنی شاعری کا موضوع انسان کو بنایا ہے اور انسانیت کے مسائل حل کرنا وہ اپنی شاعری کا مقصد قرار دیتے ہیں،ایک ایسے عہد میں،جب قومی و وطنی عصبیت کا بول بالا ہے،ایک ملک کا انسان،دوسرے ملک کے انسان کو گوارہ نہیں کرتا اور ایک فرقہ،دوسرے فرقہ کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے،اقبال نے پوری جرأتمندی کا مظاہرہ کرکے اس رویہ کو ننگِ انسانیت قرار دیا ہے:

یہی آدم ہے سلطان، بحر و بر کا
کہو کیا ماجرا،اس بے بصر کا
نہ خود بیں،خوابین جہاں بیں
یہی شہ کار ہے، تیرے ہنر کا

شاعر مشرق کے نزدیک انسان کسی بھی نسل،فرقے یا جماعت سے تعلق رکھتا ہو،اس سے امتیاز برتنا جرم ہے کیونکہ اس انسان کو وجود بخشنے والا ایک ہے،جب اس نے بنی نوع انسان کے لئے ہوا، پانی،غذا اور روشنی کے انتظام میں کوئی تفریق نہیں برتی اور یکساں طور پر سب کے لئے اس کو مہیا کیا تو انسانوں کے لئے یہ کیونکر مناسب ہے کہ وہ باہم تفرقہ اندازی سے کام لیں،اس کا پیغام،پیغمبروں،اوتاروں، مصلحوں اور بزرگوں نے بھی دیا ہے:

شکتی بھی شانتی بھی، بھگتوں کے گیت میں ہے
ہم دیش واسیوں کی مکتی،پریت میں ہے

اقبال نے انسانوں کے لئے ایک ایسے سماج کا خواب دیکھا، جس میں توازن ہو،عشق کے ساتھ عقل مل کر ارتقاء کی طرف گامزن رہے،ان کے نزدیک یہی انسانیت کی معراج ہے، جس کی بازیابی وقت کی اہم ضرورت ہے۔

جوش ملیح آبادی(۱۹۸۲ء— ۱۸۹۸ء)اردو ادب کے نامور اور قادر الکلام شاعر تھے۔انہیں شاعر انقلاب اور شاعر شباب کہا جاتا ہے۔
وہانساںپر ہونے والے ہر ظلمو جبر کے خلافآواز بلند کرتے تھے۔سماجینا برابریاور بے انصافیکے وہسخت شمنتھا۔انکینظمیں "غلاموں سے خطاب"، "نعرہشباب"،"زنداں کا گیت"،"شکستزنداں کا خواب"،"مردانقلابکیآواز"و"نادارانازلیکاپیامشنشاہہندوستانکے نام" وغیرہسبکیسبغلامیکے بندھنتوڑدینے کے لئے اکساتیہیں۔اننظموں میں وہانساندوستشاعرکیحیثیتسے سامنے آتے ہیں۔

جوشؔ انسانکی دردناک زندگیکی تصویر کشی کرتے ہیں جو اپنے زبردست محنت و مشقت کے باوجود سرمایہ دار انہ استحصال کی وجہ سے عزت و وقار کی زندگی بسر نہیں کر پاتا۔ اور دوسروں کے لئے لذیذ غذا اور اشیاء کی فراہمی کرنے والا خود زندگی کی آسائشوں سے محروم رہتا ہے۔
جوشؔ اس موقع پر اس پورے نظام ظلم و فساد کو ملامت کرتے ہیں جو غریبوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا اور ہر شخص کو اسکی محنت کا پھل پانے سے محروم کر دینا چاہتا ہے
۔

قطعہ

ہو تی ہیں نہیں تاریکی حرماں سے راہ
فاقہ کشی بچوں کے دھندلے آنسوؤں پر ہے نگاہ

جوشؔ کے نزدیک فرقہ پرستی بشریت میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ انکے نزدیک مذہب کی اصل پر نگاہ رہے تو اختلاف پیدا نہ ہو۔ وہ امتیاز گبر و مسلمان مٹانے کے لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر شخص پہلے اپنے کو انسان سمجھے پھر کچھ اور:

انسان کو نہ دید ہجور و جفا سے دیکھ
اسے بندہ خدا تو نگاہ خدا سے دیکھ

اس طرح جوشؔ کے کلام میں ایک طرف مظلوموں کی داد رسی اور کمزوروں کی حمایت اور ظلم و جبر اور طاقت کے زور پر انسانیت کو روندنے والوں کی مذمت پر مشتمل ہے اور انکی انسان دوستی کی شناخت کو نمایاں کرتا ہے۔

فیض احمد فیض (1984ء – 1911ء)
کا شمار بیسویں صدی کے ان چند بڑے شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے بلا تفریق پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کے حق میں آواز بلند کی۔ وہ انسانی حقوق کے علمبردار تھے۔ وہ انسانیت کے مجموعی مسائل اور ضرورتوں کی طرف متوجہ رہے۔
انسان کے دکھ درد، رنج، خوشی اور مسرت کو فیض اجتماعی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔
فیض انسان کو دنیا کی بقا اور انسان کے بہتر مستقبل کے لئے ضروری سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ عالمی تحریک سے وابستہ رہے۔
افسردگی، مایوسی اور ناامید کا گزر فیض کی تحریروں میں شاذ ہی ملتا ہے کیوں کہ زندگی سے متعلق انکا نظریہ تھا کہ زندگی خواہ کچھ بھی دکھائے بالآخر بہت خوبصورت ہے اور بہت حسین بھی ہے:

ملک شہر زندگی تیرا
شکر کس طور سے ادا کیجئے
دولت دل کا کچھ شمار نہیں
تنگدستی کا کیا گلہ کیجئے

فیضاحمد فیضنے حقآزادی، انساندوستی، حبالوطنی، انسانیقدروں کیپامالی، سماجکیریاکاری، سیاسیمفادپرستیاور پھیلتے سامراجینظاموغیرہکو نہصرف اپنیشاعریکا موضوعبنایا بلکہانموضوعات کیپیشکشمیں اپنے ہمعصروں سے سبقتبھیلے گئے۔
فیضتمامعمر اُنطاقتوں کے خلافجدوجہد کرتے رہے جوانسانیقدروں کو طرحطرح سے پامالکررہے تھے۔

علی سردار جعفری (2000ء-1913ء) کی شخصیت شش جہت تھی۔ وہ بیک وقت ایک عظیم شاعر، ممتاز ادیب، مستند نقاد، بہترین مرثیہ گو، اچھے افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں دونوں کے ذریعے انسان دوستی اور انسانیت سے بے پناہ ہمدردی کا پیغام دیا ہے۔ ''پتھر کی دیوار''، ''میرے خواب''، '' ایک خواب'' اور '' جیل کی رات'' قابل ذکر ہیں۔ تمام نظموں میں جوش و خروش کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ ولولہ کا دبدبہ محسوس ہوتا ہے اور انسان وانسانیت دوستی کا غلغلہ سنائی دیتا ہے۔ سردار اپنی ایک نظم "آنسوؤں کے چراغ " میں مہاجر عورتوں سے یوں مخاطب ہیں:

شریف بہنو!
غیور ماؤں!
تمہاری آنکھوں میں بجلیوں کی چمک کے بدلے یہ آنسوؤں کا وفور کیوں ہے ؟
میں اپنے نغمے کی آگ لاؤں
تم اپنی آہوں کی مشعلوں کو جلا کے نکلو
ہم اپنی روحوں کی تابناکی سے اس اندھیرے کو پھونک دیں گے۔

علی سردار جعفری کی نظموں میں سیاسی، انقلابی اور سماجی شعور کا دریا متموج نظر آتا ہے، مثلاً "ایشیا جاگ اٹھا "، "نئی دنیا کو سلام "اور" امن کا ستارہ " وغیرہ۔ یہ سب ایسی نظمیں ہیں، جن میں انھوں نے نئی نئی تشبیہوں اور استعاروں کے پیرائے میں بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، انسان و انسانیت سے اپنی بے پناہ دوستی کا بین ثبوت پیش کیا اور پوری توانائی کے ساتھ انقلاب کا علم بلند کیا تھا۔ درج ذیل اشعار سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے:

نئے زمان و مکاں، انقلاب زندہ باد
نئی ہے عمرِ رواں، انقلاب زندہ باد
دمک رہی ہیں فضائیں، چمک رہے ہیں فلک
بلند شعلۂ جاں، انقلاب زندہ باد

انسان دوستی اور انسانیت سے ہمدردی ان کا وطیرہ تھا، چنانچہ انہوں نے پوری زندگی اپنی تمام طرح کی نثری اور شعری تحریروں کے ذریعے، یہاں تک کہ تقریروں کے توسط سے بھی انسان دوستی کا عملی مظاہرہ کیا، اسی لیے علی سردار کو انسان دوستی کا بہت بڑا سپہ سالار و علمبردار سمجھا جاتا ہے۔ آج انسانیت خطرے میں ہے۔ انسان دوستی کے بجائے عدم رواداری کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ میں پیار و محبت کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ اردو شعرا انسانیت کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش یاد دلاتے ہیں۔ بقول حالی:

یہی ہے عبادت یہی دین وایمان
کہ کام آئے دنیا میں انساں کے انساں